সমরেশ মজুমদার

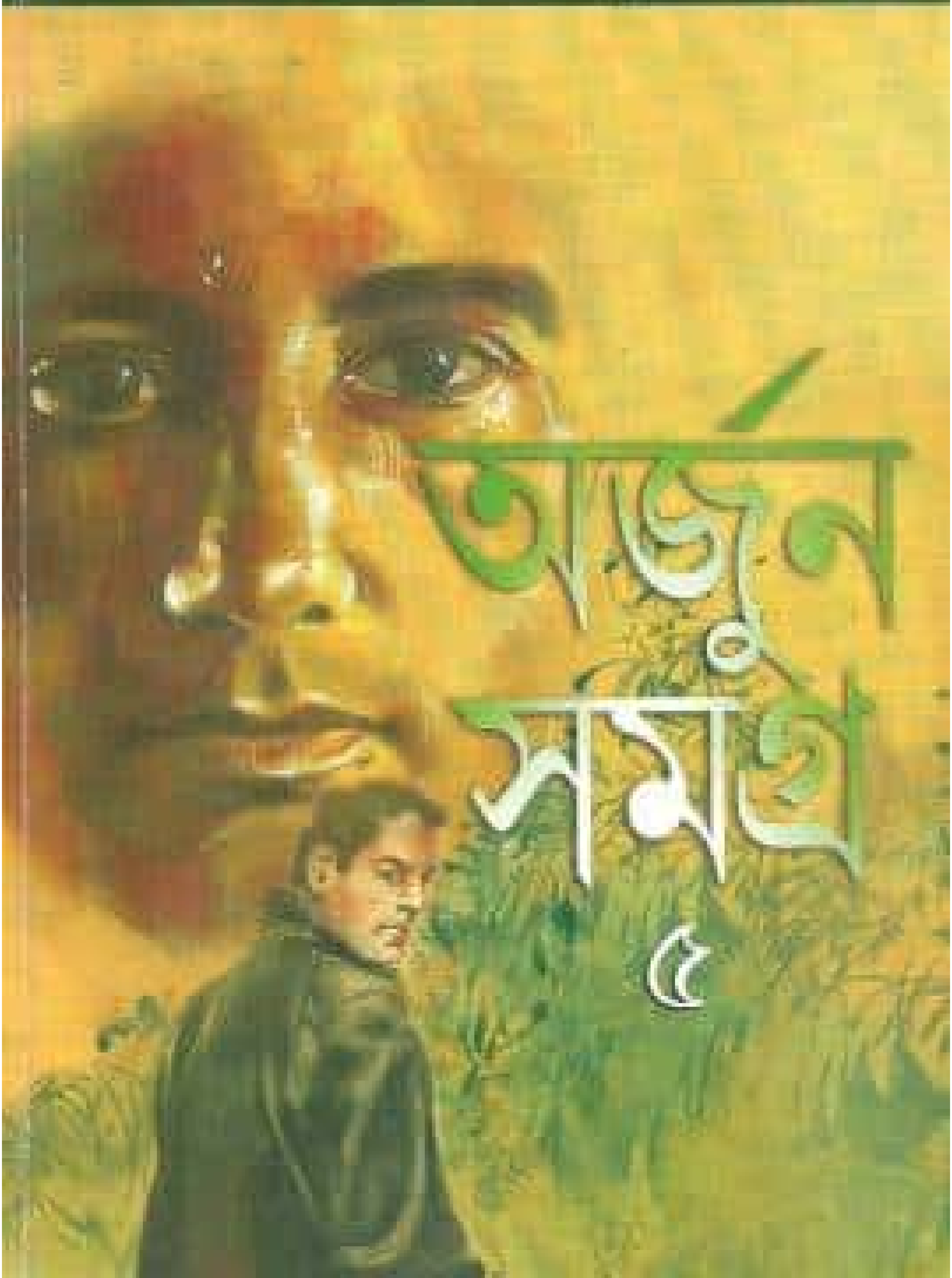

অর্জুন সমগ্র ৫

সমরেশ মজুমদার

সূচীপত্র

অর্জুন @ বিপবিপ ডট কম

মানুষ পাচার

নবাবগঞ্জের নরখাদক

অর্জুন এবার নিউইয়র্কে

বিশল্যকরণী

দাসবংশ ধ্বংস

অর্জুন@বিপবিপ ডট কম (২০০৬)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১. কদমতলার মোড়ে

অর্জুন@বিপবিপ ডট কম (২০০৬)
অর্জুন সমগ্র ৫ – সমরেশ মজুমদার

কদমতলার মোড়ে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল জগন্নাথদা। জলপাইগুড়ি শহরের কিছু এই মানুষ অনেক চেষ্টা করেও ব্যবসায় সফল হতে পারেননি। না পারার কারণ তাঁর সততা। এই জগন্নাথদাকে অনেকদিন ধরে চেনে অর্জুন। বাড়ির নীচে বড় রাস্তার উপর তাঁর দোকান। গত দশ বছরে অন্তত তিনবার দোকানের চরিত্র বদলাতে বাধ্য হয়েছেন ব্যাবসা না জমায়। এখন করছেন। মোবাইলের ব্যাবসা।

প্রথম দিকে বেশ ভিড় দেখেছে অর্জুন জগন্নাথদার দোকানে। ইদানীং লোকজন চোখে পড়ত না। খদ্দের নেই বলেই বোধহয় জগন্নাথদা দোকানের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। অর্জুন পাশে গিয়ে দাঁড়াল, কী ব্যাপার? বাইরে দাঁড়িয়ে আছ?

ভিতরে বসে কী করব? খদ্দের কোথায়?

সেকী! এখন তো প্রায় পঞ্চাশভাগ মানুষের হাতে মোবাইল। তোমার তো ব্যাবসা ভাল হওয়া উচিত। অর্জুন বলল।

তুমি সত্য অন্বেষণ করে বেড়াও, অথচ কোনও খবর রাখে না। আমার দোকানে এসে মোবাইল কিনলে কাস্টমারকে তার আইডেন্টিটির প্রমাণ দ্যাখাতে হয়। ফর্ম ভরতি করতে হয়। কোনও মোবাইল কোম্পানির পোস্ট-পেড কানেকশন নিতে হলে নিয়মকানুন মানতে হয়। তা ছাড়া আমি কোম্পানির কাছ থেকে যে-দামে সেট নিয়ে আসি, তাতে খুব বেশি কমিশন পাই না। তাতেই এক-একটা সেট চার থেকে পাঁচ হাজারের কমে বিক্রি করা যায় না। অথচ জলপাইগুড়িতে দেড়-দু'হাজারে প্রচুর সেট পাওয়া যাচ্ছে অনায়াসে। কোনও নিয়মকানুন নেই। অতএব লোক।

আমার কাছ থেকে কিনবে কেন? শ্বাস ফেললেন জগন্নাথদা।

এত সস্তায় সেট কী করে পাচ্ছে? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

বিদেশ থেকে স্মাগলাররা নিয়ে আসছে। এখন ক্যামেরা লাগানো মোবাইল সেট ছ'হাজারে কেনা যাচ্ছে। জগন্নাথদা বললেন।

কিন্তু সেগুলো খারাপ হয়ে গেলে?

সাধারণত দু-তিন বছরের মধ্যে খারাপ হয় না। কি-প্যাড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। চল্লিশ টাকা খরচ করলে নতুন প্যাড লাগিয়ে নেওয়া যায়?

পুলিশ কিছু বলছে না?

জানি না ভাই। দেখবে সবাই প্রি-পেড কার্ড ব্যবহার করে। ফলে কোনও অপরাধীকেই মোবাইলের সূত্র ধরে ধরা যাবে না।

কাছাকাছি কাউকে পাওয়া যাবে, যে চোরাই সেট বিক্রি করে?

রূপমায়া সিনেমায় যারা টিকিট ব্ল্যাক করে, তাদের কাছে গিয়ে খোঁজ করো, পেয়ে যাবে। জগন্নাথদা বললেন।

.

এখন বিকেল। রূপমায়াতে শাহরুখের ছবি চলছে। হাউসফুল। ম্যাটিনি ভেঙেছে একটু আগে। অর্জুন হলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ ভিড়। কানে এল গুনগুনানি, কুড়ি পঞ্চাশ, কুড়ি পঞ্চাশ। সঙ্গে সঙ্গে একজন ছেলেটার কাছ থেকে চারটে টিকিট কিনে নিল। এইসময় অর্জুনের সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল টাকমাথা একটা লোক, দাদা আপনি? সিনেমা দেখবেন?

লোকটাকে কয়েকবার দেখেছে বলে মনে হল অর্জুনের। সে কিছু বলার আগেই লোকটা বলল, বাম্পার হিট। হাউসফুল চলছে। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনাকে দামে-দামেই টিকিট দিতে বলে দিচ্ছি ওদের।

কেন?

কী যে বলেন! আপনাকে কে না চেনে? আপনার একটা ফোনে এস পি সাহেব চলে আসবেন দশ মিনিটের মধ্যে! জানি না নাকি? লোকটা হাসল।

অর্জুন মাথা নাড়ল, রাস্তা থেকে ফোন করব যে, ফোন কোথায়?

কেন? আপনার মোবাইল নেই? টাকমাথা নোকটা খুব অবাক হল।

একটু ভাবল, আপনি কাল সকালে বাড়িতে থাকবেন?

কেন?

যে মোবাইল বিক্রি করে, তাকে বলব, বেশ কয়েকটা সেট নিয়ে যেতে। আপনি পছন্দ করে নেবেন। দামের জন্যে ভাববেন না, বাজার থেকে অনেক কমে পাবেন।

আমার বাড়ি কোথায় জানা আছে?

কী যে বলেন দাদা! এখন বলুন, সিনেমার ক'টা টিকিট লাগবে?

না না। আমি এক বন্ধুকে খুঁজতে এসেছিলাম। সিনেমা দেখতে নয়।

.

ঠিক সকাল নটায় টাকমাথা লোকটা বেঁটে মোটা মানুষকে নিয়ে এল। লোকটার হাতে একটা অ্যাটাচি। সেটা খুলতেই অর্জুন নানা মডেলের মোবাইল সেট দেখতে পেল। লোকটি বলল, এগুলো উইথ ক্যামেরা এবং রেডিয়ো। কানে এই নবটা ঢুকিয়ে রাখলে আপনাকে আর সেট হাতে ধরে রাখতে হবে না। গাড়ি বা বাইক চালাতে চালাতে আরামসে কথা বলতে বা শুনতে পারবেন। এগুলোয় রেডিয়ো নেই, শুধুই ক্যামেরা। আর এগুলো অর্ডিনারি সেল, কিন্তু তিন বছরের মধ্যে ব্যাটারি চেঞ্জ করতে হবে না।

এগুলো ব্যবহার করা সেট নয় তো?

কী বলছেন স্যার! একেবারে অরিজিন্যাল নিউ সেট আসছে বাইরে থেকে। এই দেখুন। এই নম্বর টিপলেই দেখতে পাবেন ব্যাটারি কবে তৈরি হয়েছে।

অর্জুন দেখল। মাত্র তিনমাস আগের ব্যাটারি।

ক্যামেরা-রেডিয়ো সমেত সেটটির দাম জিজ্ঞেস করল অর্জুন। লোকটি হাসল। আপনার কাছে তো বাড়তি দাম চাইতে পারব না। এদেশে কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে আশি হাজারের নীচে পাবেন না।

আপনি কততে দিচ্ছেন? অর্জুন তাকাল।

আমরা পঁয়ত্রিশে দিয়ে থাকি, আপনি না হয় ত্রিশ দিন।

ওরে বাবা! অর্জুন মাথা নাড়ল।

এর নীচে দেওয়া যায় না স্যার। কত হাত ঘুরে আসছে বলুন।

কত হাত?

শুনেছি বিদেশি জাহাজ থেকে ঝেড়ে মায়নামারে নামানো হয় পেটি। তারপর সেই পেটিগুলো খুলে খুলে বিভিন্ন জায়গায় চালান করা হয়। ইন্ডিয়ায় ঢোকে ভুটান হয়ে। অন্তত ছ'বার হাতবদল হয়। লোকটি গর্বের সঙ্গে বলল।

আপনি পেয়েছেন কার হাত থেকে?

আমি শিলিগুড়ির একজন ব্যবসায়ীর সেল-এজেন্ট।

কী নাম?

মাফ করবেন স্যার। নাম বলতে পারব না। নিষেধ আছে। এবার যে লোকটি সতর্ক হয়েছে, তা তার মুখ-চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

তিনি ভুটান থেকে নিয়ে আসেন?

ওই আর কী! আপনি যদি নেন, তা হলে ত্রিশে দিয়ে দিতে পারি।

যদি পুলিশ আমাকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় পেলে?

সেই ব্যবস্থাও আছে। তার জন্য মাত্র দু'হাজার বেশি দিতে হবে।

কীরকম?

বলবেন, থিম্পু থেকে কিনেছি। থিম্পুর একটা দোকানের রসিদ দিয়ে দেব আপনাকে। অরিজিন্যাল রসিদ। লিগাল পেপার। ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে যেতে ভারতীয়দের ভিসা করতে হয় না, পাসপোর্টের প্রয়োজন নেই। পুলিশ বিশ্বাস করতে বাধ্য। কারণ দোকানটা আছে কিনা, ই খোঁজ করতে থিম্পু যাওয়া ভারতীয় পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। দুটো দেশ তো আলাদা।

ভূটান-পুলিশকে অনুরোধ করতে পারে তদন্ত করে দ্যাখার জন্য।

আপনি কি ভেবেছেন এরকম ঘটনা আগে ঘটেনি? ভুটানের পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে ওই নামের দোকান থিম্পুতে আছে এবং তারা আইনসংগতভাবে সেট বিক্রি করে।

অর্জুন তাকাল, কিন্তু আপনারা বেআইনি কাজ করছেন এবং এই অন্যায় করার জন্য, যারা আইন মেনে ব্যাবসা করতে চান তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমি ইচ্ছে করলে আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি।

নিশ্চয়ই পারেন। আমাকে পুলিশে দিলে যদি এই মোবাইল ব্যাবসা বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে দিতে পারেন। আমি আপত্তি করব না।

অর্জুন ভাবল, লোকটা যে-গলায় কথা বলছে তাতে কোথাও ওর জোর আছে। হয়তো পুলিশকে বলবে সবক'টার বৈধ কাগজপত্র আছে। তা ছাড়া একজনকে ধরলে তো অন্য স্মাগলারদের ব্যাবসা বন্ধ করা সম্ভব হবে না।

লোকটা বলল, এক কাজ করুন, আপনি পঁচিশ দিন। আমার একটা পয়সা লাভ থাকবে না, উলটে লস-ই হবে। হোক।

আপনি যেতে পারেন। মোবাইল কিনতে হলে আমি ভারতীয় মোবাইল এখানকার দোকান থেকে কিনব। অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

.

বিকেলে অর্জুন জলপাইগুড়ি থানার কম্পাউন্ডে বাইক থেকে নামল। থানার ওসি তখন অফিস থেকে বেরোচ্ছিলেন, অর্জুনকে দেখে এগিয়ে এলেন, কী ব্যাপার, কেমন আছেন? আপনার তো সমস্যা না হলে আমাদের কথা মনে পড়ে না।

একেবারে সত্যি কথা। সমস্যায় না পড়লে এখানে আসা মানে আপনাদের সময় নষ্ট করা। কোনও জরুরি কাজে বেরোচ্ছেন?

না না। গত তিনদিন আমার থানায় কেউ একটা ডায়েরি করতে আসেনি। এটা একটা রেকর্ড! তাই ভাবলাম শহরটাকে একবার ঘুরে দেখে আসি। ওসি বললেন।

তা হলে চলুন, আমি একটা কমপ্লেন নথিভুক্ত করতে চাই।

কীরকম?

এই শহরে স্মাগল্ড মোবাইল সেট এত কম দামে বিক্রি হচ্ছে যে, সৎ দোকানদারদের ব্যবসায় লালবাতি জ্বলার উপক্রম হয়েছে। এই চোরাকারবারিদের উৎখাত করতে পুলিশ সক্রিয় হোক।

ওসি জিজ্ঞেস করলেন, পাবলিককে ঠেকাবেন কী করে?

তার মানে?

ছ'হাজারের জিনিস যদি দু'হাজারে পাওয়া যায়, তা হলে পাবলিক হাজার নিষেধ সত্ত্বেও কিনবে। লুকিয়ে কিনে ব্যবহার করবে, ওসি বললেন, আমার পক্ষে তো সবাইকে হাতেনাতে ধরা সম্ভব নয়।

ঠিক। কিন্তু যে বা যারা ওগুলো বিদেশ থেকে এনে এজেন্ট মারফত বিক্রি করছে, তাদের খুঁজে বের করা তো সম্ভব! অর্জুন বলল।

আমরা চেষ্টা করছি। এর আগে কয়েকটা সেট সিজ করলেও ছেড়ে দিতে হয়েছে। কারণ, ওরা থিম্পু কিংবা পারোর দোকানের রসিদ দেখিয়েছে। আপনার কাছে যদি কোনও সূত্র থাকে, তা হলে আমাদের সাহায্য করুন। কথা দিচ্ছি, অলআউট যাব।

.

অর্জুন জগন্নাথদার দোকানে চলে এল। তখন একজন বয়স্ক মানুষ কাউন্টারের এপাশে দাঁড়িয়ে। বাইক থেকে নেমে দোকানে ঢুকতেই জগন্নাথদা একটু অবাক হয়ে তাকালেন।

ভাবছি, এবার মোবাইল নেব।

বেশ তো! তোমার ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন, যেরকম ঘুরে বেড়াও।

ভদ্রলোক বললেন, পঁচিশ বছর আগে এই যন্ত্রের কথা কে জানত!

তা ঠিক। জগন্নাথদা বললেন, তার ছাড়া কথা বলার ব্যাপার কল্পনাতেই ছিল না।

শুনুন একটা ঘটনা। আমার এক আত্মীয়ের বাতিক ছিল টেলিফোনের। যে-বাড়িতেই যেত, তাদের ফোন থাকলে বলত, একটা কল করতে পারি? কোনও জরুরি কথা নয়! ডায়াল করে বলত, আমি এই বাড়িতে আছি এখন, কিছুক্ষণের মধ্যে বেরোব। আমরা বুঝতাম এটা ওর অসুখ। ফোন দেখলে স্থির থাকতে পারে না। একদিন আমি ওকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলাম, তোমার যা অবস্থা, তাতে রাস্তায় হাঁটার সময় বাসে চলার সময়ও ফোন থাকলে খুশি হও। বছরতিনেক আগে সে আমাকে ফোন করে বলল, তোমার কথাই ঠিক হল, আমি বাসের সিটে বসে তোমাকে ফোন করছি। আমি আর কী বলব? একসময় যা অসম্ভব মনে হত, বিজ্ঞান তাকে কত দ্রুত সম্ভব করে। দিয়েছে।

জগন্নাথদা বললেন, ঠিক কথা। মোবাইল হাতে ধরে কথা বলতে হয় বলে সে সময় মানুষ অন্য কাজ করতে পারে না। গাড়ি যাঁরা চালান, তাঁরা চলন্ত অবস্থায় ওইভাবে কথা বললে দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। তাই বেরিয়ে গেল রিমোট সিস্টেম। সরু তারের হেডফোন কানে গুঁজে, পকেটে মোবাইল সেট রেখে, দিব্যি দু'হাত মুক্ত রেখে সব কাজ করতে করতে কথা বলা সম্ভব হয়ে গিয়েছে।

ভদ্রলোক হাসলেন, দেখুন না, কিছুদিনের মধ্যে মোবাইল সেট-ই উঠে যেতে পারে। আপনাকে দোকান বন্ধ করতে হতে পারে।

সে তো এখনই করব ভাবছি। চোরাই ব্যাবসার সঙ্গে পেরে উঠব কী করে? জগন্নাথদা মাথা নাড়লেন, কিন্তু কেন বললেন কথাটা?

সেদিন আর বেশি দূরে নেই, যেদিন হ্যান্ডসেটের কোনও প্রয়োজন হবে। না। যার সঙ্গে কথা বলব তার মস্তিষ্কের সেল নেটওয়ার্কে ধরে কথা বললেই সে হয়তো শুনতে পাবে। কিছুই বলা যায় না। প্রি-পেড

ক্যাশকার্ড কিনে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

জগন্নাথদা বললেন, খুব খুশি হব। আমার দোকান না হয় বন্ধ হবে, কিন্তু স্মাগলাররা তো বিপদে পড়বে। ও হ্যাঁ, কী ধরনের সেট নেবে?

সবচেয়ে কম দামের কী আছে?

তিন হাজার চারশোতে পেয়ে যাবে।

ঠিকঠাক কাজ করবে তো?

কথা বলা-শোনায় অসুবিধে হবে না। তবে দাম কম বলে শক্তিও কম। তুমি পাঁচ হাজারের এই সেটটা নাও। এর সম্পর্কে কোনও কমপ্লেন নেই।

ঠিক আছে। আমাকে কী করতে হবে?

নিয়ম হল, তোমার পরিচয়পত্র আর ফোটো দিয়ে এই ফর্মটা ভরতি করতে হবে। এখনই পোস্ট-পেডে যেয়ো না। প্রি-পেড ক্যাশকার্ড কিনে দ্যাখো কীরকম খরচ হচ্ছে। জগন্নাথদা ফর্ম বের করে প্রশ্ন করে করে সেটা ভরতি করলেন। ঠিক হল, অর্জুন আগামীকাল এসে ফোটো এবং প্রমাণপত্র দিয়ে যাবে। জগন্নাথদা চেক নিতে রাজি হলেন। অর্জুন বাড়ি ফিরে এল। মা বললেন, ইস, একটু আগে এলে তুই মেজরের সঙ্গে কথা বলতে পারতিস।

আচ্ছা! মেজর ফোন করেছিলেন? অর্জুন সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ। বললেন কয়েকদিনের মধ্যে উনি এদিকে আসছেন। দিল্লি হয়ে সোজা বাগডোগরায় নামবেন। বললেন, দিল্লিতে নেমে তোকে ফোন করবেন।

খুশি হল অর্জুন। মেজর আসা মানে দিনগুলো অন্যরকম হয়ে যাওয়া। ভদ্রলোক যে কেন এই বয়সে আমেরিকায় একা রয়েছেন, তা বুঝতে পারে না সে। এটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ভেবে জিজ্ঞেসও করেনি।

এইসময় হাবু এল। হাবুকে দেখলেই অমল সোমের কথা মনে পড়ে যায়। অমলদা জলপাইগুড়ি ছেড়েছেন অনেকদিন, কিন্তু বাড়ি বিক্রি করেননি। হাবু সেই বাড়িটিকে বেশ যত্নে রেখেছে। বছরে দু'বার হাবুর নামে টাকা পাঠান অমল সোম। তাতে দিব্যি চলে যায় তার। সেই টাকায় ইলেকট্রিক, ট্যাক্স, টেলিফোনের ভাড়া মিটিয়ে হাবুর খাওয়া-পরায় কোনও অসুবিধে হয় না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার?

হাবু হাসল। বেচারা কথা বলতে পারে না। তারপর পকেট থেকে একটা খাম বের করে সামনে ধরল। উপরে অর্জুনের নাম, কেয়ার অফ অমল সোম লেখা। একটু অবাক হল সে। অমলদা তার ঠিকানা জানা সত্ত্বেও নিজের বাড়ির ঠিকানায় চিঠি পাঠালেন কেন? চিঠি বের করে চোখ রাখল অর্জুন,

স্নেহের অর্জুন, আশা করি ভাল আছ। শ্রীমান হাবু যাতে একটু নড়াচড়া করে তাই আমার ঠিকানায় চিঠিটি পাঠাচ্ছি। মাঝে মাঝে ও মাথার ব্যথায় কষ্ট পেত। ওর কথা বলতে না পারার কারণ কণ্ঠনালি জিভ অথবা মস্তিষ্কের ঘাটতির কোনটা জানি না। তুমি ওর ব্রেন স্ক্যান এবং পি ই টি করিয়ে রিপোর্টটা পাঠাতে পারবে? এই একটা ব্যাপার, আমরা শরীর সুস্থ রাখতে পরীক্ষা করাই, কিন্তু ব্রেন সম্পর্কে বড় উদাসীন। তুমিও নিশ্চয়ই কখনও তোমার ব্রেন স্ক্যান করাওনি। তুমিও তোমার ব্রেনের স্ক্যানিং এবং পি ই টি রিপোর্ট পাঠাবে। এটা জরুরি। দুটো রিপোর্টই আমাকে মেলে পাঠাবে। আমার অ্যাড্রেস হল, সোম এ ডট নেট ডট কম।

তোমাদের অমলদা।

পুনশ্চ: তোমার মোবাইল নম্বর কী অবশ্যই জানাবে।

হাবুর দিকে তাকাল অর্জুন। মুখে হাসি যেন সেঁটে আছে।

সব ঠিক আছে তো?

মাথা নাড়ল হাবু। মাথায় হাত দিয়ে বোঝাল সেখানে ব্যথা হয়।

কাল সকাল আটটায় এখানে চলে এসো।

মাথা নেড়ে হাবু চলে গেল। হাবুর না হয় মাথায় ব্যথা হয়, তার তো কোনও সমস্যা নেই। তা হলে খামোখা স্ক্যান করাতে যাবে কেন? অমলদার যে বয়স বাড়ছে, এতে বোঝা যাচ্ছে। মাকে চিঠির কথা বলতেই উলটো কথা শুনল অর্জুন, দ্যাখ, উনি এখন প্রায় সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেন। ওঁর কথা ফেলিস না, যা বলেছেন তাই কর।

তার মানে তুমি বলতে চাও অমলদা যোগবলে জানতে পেরেছেন। আমার মাথার ভিতরে কিছু হয়েছে, যেটা আমিই জানি না। কপাল!

মা গম্ভীর হলেন, গুরুর আদেশ সবসময় শিরোধার্য করতে হয়। উনি যা করতে বলেছেন তাই কর বাবা।

.

টেলিফোনে অর্জুন কথা বলে রেখেছিল ক্লিনিকের ডাক্তারের সঙ্গে। হাবুকে নিয়ে সোয়া আটটার সময় সেখানে হাজির হয়ে সমস্যায় পড়ল অর্জুন। তার কাছে কোনও প্রেসক্রিপশন নেই। ওটা না থাকলে ঠিক

কী রিপোর্ট চাইছে, তা স্পষ্ট হচ্ছে না। অর্জুন অমল সোমের চিঠি দ্যাখাল। হাবুর ব্যাপারটা ওঁরা বুঝতে পারলেন। জিজ্ঞেস করলেন, যিনি চিঠি লিখেছেন তিনি কি ডাক্তার?

না। তিনি একসময় সত্যসন্ধানী ছিলেন।

তা হলে কোনও ডাক্তারকে দিয়ে প্রেসক্রিপশন করিয়ে আনুন, প্লিজ।

কাছেই চৌধুরী মেডিক্যাল স্টোর্স। তার মালিক রামদার বয়স বেড়ে যাওয়ায় শুধু সকালের দিকটায় দোকানে আসেন। এখন ওঁর ছেলেই দোকান চালায়। হাবুকে নিয়ে সেখানে গেলে রামদাকে দেখতে পেল অর্জুন। মাথার চুল এখন ধবধবে সাদা হয়ে গেলেও হাসিটি অবিকল আছে। বললেন, কী খবর? ভাল তো?

ভাল ছিলাম। কিন্তু অমলদা বিপাকে ফেলেছেন। পড়ে দেখুন।

চিঠিটা পড়লেন রামদা। হাবুকে দেখলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কি প্রেসক্রিপশন চাইছে?

হ্যাঁ।

পাশে-বসা ভদ্রলোককে রামদা জিজ্ঞেস করলেন, অর্জুনকে চেনেন?

আলাপ নেই, তবে জানি। ভদ্রলোক বললেন।

ওর গুরুর ইচ্ছে পূর্ণ করতে একটু সাহায্য করুন। অর্জুন, ইনি ডক্টর সুধীর রায়। আসা-যাওয়ার পথে আমাকে দোকানে দেখলে একটু গল্প করে যান।

অমলদার চিঠিটা পড়ে দু'জনের জন্য দুটো আলাদা প্রেসক্রিপশন লিখে নাম জিজ্ঞেস করলেন। হাবুর পদবি অর্জুনের জানা নেই। তাকে জিজ্ঞেস করেও কোনও লাভ হবে না। অতএব লিখতে হল, শ্রীহাবু...। অর্জুন রামদাকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, ওঁর সম্মানদক্ষিণা কত?

ডক্টর রায় সেটা শুনতে পেয়ে হেসে ফেললেন, একটা পয়সাও না। রিপোর্টে কোনও গোলমাল থাকলে ওরাই বলে দেবে, তখন আমার চেম্বারে আসবেন।

.

রিপোর্ট আজ বিকেলে পাওয়া যাবে। পাঁচ হাজার টাকার সঙ্গে ছবি এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র হিসেবে পাসপোর্টের জেরক্স নিয়ে জগন্নাথদার দোকানে চলে এল অর্জুন। সব দেখেশুনে জগন্নাথদা তিনটে তিনরঙের সেট সামনে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, কোনটা পছন্দ, বলো?

অর্জুন ইস্পাতরঙা সেটটা তুলে নিল।

সব ঠিকঠাক করে জগন্নাথদা বললেন, এই তোমার নম্বর। একবার এই কাগজে চোখ বোলালেই তুমি বুঝে যাবে কী করে অপারেট করতে হবে। তোমার ফোন চালু হতে ঘণ্টাদুয়েক সময় লাগবে। দেখবে বাঁ দিকে একটা লাইন ফুটে উঠেছে।

আপাতত নিষ্ক্রিয় মোবাইল পকেটে রেখে বাইক চালিয়ে রিপোর্ট নিতে গেল অর্জুন। রিপোর্ট পেয়ে শুনল তার তো বটেই, হাবুর রিপোর্টও নর্মাল। হাবুর না হয় স্ক্যান করানো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু নিজের স্ক্যানের পিছনে দেওয়া টাকাটার জন্য এখন আপশোস হতে লাগল অর্জুনের। অনেক টাকা ফালতু নষ্ট হল।

একটা সাইবার কাফেতে ঢুকল সে। মালিক তার চেনা। ঘণ্টায় কুড়ি টাকা নেয়। তাকে বলল, এই রিপোর্ট দুটো মেল করতে হবে। কত দেব?

একবার চোখ বুলিয়ে ছেলেটি বলল, দশ টাকা দেবেন। আপনি করবেন? তা হলে ওই মেশিনটার সামনে বসুন।

অর্জুন বসল। নেট খুলল। এই মেশিনগুলোর আয়ু বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে। অনেক দেরিতে কানেকশন পাওয়া গেল। পুরো রিপোর্ট টাইপ করে অমলদার ই-মেল অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিল অর্জুন। সেই সঙ্গে নতুন মোবাইলের নম্বর।

তারপর দশটা টাকা দিয়ে বাইকে উঠে বসল। হঠাৎ মনে হল, কাছাকাছি কোথাও টেলিফোন বাজছে। প্রথমে সে গুরুত্ব দেয়নি। তারপর বুঝতে পারল, আওয়াজটা আসছে তার পকেট থেকে। দ্রুত সেটটা বের করে সে বোম টিপে হ্যালো বলল। সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথদার গলা শুনতে পেল, তোমার মোবাইল চালু হয়ে গিয়েছে ভাই।

.

তিনদিনের মধ্যে শহরের পরিচিত ব্যক্তিরা অর্জুনের মোবাইল নম্বর জেনে গেল। গলির মুখেই বুড়িদির সঙ্গে দ্যাখা। ক’দিন হল বাপের বাড়িতে এসেছে। বুড়িদি জিজ্ঞেস করল, হারে অর্জুন, তুই মোবাইল নিয়েছিস?

এটা কোনও ঘটনা?

তা না। কিন্তু ভাবতেই পারছি না চোরাকারবারিদের কাছ থেকে কিনেছিস! বুড়িদি বলল, দেখি তোর মোবাইলটা।

অর্জুন দ্যাখাল। বুড়িদি দেখে বলল, কত দিয়েছিস বল, পনেরোশো?

এর দাম পনেরোশো বুঝি?

হ্যাঁ। আমার দেওর কিনেছে। এই এক মডেল। তোর কাছ থেকে কত নিয়েছে?

পাঁচ হাজার।

অ্যাঁ! হায়, তোর গলা কেটেছে রে। তুই জানিস না, নর্থ বেঙ্গল এখন টানা মালে ভরে গেছে।

আমি জগন্নাথদার দোকানে ফর্ম ভরতি করে কিনেছি।

বুড়িদি হাঁ হয়ে গেল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, তাই বল।

তুমি কী করে ভাবলে আমি টানা মাল কিনব!

ভাবতে তো পারিনি। কিন্তু যেটা দেড় হাজারে পাওয়া যায় সেটা পাঁচ হাজারে কেউ কিনবে, তাও বিশ্বাস করতে পারিনি। ইস, আমার মন খুব ছোট হয়ে গিয়েছে রে।

দুর! তুমি ঠিকই ভেবেছ। আমি ধরে নিলাম, এ ক্ষেত্রে সতোর দাম তিন হাজার টাকা। এদিক দিয়ে ভাবলে মনে হবে খুব সস্তা।

কদমতলায় চায়ের দোকানের বন্ধুরাও খুব আওয়াজ দিল তার নির্বুদ্ধিতার জন্য। আদর্শের জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা লস করার কোনও মানে হয় না। জগুদা মোবাইল ব্যবহার করেন না। গম্ভীর মুখে বললেন, বোকামির দাম সাড়ে তিন হাজার টাকার অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে।

একজন জিজ্ঞেস করল, তার মানে?

তুমি দশ হাজারের মোবাইলটা সাড়ে পাঁচে কিনেছ। পুলিশ যদি তোমাকে ধরে তুমি থিম্পুর রসিদ দ্যাখাবে। তাই তো?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু ওখানে যে তারিখ লেখা আছে, সেই তারিখে তুমি এখানে অফিস করেছ তা প্রমাণ করতে পুলিশের কোনও অসুবিধে হবে না।

দুর! অত ঝামেলা পুলিশ করবে না।

যদি করে? তা হলে মোবাইলটা বাজেয়াপ্ত হবে। অন্তত দিনসাতেকের জেল হয়ে যেতে পারে। এরকম হলে অফিস তোমাকে সাসপেন্ড করতে পারে। মোবাইল কিনে তুমি যে সাড়ে চার হাজার প্রফিট করেছিলে, তার বহুগুণ লস করবে এরকম হলে। জগুদা বললেন।

ছেলেটি চুপ করে থাকল। অর্জুন বুঝল, বেচারা খুব চিন্তায় পড়ে গেল।

.

রাতে যখন শুতে যাচ্ছে তখন ল্যান্ডলাইনের ফোন বাজল। রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই মেজরের গলা কানে এল, এই যে তৃতীয় পাণ্ডব, কেমন আছ?

আপনি? আপনি কোত্থেকে?

দিল্লিতে। একটু আগে পৌঁছেছি। কাল সকালে বাগডোগরায় ফ্লাইট ধরব। এয়ারপোর্টে আসবে নাকি?

অবশ্যই। অর্জুন হাসিমুখে বলল।

.

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। কাছাকাছি কোথাও রিং হচ্ছে। মোবাইল বাজছে। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে টেবিলে রাখা মোবাইলটা তুলল সে। না, কোনও শব্দ নেই। কেউ কি তাকে মোবাইলে ফোন করেছিল? ধরছে না দেখে লাইন কেটে দিয়েছে? সে বোতাম টিপে কল রেজিস্টারে চলে এল। তারপর মিস্ড কলসে গিয়ে দেখল, কয়েকটা ডট ফুটে উঠেছে। কোনও নম্বর নেই। যে ফোন করে কেটে দিয়েছে, এখানে তার নম্বর ফুটে ওঠার কথা। কয়েকটা ডট কারও নম্বর হতে পারে না। তা হলে? মাথামুন্ডু বুঝতে না পেরে ফোনটা অফ করে শুয়ে পড়ল অর্জুন। যার দরকার, সে কাল সকালে ফোন। করবে। সে যাঁদের নম্বর দিয়েছে, তাঁদের কেউ মাঝরাতে রসিকতা করার জন্য ফোন করবেন না। তা হলে...। খচখচানি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ঘুম এসে গেল।

.

প্রতিবারই কোথাও গেলে মা যে ব্যাগটা এগিয়ে দেন, তাতে তিন দিনের পোশাক ইত্যাদি থাকে। আজও সেই ব্যাগ নিয়ে সকালবেলায় কদমতলার মোড়ে এসে অর্জুন দেখল, জগন্নাথদা দোকান খুলছেন। পকেট থেকে মোবাইল বের করে সে জগন্নাথদাকে গত রাতের অভিজ্ঞতার কথা জানাল। ভদ্রলোক হেসে বললেন, এরকম হওয়া অস্বাভাবিক। বিলেত থেকে ফোন এলেও তিন-চারটে নম্বর ফুটে উঠবে। দাও তো দেখি। মোবাইল সেট নিয়ে নম্বর টিপে দেখলেন তিনি। তারপর বললেন, কোনও সমস্যা নেই। সব ঠিক আছে। তুমি ঘুমন্ত অবস্থায় ভুল শুনেছ।

তাই যদি হবে, তা হলে এই ডটগুলো এল কী করে? অর্জুন মাথা নাড়ল, যাক গে। আমি এখন বাগডোগরা যাচ্ছি। ওখানে তো নেটওয়ার্ক পাব না, না?

পাবে। রোমিং করে নিতে হবে। আগে প্রি-পেডে রোমিং হত না। এখন হচ্ছে। তোমার এই কার্ড থেকেই চার্জ কেটে নেবে। অর্থাৎ যতটা কল তুমি করতে পারতে, রোমিং-এর কারণে সেটা কমে যাবে।

ঠিক আছে। যা করার করে দিন।

.

জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি হয়ে যখন অর্জুন বাগডোগরায় পৌঁছোল তখন ভরদুপুর। দিল্লির ফ্লাইট আজ দেরিতে আসছে। এখনকার এয়ারপোর্টের চেহারা দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে বছরচারেক আগের কথা। তখন একতলার একটা হলঘরে যাত্রীদের ঠাসাঠাসি করে বসে থাকতে হত। আজকের তুলনায় সেটা প্রায় গ্রাম্য ছিল বলাই ঠিক। আধুনিক রেস্টুরেন্টে বসে খাবার অর্ডার দিয়ে চারপাশে তাকাল অর্জুন। আশপাশের টেবিলগুলোয় নারী-পুরুষরা গল্প করছেন। এঁরা হয় নিজেরা উড়বেন অথবা কাউকে নিতে এসেছেন। একেবারে কোনার টেবিলে যিনি একা বসে আছেন, তাঁর চোখে রোদচশমা, গালে একটা হাত, অন্য হাতে ম্যাগাজিন ধরা। দেখলে মনে হবে, মনোযোগ দিয়ে ম্যাগাজিন পড়ছেন। কিন্তু অর্জুনের মনে হল, উনি মূল দরজার দিকে নজর রাখছেন। মুখ ঈষৎ বেঁকে থাকায় ধারণাটা তৈরি হল। ভদ্রলোকের পরনে নীল জ্যাকেট। চেহারা বলে দিচ্ছে, উনি পাহাড়ের মানুষ। নেপালি নন, হয় সিকিম বা ভুটানের মানুষ।

মঙ্গোলিয়ান মানুষের মুখ দেখে মনের ভাব বোঝা অসম্ভব। খাবার এসে যাওয়ায় সেদিকে মন দিল অর্জুন। তখনই ঘোষণা কানে এল, দিল্লির ফ্লাইট এখনই পৌঁছে যাবে। দ্রুত খাওয়া শেষ করে কাঁচের দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই প্লেনটা মাটিতে নামতে দেখল সে। কিছুটা ঘোরাঘুরি করে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর সামনে এসে থামতেই সিঁড়ি লাগিয়ে দেওয়া হল দরজা খোলার পর। একে-একে যাত্রীরা নামতে লাগলেন। মেজরের শরীরটাকে সে দেখতে পেল সবার শেষে। মেজরের সঙ্গে একজন অল্পবয়সি মহিলা কথা বলতে বলতে নামলেন। তার পরনে জিন্স আর টপ। মেজরের চেহারা প্রায় একই রয়েছে। কাঁচাপাকা দাড়িতে আঙুল ঢুকিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন মহিলার সঙ্গে।

অর্জুন বেরোবার দরজার সামনে গিয়ে দেখল বেশ ভিড় জমেছে সেখানে। অনেকেই অপেক্ষা করছেন পরিচিতদের রিসিভ করার জন্য। সে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। মিনিটকুড়ি বাদে ট্রলিতে ঢাউস ঢাউস তিনটে সুটকেস চাপিয়ে মেজরের শরীর বেরিয়ে এল ভিড় ফুড়ে। তাঁর পিছনের মহিলার ট্রলিতে একটা সুটকেস। ফাঁকায় এসে মেজর রুমালে কপাল মুছে চারপাশে তাকালেন। অর্জুন বুঝল, তাকে দেখেও ঠাহর করতে পারলেন না মেজর। সে স্পষ্ট শুনতে পেল, মহিলাকে মেজর বলছেন, না। এরকমটা তো হওয়ার কথা নয়। লুসি, তুমি জানো না, আমরা দু'জনে কত অভিযান একসঙ্গে করেছি। কখনওই অর্জুনকে আমি শৃঙ্খলা ভাঙতে দেখিনি। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ও চলে। চিন্তা হচ্ছে, এখানে আসতে গিয়ে কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তো!

মহিলা, যাঁর নাম লুসি, বললেন, হয়তো উনি যা নন, তাই ভেবে নিয়েছ তুমি। আমার এক বন্ধু বলেছিল, ইন্ডিয়ানরা আর যাই করে করুক, সময় রেখে চলতে শেখেনি। কিন্তু কথাটা হল, আর কতক্ষণ ওঁর জন্য অপেক্ষা করবে?

অনন্তকাল। কিন্তু লুসি, হোয়াট এ চেঞ্জ! এই এয়ারপোর্টের চেহারা একদম বদলে গিয়েছে। এমনও হতে পারে, অর্জুন বাইরে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। লেটস গো।

ওঁরা মূল দরজার দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, অর্জুন তাঁদের অনুসরণ করল। গেটের বাইরে ওঁরা চলে যেতেই অর্জুন প্রি-পেড ট্যাক্সিবুথে গিয়ে শিলিগুড়ির জন্য ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে রসিদ নিল। সেটায় ট্যাক্সির নম্বর লেখা রয়েছে। আগে বাইরে বের হলে ঝাঁপিয়ে পড়ত ড্রাইভাররা। টানাটানি করত প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে। দরাদরি করার পর তাদের ট্যাক্সিতে উঠতে হত। এখন সেই অরাজকতা নেই। প্রি-পেড ছাড়া ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। যাত্রীরা কে কোথায় যাবে, তার কিলোমিটার অনুযায়ী ট্যাক্সিভাড়া ঠিক করা আছে। দরাদরির কোনও ঝামেলা নেই।

রসিদটা নিয়ে বাইরে বের হতেই অর্জুন দেখল, মেজর চুরুট ধরাবার চেষ্টা করছেন। সে পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, সরি স্যার। এখানে চুরুট ধরালে আপনাকে এক হাজার টাকা ফাইন দিতে হবে।

প্রবল বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে দেখতে পেয়ে মেজর যেভাবে চিৎকার করে উঠলেন, তা কানে গেলে জলদাপাড়া ফরেস্টের সমস্ত গন্ডার পড়ি কি মরি করে পালিয়ে যেত। দু'হাতে অর্জুনকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখে কাঁচাপাকা দাড়ির জঙ্গল চেপে ধরে বলতে লাগলেন, ওঃ, কতদিন পরে দেখা হল। খুব মনে পড়ে তোমার কথা। অথচ তুমি আমায় একদম ভুলে গেলে মাই ডিয়ার থার্ড পাণ্ডব!

কোনওরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে অর্জুন বলল, ভুল বললেন, আপনাকে আমি কখনও ভুলতে পারি?

এক পা পিছিয়ে গিয়ে মেজর অর্জুনের আপাদমস্তক দেখে নিলেন, না, একই রকম আছ। নো এক্সট্রা ফ্যাট। আমি চার কেজি বেড়েছি। গ্যালিস দেওয়া প্যান্ট পরতে হচ্ছে হে। ওহো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে লুসি। শব্দ নিয়ে গবেষণা করে বস্টন ইউনিভার্সিটিতে। আর লুসি, ইনি হলেন...।

মেজরের কথা থামিয়ে দিয়ে লুসি বললেন, বুঝেছি। ইনি অর্জুন।

কী করে বুঝলেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

সেই জে এফ কে থেকে আপনার নাম অন্তত পাঁচশোবার শুনতে বাধ্য হয়েছি! আপনার মতো বুদ্ধিমান বিনয়ী ছেলে নাকি পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না।

স্নেহ মানুষকে অন্ধ করে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি নর্থ বেঙ্গলে এর আগে কখনও এসেছেন?

মাথা নাড়লেন লুসি, নো। কখনওই আসিনি।

এইসময় একটি লোক এসে সামনে দাঁড়াল, স্যার, আপনারা কি প্রি পেড ট্যাক্সি নিয়েছেন? সব প্যাসেঞ্জার চলে যাচ্ছে...।

অর্জুন মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। তোমার ট্যাক্সি কোথায়?

মেজর এবং লুসি মালপত্র ডিকিতে রেখে পিছনের আসনে উঠে বসলে অর্জুন ড্রাইভারের পাশে উঠে পড়ল। মেজর বললেন, আচ্ছা! তুমি আগেই ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলে আর লুসি ভাবছিল যে আসোইনি।

কথাটা বাংলায় বললেন মেজর, যদিও নিজের নামটা শুনতে পেয়ে লুসি উৎসুক চোখে তাকালেন।

এখন এটাই সিস্টেম এখানে। কোথায় যাবেন জানি না বলে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বুক করেছি এটাকে। কথা বলতে বলতে অর্জুন দেখল, এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম পরা সৈনিকরা সাইকেলে চেপে তাঁদের কাজে যাচ্ছেন। পুরো এলাকাটা এয়ারফোর্সের অধীনে। সাধারণ যাত্রীরা গাড়িতে চেপে এয়ারপোর্টে আসার পথে কিছু নিয়মকানুন মানতে বাধ্য।

শিলিগুড়ি! মেজর মাথা নাড়লেন, কেন শিলিগুড়ি? হোয়াই নট জলপাইগুড়ি?

আপনি তো কিছু বলেননি! এখন বলুন কোথায় যেতে চান, কী আপনাদের প্রোগ্রাম, সেইমতো ব্যবস্থা করছি। অর্জুন ফিরে তাকাল।

লুসি বসে আছে জানলার বাইরে চোখ রেখে। মেজরের ঠোঁটে সেই চুরুটটা ধরাই রয়েছে, এখনও আগুন দেননি।

লুসির ইচ্ছে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার কোনও গভীর জঙ্গলে ক'দিন থাকবে। বিশেষ করে যেসব জঙ্গলে নানাধরনের পাখি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেইসব জায়গায় যদি ব্যবস্থা করতে পারো, তা হলে খুব ভাল হয়। মেজর বললেন।

অর্জুন একটু ভাবল। যে-কোনও ফরেস্ট বাংলোয় গেলে আজকাল চটপট জায়গা পাওয়া যায় না। বাংলোগুলোয় যেমন দপ্তরের অফিসাররা কাজেকর্মে প্রায়ই আসেন, তেমনই টুরিস্টরাও কলকাতা থেকে বুক করে বেড়াতে আসেন। পনেরো-কুড়ি বছর আগে এই ঝোঁকটা ছিল না। উত্তর বাংলায় ফরেস্ট বাংলো বলতে গোরুমারা, চাপড়ামারি, খুঁটিমারি, হলং আর মাদারিহাট বাংলো। কোথায় বেশি পাখি আসে, এই মুহূর্তে অর্জুনের জানা নেই। সে শুনেছে, কাজিরাঙা ফরেস্ট বাংলোতে নাকি এখনও গভীর জঙ্গল থাকায় পশু এবং পাখিদের সংখ্যা বেশি। তবে কাজিরাঙা তো অসমে। অর্জুন সিদ্ধান্ত নিল, একমাত্র জলপাইগুড়ির ডি এফ ও এই ব্যাপারে সঠিক সাহায্য করতে পারেন। সে বলল, তা হলে আগে জলপাইগুড়ির ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসে যেতে হয়। ওখানেই সব খবর পাওয়া যাবে।

শিলিগুড়ি শহরের মহানন্দা নদীর উপর সেতু চওড়া করে দেওয়ায় এখন তেমন জ্যাম হয় না। কিন্তু আজ হয়েছে। মিনিটতিনেক গাড়িতে বসে থাকার পর ড্রাইভার নেমে গেল ব্যাপারটা কী জানতে। ফিরে এসে বলল, খুব বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সাব। একজন স্পট ডেড। যে-গাড়িটা মেরেছে সেটা হাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন ভাঙা গাড়ি রাস্তা ব্লক করে দিয়েছে। আমি যে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যাব তার কোনও উপায় নেই। কখন যে খুলবে কে জানে, আপনারা একটু হেঁটে গেলে এয়ারভিউ হোটেলের সামনে আবার ট্যাক্সি পেয়ে যাবেন।

অর্জুন মেজরের দিকে তাকাল। তিনি মাথা নাড়লেন, ইমপসি। এত পাহাড় বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

একমত হল অর্জুন। যতই চাকা লাগানো থাক, এত সুটকেস টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। মিনিট তিনেকের মধ্যে গাড়ির হর্ন বাজতে লাগল, ইঞ্জিনের আওয়াজ, চেঁচামেচি থেকে বোঝা গেল সামনের বাধা সরানো হয়েছে। তাদের ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে মেজর বললেন, বুঝলে অর্জুন, পেশেন্স। এই পেশেন্সের বিকল্প আর কিছু নেই।

জলপাইগুড়ি শহরে ওরা যখন পৌঁছোল তখন বিকেল। এখন দু-তিনটে মোটামুটি কাজ চালানোর হোটেল হয়েছে শহরে। তবে সবচেয়ে ভাল থাকার জায়গা রাজবাড়ি ছাড়িয়ে সরকারি অতিথিনিবাস। সেখানে যাওয়ার আগে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ডি এফ ও অফিসে হাজির হল অর্জুনরা।

ডি এফ ও অফিসের বড়বাবু অর্জুনকে দেখেই চিনতে পেরে হেসে বললেন, কী ব্যাপার? জঙ্গল নিয়ে কোনও সমস্যা?

না। সমস্যা নয়। ইনি মেজর আর উনি লুসি। মেজর আমার দীর্ঘকালের পরিচিত। ওঁরা আমেরিকা থেকে আসছেন। কয়েকদিন জঙ্গলে থাকতে চান। যে-জঙ্গলে প্রচুর পাখি আছে, সেই জঙ্গলে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। অর্জুন বলল।

পাখি আসে শীতকালে। জঙ্গলের লেকগুলো বিদেশি পাখিতে ভরে যায়। এখন তো তেমন...। বড়বাবু মাথা নাড়লেন।

বিদেশি পাখির জন্য বিদেশ থেকে এদেশে আসব কেন? দিশি পাখি যেখানে বেশি পাওয়া যায় সেখানে যেতে চাই। মেজর প্রায় ধমকের ভঙ্গিতে বললেন।

বড়বাবু ওঁদের নিয়ে গেলেন তাঁর বড়সাহেবের চেম্বারে। অবাঙালি ডি এফ ও অর্জুনের নাম শুনে হাত বাড়ালেন, আমি আপনার নাম শুনেছি।

করমর্দন করে অর্জুন প্রস্তাবটা জানাল।

ডি এফ ও বড়বাবুকে নির্দেশ দিলেন কোন ফরেস্ট বাংলো খালি আছে তা দ্যাখার জন্য। তারপর গল্প শুরু করলেন। কেন লুসি পাখির ডাক শুনতে চান? লুসি তাঁকে জানালেন, ইতিমধ্যে আফ্রিকার কিছু অঞ্চল এবং আমেরিকার পাখিদের ডাক তিনি সংগ্রহ করে দেখেছেন, দুই মহাদেশের কিছু পাখির ডাক হুবহু এক। অথচ এরা এক প্রজাতির নয়। এদের ডানায় সেই শক্তি নেই যে, সমুদ্র পেরিয়ে দুই মহাদেশে যাতায়াত করতে পারবে। লুসি শুনেছেন, ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে নাকি প্রচুর পাখি পাওয়া যায়। তিনি ওদের গলার স্বর রেকর্ড করতে চান। তিনি প্রমাণ করতে চান, পৃথিবীর যে-প্রান্তেই জন্মাক, পাখিদের ভাষায় বেশ মিল আছে। আফ্রিকান পাখির ডাক টেপে তুলে সেটা আমেরিকার জঙ্গলে বাজিয়ে শুনেছেন, একটি পাখি তাতে সাড়া দিচ্ছে। সে ভাবছে, তারই সঙ্গী কেউ তাকে ডাকছে।

বড়বাবু এসে জানালেন, একমাত্র খুঁটিমারি ছাড়া আর কোনও বাংলোতে জায়গা নেই। অর্জুন জলদাপাড়ার কথা বলল। ডি এফ ও বললেন, ওটা কোচবিহারের ডি এফ ও-র এলাকা। খুঁটিমারির জঙ্গল যদিও খুব ঘন নয়, কিন্তু ওখানে পাখি পাবেন। তা ছাড়া সঙ্গে যদি গাড়ি থাকে, তা হলে যে কোনও জঙ্গলে গিয়ে লুসি তাঁর কাজ করতে পারবেন। বড়বাবুকে ওই অনুমতি লিখিতভাবে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি।

কদমতলার মোড়ে এসে শিলিগুড়ির ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে পরিচিত একটি নেপালি ড্রাইভারকে কয়েকদিনের জন্য সঙ্গী করে নিল অর্জুন। তারপর মোবাইল বের করে বাড়িতে ফোন করে মাকে জানিয়ে দিল কোথায় যাচ্ছে।

তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে ময়নাগুড়ি বাইপাস দিয়ে যখন নেপালি ড্রাইভার তার মারুতি ঝড়ের বেগে চালাচ্ছে, তখন মেজর বললেন, ওহে তৃতীয় পাণ্ডব, পেটে কিছু দেওয়া যাবে না?

ওহো! কিন্তু এখানে খেতে হলে কোনও ধাবার সামনে দাঁড়াতে হবে।

যে চুলোয় হোক, পেটের নাড়িভুড়ি জ্বলছে।

ড্রাইভারের নাম পদমবাহাদুর। ধুপগুড়ির পথে একটা ধাবার সামনে সে গাড়ি দাঁড় করাল। অর্জুন গাড়ি থেকে নামতে নামতে দেখল, ধাবা থেকে দুটো লোক খুব দ্রুত বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ানো সুমো গাড়িতে উঠে বসল। তারপর স্টার্ট নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ধুপগুড়ির দিকে। ওদের চলে যাওয়ার ধরনটা বেশ অস্বাভাবিক।

ধাবাতে ঢুকতেই গলা শুনতে পেল অর্জুন, আইয়ে সাব। বহুত দিন পর আপ আয়া। বিশাল চেহারার সর্দারজিকে দেখে মনে পড়ে গেল অর্জুনের। লোকটার নাম জ্ঞান সিংহ। এর আগে এই ধাবায় খেতে এসে আলাপ হয়েছিল।

কেমন আছেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

কোনওরকমে চলে যাচ্ছে। বসুন। প্লিজ সিট ডাউন। ইংরেজিতে অনুরোধ মেজর এবং লুসিকে।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন কী পাওয়া যাবে?

জ্ঞান সিংহ বলল, চিকেন, মাটন, ফিশ কারি, কষা, চাপ, কাবাব। সঙ্গে রাইস, প্লেন রুটি, তন্দুরি। নবরতন তরকারি।

আমাকে চিকেন চাপ, তন্দুরি রুটি আর এই ভদ্রমহিলাকে চিকেন কাবাব দিন। অর্জুন, তুমি কী খাবে? মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

আমি হাফ প্লেট কাবাব নেব। অর্জুন বলল।

লুসি এসব কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, চিকেন স্যান্ডউইচ বলুন আমার জন্য।

জ্ঞান সিংহ মাথা নাড়ল, নো ম্যাডাম নো স্যান্ডউইচ!

মেজর লুসিকে আশ্বস্ত করলেন, যে খাবার বলা হয়েছে তাতে লুসির অসুবিধে হবে না। কোনও মশলা নেই তাতে।

জ্ঞান সিংহ অর্ডারগুলো সহকারীদের জানিয়ে দেওয়ার পরে কাছে এলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ওই লোকগুলো আমাদের দেখেই কি ওইভাবে পালাল?

জ্ঞান সিংহ হাসল, আপনাকে যারা চেনে, তারা হয় হেসে আপ্যায়ন করে, নয়তো দৌড়ে পালায়।

আচ্ছা, এদের পালাবার কারণ?

আপনি গাড়ির সাইডটা দ্যাখেননি, না? অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। ওদের কথাবার্তায় মনে হল, কেউ মারাও গেছে। ওরা শিলিগুড়ি থেকে আসছে।

জ্ঞান সিংহের কথায় মহানন্দা ব্রিজের উপর ঘটা দুর্ঘটনার কথা খেয়ালে এল। লোক দুটো কেন থানায় রিপোর্ট না করে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে? অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি যখন বুঝতে পারলেন, তখন ওদের আটকাবার চেষ্টা করলেন না কেন?

দেখুন সাব, আমার এখানে হাজার রকমের মানুষ খেতে আসে। কার মনে কী মতলব আছে তা বুঝব কী করে? আপনাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে যেভাবে পালাল, তাতেই বুঝলাম ওরা ক্রিমিনাল। তখন তো কিছু করার ছিল না। তা ছাড়া আমি যদি আমার ধাবায় ক্রিমিনাল ধরি তা হলে কাল থেকে কোনও গাড়ি আর এখানে দাঁড়াবে না। না খেয়ে মরতে হবে আমাকে। জ্ঞান সিংহ বলল।

কিছু বলার ছিল না একথা শোনবার পর। কিন্তু অস্বস্তিটা যাচ্ছিল না অর্জুনের। শিলিগুড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। অ্যাক্সিডেন্ট তো হতেই পারে। ধরা পড়ার ভয়ে অনেকেই পালিয়ে যায়। কিন্তু তাকে দেখে ওরা ওভাবে পালাল কেন? যেখানে ওই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তার ধারেকাছে ওদের গাড়ি ছিল না। পিছনের লম্বা গাড়ির লাইনে কে কোথায় রয়েছে, তা দ্যাখার কোনও সুযোগই ছিল না এদের। এ ক্ষেত্রে দুটো চিন্তাই মাথায় আসছে। এক, এরা দাগি অপরাধী, তাকে আগে থেকেই চিনত। নয়তো এরাও এয়ারপোর্ট থেকে আসছিল। সেখানে মেজরদের সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখেছে। এই দ্বিতীয় ভাবনাটা তেমন জোরদার নয়। অচেনা তিনটে মানুষকে এয়ারপোর্টে দেখলে কেউ সেটা মনে রাখে না। রাখলেও তাকে দেখে ভয় পেয়ে পালাবার কথা ভাবে না।

চিকেন রেশমি কাবাব মুখে দিয়ে লুসি খুব খুশি। মশলা নেই, বেশ তুলতুলে, নরম। জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ওখানে অনেক ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে। সেখানে কি এই খাবার পাওয়া যায়?

তন্দুরি রুটিতে মাংস তুলে মুখে পুরতে পুরতে মেজরের চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় বললেন, ওঃ! শিয়োর। তোমরা তো সেদ্ধ ছাড়া কিছু খেতে জানলে না। ভাল খাবার খেতে হলে ওই ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে ঢুকতে হবে।

ধূপগুড়ি পেরিয়ে গয়েরকাটা হয়ে নাথুয়ার দিকে যখন গাড়ি ঘোরাল পদমবাহাদুর, তখন ছায়া ঘন হয়ে গিয়েছে। দূরে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, আর কত দূরে হে?

এই তো সামনে মেছুয়া পুল, ওটা পার হলেই জঙ্গলে ঢুকব, অর্জুন বলল।

নেহি সাব। মেছুয়া পুল কা নাম চেঞ্জ হহা গয়া, পদমবাহাদুর বলল।

তাই নাকি? কী নাম হয়েছে? অর্জুন অবাক হল।

মধুবনি, পদম জবাব দিল।

দু'পাশে এখন ঘরে ফেরা পাখির চিৎকার। লুসি উৎসুক চোখে তাকাচ্ছেন। অর্জুন দেখল, জঙ্গল বেশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। তবু অন্ধকার নেমে পড়ায় চারপাশ রহস্যময় হয়ে উঠেছে। জঙ্গলের মধ্যে নুড়ি বিছানো রাস্তায় চাকার শব্দ তুলে পদম গাড়িটাকে বাংলোর সামনে দাঁড় করিয়ে মৃদু হর্ন বাজাল। বাংলো অন্ধকার। পিছন দিকে ছোট একতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে। পদম চেঁচাল, কোই হ্যায়?

একটা হারিকেন উপরে তুলে যে-লোকটা এগিয়ে এল, তার মুখে রাজ্যের বিরক্তি। অর্জুন বলল, তুমি নিশ্চয়ই চৌকিদার?

জি।

আমরা জলপাইগুড়ি থেকে আসছি। ডি এফ ও সাহেব এই বাংলোয় থাকার অনুমতি দিয়েছেন। দরজা খুলে দাও।

চাবি তো আমার কাছে নেই সাহেব।

যার কাছে আছে তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

লোকটা লণ্ঠন হাতে গেটের দিকে চলে গেল। কথাবার্তা হচ্ছিল বাংলায়। লুসির পক্ষে বোঝার উপায় নেই। মেজর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লুসি জিভ দিয়ে আওয়াজ করল, যাতে তিনি চুপ করে থাকেন। শব্দটা কানে এল। এই ভর সন্ধেবেলায় পাখিটা ডাকছে, চোখ গেল। একা-একাই ডেকে যাচ্ছে।

লুসি দ্রুত তার ব্যাগ খুলে রেকর্ডার বের করার আগেই ডাক থেমে গেল। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঝিঁঝির ডাক শোনা গেল। লুসি খুব হতাশ হয়ে বললেন, আপনারা ওই পাখিটার কী নাম দিয়েছেন?

চোখ গেল। অর্জুন বলল।

মানে কী?

মেজর তাঁর মতো করে বুঝিয়ে দিলেন লুসিকে। লুসি হাসলেন, মাই গড। ফ্লোরিডার জঙ্গলে অবিকল একই ডাক শুনেছি আমি। স্থানীয় মানুষ বলেন, পাখিটা গালাগাল দিচ্ছে, গো হেল'। অদ্ভুত! কোথায় খুঁটিমারির জঙ্গল আর কোথায় ফ্লোরিডা!

লণ্ঠনটাকে এগিয়ে আসতে দ্যাখা গেল। কেয়ারটেকার বাঙালি। বললেন, জলপাইগুড়ি থেকে কোনও অর্ডার এখনও আসেনি। অ্যাডভান্স কপি সঙ্গে থাকলে আপনারা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। অনেক অবাঞ্ছিত লোক এখানে এসে টাকা দিয়ে থাকতে চায়। তাদের আমি অ্যালাউ করি না।

ডি এফ ও সাহেবের অর্ডার হারিকেনের আলোয় দেখে নিয়ে কর্মচারীটিকে জেনারেটর চালাতে বললেন কেয়ারটেকার। কয়েক মিনিটের মধ্যে চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠলেও জেনারেটরের শব্দ ভাল লাগছিল না।

দোতলায় দুটো সুন্দর সাজানো ঘর। ওপাশের লম্বা বারান্দায় সোফা পাতা। দোতলা থেকে এ পাশের জঙ্গলটার অন্ধকার আরও রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

আপনারা ডিনার করবেন তো? কেয়ারটেকার জিজ্ঞেস করলেন।

কী খাওয়াবেন? মেজর ঘুরে দাঁড়ালেন।

আজ রাতে ডিম আর রুটি ছাড়া কিছু পারব না স্যার।

তাই হোক। মেমসাহেবের জন্যে ঝাল দেবেন না।

অর্জুন হাসল, আজ একটা অভিনব ব্যাপার দেখছি।

কী হে? মেজর ঘুরে তাকালেন।

এয়ারপোর্ট থেকে এখন পর্যন্ত আপনি একবারও নিব বের করে চুমুক দেননি। এরকম তো আগে কখনও দেখিনি, অর্জুন বলল।

নিব? আপনি হুইস্কি-রামের কথা বলছেন। না স্যার, ওসব বিলিতি জিনিস এই জঙ্গলে পাবেন না। তবে অর্ডার দিলে গয়েরকাটা থেকে আনিয়ে দিতে পারি। গাড়ি তো আছেই, কেয়ারটেকার সবিনয়ে জানালেন।

তাঁর কথা শেষ হওয়ামাত্র মেজর চিৎকার শুরু করলেন, গেট আউট, গেট আউট ফ্রম হিয়ার। আমাকে, এই মেজরকে বলে কিনা হুইস্কি-রাম কিনে এনে দেবে! সারাজীবনে ওসব কত খেয়েছি তা কি জানো ছোকরা? হুম। আজ তিন মাস হল আমি ওসব ত্যাগ করেছি। আর সেই আমার কানের কাছে ওই নামগুলো না জপলে চলছিল না!

অর্জুন বলল, আমি সত্যি দুঃখিত। আপনি যে এতদিনের অভ্যেস ছেড়ে দিয়েছেন, এই খবর আমার জানা ছিল না।

না জানা থাক, আমাকে দেখে তুমি বুঝতে পারছ না? সবসময় কীরকম ঝিমিয়ে আছি। আগের মতো আজ সারাদিনে কোনও চেঁচামেচি করেছি? ধাবায় বসে যখন খাচ্ছিলাম, তখন যেদিকে লোকেরা বিয়ার খাচ্ছিল, সেদিকে দ্বিতীয়বার তাকাইনি। নো মোর হুইস্কি-রাম! সব হাডসনের জলে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি হে। বেশ জোরে শ্বাস ফেললেন মেজর।

.

রাতের খাওয়ার পর বারান্দায় বসেছিল ওরা। দশটা বাজতেই জেনারেটর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওটা বন্ধ হওয়ায় আলো নিভে গিয়েছে, পাখা ঘুরছে না বটে, কিন্তু মনে হল এরই নাম শান্তি। কর্কশ একটানা আওয়াজটা আর কানের পরদাকে বিব্রত করছে না। আর শব্দটা থেমে যাওয়ার খানিক বাদেই সামনের জঙ্গল থেকে অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। রাত-পাখিরা এখন মাঝে মাঝেই ডেকে উঠছে। হঠাৎ কোনও প্রাণী জানান দিল, কিট কিটকিট কিটুস।

হঠাৎ লুসি বললেন, লেটস গো।

মেজরের বোধহয় ঘুম পাচ্ছিল। বললেন, সেই ভাল, ঘুমোতে যাই চলো।

ওঃ! নো। টর্চ নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে গেলে ওইসব ডাক খুব ভালভাবে রেকর্ড করতে পারব আমরা। এটাই ঠিক সময়। আজেবাজে আওয়াজ এখন নেই, লুসি বেশ উত্তেজিত হয়ে নতুন একটা ডাক শুনলেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, আপনি কি আত্মহত্যা করতে চান?

মানে?

এখন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে কাল সকালে যদি আপনার শরীর কেউ খুঁজে পায়, তা হলে দেখে চিনতে পারবে না! এদিকের জঙ্গলে কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে প্রায় শখানেক হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। জঙ্গলে তাদের খাবার নেই বলে হামলা করছে পাশের গ্রামগুলোতে। গ্রামবাসীরা স্বাভাবিক কারণে ওদের বাধা দেয়। ফলে হাতিরা মানুষ দেখলেই খেপে ওঠে। হাতি ছাড়া চিতাবাঘের সংখ্যাও বাড়ছে। আপনি তো জানেন, চিতাদের মতো হিংস্র প্রাণী খুব বেশি নেই। অর্জুন বলল।

আপনি আমাকে অযথা ভয় দেখাচ্ছেন না তো? লুসির গলায় সন্দেহ।

আমার কী লাভ?

আচ্ছা, আমরা তো বাংলোর কম্পাউন্ডের মধ্যে থেকে রেকর্ড করতে পারি।

যাওয়ার মধ্যে আমি নেই। আমার ঘুম পেয়েছে খুব, হাই তুলতে তুলতে মেজর ঘরে ঢুকে গেলেন।

অর্জুন বলল, লুসি, আমার মনে হয়, আজ রাতে আপনার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আগামীকাল থেকে আমরা পরিকল্পনা করব, যাতে আপনি রাতের পাখিদের ডাক ভালভাবে তুলতে পারেন।

লুসি একটু ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে ‘গুড নাইট’ বলে চলে গেলেন নিজের ঘরে। অর্জুন বারান্দার রেলিং ধরে জঙ্গলের দিকে তাকাল। হঠাৎ সে খেয়াল করল অন্ধকারে কী একটা নড়ছে। ওরা যে একটা হাতির দল, তা বুঝতে সময় লাগল না। খুব খেপে না গেলে ওরা বাংলোর কম্পাউন্ডে ঢোকে না, এই বাঁচোয়া!

এই বাংলোর দোতলায় দুটো ঘর। একটা ঘরে লুসি রয়েছেন, দ্বিতীয়টায় মেজর আর অর্জুন। হঠাৎ কানে এল শব্দ। যেন বুনো দাঁতাল শুয়োর মারপিট করছে ঘরের মধ্যে। কৌতূহলী হয়ে সে অন্ধকার ঘরের দরজায় এসেই বুঝতে পারল, মেজর নাক ডাকছেন! এইরকম ডাককেই কি গর্জন বলে? এই গর্জন কানে নিয়ে সে পাশের খাটে ঘুমোবে কী করে? তারপরেই টের পেল। বাংলোয় মৃদু কাঁপুনি হচ্ছে। এইসময় লুসির ঘরের দরজা খুলে গেল।

লুসি জিজ্ঞেস করলেন, কীসের আওয়াজ হচ্ছে?

অর্জুন হাসল, আপনার রেকর্ডারটা নিয়ে আসুন।

লুসি ঘরে ঢুকেই চাপা গলায় বললেন, ওঃ মাই গড! তারপর দৌড়ে চলে গেলেন নিজের ঘরে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রেকর্ডার চালু করলেন লুসি। মেজরের নাক থেকে যে বিচিত্র শব্দাবলি ফোয়ারার মতো বের হচ্ছিল, তা টেপ রেকর্ডার গিলে নিতে লাগল।

মিনিটপাঁচেক পরে ক্লান্ত হলেন লুসি। রেকর্ডার নিয়ে ফিরে গেলেন ঘরে। আর কী আশ্চর্য, মেজর পাশ ফিরতেই আচমকা আওয়াজটা থেমে গেল। এখন মৃদু শ্বাসের শব্দ, যা কানে গেলেও ঘুমোতে অসুবিধে হবে না। ওই ভয়ংকর আওয়াজ যদি সমান তালে চলত, তা হলে এই ঘরে তার পক্ষে ঘুমোনো সম্ভব হত না। সারারাত বাইরের বারান্দায় কাটাতে হত সে ক্ষেত্রে। মেজর আবার শব্দ করার আগে ঘুমিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

মোবাইলটা দেখল অর্জুন! লঃ, এখানে নেটওয়ার্ক আছে। ওটাকে বালিশের পাশে রেখে শুয়ে পড়ল সে। আর তখনই জঙ্গল থেকে ভেসে আসা আওয়াজ তার কানে এল। সেই আওয়াজ হাওয়ার জন্য, রাত-পাখি আর প্রাণীদের হাঁকাহাকির কারণে হতে পারে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে তা শুনতে শুনতে অর্জুনের বেশ রহস্যময় বলে মনে হল।

২. হ্যালো অর্জুন

অর্জুন, অর্জুন। হ্যালো হ্যালো! অর্জুন, শুনতে পাচ্ছ?

একটা কণ্ঠস্বর অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল। আগেকার দিনে, যখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলে তবেই দুর দেশের লোক টেলিফোনে কথা শুনতে পেত, সেই রকমের শব্দ। যা মিহি হতে হতে কানের পরদায় এসে মিলিয়ে যাচ্ছে। গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকা অর্জুন ক্রমাগত সেই ডাক শুনতে

শুনতে অস্ফুটে 'উঁ' বলল।

অর্জুন, অর্জুন। হ্যালো, হ্যালো! অর্জুন শুনতে পাচ্ছ? কণ্ঠস্বর চেনা যাচ্ছে না, খুব মিহি। ঘুমন্ত অর্জুন কোনওমতে সাড়া দিল, হ্যাঁ, পাচ্ছি, পাচ্ছি।

উঠে পড়ো, এখনই ঘুম থেকে উঠে পড়ো। দিনে ঘুমোও, রাতে জায়গা। অর্জুন, অর্জুন। হ্যালো, হ্যালো! গলার স্বর যেন পরিচিত, অমলদার নয়, অনেকটা বিষ্টসাহেবের মতো।

তারপর আর কোনও সাড়া নেই। যেন গভীর জলের নীচ থেকে ভুস করে উপরে উঠে এল অর্জুন। ঘুম ভেঙে যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। সঙ্গে, সঙ্গে মাথার ভিতরটা টনটন করে উঠল। দু'হাতে কপালের দু'পাশের শিরা চেপে ধরল। মেজর আবার নাক ডাকছেন, তবে এবার মৃদু আওয়াজ হচ্ছে। অর্জুন মাথা ঝাঁকাল। মাথা ধরে গিয়েছে প্রচণ্ড। এরকম বিশ্রী স্বপ্ন সে কখনও দ্যাখেনি। না, ঠিক হল না। দ্যাখা নয়, শোনেনি। স্বপ্ন কি কেউ শোনে? কিন্তু সে তো কিছু দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। তাকে কেউ যে ডাকছিল সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আজব ব্যাপার! মাথা ধরা সারাবার কোনও ট্যাবলেট সঙ্গে নেই। সে আবার শোওয়ার জন্য বালিশে মাথা রাখতেই দেখতে পেল, মোবাইলের আলোটা টুপ করে নিভে গেল। মোবাইল সে অন করে শুয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ওটা তো লক হয়ে থাকার কথা!

মোবাইল তুলে নিয়ে লকটা খুলতে কোনও মিস্ড কল ফুটে উঠল না। কল রেজিস্টারে গিয়ে রিসিভড্ কলে যেতেই ফুটে উঠল 'নম্বর আনোন। আনোন নম্বর থেকে ফোন এসেছিল? সাধারণত বিদেশের ফোন এলে পুরোটা ফুটে ওঠে না। সে টাইম অফ কল দেখতে চাইল। দেখে হতভম্ব হয়ে গেল অর্জুন। রাত দুটো পনেরো, তারিখ আজকের। অর্থাৎ রাত বারোটার পর যে দিনটা শুরু হয়েছে সেই দিনের। তার মানে, এই মোবাইলে কল এসেছিল। কিন্তু রিং হয়নি। রিং হলে সেই আওয়াজে তার ঘুম নির্ঘাত ভেঙে যেত। কিন্তু কল এসেছিল একটু আগে, যখন সে ঘুমোচ্ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় কী করে যে ফোন করেছিল

তার কণ্ঠস্বর সে শুনতে পারে? অথচ একটা ফোন এসেছিল ওই মোবাইলে কিন্তু রিং হয়নি। নম্বর ওঠেনি এটা প্রমাণিত।

বাথরুমে গিয়ে বেসিন খুলে ঘাড়ে-মুখে জল দিল অর্জুন। কিন্তু মাথার ভিতরের দপদপানিটা যাচ্ছিল না। বহু দূর থেকে কথা বললে যেরকম শুনতে লাগে, সেইরকম শোনাচ্ছিল লোকটার গলা। ঘুম থেকে উঠে পড়ো! দিনে ঘুমাও, রাতে জাগো।

দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় পা বাড়ানোর আগে ঘরের আলো নিভিয়ে দিল অর্জুন। অনেকটা ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ এখন জঙ্গলের মাথায়। শেয়াল ডাকছে দূরে। এখন অন্ধকার অনেক পাতলা হয়ে গিয়েছে। গাছেদের রহস্য তরল।

অর্জুন রেলিং-এর ধার ঘেঁষা সোফায় বসল। কে বলল কথাটা? এত কিছু থাকতে, ঘুম থেকে উঠে পড়তে বলল কেন? হাসল অর্জুন, তার পক্ষে কি রাতে না ঘুমিয়ে দিনে ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব? তা ছাড়া সেটা করবেই বা কেন?

মাথা ধরাটা যাচ্ছে না, ঘুমও আসছে না। মেজরের নাক ডাকার শব্দ প্রথম রাতের মতো ভয়ংকর নয়। মেজর বেশ বদলে গিয়েছেন। ভেজা মুড়ির মতো লাগছে এবার। সেটা মদ্যপান ছাড়ার কারণে না বয়স বাড়ার জন্য, বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু হম্বিতম্বি চিৎকার করে কথা না বললে মেজরকে মানায় না।

হঠাৎ একটা গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। গয়েরকাটা-নাগুয়ার রাস্তাটা বাংলো থেকে বেশি দূরে নয়। এত রাতে বিশেষ প্রয়োজনে কোনও গাড়ি যেতেই পারে। কিন্তু অর্জুনের কান সজাগ হল। ইঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে তো গেলই না, বরং কাছে এগিয়ে আসছে। কোনও গাড়ি যে বাংলোর গেটে পৌঁছে গিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু গাড়ির হেডলাইটের আলো কোথায়? এত রাতে কোনও গাড়ি আলো নিভিয়ে আসবে কেন? আলো জ্বাললে তো নীচের বাগান, লন, সামনের জঙ্গলের কিছুটা আলোকিত হয়ে যেত। অর্জুন নিঃশব্দে বারান্দার কোনায় চলে এসে শরীরটা যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে, গেটের দিকে তাকাতেই গাড়িটাকে দেখতে পেল। ফিকে অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল ওটা সুমো। আলো নিভিয়ে চুপচাপ বাংলোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আবার ইঞ্জিন চালু হল। উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে সুমো দাঁড়িয়ে গেল। প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে দুটো লোক গাড়ি থেকে নামল। তারপর গেট খুলে চুপচাপ বাংলোর বাগানে চলে এসে উপরের দিকে তাকাল। সম্ভবত অন্ধকার বাংলো ওদের বিভ্রান্ত করছিল। তারপর ওপাশ দিয়ে হেঁটে চোখের আড়ালে চলে গেল ওরা।

এত রাতে কেউ আশ্রয় পাওয়ার জন্য কোনও বাংলোয় এলে এমন চোরের মতো আচরণ করে না। চিৎকার করে দরোয়ানকে ডাকবে। অতএব লোক দুটো যে অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছে, এটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। এখন কী করা উচিত? অর্জুন ভাবল। সোজা নীচে নেমে ওদের চ্যালেঞ্জ করবে। ওরা তো বলতেই পারে, এখানে থাকার জায়গা খুঁজতে এসেছিল। সব অন্ধকার দেখে মনে হয়েছে, ডেকে কোনও লাভ হবে না। এটুকু জানিয়ে চলে গেলে সে কিছুই করতে পারবে না।

মিনিটতিনেক পরে কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হল জুতোর। ওরা উপরে উঠছে। অর্জুন সোজা সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়াল। বাঁক নিয়ে ওরা উপরের সিঁড়িতে পা রাখতেই মুখ তুলে অর্জুনের ছায়ামূর্তি দেখে থমকে গেল।

অর্জুন পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল, কে আপনারা? কী চাই?

ওদের মুখ অন্ধকারের জন্যে দ্যাখা যাচ্ছে না। হঠাৎ লম্বা লোকটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা দ্রুত বের করতেই অর্জুন বিদ্যুৎবেগে দেওয়ালের আড়ালে সরে এল। লোকটা যে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বের করছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার পরই দুদ্দাড় শব্দ তুলে লোক দুটো বাংলো থেকে নেমে গাড়ির দিকে ছুটে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গাড়িটা হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটে গেল পিচের রাস্তার দিকে।

অর্জুন ফিরে গেল বারান্দায়। সোফায় বসামাত্র কথাটা মনে এল, এখনই ঘুম থেকে উঠে পড়ো। দিনে ঘুমোও, রাতে জাগো।

যদি তাকে কেউ এই কথাগুলো না বলত, যদি তার ঘুম না ভাঙিয়ে দিত, তা হলে...! থমকাল অর্জুন। লোক দুটো কী উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এত রাতে এই বাংলোয় এসেছিল, তা জানার উপায় আপাতত নেই। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল সে। আজ জ্ঞান সিংহের ধাবা থেকে যে লোক দুটো সুমোয় করে পালিয়ে গিয়েছিল, যারা শিলিগুড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল, সেই লোক দুটো কি এরাই?

অন্ধকারের আড়ালে থাকায় সুমো গাড়ির চেহারা দ্যাখা যায়নি। কিন্তু ওই লোক দুটোর শরীরের আদলের খুব মিল আছে ধাবার সামনের লোক দুটোর সঙ্গে। ধারণাটা যদি সত্যি হয়, তা হলে বুঝতে হবে, ওই লোক দুটো এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। প্রি-পেড থেকে শিলিগুড়ির জন্যে ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছে, তা জেনেছিল। জেনে আগেভাগে শিলিগুড়ি চলে আসার পথে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। শিলিগুড়ি থেকে তাদের অনুসরণ করে জলপাইগুড়িতে এসেছিল। জলপাইগুড়ির ডি এফ ও অফিস থেকে ওরা খবর পেয়েছিল যে, অর্জুনরা খুঁটিমারি জঙ্গলের বাংলোয় থাকবে। জেনে রওনা হয়ে জ্ঞান সিংহের ধাবায় খেয়েছিল। কিন্তু পরপর এত ঘটনা বড় কাকতালীয় বলে মনে হচ্ছিল অর্জুনের। তা ছাড়া ওরা তাদের অনুসরণ করবে কেন? মেজর যে লুসিকে নিয়ে আসছেন, সেটা ওদের জানার কথা নয়। অর্জুনকে অনুসরণ করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। অর্জুন চুলে আঙুল বোলাল। এবং তখনই আবিষ্কার করল, তার মাথা একেবারে হালকা হয়ে গিয়েছে। সেই যন্ত্রণা উধাও!

.

জঙ্গলে রাত শেষ হওয়ার দৃশ্য অসাধারণ। যেন গহীন অন্ধকারের জাল কেউ ছুঁড়েছিল পৃথিবীর উপর সেই সন্ধের মুখে, সূর্য ওঠার একঘণ্টা আগে থেকে সে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিচ্ছে জাল। একটু একটু করে ফরসা হচ্ছে আকাশ। গাছের পাতাদের নাচতে দ্যাখা যাচ্ছে বাতাসে। রোদ নেই, সূর্য ওঠার আগে

গম্ভীর ছায়ার চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে সামনের বাগান, লন, খুঁটিমারির জঙ্গল। কিন্তু জঙ্গলের গাছে গাছে শুরু হয়ে গিয়েছে পাখিদের অর্কেস্ট্রা। ভোর হল, ভোর হল।

গুড মর্নিং! বলেই লুসি চমকে জঙ্গলের দিকে তাকালেন, মাই গড!

পাখিরা আপনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

মাথা নাড়লেন লুসি, না। এই হট্টগোল রেকর্ড করে কোনও লাভ হবে না। কোনও পাখিকেই আলাদা চেনা যাবে না। কিন্তু আপনি কি আর্লি রাইজার?

আমি? না তো। তারপরেই খেয়াল হল, ওঃ। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তারপর আর ঘুম আসেনি।

ঠিক তখনই চিৎকারটা শোনা গেল। অর্জুন কান খাড়া করেই বুঝতে পারল ওটা পদমবাহাদুরের গলা। সে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বাংলোর পিছনে চলে এল। পদমবাহাদুর চিৎকার করে যাচ্ছে। চৌকিদার তার পাশে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে। গাড়ির বনেট খোলা, সামনের চাকা মাটিতে বসে গিয়েছে।

কী হয়েছে?

অর্জুনকে দেখে কয়েক পা এগিয়ে এল পদমবাহাদুর, সাব, দেখুন গাড়ির কী অবস্থা করেছে! ভিতরের তার ছিঁড়েছে, চাকার হাওয়া বের করে দিয়েছে।

চৌকিদার বলল, এরকম ঘটনা এর আগে এখানে ঘটেনি সাব! রাতে বাইরের লোক এখানে আসে না।

বাইরের লোক আসে না! পদমবাহাদুর খিঁচিয়ে উঠল, তা হলে এসব কে করল?

এইসময় মেজর এবং লুসি পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। সব দেখে মেজর ঘুসি মারলেন গাড়ির দরজায়, শুট করব, ক্ষতিপূরণ চাইব। হোয়্যার ইজ দ্যাট কেয়ারটেকার? কল হিম।

চৌকিদার ছুটল। পদমবাহাদুর জানাল, শুধু তারগুলো জুড়ে ঠিকঠাক করতে এই বেলাটা কেটে যাবে। তার কাছে একটা স্টেপনি আছে। অথচ দুটো চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে কোনও গ্যারাজ থেকে আর একটা স্টেপনি ধার করে আনতে হবে। তারপর গাড়িটাকে নিয়ে গিয়ে খোলা চাকায় হাওয়া ভরতে হবে।

অর্জুন মাথা নাড়ল, এসব কিছুই করতে হবে না। তুমি পিচরাস্তা থেকে একটা ভ্যান-রিকশা ডেকে এনে তাতে চাকা তুলে গয়েরকাটার গ্যারাজে নিয়ে যাও। সেখানে হাওয়া ভরার পর, একজন গাড়ির ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে সঙ্গে নিয়ে এসো।

পদমবাহাদুর চাকা খুলতে বসে গেল জ্যাক বের করে।

বাংলোর দোতলার বারান্দায় চেয়ারে বসে টি-পট থেকে কাপে চা ঢালছিলেন মেজর। এখন সোনা সোনা রোদ্র চারপাশে। মেজর বললেন, বুঝলে লুসি, কোনও একটা দুষ্টু ছেলে কাণ্ডটা করেছে। বাচ্চাদের মাথায় তো কত রকমের বুদ্ধি খেলা করে। সাধারণ ব্যাপার।

লুসি চায়ের কাপ তুলে নিলেন, আমরা কি এখানে আজকের দিনটা থাকব?

যদি তোমার কাজ না হয় তা হলে নিশ্চয়ই থাকব। মেজর বললেন।

অর্জুন ভাবছিল কী করে গত রাতের ঘটনাগুলো এঁদের জানাবে। ব্যাপারটা যে একেবারেই ছেলেমানুষি নয়, তা জানলে এঁরা নিশ্চয়ই বেশ . আপসেট হয়ে পড়বেন। বিশেষ করে লুসির মতো ভদ্রমহিলা বিদেশে এসে বড় রকমের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে নিশ্চয়ই চাইবেন না।

চায়ে চুমুক দিয়ে লুসি অর্জুনের দিকে তাকালেন, আমি ম্যাপে দেখলাম নর্থ বেঙ্গলের ফরেস্টের শুরু এখান থেকেই। তার মানে ওপাশে আরও গভীর জঙ্গল আছে। আমরা আজই সেরকম কোনও জঙ্গলে চলে যেতে পারি না?

নিশ্চয়ই পারি।

বেশ। কোথায় যাবেন ঠিক করে নিন। আর সারাদিন আমি যেন নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারি, সেটা দেখবেন প্লিজ। বেশি প্রচার করে না যাওয়াই ভাল। চা-টা শেষ করে লুসি উঠে চলে গেলেন তার ঘরে। মেজর চায়ের কাপ হাতে সুর ভাঁজছিলেন, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...।

অর্জুন তাকাল, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব?

শিয়োর, চায়ে চুমুক দিলেন মেজর।

আমি ছাড়া এদেশে আপনাদের আসার কথা আর কেউ কি জানে?

ওদেশে অনেকেই জানে। বিষ্ণু সাহেবকে বলে এসেছি। তিনি এখন কিছুটা সুস্থ। কিন্তু বনে-জঙ্গলে ঘুরতে হবে শুনে এলেন না। লুসির গবেষণার ব্যাপারটা যাঁরা স্পনসর করছেন তারা জানেন। আর এদেশে দু'জন জানেন।

কারা?

তোমার মা আর অমল সোম।

অমলদার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে?

হ্যাঁ। কথা হয় না। মাঝে মাঝে ইন্টারনেটে পত্র বিনিময় হয়।

কিন্তু মেজর, আমার বিশ্বাস আপনাদের উপর নজরদারি করতে কেউ বা কারা বেশ সক্রিয়। দু'জন গত রাতে এই বাংলোয় এসেছিল। তারাই যাওয়ার সময় গাড়িটার অবস্থা ওইরকম করে গিয়েছে, অর্জুন বলল।

হাঁ হয়ে গেলেন মেজর, মাই গড। লোক দুটো এখানে এল কী করে?

সুমো গাড়িতে চেপে।

তুমি দেখলে ওরা গাড়িটাকে নষ্ট করছে আর চুপ করে থাকলে?

খালি হাতে কিছু করতে যাওয়া বোকামি হত।

কখন এসেছিল?

রাত আড়াইটের পর।

তখন তুমি জেগে ছিলে? ঘুমোওনি?

ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

আশ্চর্য! আমাকে ডাকলে না কেন? মেজর বিরক্ত।

ওদের কাছে অস্ত্র ছিল। কিছুই করা যেত না। তা ছাড়া আপনি যেরকম গভীর ঘুমে ডুবে ছিলেন, তাতে সহজে ওঠানো যেত না, অর্জুন বলল।

কিন্তু, কিন্তু লোক দুটো কোন উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল?

ওদের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি। বোধহয় জেগে আছি দেখে আর এখানে দাঁড়াতে চায়নি। লোক দুটো নর্থ বেঙ্গলের। এখানকার সব কিছু জানে। হয়তো কেউ ওদের রিক্রুট করেছে, অর্জুন বলল। লুসিকে এসব কথা না বলাই ভাল।

মেজর বললেন, এমন তো হতে পারে, কে বা কারা পছন্দ করছে না, লুসি এই গবেষণা করুন। ওঁর সঙ্গে কথা বললে জানা যেত আমেরিকায় এরকম কেউ আছে কিনা। মেজর তাকালেন।

তা যদি হয়েও থাকে, তা হলে তারা নর্থ বেঙ্গলের লোককে রিক্রুট করবে কী করে? বড্ড অস্বাভাবিক বলে কি মনে হচ্ছে না আপনার?

মেজর মাথা নাড়লেন। একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, একটা কথা বলি। কাল রাত্রে তুমি এসব স্বপ্নে দ্যাখোনি তো?

তার মানে? স্বপ্ন দেখলাম আর সেইমতো গাড়িটাকে ওই অবস্থায় সকালে পাওয়া গেল? অর্জুন বেশ জোরে বলে ফেলল।

এইসময় লুসি এলেন। পরনে জিন্স, টপ, পায়ে জঙ্গলে ঘোরার উপযোগী জুতো, কাঁধে বড় ব্যাগ। আমি তৈরি।

এখনই বেরোবে? ব্রেকফাস্ট খেয়ে গেলে হত না? মেজর বললেন।

না না। তখন রোদ আরও কড়া হয়ে যাবে।

.

মিনিটপাঁচেকের মধ্যে ওরা বাংলো ছেড়ে পিছনের পথ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। এত অল্প সময়ের মধ্যে মেজরকে তৈরি হতে দেখে ভাল লাগল অর্জুনের। বয়স হওয়া সত্ত্বেও বার্ধক্য ওঁকে গ্রাস করেনি।

প্রথম দিকের জঙ্গল বেশ ফাঁকা। পুরনো গাছ কেটে নতুন যে গাছগুলো লাগানো হয়েছিল, তাদের শৈশব অবস্থা কাটেনি। কিন্তু পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে খুব। বিশেষ করে 'বউ কথা কও' বলে পাখিটা জঙ্গল কাঁপিয়ে দিচ্ছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি এই পাখির ডাক আগে শুনেছেন?

না। কী পাখি ওটা?

এখানে বলা হয় 'বউ কথা কও'।

বউ...! থেমে গেলেন লুসি।

অর্জুন হেসে ফেলল, এর ইংরেজি অনেকটা এইরকম, ব্রাইড, সে সামথিং।

ইজ ইট? লুসি প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন একটা গাছের তলায়। তারপর ব্যাগ থেকে টেপ রেকর্ডার বের করে চাপা গলায় কিছু বলে যন্ত্রটাকে উঁচু করে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাকটা থেমে গেল। মিনিটদুয়েক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকেও আর পাখিটাকে ডাকতে শুনল না ওরা।

ফিরে এসে লুসি বললেন, এখন থেকে কেউ আর কথা বলব না এবং জুতোয় যাতে শব্দ না হয় সেটা খেয়াল রাখব। কেমন?

একটু পরেই জঙ্গল গম্ভীর হলেও পায়ে চলা পথ ধরে এগোতে অসুবিধে হচ্ছিল না। আচমকা একটা পাখির ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন লুসি। পাখিটা উঁচু হয়ে চলে গেল জঙ্গলের আরও ভিতরে। টিপ টিপ টিসুম। টিপ টিপ টিসুম! লুসি ডাকটা রেকর্ড করছিলেন।

অর্জুন মেজরের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। এখন মেজরের মাথায় টুপি। আর সেই টুপির উপর একটা কালো জোঁক নৃত্য করছে। বললেই মেজর এমন চিৎকার করে উঠবেন যে, জঙ্গলের সব পাখি উড়ে পালাবে। সে ইশারায় মেজরের কাছ থেকে টুপিটা দেখতে চাইল। খুব গর্বিত হাসি হেসে মেজর টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে অর্জুনের হাতে দিলেন। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে জোঁকটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল। কিন্তু ওর পড়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না। ততক্ষণে জোঁকটাকে দেখতে পেয়ে মেজর দু'হাতে নিজের মুখ চেপে ধরেছেন প্রবল শক্তিতে। মাটিতে টুপি নামিয়ে একটা কাঠির সাহায্যে জোঁকটাকে টুপি থেকে নামাতে পারল অর্জুন। জুতোয় পিষে ওটাকে মারতে চাওয়া অর্থহীন। তবু মেজর সেই চেষ্টা করে ক্ষান্ত হলেন।

.

বেলা এগারোটায় ওরা একটা ঝরনার সামনে দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে লুসি গোটাদুয়েক ক্যাসেট পরিবর্তন করেছেন।

মেজর বললেন, লুসি, এবেলার জন্য অনেক হয়েছে। এবার ফেরা যাক।

লুসিকে বেশ খুশি দ্যাখাচ্ছিল। তিনি প্রথম ক্যাসেটটা বের করে রেকর্ডারে ঢুকিয়ে বললেন, একটু চেক করে নিই, সাউন্ড ঠিক আছে কিনা।

লুসি ক্যাসেট রি-ওয়াইন্ড করছিলেন। অর্জুন ঝরনার দিকে তাকাল। একটা বেশ বড়সড় পাথরঠোকা মাছ প্রায় হাতের নাগালে এসে পাক খেয়ে চলে গেল। এই ঝরনায় মাছ আছে। আর এই মাছেরা নীচের দিকে যায় না! মেছুয়া পুলের নীচের ঝরনায় এদের তো একসময় দেখা যেত।

হঠাৎ শব্দ হল। অর্জুন ঝরনার ওপাশে তাকাতেই চমকে উঠল। জঙ্গল কুঁড়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিশাল চেহারার দাঁতাল হাতি। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ করছে। ঝরনাটা চওড়ায় বড়জোর কুড়ি ফুট।

মাই গড! মেজরের গলা দিয়ে বেরোনো স্বরটাকে ঠিক বোঝা গেল না মেজরের বলে। ঠিক সেই সময় রি-ওয়াইন্ড সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্লে বোতাম টিপে উঠে দাঁড়ালেন লুসি, মেজরের জন্যে একটা সারপ্রাইজ প্রথমে বাজবে।

দাঁড়িয়ে থেকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মরার কোনও মানে হয় না। অর্জুন ফিসফিস করে বলল, দৌড়োন।

সে ঘুরে দাঁড়াতেই মেজর তাকে অনুসরণ করলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভয়ংকর আওয়াজ শোনা গেল। সেই সঙ্গে লুসির আর্তনাদ। মেজর অর্জুনের হাত ধরে টেনে থামালেন, শুনতে পাচ্ছ? এটা নিশ্চয়ই বাঘ। নিশ্চয়ই জন্তুটা লুসির উপরে ঝাঁপিয়েছে। হাতির ভয়ে পালালাম আমরা অথচ মেয়েটাকে

ছেড়ে এলাম বাঘের পেটে যাওয়ার জন্য। কী জবাব দেব? কী জবাব দেব আমি ওর বাবা-মাকে? মেজর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অর্জুনের কানে এল গাছপালা ভাঙার শব্দের সঙ্গে বন্য জন্তুর হুংকার মেশা বিচিত্র আওয়াজ। সে দেখল, মেজর হাত মুঠো করে হাঁটছেন ঝরনার দিকে। অর্জুন মেজরের সঙ্গ নিতেই হুংকার থেমে গেল। মেজর ফিসফিসিয়ে বললেন, বাঘটা বোধহয় চলে গেল। কিন্তু হাতিটা তো ওখানে আছে!

বাঘে-হাতিতে একসঙ্গে ঝরনার জল খায় না।

আঃ, তুমি এই সময়ও রসিকতা করছ?

জঙ্গল সরিয়ে ঝরনা দেখে ওপারে তাকাল অর্জুন। হাতিটাকে দ্যাখা যাচ্ছে । প্রাণীটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেই জায়গার গাছপালার উপর যেন তাণ্ডব বয়ে গিয়েছে। মুখ ফেরাতে সে লুসিকে দেখতে পেল। উবু হয়ে বসে টেপ রেকর্ডারে কিছু করছেন। মেজরকে সেটা দ্যাখাতেই তিনি হাত উঁচু করে চিৎকার করতে করতে ছুটলেন। ও লুসি, মাই লিটল ডিয়ার, তোমার কিছু হয়নি তো? হাতি বা বাঘ তোমাকে আহত করেনি দেখে আমি যে কী খুশি হয়েছি!

লুসি অবাক হলেন, বাঘ? এখানে বাঘ কখন এল? একটা হাতিকেই তো দেখলাম।

লুসির কথা শোনামাত্র অর্জুনের মনে পড়ে গেল। বাঘের ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে। সে লুসিকে বলল, আওয়াজটা মেজরকে শোনান।

লুসি হেসে প্লে-বোতাম টিপবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গর্জন শুরু হল।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই আওয়াজ কোথায় রেকর্ড করলে? এ তো বাঘ কিংবা সিংহের গর্জন। একবার আফ্রিকায়...।

কাল রাতে অর্জুন ডেকে শোনালে আমি রেকর্ড করেছিলাম। এই আওয়াজ তোমার নাক থেকে বেরিয়েছে মেজর, লুসি হাসলেন।

মেজর এমন হকচকিয়ে গেলেন যে, দাড়ি-গোঁফের আড়ালে ঢেকে থাকা মুখেও লজ্জা লজ্জা ভাব ফুটে উঠল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, হাতিটা এপারে আসেনি?

আপনারা চলে যেতে আমি কী করব বুঝতে না বুঝতেই হাতি জলে পা রেখেছিল এপারে আসবে বলে। ঠিক তখনই টেপ রেকর্ডার থেকে মেজরের নাক ডাকার শব্দ বেরিয়ে এসেছিল। প্লে-বোতাম টেপার পর কয়েক সেকেন্ড গ্যাপ ছিল হয়তো। আমি ভয় পেয়ে ভলিউম বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেই আওয়াজ কানে যেতেই হাতি থমকে দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো

দৌড়োতে লাগল পিছন ফিরে। গাছগুলো ভাঙল কিন্তু ওর সেদিকে খেয়াল ছিল না। এমন প্রাণভয়ে পালাতে আমি আজ পর্যন্ত কোনও জন্তুকে দেখিনি, লুসি এগিয়ে এসে মেজরের হাত ধরলেন, তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব মেজর, জানি না। তুমি আজ আমার জীবন রক্ষা করেছ। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ।

মেজর ততক্ষণে স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন, এ এমন কিছু নয়। আমি কী নাক ডাকি! তোমরা তো মারিয়ার নাক ডাকা শোনোনি?

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, মারিয়া কে?

উগান্ডায় আমার যে গাইড ছিল। লিকলিকে রোগা, পাঁচ তিন লম্বা। মাথা ন্যাড়া রাখতে ভালবাসে। ও যখন রাতে নাক ডাকে তখন পৃথিবী কাঁপতে থাকে। ভয়ংকর ব্যাটল স্নেকরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। হাতি তো তার কাছে কিছু নয়। কিন্তু মাই ডিয়ার লুসি, এবার তোমার যন্ত্রটাকে বন্ধ করবে? মেজর বললেন।

অর্জুন বলল, হ্যাঁ। বন্ধ করুন। তাকিয়ে দেখুন, ঝরনার মাছগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে এখান থেকে। কোনও গাছে পাখি ডাকছে না।

মেজর বললেন, আমি ইচ্ছে করলে তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারি তা জানো? অনুমতি ছাড়া আমার ব্যক্তিগত শব্দ চুরি করেছ! এবার ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ, ওই শব্দ লুসির প্রাণ বাঁচিয়েছে। এখন চলো, হাঁটা যাক।

.

গোটা দুপুর লুসি তার ঘরে টেপ রেকর্ডার নিয়ে কাটালেন। আজ যত পাখির ডাক তিনি রেকর্ড করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে একটা ডায়েরিতে মন্তব্য লিখে রাখছিলেন। অর্জুনকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন সাহায্য করবার জন্যে। লাঞ্চের পর যখন মেজর একটু বিছানায় গড়াতে গেলেন, তখন অর্জুন এসেছিল লুসির ঘরে। এখন লুসির পরনে হাঁটুর তিন ইঞ্চি নীচে নামা প্যান্ট আর গেঞ্জি। খাটের উপর রেকর্ডার এবং ডায়েরি নিয়ে বাবু হয়ে বসে কাজ করছেন। কোনও কোনও বাঙালি মেয়ে হয়তো এরকম পোশাকে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারে, কিন্তু এখনও তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। লুসি যে কাজপাগল মানুষ তাতে সন্দেহ নেই।

রেকর্ডারের স্টপ বোতাম টিপে লুসি তাকালেন, পাখিদের সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে আপনার? পাখিদের পৃথিবীটা কীরকম জানেন?

মাথা নাড়ল অর্জুন, জানি না।

লুসি যেন ছাত্র পেয়ে খুশি হলেন, ১৮৫৭ সালে পি এল স্কাটার নামে এক ভদ্রলোক পাখিদের পৃথিবীটাকে ভাগ করেছেন ছ'ভাগে। এক, নিয়ার্কটিক, উত্তর আমেরিকা এবং মধ্য মেক্সিকো। দুই, নিউ ট্রপিক্যাল, মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা। তিন, প্যালিয়াটিক, ইয়োরোপ, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অংশ, এশিয়ার পশ্চিমাংশ। চার, ইথিওপিয়ান, আফ্রিকার অধিকাংশ এবং আরব দেশ। পাঁচ, ওরিয়েন্টাল, ভারত, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আর ছয়, অস্ট্রেলিয়ান, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের আকাশে যেসব পাখিদের দেখা যায়। কিন্তু এর পঁয়ত্রিশ বছর পর ক্লিস্টন হার্ট মেরিয়াম বললেন, ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী পাখিদের ভাগ করা খুব ভুল হবে। তিনি বললেন, টেম্পারেচার এবং হিউমিডিটি অনুযায়ী পাখিদের চরিত্র তৈরি হয়।

অর্জুন মাথা নাড়ল, এটাই তো সহজ। শীতের পাখি, গরমের পাখি। আপনাদের আমেরিকায় কত পাখি আছে তার গণনাও কি করা হয়েছে?

জোর দিয়ে বলা যাবে না। তবে সামারের শুরুতে প্রায় ছয় মিলিয়ন পাখি আমেরিকায় থাকে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, প্রতি একর জমিতে প্রায় তিনটি পাখি। এই হিসেবটা খুব কাছাকাছি। আপনাদের এখানে পাখির সংখ্যা কি গোনা হয়েছে? লুসি জিজ্ঞেস করলেন।

অর্জুন চোখ বন্ধ করল। প্রায়ই শোনে, হাতি, গন্ডার বা বাঘ গোনা হচ্ছে। কিন্তু পাখি গোনার কথা কানে আসেনি। সে মাথা নেড়ে না বলল।

লুসি টেপটা চালু করতেই কাঠঠোকরার আওয়াজ কানে এল। অর্জুন নামটা বলতেই লুসি বললেন, উডপোকার। ট্রপিক্যাল দেশগুলোতে প্রচুর দ্যাখা যায়।

হঠাৎ কানে এল একটা ডাক। বিপ বিপ বিপ। তারপর একটু শিস। লুসি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই পাখির নাম কী?

না, আমি কখনও শুনিনি।

কোনও পক্ষীবিশারদের নাম জানা আছে?

সলিম আলির নাম মনে পড়ল অর্জুনের। কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন কিনা, তা তার জানা নেই। আর-একজন, লেখক বুদ্ধদেব গুহ। ওঁর নানা লেখায় বিচিত্র সব পাখির ডাক পাওয়া যায়।

লুসি বোধহয় আন্দাজ করলেন। বললেন, এই পাখির ডাক আমার আরও দরকার।

ওঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিশাল গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গিয়েছেন।

আপনাদের ওখানকার কোনও পরিচিত পাখির ডাকের সঙ্গে মিল পাচ্ছেন বুঝি?

অর্জুন জিজ্ঞেস করতে লুসি মাথা নাড়লেন, নো। তারপর আবার রি ওয়াইন্ড করে ডাকটা শোনালেন। বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন, শোনার পর কি কিছু মনে আসছে?

বিপ বিপ বিপ। শিসের আওয়াজ। শিসের আওয়াজ খুব স্পষ্ট রেকর্ড হয়নি। অর্জুন চোখ বন্ধ করল। বিপ বিপ বিপ টেলিফোনের নম্বর ঘোরানোর পর অনেক সময় লাইনটা পাওয়ার আগে বিপ বিপ বিপ শব্দ শোনা যায়। নির্দিষ্ট নম্বরে পৌঁছোবার প্রয়াস চালিয়ে যায়।

অর্জুন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

চলুন, বেরিয়ে পড়ি। পাখিটাকে লোকেট করতেই হবে।

কেন?

ওর ডাকটাকে ব্যবহার করা যায়। লুসি নেমে পড়লেন।

অর্জুন ঘড়ি দেখল, এখন জঙ্গলে গেলে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। আমাদের তো আজই এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা। অর্জুন বলল।

কিন্তু আমার যে ওই পাখিটাকে দরকার।

আপনি পাবেন। এই খুঁটিমারিতে যত পাখি আছে, তার সবটাই পাওয়া যাবে গোরুমারায়। চাপড়ামারি অথবা জলদাপাড়ায়।

যদি না পাওয়া যায়?

তা হলে এখানে ফিরে আসব। এমন কিছু দূরত্ব নয়, অর্জুন আশ্বস্ত করল তাকে। গুছিয়ে নেওয়ার জন্য দশ মিনিট সময় দিয়ে অর্জুন নিজেদের ঘরে ঢুকে দেখল, মেজর ডায়েরি লিখছেন। তাকেও তৈরি হতে বলে মোবাইলটা অন করল অর্জুন। বাঃ, এই মুহূর্তে নেটওয়ার্ক আছে। সে জলপাইগুড়ির বাড়ির ল্যান্ডলাইন ধরবার জন্যে বোতাম টিপতেই শুনতে পেল, বিপ বিপ বিপ। তারপর স্ক্রিন সাদা, নেটওয়ার্ক চলে গেল। অবিকল ওই পাখির ডাক।

.

গাড়ি সারানো হয়ে গিয়েছিল। লুসি বসলেন ড্রাইভারের পাশে, ওরা পিছনে। অর্জুন লক্ষ করছিল কেউ তাদের অনুসরণ করছে কিনা। সে ঠিক করল, গয়েরকাটার চৌমাথা দিয়ে জলদাপাড়ায় যাবে না। ড্রাইভারকে বলল, পদমবাহাদুর, তুমি হিন্দুপাড়া দিয়ে বিনাগুড়ির রাস্তাটা চেনো?

জি সাব।

ওই রাস্তায় চলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে শর্টকাট পথ ধরে ওরা বিনাগুড়ির দিকে ছুটতে লাগল। একটু তরল গলায় জিজ্ঞেস করল অর্জুন, পদমবাহাদুর, কাল রাত্রে যারা গাড়ির ক্ষতি করেছে, তাদের খবর পেলে?

বদমাশরা বেঁচে গিয়েছে!

মানে?

কাল রাতে, ভোর রাতে, একটা সুমো গাড়ি নাথুয়ার দিক থেকে এসে গয়েরকাটার তিনমোড়ে গাছের গায়ে ধাক্কা মারে। তখন সবাই ঘুমোচ্ছিল। শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দ্যাখে, গাড়িটা কাত হয়ে পড়ে আছে। ড্রাইভার বা কেউ নেই। দুপুরে আমার গাড়ি নিয়ে ফেরবার সময় দেখলাম, পুলিশ এসে গিয়েছে। শুনলাম, ওই সুমোটা নাকি গতকালই চুরি হয়ে গিয়েছিল শিলিগুড়ি থেকে।

অদ্ভুত ব্যাপার। এরা গাড়ি চালালেই অ্যাক্সিডেন্ট করে নাকি! কিন্তু অত ভোরে এই গয়েরকাটার মতো নির্জন জায়গা পেরিয়ে গিয়ে লুকোবে কোথায়? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

পদমবাহাদুর মাথা নাড়ল, কোনও ট্রাক ধরে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

সেটা অস্বাভাবিক নয়। জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রতি মিনিটে ট্রাক যাওয়া আসা করে অসম থেকে। তার একটাকে থামিয়ে উঠে পড়লেই হল।

গয়েরকাটা ছাড়িয়ে বীরপাড়া হয়ে মাদারিহাটের দিকে ছুটে যাচ্ছিল গাড়ি। অর্জুন দেখল, রাস্তার দুপাশে জঙ্গল কেটে বসতি তৈরি হয়ে গিয়েছে বীরপাড়া পর্যন্ত। মাদারিহাটে যখন তাঁরা পৌঁছোল তখন ঘন বিকেল। আর-একটু এগিয়ে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে টুরিস্ট বাংলো। বাংলোয় গিয়ে পরিচয় দেওয়ার আগেই কেয়ারটেকার বললেন, নমস্কার অর্জুনবাবু।

অর্জুন বলল, নমস্কার। আমরা কাল রাতে ছিলাম খুঁটিমারির বাংলোয়। জলপাইগুড়ির ডি এফ ও অনুমতি দিয়েছিলেন। এই ভদ্রমহিলার শখ পাখির ডাক রেকর্ড করা। তা আমাকে বলা হয়েছে, জলদাপাড়া কোচবিহারের ডি এফ ও-র এলাকা। আপনাদের বাংলোয় নিশ্চয়ই জায়গা নেই। কোনও প্রাইভেট থাকার ব্যবস্থা আছে?

ভদ্রলোক হাসলেন, তার আর দরকার হবে না। একটু আগে হলং বাংলোটা খালি হয়েছে। কলকাতার এক পার্টি চার দিনের জন্যে বুক করেছিল। ওরা গতকাল এসেছিল, কিন্তু আজই একটা খারাপ খবর পেয়ে ফিরে গিয়েছে কলকাতায়। এ ক্ষেত্রে তিনটে রাত বাংলো খালি থাকছে। আপনারা স্বচ্ছন্দে তিন রাত ওখানে থাকতে পারেন।

বাংলোটা কোথায়?

একেবারে জলদাপাড়া ফরেস্টের ঠিক মাঝখানে। আপনারা চলে যান, আমি ওখানকার রেঞ্জারকে ফোনে বলে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠল অর্জুন। ঢোকার মুখে পাহারাদারের চৌকি, গেট বন্ধ। সেখানে পরিচয়পত্র দেখালে, লেখালেখির পর গেট খুলে দেয়। যেহেতু ওরা কেয়ারটেকারের কাছ থেকে আসছে, তাই কোনও সমস্যা হল না।

মেজর এতক্ষণে মুখ খুললেন, আচ্ছা অর্জুন, তুমি জানতে ফরেস্টের কোনও বাংলোয় জায়গা নেই। শুধু খুঁটিমারিই আমাদের ভরসা ছিল। তা হলে কোন সাহসে সেই বাংলো ছেড়ে এদিকে এসেছিলে! কিছু না পেলে তো আবার ফিরে যেতে হত!

না, যেতাম না। এখান থেকে ফুন্টশোলিং ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। ওখানে চলে যেতাম। বিদেশ ঘোরাও হয়ে যেত। অর্জুন হাসল।

জঙ্গলের মধ্যে চমৎকার রাস্তা। অর্জুন বলল, এই জঙ্গলে গন্ডার, বাইসন এবং হাতি যে-কোনও মুহূর্তে দেখলে অবাক হবেন না।

কথাটা সে বলেছিল ইংরেজিতে। লুসি কাঁধ নাচালেন, আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড। এর মধ্যে বুঝতে পেয়েছি, প্রচুর পাখি আছে এখানে।

রেঞ্জার সাদরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে অর্জুনকে বললেন, আপনি কি এবার কোনও অভিযানে এসেছেন? তা হলে আমাকে সঙ্গে নেবেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, এবার এসেছি পাখির ডাক শুনতে। উনি ওই নিয়ে গবেষণা করছেন। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

রেঞ্জার বললেন, কিছুটা দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঝিল তৈরি করা হয়েছে। প্রচুর পাখি হয় শীতকালে। এখনও কিছু আছে। গিয়ে দেখতে পারেন।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, এখানে আপনাদের সমস্যা কী কী?

মূল সমস্যা দুটো। চোরা-কাঠকারবারি আর গন্ডারশিকারি। তবে আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। জঙ্গলের উপর ঘন ছায়া। লুসি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, রাতে এই জঙ্গলের ভিতর ঢোকা কি নিরাপদ নয়?

না। বিশেষ করে বাইসন বা হাতির সামনে পড়লে ফিরে আসতে পারবেন না, রেঞ্জার বললেন। সবচেয়ে ভাল সময় ভোর সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটা। প্রচুর পাখির ডাক শুনতে পাবেন সে সময়।

হলং বাংলোটি চমৎকার। বোঝাই যায় মন্ত্রী বা বড় আমলারা ওখানে মাঝেমধ্যে ওঠেন। তিনটে খালি ঘর পাওয়ায় সুবিধে হয়েছিল। রাত দশটায় জেনারেটর বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন হারিকেনের আলো ভরসা। তার আগে খেয়ে নিতে হবে। নিজের ঘরে বসে অর্জুন মোবাইলে গেম খেলছিল। হঠাৎ মেজর ঢুকলেন বেশ উত্তেজিত হয়ে, কাম, ভিতরে এসো। পাজি, নচ্ছার।

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে দেখল, একটি রোগা মানুষ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে হাতজোড় করে। ভয়ে কাঁপছে বেচারা। মেজর বললেন, কী আস্পর্ধা, আমার ঘরে মশারি টাঙাতে আসে একপেট হুইস্কি খেয়ে! আবার যতবার জিজ্ঞেস করছি ডিউটিতে থাকার সময় কেন হুইস্কি খেয়েছ, ততবারই বলছে খায়নি। লায়ার। ওর শাস্তি হওয়া উচিত।

অর্জুন তাকাল লোকটার দিকে। লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, আমি হুইস্কি খাইনি সাহেব।

আবার মিথ্যে কথা! সারাজীবন ওটা খেয়ে এসেছি, আমি জানি না ওরকম নেশা কী খেলে হয়! তুমি নিশ্চয়ই আমার উপর এ ব্যাপারে আস্থা রাখবে অর্জুন।

নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। হুইস্কি কিনে খাওয়া ওর পক্ষে তো অসম্ভব ব্যাপার। তা হলে ও খেল কোথায়? অর্জুন বলল।

সোজা ব্যাপার। কোনও গেস্টের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে।

আমার তা মনে হয় না। এই জঙ্গলের গভীরে, ও জিনিস যারা পছন্দ করে তারা টাকা দিতে পারে, কিন্তু নেশার বস্তু দান করবে না। অর্জুন এগিয়ে গেল, বুঝলাম, তুমি সত্যি কথা বলছ, হুইস্কি খাওনি।

এতক্ষণে লোকটার মুখে হাসি ফুটল, হ্যাঁ সাহেব, হুইস্কি খাইনি।

কিন্তু কিছু একটা খেয়ে নেশা করেছ। কী সেটা?

হাঁড়িয়া। আমরা যে হাঁড়িয়া খাই, তা সবাই জানে।

হাঁড়িয়া? মেজর একপা এগিয়ে এলেন, হোয়াট দ্যাট?

কান্ট্রি লিকার। ওরা বাড়িতে বানিয়ে খায়। অনেকটা বিয়ারের মতো।

মাই গড। সেটার এফেক্ট একেবারে হুইস্কির মতো?

তা আমি বলতে পারব না।

কিন্তু জিনিসটা আমি দেখতে চাই।

অর্জুন পকেট থেকে দশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে ধরল। এতে এক বোতল হাঁড়িয়া পাওয়া যাবে?

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। অর্জুন বলল, যাও, নিয়ে এসো। এই সাহেবকে দ্যাখাবার পর কাজ শেষ হয়ে গেলে তুমি খেয়ে নিয়ো।

লোকটা তৎক্ষণাৎ টাকা হাতে নিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। মেজর মাথা নাড়লেন, না, অর্জুন একটা মিথ্যেবাদীকে তুমি প্রশ্রয় দিলে!

বোধহয় না। এখন বলুন, এখানে কেমন লাগছে আপনার?

দারুণ। তবে আফ্রিকার জঙ্গলের মতো রহস্যময় নয়।

তা হলে আসুন, আমরা আজকের রাতটা জেগে দেখি, রহস্য কিছু আছে কিনা!

মেজরের চোখ ছোট হল, বলছ? একটা রাত তো জেগে থাকাই যায়। লুসিকেও বলি।

না না। ওঁকে রেস্ট নিতে দিন। কাল সকালে ওঁর তো অনেক কাজ। অর্জুন আপত্তি করল। এইসময় তার মোবাইলে আলো জ্বলে উঠল। কেউ ফোন করেছে মনে করে ওটা তুলতেই আলো নিভে গেল। অর্জুন দেখল নেটওয়ার্ক আছে। কিন্তু ফোন এলে তো রিং হত।

মেজর বললেন, ওই বস্তুটি খুব বিরক্তিকর। তোমার প্রাইভেসি বলে কিছু থাকবে না। যেখানেই যাও, লোকে তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। আমেরিকার রাস্তায় প্রতি তিনজনের দু'জনে বিড়বিড় করতে করতে হাঁটে। আজকাল তো কানে ফোন চেপে রাখতে হচ্ছে না, রিমোটে শুনতে পাচ্ছে।

অর্জুন বলল, এটা নেওয়ায় মা খুব খুশি। যখন ইচ্ছে আমার খবর পাবেন। অথচ গতকাল থেকে তিনি একবারও ফোন করেননি!

এইসময় দরজায় শব্দ হল। অর্জুন বলল কে?

সেই লোকটি সসংকোচে ঘরে ঢুকল। হাতে ছোট বোতল।

অর্জুন মেজরকে বলল, নিন, পরীক্ষা করে দেখুন।

মেজর খপ করে বোতলটা ধরে উপরে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। নাকের নীচে নিয়ে এসে গন্ধ শুকলেন, কী দুর্গন্ধ!

ভাত পচিয়ে ওরা ওই তরল পদার্থ তৈরি করে, যাকে আপনি দামি হুইস্কি ভেবে ভুল করছিলেন। অর্জুন বলল।

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ভাই। যা বলছ, তাতে বুঝতে পারছি এটা খুব সস্তার জিনিস। তা হলে দামি জিনিসের সমান এফেক্ট কী করে হবে। আর যদি হয়, তা হলে আন্তর্জাতিক মদ্যপায়ী অ্যাসোসিয়েশনের নজরে আনা উচিত। হয়তো দেখবে লক্ষ লক্ষ লিটার হাঁড়িয়া বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। গন্ধটা যদি কোনওভাবে কমানো যায় তা হলে...। অবশ্য এফেক্ট একই থাকবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে, মেজর বোতলটাকে ভাল করে দেখলেন আবার, কোনও নাম লেখা নেই। তার মানে নেহাতই দিশি।

অর্জুন বলল, আপনি তো বিয়ার-হুঁইস্কিরাম এ জীবনে আর মুখে তুলবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। খুব ভাল সিদ্ধান্ত। কিন্তু টি-টেস্টারের মতো হাঁড়িয়া-টেস্টার হবেন না, এমন প্রতিজ্ঞা কি করেছেন?

না, তা অবশ্য করিনি, বলে লোকটির দিকে তাকালেন। ঠিক হ্যায়, তুমি যেতে পারো। কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলব।

লোকটা চলে গেল। হঠাৎ খেয়াল হল মেজরের, ইস, লুসি অনেকক্ষণ একা আছে। যাই, ওর খবর নিয়ে আসি। আমি আজ ঘরেই ডিনার খেয়ে নেব, বুঝলে? বেশ টায়ার্ড। গুড নাইট।

.

রাত তখন একটা। হলং ফরেস্ট নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে জঙ্গল থেকে অদ্ভুত সব প্রাণীর চিৎকার ভেসে আসছে। অর্জুন জানলার পাশের চেয়ারে বসে অলস চোখে অন্ধকার দেখছিল। একটু ঝিমুনি আসছে। কোনও কারণ নেই, তবু সে স্থির করেছিল রাতে ঘুমাবে না। দিনে ঘুমোও, রাতে জাগো', নির্দেশটা না হয় আজ পালন করবে। এইসময় অন্ধকারকে একটু নড়তে চড়তে দেখে সে সোজা হয়ে বসল। তারপর বুঝল, গেটের বাইরে হাতির দল দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তাদের চেহারা অস্পষ্ট। তবু, এক-দুই করে গোটাছয়েকের শরীরের আভাস পেল অর্জুন। শেষপর্যন্ত দলটা চলে গেল বাঁদিকে। অর্জুনের মনে প্রশ্ন এল, ওরা কখন ঘুমোয়?

রাত গড়াচ্ছিল। হঠাৎ অন্ধকার ঘরে মোবাইলের আলো দপদপ করে উঠতেই চমকে তাকাল অর্জুন। কোনও রিং হচ্ছে না। মোবাইলের স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে, প্রাইভেট নম্বর। আর তখনই মাথার ভিতরে অদ্ভুত অস্বস্তি শুরু হল। স্পষ্ট কানে এল, বিপ, বিপ, বিপ...? তিনবার ওই একটানা শব্দের পর গলার স্বর কানে এল, হ্যালো, হ্যালো অর্জুন! তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো অর্জুন?

পাচ্ছি। আপনি কে? ফিসফিস শব্দে জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

আমি, আমি। শোনো, ওই মেয়েটির দিকে নজর রেখো। সাবধান। মেয়েটি খুব বিপদের মধ্যে আছে, যা ওর জানা নেই। হ্যালো হ্যালো...! যেভাবে টেলিফোনের লাইন কেটে যায় তেমনভাবে কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। আর সেটা হওয়ামাত্র মাথা ধরে গেল অর্জুনের। কপালের দু'পাশের শিরা দপদপ করতে লাগল। সে মোবাইল তুলে দেখল, আলো নিভে গিয়েছে। কল রিসিভড-এ লেখা হয়েছে, আ প্রাইভেট নম্বর।

এইসময় দরজায় টোকা পড়ল। হারিকেনের আলো ঈষৎ বাড়িয়ে দিয়ে দরজা খুলল অর্জুন। মেজর দাঁড়িয়ে আছেন, ওটা হুইস্কির বাবা, বুঝলে। কথা জড়ানো।

আপনি পুরোটা খেয়ে নিলেন? অর্জুন অবাক।

না খেলে বুঝব কী করে? আমার খুব নেশা হয়ে গিয়েছিল।

কী করে বুঝলেন?

বুঝব না? হঠাৎ মনে হল, কে যেন জানলা দিয়ে একটা বড় জবাফুলের মালা ছুঁড়ে দিল আমার গলায়। আশ্চর্য, উঠতে না-উঠতে মালাটা ভ্যানিশ হয়ে গেল। বুঝতে পারছ, কী বিপুল নেশা! এরকম আমার কখনও হয়নি। তাই তোমাকে না জানিয়ে পারলাম না, মেজর আবার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

অর্জুন বাধা দিল, মেজর!

ইয়েস মাই বয়!

আমি একটা বইয়ে পড়েছি, যারা বুঝতে পারে তাদের নেশা হয়ে গিয়েছে, তাদের মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে যায় না। আপনার হয়নি, দাঁড়ান। নিজের ঘর বন্ধ করে সে মেজরকে নিয়ে ওপাশের ঘরে ঢুকল। হারিকেনের আলো টিমটিম করছে। সেটাকে বাড়াল।

হেসে জিজ্ঞেস করল, জবাফুলের মালা ওই জানলা দিয়ে কেউ ছুঁড়েছিল?

ইয়েস। মাথা নাড়লেন মেজর।

আপনার কী করে মনে হল ওটা জবার মালা, গাঁদাও তো হতে পারে।

নো, রেডিশ, লালচে।

বাব্বা! আপনার রংও খেয়াল আছে।

অ্যাজ বিকজ আমার নেশা হয়নি। মেজর টলছিলেন।

এইজন্য বলে, অনভ্যাসের চন্দন কপালে চড়চড় করে।

তার মানে?

অনেকদিন পরে খেলেন তো! অভ্যেস চলে গিয়েছে। বোতলটা তুলে ভাল করে দেখল অর্জুন। এক বিন্দুও তলানি নেই।

ঘুম পাচ্ছে হে, গুড নাইট। মেজর বিছানার দিকে গেলেন।

আরে! আমি চলে গেলে দরজা বন্ধ করে তবে তো শোবেন। খাটের তলায় উঁকি মারল অর্জুন, মালা কেউ ছোড়েনি। স্বপ্ন দেখেছেন। মশারি টাঙাননি কেন? টাঙিয়ে দেব? ভোরের মশা কিন্তু মারাত্মক।

না ভাই। আচ্ছা, দুটো বালিশ ছিল, একটা কোথায় গেল? তুমি নিয়েছ?

অদ্ভুত কথা বলেন। নিশ্চয়ই ওপাশে পড়ে গিয়েছে। অর্জুন ঘুরে খাটের ওপাশে গিয়ে বালিশটাকে দেখে বাঁহাত বাড়াতে যেতেই ফোঁস করে ফণা তুলল একটা কালচে সাপ। মেঝে থেকে অন্তত চার ফুট উঁচুতে ফণাটা উঠতেই ডান হাতে ধরা হাঁড়িয়ার বোতলটা দিয়ে অর্জুন বিদ্যুৎগতিতে আঘাত করল ওর মাথায়। ছিটকে পড়ে গেল সাপটা। লাফিয়ে পাশে গিয়ে চটিপরা ডান পা ওর মাথার উপর সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরতেই সাপটা কয়েকবার লেজ আছড়ে নেতিয়ে পড়ল।

ওটা মরে গিয়েছে বোঝবার পর অর্জুন সাপটাকে মাথার নীচে ধরে উপরে তুলল। অন্তত এক কেজি ওজনের বিষধর সাপ। এতক্ষণ মেজর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুন হাসল, এই আপনার জবাফুলের মালা। স্বপ্নেও রঙের কাছাকাছি গিয়েছিলেন! কেউ ওই জানলা দিয়ে আপনার বিছানায় এটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। বোধহয় বালিশে ধাক্কা লাগায়, ইনি বালিশের সঙ্গেই নীচে পড়ে যান। নইলে আপনার কী অবস্থা এতক্ষণে হত অনুমান করে দেখুন!

মাই গড। এত বড় সাপ ছুড়বে কে? মেজরের নেশা পাতলা হচ্ছিল।

কে ছুঁড়েছিল জানতে হলে, কেন ছুঁড়েছিল তা জানা দরকার।

কেন ছুঁড়েছিল! মেজর বিড়বিড় করলেন, আমি তো এখানে প্রথম এলাম। কারও সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই।

মনে হচ্ছে, ওরা ঘর ভুল করেছে। অর্জুন বলল, যাক গে, এখন এসব নিয়ে ভেবে কোনও লাভ হবে না। জানলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আপনি দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ুন। মরা সাপটাকে জানলার বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিল অর্জুন।

তুমি ঘুমোবে না?

না।

ও। তা হলে চলো, তোমার খাটে না হয় শোব আমি। মানে, তুমি যখন আজ ঘুমোচ্ছ না, তখন তো খাটটা খালিই থাকবে...!

ঘুমোব না, কিন্তু খাটে শোব না কি বলেছি? দরজা বন্ধ করুন। অর্জুন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দূরে সাদা কিছুকে সরে যেতে দেখল। যেন কেউ দৌড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। একটু আগে সেই কণ্ঠস্বর জানিয়েছে যে, লুসি জানেন না তিনি বিপদে আছেন। কাল সকালে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

৩. চা-বিস্কুট এসে গেল

কাল বাকি রাতটা নির্বিঘ্নে কেটেছে। ভোর হল। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় চলে গেল। ঘুম এল ঝড়ের মতো। যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন বেলা এগারোটা। বাথরুম থেকে পরিষ্কার হয়ে দরজা খুলতে, কাল রাতের সেই লোকটাকে দেখে চা দিতে বলল সে। মিনিট দশেকের মধ্যে চা-বিস্কুট এসে গেল। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবে?

আমি গরিব মানুষ। চাকরি চলে গেলে মরে যাব। হাতজোড় করল লোকটি।

ডিউটির সময় হাঁড়িয়া খাও কেন?

আর খাব না স্যার।

ঠিক আছে। ওঁরা উঠেছেন?

হ্যাঁ স্যার। সেই ভোরবেলায় ওঁরা জঙ্গল দেখতে হাতির পিঠে চড়েছেন, এখনও ফেরেননি। লোকটি বলল।

হাতির পিঠে?

হ্যাঁ স্যার। এখানে প্রত্যেক ভোরে টুরিস্টদের হাতির পিঠে চড়িয়ে গন্ডার বাইসন দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ওঁরা ফিরে আসেন সকাল নটার মধ্যে। আজ কেন দেরি হচ্ছে জানি না।

লোকটি কাপ-ডিশ নিয়ে চলে গেলে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল। মেজরের ঘরের জানলার নীচে এসে চারপাশে তাকিয়ে সাপটাকে দেখতে পেল না সে। মাটি থেকে বেশ উঁচুতে জানলা। যে ওই ভারী সাপটাকে ছুঁড়েছিল তাকে অবশ্যই জানলার এপাশে উঠতে হয়েছে। হয়তো ব্যাগের মধ্যে সাপটাকে পুরে রেখেছিল ছোঁড়ার আগে। কিন্তু উঠল কী করে? চারপাশ তাকিয়ে তেমন কোনও সিঁড়ি বা উঁচু বস্তু চোখে পড়ল না। সে জানলার নীচে এসে ভাল করে লক্ষ করতেই দেখল, দুটো জুতোর চাপে মাটি অনেকটা বসে গিয়েছে। একজন মানুষের শরীরের ওজনে মাটি অতটা বসে যেতে পারে না। নিজের জুতোর ছাপ পাশে রেখে বুঝল, যে দাঁড়িয়েছিল তাকে প্রচুর ওজন বইতে হয়েছিল। একটু ভাবতেই দৃশ্যটা আন্দাজ করল অর্জুন। একজন মানুষের কাঁধে দু’পা রেখে যদি আর-একজন মানুষ দাঁড়ায়, তা

হলে মাটিতে দাঁড়ানো মানুষের জুতো নরম মাটিতে অতটা বসে যেতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে ওপরে দাঁড়ানো মানুষটাও জানলার গায়ে পৌঁছে যাবে সহজে।

এইসময় বাইরের গেটে কথাবার্তা শুরু হওয়ায় অর্জুন চলে এল সামনে। হাতি ফিরে এসেছে। লুসি নামলেন স্বচ্ছন্দে। মেজরকে নামাতে হল বেশ কসরত করে। রেঞ্জার এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর প্রশ্নের জবাবে মাহুত বলল, কী করব স্যার! সামনে পাঁচটা হাতি, নড়ছে না সরছে না। পিছনে বাইসনদের দল। ওরা যতক্ষণ সরে না যাবে, ততক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। শেষপর্যন্ত বাইসনদের দলটা সরে গেলে পিছন দিক দিয়ে অনেকটা ঘুরপথে ফিরে আসতে পারলাম।

এরকম তো ওরা করে না। নিশ্চয়ই কোনও ঘটনা ঘটেছে। রেঞ্জার বললেন।

লুসি খুব উত্তেজিত। এত কাছ থেকে হাতি বা বাইসন তিনি কোনও জঙ্গলে দ্যাখেননি। প্রথম দিকে পাখির ডাক রেকর্ড করেছিলেন, কিন্তু শেষ তিনটে উত্তেজনাপূর্ণ ঘণ্টায় সেসব মাথা থেকে উড়ে গিয়েছিল।

মেজর শুধু মন্তব্য করলেন, গড ইজ গ্রেট।

হঠাৎ? অর্জুন অবাক হল।

ধরো হাতিকে যদি তার শরীরের সঙ্গে মানানসই চোখ ভগবান দিতেন, তা হলে বাঘ-সিংহ ল্যাজ গুটিয়ে পালাত। সাপটাকে ফেলে দিয়েছি।

সাপ! মানে?

উঃ। কাল রাত্রে যে-সাপটাকে তুমি মারলে...।

কখন ফেললেন? কোথায় ফেললেন?

ভোরবেলায়। সাফারিতে যাওয়ার আগে। ওপাশের খাদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। বেশ ভারী ছিল হে। ও হ্যাঁ, জানলার নীচ থেকে এইটে কুড়িয়ে পেয়েছি। কার জিনিস জানি না, যদি কোনও কাজে লাগে। পকেট থেকে একটা সাদা রঙের লাইটার বের করে অর্জুনকে দিলেন মেজর।

লাইটার হাতে নিয়ে অর্জুন বুঝল এটা বিদেশে তৈরি। একপাশে লেখা রয়েছে, ই ডি টি। এটা লোগো। পাশে লেখা, EXTRUSION, DIES AND TOOLS, 58769 NACHRODT/Tel : 02352-9386-0! না, ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় তৈরি নয় লাইটারটা। মেজরকে ঠিকানা দ্যাখাতে বললেন, এ জার্মানির লাইটার।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি ব্যবহার করেছেন বলে মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, এখন আমেরিকায় এই লাইটার কোনও দোকানে পাওয়া যায় না। আগে অঢেল আসত। মেজর বললেন।

এর কোনও বিশেষত্ব আছে?

শিয়োর। অন্ধকারে ল্যাম্পের কাজ করে। সোজা দাঁড় করিয়ে ফ্লেম বের করে সুইচ টিপে দিলে চমৎকার জ্বলতে থাকবে। অন্তত কুড়ি মিনিট।

আপনার এটা দরকার?

নো। পকেটে রাখলেই ধূমপানের ইচ্ছে হবে। নো মোর। তবে তুমি যাই বলো অর্জুন, দ্যাট ওয়াজ এ গ্রেট ড্রিঙ্ক। চোখ ঘোরালেন মেজর।

হাঁড়িয়া?

মাথা নেড়ে টুপিটাকে নাড়ালেন মেজর।

আপনি তো হুইস্কি-রাম খাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন!

করেছি এবং খাব না। কিন্তু ওই বস্তু তো হুইস্কি বা রাম নয়। স্রেফ কান্ট্রি লিকার। অযত্নে পড়ে আছে। ওর কোয়ালিটির উন্নতি করতে পারলে বিশ্বজয় করা যাবে। আমি ঠিক করেছি সেটাই করব। মেজর আর দাঁড়ালেন না।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতিটিকে এখন খাবার দিচ্ছে মাহুত। চুপচাপ সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে গত রাতের কথা ভাবছিল অর্জুন। অত কষ্ট করে যারা জানলা দিয়ে সাপটাকে ছুঁড়েছিল তাদের কেউ জার্মান লাইটার ব্যবহার করে। অর্থাৎ খুঁটিমারির বাংলোতে যারা হানা দিয়েছিল তারা উধাও হয়ে যায়নি। নিশ্চয়ই তাদের অনুসরণ করে জলদাপাড়ায় এসেছে। অথচ আসার সময় কোনও গাড়িকে অনুসরণ করতে দ্যাখেনি অর্জুন। তা ছাড়া যদি এসেও থাকে, তা হলে বিকেল থেকে রাতের মধ্যে ওই বিষধর সাপটাকে কী করে জোগাড় করল? ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে এই হলং-এর বাংলো অনেক দূরে। ঢুকতে গেলে অনুমতি নিতে হয়। ওই সাপটাকে নিয়ে ওরা নিশ্চয়ই গাড়িতে করেই এসেছে। অত রাতে গাড়ি ঢুকলে রক্ষীরা নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জ করবে। অর্জুন রেঞ্জারের অফিসে গেল।

রেঞ্জার সবে কাজে এসে বসেছেন, অর্জুনকে দেখে আপ্যায়ন করলেন। উলটো দিকের চেয়ারে বসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, গত রাতে কোনও গাড়ি কি এদিকে এসেছিল? তেমন কোনও রিপোর্ট পেয়েছেন?

না তো! এদিকে কোনও গাড়ি আসেনি। তা ছাড়া রাতে জঙ্গলের পথে গাড়ি চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আছে। কেন বলুন তো? রেঞ্জার জিজ্ঞেস করলেন।

আমার সন্দেহ হচ্ছে বলেই জানতে চাইছি।

সন্দেহের কারণ?

আমার সঙ্গী ওই দাড়ি-গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকের বিছানায় কাল রাতে কেউ মোটা সাপ ছুঁড়ে ফেলেছিল জানলা দিয়ে।

সে কী? রেঞ্জারের চোখ বিস্ফারিত।

ভাগ্যে বেঁচে থাকা ছিল বলে মেজর মারা যাননি।

সাপটা কোথায়?

গত রাতেই আমি মেরে জানলার বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম। আজ আর ওর মৃতদেহ দ্যাখা যাচ্ছে না। বোধহয় কোনও প্রাণী খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু ও সত্যি মরেছিল তো!

হ্যাঁ। মাথাটা একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল।

রেঞ্জার টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, মান সিংহ, কাল রাতে কোনও গাড়িকে ভিতরে ঢুকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল?

লোকটার জবাব কানে এল অর্জুনের, আমি রাতের ডিউটিতে ছিলাম না সাব।

আঃ, খাতা দ্যাখো! ধমকালেন রেঞ্জার।

না সাব। কোনও এন্ট্রি নেই।

ডিউটিতে যারা ছিল তাদের কেউ কাছে আছে?

একটু দাঁড়ান সাব। মান সিংহের গলা অস্পষ্ট হল। তারপর আর একটি কণ্ঠ বাজল, মধুসূদন গড়াই সাহেব। কাল রাতে একটা জিপ ঢুকতে চেয়েছিল, আমরা পারমিশন দিইনি। ওরাও বেশি ঝামেলা না করে মাদারিহাটের দিকে চলে গিয়েছিল।

ক'জন ছিল গাড়িতে?

তিনজন। একজন সাহেব, মানে সাদা চামড়ার লোক। ঠিক আছে।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন রেঞ্জার, যেভাবে চেঁচিয়ে কথা বলছিল, তাতে উত্তরগুলো নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন?

তা হলে কেউ কাল রাতে জঙ্গলে ঢুকতে চেয়েছিল। আচ্ছা বলুন তো, মেন গেট দিয়ে না এসে অন্য কোনও রাস্তায় ভিতরে আসা যায়? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

দেখুন, এত বড় জঙ্গল তো, পাহারা দিয়ে ঢোকা বন্ধ করা যায় না। আমাদের বিট অফিসাররা মাঝে মাঝেই জঙ্গলে ঘুরে দ্যাখেন, অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে কিনা। জঙ্গলে ঢোকার যেসব পথ আছে, সেগুলো পায়ে চলার পথ, এবড়োখেবড়ো। তবে তার উপর দিয়ে কেউ যদি জিপ চালিয়ে ঢোকে, তা হলে কিছু করবার নেই। অবশ্য জিপের হেডলাইটের আলো চোখে পড়বেই। রেঞ্জার বললেন।

কাল রাতে সাপটাকে ছোঁড়া হয়েছিল, যাতে ওর বিষে যাকে ওরা মারতে চায় সে মারা যায়। এই সাপ ওরা কীভাবে পেতে পারে?

সাপুড়েদের কাছ থেকে। জঙ্গল থেকে হরিণ-বাঘ ধরা যেমন বেআইনি, সাপও তেমন। তবু সাপ ধরতে অনেক সাপুড়ে জঙ্গলে ঢোকে। বর্ষার সময় এদিকে যখন সাপের অত্যাচার বাড়ে, তখন আমরাই বাধ্য হই ওদের খবর দিতে। তবে হাসিমারার কাছে একটা সেন্টার খোলা হয়েছে মাসদশেক হল। ওরা সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছে, বিষধর সাপের বিষ সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু বিষ বের করে নেওয়ার পর সাপগুলোকে আবার জঙ্গলে ছেড়ে দিতে হবে। কোনও অবস্থাতেই মারা বা বিক্রি করা চলবে না। ওই বিষ নাকি নানা ওষুধ তৈরির কাজে প্রয়োজন হয়। রেঞ্জার বললেন।

ওই সেন্টারে টুরিস্ট হিসেবে যাওয়া যায়? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

বেশ তো, কাল বিকেলেই চলুন। আমিও যাব।

রেঞ্জারের অফিস থেকে বেরিয়েই অর্জুন লুসিকে দেখতে পেল। কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। সে হাত নাড়তেই লুসি দাঁড়ালেন। কাছে গিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, রোদ বাড়ছে, এখন কি পাখিরা ডাকবে?

দিনের প্রতিটি ঘন্টায় পাখি ডাকে, এক-এক প্রজাতির পাখি এক-এক সময়। যাবেন নাকি? লুসি হাসলেন।

চলুন।

হাঁটতে হাঁটতে লুসি জিজ্ঞেস করলেন, কাল রাতে মেজরের ঘরে যে-সাপটাকে মেরেছেন, সেটাকে সত্যি কেউ জানলা দিয়ে ছুঁড়েছিল?

হ্যাঁ। তখন আধা-অন্ধকারে মনে হয়েছিল বেশ ভারী সাপ। সকালে ওটার দ্যাখা না পাওয়ায় ওর জাত বা ওজন সম্পর্কে সন্দেহ থাকছে।

কিন্তু মেজরের মতো ভাল মানুষকে কেন কেউ মারতে চাইবে?

ঠিক। তা ছাড়া গত রাতে মেজর যে ওই ঘরে থাকবেন, তা তো উনি নিজেই জানতেন না! অথচ যারা মারতে এসেছিল তারা জানল কী করে?

এটাই অদ্ভুত লাগছে। ওই ঘরে আমি আমার ব্যাগ রেখেছিলাম। রাতে আপনার ঘর থেকে ফিরে মেজর আমাকে বলল, সে ওই ঘরে শোবে। আমি যদি মাঝখানের ঘরে যাই, তা হলে ভাল হয়।

তখন ওঁর হাতে কি একটা বোতল ছিল?

হ্যাঁ হ্যাঁ। ও বলল মাঝখানের ঘরে একটাই জানলা আর ওখানে দুটো। ও জানলার পাশে বসে বোতলের পদার্থ টেস্ট করতে চায়। তারপর তো ডিনারেও এল না, আলোও নিভে গেল। মেজর যে ও ঘরে আছে, তা আমি ছাড়া কেউ জানত না। যে সাপ ছুঁড়েছিল সে যদি খবর নিতে আসে, তা হলে বেয়ারাদের কাছে শুনেছে আমি শুয়ে আছি ওই ঘরে। তা হলে মেজর নয়, আমিই টার্গেট ছিলাম? লুসি তাকালেন।

এমন কোনও ইঙ্গিত কি পেয়েছেন, যাতে মনে হতে পারে আপনাকে কেউ মারতে চাইছে? অর্জুন সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

লুসি মাথা নেড়ে বললেন, আমার কোনও শত্রু নেই।

ওরা জঙ্গলের ভিতরে পায়ে চলা পথ ধরে হাঁটছিল। লুসি বললেন, আফ্রিকার জঙ্গলে গেলে যে আদিম গন্ধ পাওয়া যায়, তা এদিকের জঙ্গলে নেই।

আছে। সুন্দরবনে গেলে সেটা পাবেন। মুশকিল হল, ওখানে বেশিক্ষণ হাঁটা যায় না। হাঁটতে চেষ্টা করলে হয় সাপের কামড় খাবেন, না হয় বাঘের পেটে যাবেন।

সুন্দরবন, এখান থেকে কত দূরে?

অনেক দুরে। তবে কলকাতার কাছেই।

লুসি মাথা নাড়লেন। অর্জুন লক্ষ করছিল, মাথার উপর প্রচুর পাখি ডাকা সত্ত্বেও, লুসি সেগুলোকে রেকর্ড করার চেষ্টা করছেন না।

হঠাৎ একটা কাঠঠোকরা বিকট শব্দে জানান দিতেই যন্ত্র খুললেন লুসি। খানিকটা শব্দ রেকর্ড করে নিয়ে বললেন, এই পাখিরা পৃথিবীর সব দেশে একই আচরণ করে। এদের পক্ষে আটলন্টিক বা প্যাসিফিক

পার হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ডানায় অত জোর নেই। ধরে নেওয়াই যেতে পারে যে, যে মহাদেশে জন্মেছে সেখানেই বংশপরম্পরায় থেকে গিয়েছে। তা হলে আচরণ এক হয় কী করে? একটা কাণ্ড দেখবেন? উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে লুসি ক্যাসেটটা বের করে ব্যাগ থেকে আর-একটা ক্যাসেট ভিতরে ঢুকিয়ে প্লে বোতাম টিপলেন। কয়েক সেকেন্ড পরেই যন্ত্রের ভিতর থেকে শব্দটা বের হল। অবিকল কাঠঠোকরার ডাক। বেশ জোরে যেন পাখি ডাকছে। এটা থামতেই গাছের পাতার আড়ালে বসা কাঠঠোকরা ডেকে উঠল। এবারের ডাকটায় যেন আর্তি মেশানো। যন্ত্রের পাখির ডাক শুরু হতেই ওটা থেমে যাচ্ছে। তারপর ডানার ঝটপটানি কানে আসতেই অর্জুন দেখল, গাছের কাঠঠোকরা একেবারে নীচের ডালে উড়ে এসে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে। লুসির আঙুল স্টপ বোতামটা টিপতেই যন্ত্র নীরব হল। গাছেরটি বোকাবোকা মুখ করে অর্জুনদের দেখে উড়ে গেল কোথাও। লুসি বললেন, এই ডাকটা মেক্সিকোর এক কাঠঠোকরা ডেকেছিল। ইন্ডিয়ান কাউন্টার পার্ট স্বচ্ছন্দে বুঝতে পেরেছে!

.

এখন ভরদুপুর। বাংলো থেকে প্রায় আধমাইল দূরের জঙ্গলে পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। লুসি অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে নানা পাখির ডাক রেকর্ড করে চলেছেন। রেকর্ড করতে করতে ফিসফিস করে বলে চলেছেন, হারমিট, সিক্লেবিল, থর্নবিল, সোর্ডবিল। অথবা পিনটেল গ্রিন পিজিয়ন, হোয়াইট হেডেড মাউসবার্ড। অর্জুনের খুব খিদে পেয়ে গেল। সকালে চা আর বিস্কুট ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি। জঙ্গলের ভিতরে খাবার পাওয়া অলৌকিক ব্যাপার। আর-একটু এগোলেই জঙ্গলঘেঁষা গ্রাম হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কথাটা বলার জন্য মুখ খুলতেই মেহগনি গাছটা থেকে ভেসে এল, বিপবিপ, বিপ, হুইলের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে শব্দটাকে রেকর্ড করতে লাগলেন লুসি। পাখিটা ডেকেই চলেছে। পাতার আড়াল থাকায় ওর চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুনের মনে হল, অবিকল টেলিফোনের শব্দ গাছের উপর থেকে ভেসে আসছে। হঠাৎ অনেক দূরের গাছ থেকে বিপ, বিপবিপ ডাক শুরু হতেই পাখিটা ডাক থামাল। লুসি মুখ ঘুরিয়ে অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, ওকে উড়ে যেতে দেখলেন?

না।

যেদিক থেকে ক্ষীণ ডাকটা আসছিল সেদিকে পা বাড়ালেন লুসি। মিনিটদেড়েকের মধ্যে কানে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ বাজল। অর্জুন বুঝল, ওরা হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের প্রান্তে চলে এসেছে। এদিকে বোধহয় যাতায়াতের রাস্তা আছে। নইলে গাড়ি চলবে কী করে!

লুসিকে ওঁর কাজ করতে দিয়ে, সরু পথ ধরে কিছুটা এগোতেই একটা। মাটির রাস্তা দেখতে পেল সে। রাস্তার উপর গাড়ির চাকার দাগ। এই রাস্তা আজকাল কেউ ব্যবহার না করলেও যে-গাড়িটা এসেছিল, তার চালক খুব দক্ষ হাতে চালিয়ে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে গিয়েছে। চাকার দাগ অনুসরণ করে কিছুটা হাঁটতেই জঙ্গলের বাইরে চলে এল অর্জুন। দূরে একটা গ্রাম দ্যাখা যাচ্ছে। পাশে ঝোঁপ, বুনো লতানো গাছ, তারপর পিচের রাস্তা। ন্যাশনাল হাইওয়ে। গাড়ি যাচ্ছে ওখান দিয়ে। কিন্তু ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে

কারও পক্ষে জঙ্গলের এই প্রবেশপথ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। ড্রাইভার নিশ্চয়ই এর খবর রাখত। মূল গেটে বাধা পাওয়ায় এদিক দিয়ে ঢুকছে।

এইসময় লুসি পাশে এসে দাঁড়ালেন, কী ব্যাপার?

গত রাতে যারা সাপ ছুঁড়েছিল তারা এই পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকেছিল। বাংলোর যতটা কাছাকাছি যাওয়া যায়, ততটা আলো নিভিয়ে গিয়ে জিপ থেকে নেমেছিল ওরা। তার মানে বুঝতে পারছেন? ওদের মধ্যে কেউ এই জঙ্গল চেনে। সাপও তার পক্ষে জোগাড় করা স্বাভাবিক। অর্জুন বলল।

কিন্তু কেন? লুসি তাকালেন।

আপনি জানেন না, মেজরেরও জানা নেই। তাই প্রশ্নটার উত্তর একমাত্র ওরাই দিতে পারে। অবশ্য তার আগে আমাদের কেউ যদি খুন হয়ে যায়, তা হলে ব্যাপারটা খুব দুর্ভাগ্যজনক হবে। একটু আগে শুনলাম, ওরা যে গাড়িতে এসেছিল, তাতে একজন সাদা চামড়ার মানুষও ছিল!

সাদা চামড়া?

হ্যাঁ। আমেরিকা না ইয়োরোপের তা জানা যায়নি। ওরা কথা বলতে বলতে আবার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এবার পথ বদলে জিপের চাকা অনুসরণ করে যাবে বলে ঠিক করল অর্জুন। ঠিক তখন মাথার উপরে গাছের ডালে সেই পাখিটা বিপ বিপবিপ করে উঠতেই লুসি তড়িঘড়ি রেকর্ডার বের করতে উদ্যোগী হলেন। অর্জুন তাঁকে ফেরার জন্যে তাগাদা দিতে মুখ ফেরাতেই লোকটাকে দেখতে পেল। হাইওয়ে থেকে নেমে বুনো ঝোঁপের পাশ দিয়ে জঙ্গলের দিকে আসছে।

সে চাপা গলায় বলল, কোনও শব্দ করবেন না, চটপট লুকিয়ে পড়ুন। তারপর দ্রুত ছুটে গেল শালগাছগুলোর পিছনে। কিছু না বুঝেও লুসি চলে এলেন পাশে। অর্জুন ঠোঁটে আঙুল চেপেই ইশারা করল সামনের দিকে তাকাতে।

প্রথমে শিস শোনা গেল। তারপর লোকটাকে দ্যাখা গেল। পকেট থেকে একটা বড়সড় সিগারেটের প্যাকেট বের করে গন্ধ শুকল একটু। ওটা যে বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট, তাতে কোনও সন্দেহ নেই অর্জুনের। প্যাকেটটাকে পকেটে রেখে আবার শিস দিতে দিতে চলে গেল লোকটা এবড়োখেবড়ো জিপ চলা পথ দিয়ে।

লুসি জিজ্ঞেস করলেন, হু ইজ হি?

আমি জানি না। তবে মনে হচ্ছে ফরেস্টের একজন কর্মী। চলুন, এবার ফেরা যাক। অর্জুন হাঁটা শুরু করল।

নমস্কার স্যার। আপনারা এদিকে?' দুটো লোক যেন জঙ্গল ফুড়ে ওদের সামনে হাজির হল। দু'জনের কাঁধেই বন্দুক, পরনে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ইউনিফর্ম।

ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। আপনারা? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

আমরা ফরেস্টের স্টাফ। পাহারা দিতে বেরিয়েছি।

এদিকে জন্তু-জানোয়ার থেকে কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই তো!

নেই বলব না। তবে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি। এদিকের সব জানোয়ার জঙ্গলের ওপাশে চলে গিয়েছে। এরকম ব্যাপার সাধারণত হয় না।

হয়তো কোনও কারণে ভয় পেয়েছে। চোরাশিকারিরা নিশ্চয়ই এদিকে আসে। ওদিকের হাইওয়ে খুব দূরে নয়। ঢুকে পড়তে কতক্ষণ! অর্জুন বলল।

এই গাদাবন্দুক দিয়ে ওদের আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে লড়াই করা যাবে না জেনেও আমরা সাহস দ্যাখাই। সরকার যদি বন্দুকগুলো বদলে না দেয়, তা হলে আর কতদিন সাহস থাকবে জানি না।

হঠাৎ দ্বিতীয় লোকটা গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেয়ে প্রথমজনকে ডেকে দ্যাখাল। প্রথমজন চটজলদি উবু হয়ে বসে আঙুল দিয়ে চাকার দাগ পরীক্ষা করতে করতে বলল, এটা রেঞ্জার সাহেবের জিপ নয়। এত বড় জঙ্গল কি সবসময় চোখে চোখে রাখা যায়! বদমাশরা হাতি-বাইসনকেও ভয় করে না।

গন্ডার? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

এখানকার গন্ডাররা ঝামেলা এড়িয়ে চলে। আচ্ছা স্যার...।

ওরা হেঁটে এল পথটা। জিপ চলতে পারে, কিন্তু হাঁটার পক্ষে খুব কষ্টকর রাস্তা। হঠাৎ চোখে পড়ল জিপের চাকার দাগ ঘুরেছে। অর্থাৎ এখান থেকে জিপটা ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বাংলোর সামনে ওরা পৌঁছোল পাঁচ মিনিটের মধ্যে। এখন দুপুর দেড়টা। গত রাতে যে লোকটা হাঁড়িয়া এনে দিয়েছিল, সে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, সাব, খাবার তৈরি।

পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি। ওই সাহেব কোথায়?

উনি ওঁর ঘরে কুকুরকে ট্রেনিং দিচ্ছেন।

কুকুর? অর্জুন অবাক। লুসি ঢুকে গেলেন তাঁর ঘরে। অর্জুন দেখল, মেজরের ঘরের দরজা বন্ধ। কিন্তু ভিতর থেকে অদ্ভুত সব শব্দ ভেসে আসছে। সে দরজা ঠেলতেই ওটা খুলে গেল। দৃশ্যটা দেখে চোখ কপালে উঠল অর্জুনের। বারমুডা আর গেঞ্জি পরে হামাগুড়ি দিচ্ছেন মেজর। তাঁর সামনে মাসদেড়েক

বয়সি একটি নেড়ি কুকুরের বাচ্চা। মেজর বলছেন, ইউ মাস্ট ফাইট, খপ করে ধরবি। ফাইট। কিন্তু মাটিতে পড়ে থাকা একটি দড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেড়ির বাচ্চাটার নেই।

মেজর! কী করছেন? অর্জুন ঘরে ঢুকল।

কে? ও তুমি! ট্রেনিং দিচ্ছি। কিন্তু ইন্ডিয়ানরা কখনও যুদ্ধ করেনি তো, তাই এটাকে লড়াকু করে তুলতে সময় লাগবে। কাম অন মাই বয়, ফাইট!

ও কার সঙ্গে লড়াই করবে?

সাপের সঙ্গে। যে-কেউ জানলা দিয়ে সাপ ছুঁড়ে আমাকে মেরে ফেলবে, তা চলবে না। একটা বেজি কিংবা ময়ূর পাওয়া গেলে খুব ভাল হত। কিন্তু ওরা বন্যপ্রাণী, ওদের ধরা চলবে না। তাই এটাকেই তৈরি করছি। কাম অন...। মেজরের কথাগুলো বেশ জড়ানো। অর্জুনের বুঝতে অসুবিধে হল না উনি পান করেছেন।

মেজর! আপনি ওসব খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন!

ইয়েস। নো মোর হুইস্কি-রাম-ভদকা।

কিন্তু এই ভরদুপুরে আপনি পান করেছেন?

ওঃ! কাল রাতে প্রথম হাড়িয়া খেয়েছিলাম। আজ মনে হল, রাতে যেরকম লেগেছিল দিনের বেলায় সেরকম লাগে কিনা দেখতে হবে। তাই আর-একটা বোতল হাঁড়িয়া আনিয়ে টেস্ট করলাম। বুঝলে ব্রাদার, ভালভাবে বটলিং করে এক্সপোর্ট করলে এ জিনিস গোটা পৃথিবী লুফে নেবে। এদেশের বেকার সমস্যা এক মাসে দূর হয়ে যাবে। বলতে বলতে মেজর চোখ বন্ধ করে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। সেই সুযোগে নেড়ির বাচ্চা দৌড় লাগাল খোলা দরজা সামনে পেয়ে।

মেজর, আপনার স্নান হয়ে গিয়েছে?

ইয়েস।

নীচে আসুন। লাঞ্চ রেডি হয়ে গিয়েছে। অর্জুন বেরিয়ে এল।

.

লাঞ্চের পর লুসির ইচ্ছে ছিল উলটো দিকের জঙ্গলে ঢোকার। কিন্তু ওদিকে একটা বড়সড় হাতির দল এসেছে শোনবার পর তিনি বিশ্রাম নিতে ঘরে চলে গেলেন। মেজরের খুব ঘুম পেয়ে গেল। গত দুটো রাত প্রায় জেগেই কাটাতে হয়েছে অর্জুনকে। তাকেও বিছানা টানছিল। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে জানলায়

দাঁড়িয়ে সে বিশাল জঙ্গলের মাথা দেখতে দেখতে রেঞ্জারের অফিসের দিকে চোখ নামাতেই লোকটাকে দেখতে পেল। চোরাই পথ দিয়ে শিস দিতে দিতে ঢুকেছিল লোকটা। বিদেশি সিগারেটের ঘ্রাণ নিচ্ছিল মাঝে মাঝে। এখন লোকটা হাত নেড়ে কথা বলে যাচ্ছে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে। তারপর ঢুকে গেল রেঞ্জারের অফিসে।

.

বড়জোর ঘণ্টাআড়াই ঘুমিয়েছিল অর্জুন। হঠাৎ মাথার ভিতর সেই অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। পাশ ফিরে শোওয়া অবস্থায় সে চোখ অল্প খুলতেই দেখতে পেল, মোবাইলের আলো দপদপ করছে। তারপরই শুরু হল, বিপ, বিপ, বিপ। যোগাযোগ করার জন্য মরিয়া চেষ্টা চলছে বলে মনে হল। তারপরই শব্দটা থেমে গেল। অর্জুন পরিষ্কার শুনতে পেল, কেমন আছ অর্জুন? আমাকে চিনতে পারছ না? আমি বিষ্ঠুসাহেব। সেই কালিম্পং-এর!

ও হ্যাঁ। আপনার গলা চিনতে পারিনি। আপনি তো এখন আমেরিকায়!

হ্যাঁ। আমার বন্ধু প্রোফেসর ক্যালডার মুলেনের সৌজন্যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। বন্ধু অমল সোম তোমার ব্রেন স্ক্যানিং-এর রিপোর্ট আর মোবাইল নম্বর আমাকে পাঠিয়েছিলেন। বিষ্টসাহেব বললেন।

কিন্তু মোবাইল সেট ছাড়া কী করে আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি?

না না। তোমার মোবাইল অফ থাকলে আমার কথা তুমি শুনতে পেতে না। যন্ত্রটির ব্যাটারির সাহায্যে তোমার মস্তিষ্কে আমার কথা পৌঁছোচ্ছে, বছরখানেকের মধ্যে এই আবিষ্কারের ফল ভোগ করবে গোটা পৃথিবী। যাক গে, লুসি কেমন আছে?

ভালই আছেন।

তুমি কি ওর মুখে প্রোফেসর মুলেনের নাম শুনেছ?

না।

ওকে জিজ্ঞেস করো, সব জানতে পারবে। গুড বাই!

অর্জুন চোখ খুলল। হাত বাড়িয়ে মোবাইল সেট তুলে দেখল, একটি প্রাইভেট কল এসেছিল। কোনও নম্বর ফুটে ওঠেনি।

বিষ্ণুসাহেবের মুখ মনে এল। কালিম্পং-এ দেখা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে। প্রিয় কুকুর মারা যাওয়ায় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। মেজরের সঙ্গে পরিচয় ওঁর মাধ্যমে। তারপর খুব অসুস্থ হয়ে বিদেশে চলে যান। বোঝাই যাচ্ছে, বিষ্টুসাহেব-মেজর অমলদার মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু বিষ্ঠুসাহেব যাঁর কথা বললেন, সেই

প্রোফেসর মুলেনের এই আবিষ্কার যেদিন পৃথিবী জানবে, সেদিন হইহই পড়ে যাবে। শুধু যার সঙ্গে কথা বলতে চাই, তার ব্রেনের অবস্থান ঠিকঠাক জানা চাই। আর চাই তার মোবাইল নম্বর। পৃথিবীর যে-দেশেই থাকো, সেই মোবাইলের সাহায্যে মাথার ভিতর শব্দগুলো পৌঁছে দেওয়া যাবে। ফলে ঘুমন্ত অবস্থাতেও কথা বলতে অসুবিধে নেই। আর এই সংলাপ অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অর্জুনের মনে হল, সে শুধুই শুনতে পাচ্ছে। ইচ্ছে হলেও বিষ্টসাহেবকে কোনও কথা বলতে পারছে না। কারও মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে কী যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে, তার চেহারাই বা কী, তা সে জানে না। বিষ্ট্রসাহেবও তাকে জানাননি।

.

বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে মেজর সব শুনলেন। লুসি তখনও তাঁর ঘরে, খবর পাঠানো হয়েছে চা খেতে আসবার জন্য। অর্জুন বলল, এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনাদের অনুসরণ করা হচ্ছে।

কারা করছে? কারা? ওই সাপ যদি আমাকে ছোবল মারত, তা হলে কী হতে পারত ভাবলেই বুক কেঁপে উঠছে! আচ্ছা মানলাম, ওরা আমাদের অনুসরণ করে খুঁটিমারি বাংলোয় এসেছিল। ভোরবেলায় পালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। কিন্তু ওদের পাওয়া যায়নি। আমরা যে বিকেলে এখানে আসব, সেটা ওদের জানার কথা নয়। এখানে কোনও বুকিং ছিল না। মেজর মাথা নাড়লেন।

মোবাইল ফোনের দৌলতে ওরা নিশ্চয়ই জেনেছিল আমরা বাংলো ছেড়ে জলদাপাড়ার দিকে এগোচ্ছি। লুসি যে পাখির ডাক রেকর্ড করার জন্যে জঙ্গলে ঢুকবেন, এটা তো ওদের জানা তথ্য। ময়নাগুড়ি হয়ে গোরুমারার দিকে না গিয়ে, মাদারিহাটের রাস্তা ধরতেই ওরা বুঝে গিয়েছিল আমাদের ডেস্টিনেশন হল জলদাপাড়া। অর্জুন যেন নিজেকেই বোঝাতে চাইল।

বেশ। এবার সাপ! সন্ধেবেলায় এই এলাকায় পৌঁছে ওরা অত বড় বিষধর সাপ জোগাড় করে ফেলল? সারারাত সময় দিলে তুমি পারবে?

আমি তো এক সপ্তাহ সময় পেলেও পারব না। মেজর বললেন।

এইসময় টর্চের আলো গেট খুলে এগিয়ে এল। অর্জুন উঠে দাঁড়াল, আসুন রেঞ্জারসাহেব। আমরা এখানে গল্প করছি।

না অর্জুনবাবু। আমাকে এখনই কোচবিহার ছুটতে হবে। আমি আপনাকে খবরটা দিতে এলাম। মাদারিহাটে আমরা একটা ট্রানজিট সেন্টার করেছি। যেসব হিংস্র প্রাণী জঙ্গলের বাইরে এসে অথবা চা-বাগানের ভিতর ধরা পড়ে, তাদের ওখানে রাখা হয় কয়েকদিন। একটু অভ্যস্ত হয়ে গেলে, আবার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। আজ বিকেলে ধরা পড়েছে যারা, তাদের একটিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

তার মানে? অর্জুন অবাক।

গরম লাগলে অনেকেই দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে ভিতরে। কিন্তু বিকেলে খাবার খেতে বের হয়। আজ হয়নি। রেঞ্জার বললেন।

প্রাণীটি কী ধরনের? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

সাপ। যে-সাপটির কথা আপনি আজ সকালে বলেছেন, তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। কাল সন্ধের পরে খাঁচার পিছনের তক্তা খুলে ওকে চুরি করেছে কেউ। খাঁচার ভিতর সাপের সুবিধের জন্যই দিনের বেলাতেও অন্ধকার করে রাখা হয় বলে কর্মীরা বুঝতে পারেনি। আমি ডি এফ ও-কে জানিয়েছি। থানাতেও ডায়েরি করা হয়েছে। রেঞ্জার বললেন, ব্যাপারটাকে আর হালকাভাবে নেওয়া যাচ্ছে না, সাবধানে থাকবেন।

মাই গড! মেজর চাপা গলায় বললেন।

টর্চের আলো ফিরে গেল।

অর্জুন বলল, একটা ভুল হয়ে গেল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ওই লোকটা সম্পর্কে রেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।

এইসময় লুসি এলেন। চেয়ারে বসে টি-পট থেকে কাপে চা ঢেলে নিয়ে বললেন, আমরা কি কাছাকাছির জঙ্গলে এখন একটু যেতে পারি না?

মেজর বললেন, না যাওয়াই ভাল। এখানে যে সাপ আছে তা প্রমাণিত!

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা লুসি, আপনি দু'দিনে যত পাখির ডাক রেকর্ড করেছেন, তা কি গবেষণার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

লুসি তাকালেন, আমি ঠিক জানি না। যাদের ডাক পেয়েছি, তাদের বাইরে এমন অনেক পাখি থাকতেই পারে।

প্রোফেসর ক্যালডার মুলেন কি স্পেসিফিক কিছু বলে দেননি?

চমকে তাকালেন লুসি। প্রথমে অর্জুনের দিকে, তারপর মেজরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি প্রোফেসরের কথা ওঁকে বলেছ?

না তো! ওঁর বিষয়ে কোনও কথাই হয়নি। তা ছাড়া প্রোফেসরকে আমি খুব কম জানি। বিষ্টসাহেব আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তুমি যে ওঁর অধীনে গবেষণা করছ, তাও বিষ্টসাহেবের কাছেই শুনেছি।

পরে তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগায় এদেশে আসতে আপত্তি করিনি। মেজর বললেন।

তা হলে আপনি প্রোফেসর মুলেনের কথা জানলেন কী করে?

ধরে নিন, বিষ্টুসাহেব জানিয়েছেন। অর্জুন বলল।

হ্যাঁ। প্রোফেসর মুলেন আমাকে বিশেষ কয়েকটি পাখির ডাক রেকর্ড করতে বলেছেন। তবে তার বাইরে যে করা যাবে না, তাও বলেননি?

লুসি, প্রোফেসর মুলেন যে-বিষয়ে গবেষণা করছেন, তার সঙ্গে পাখির ডাকের সম্পর্ক কী? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

গবেষণার বিষয়ে আপনি কি জানেন?

কিছুটা।

ও। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে অনেক সময় লাগবে।

আপনি কি ঝুঁকি নিয়ে কাজটা করছেন?

লুসি তাকালেন, এখন তো সেই রকমই মনে হচ্ছে।

কেন মনে হচ্ছে? কেউ তো আপনাকে এদেশে আসার পর ভয় দেখায়নি! অর্জুন হাসল।

লুসি তাকালেন, প্রোফেসর মুলেন ইদানীং বাড়ি থেকে বেরোন না। লং আইল্যান্ডের যে-বাড়িতে তিনি থাকেন, সেখানে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। তবু তার মধ্যেই মাফিয়ারা তাঁর কাছে প্রস্তাব দিয়েছে, যে নতুন আবিষ্কার তিনি করেছেন, যা এখনও পরীক্ষার স্তরে আছে, তার পেটেন্ট ওরা কিনে নিতে চায়। তার জন্য ওরা তাঁকে এক বিলিয়ন ডলার দিতে রাজি আছে। কিন্তু প্রোফেসর মুলেন তাঁর আবিষ্কারের পেটেন্ট হাতছাড়া করবেন না। বুঝতেই পারছেন, এই প্রত্যাখ্যান মাফিয়ারা ভাল মনে নিতে পারে না। লুসি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

বুঝলাম না। আপনার সঙ্গে কারও তো শত্রুতা নেই। তা হলে আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

আমি দীর্ঘদিন ধরে পাখির ডাক নিয়ে গবেষণা করছি। এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই প্রোফেসর মুলেনের সাহায্য নিয়েছি। আমার গবেষণার বিষয় হল, পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে মানুষ জন্মাবার পর গোষ্ঠীগতভাবে ভাষা তৈরি করে নিয়েছিল নিজেদের মধ্যে কথা বলার জন্য। ক্রমশ কাছাকাছি গোষ্ঠীর মানুষরা একত্রিত হলে তাদের ভাষাও পরিবর্তিত হয়েছিল প্রয়োজন মেনে। কিন্তু একই মহাদেশ তো

বটেই, একই দেশের মানুষ নানা ভাষায় কথা বলে। কেউ কারও ভাষা বুঝতে পারে না। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহাদেশের ভাষা তো সম্পূর্ণ আলাদা হবেই। কিছু ধ্বনি বা অভিব্যক্তির বা শব্দের মিল পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেগুলো তো কথা বলে বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমি অবাক হলাম, যখন দেখলাম, আফ্রিকার কিছু পাখির ডাকের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার কিছু পাখির ডাকের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। দু'দেশের পাখির ডাক কম্পিউটারে ফেলে দ্যাখা গেল নোটেশন হুবহু এক। ব্রাজিলের সেই পাখির ডাক, আফ্রিকার জঙ্গলে বাজালে দেখেছি ওখানকার ওই বিশেষ পাখিরা চঞ্চল হচ্ছে। গোটা পৃথিবীতে একরকম ডাক ডাকে যেসব পাখি, তাদের চিহ্নিত করতে পারলে এত দিনের মেনে নেওয়া থিয়োরিগুলোকে বাতিল করতেই হবে। যেসব পাখির ডাক একই রকম, তাদের ডানায় তেমন জোর নেই। যা থাকলে ভারত, প্রশান্ত বা অতলান্তিক মহাসাগর পার হওয়া সম্ভব! তা হলে এরা এক ভাষায় কথা বলতে শিখল কী করে? চিনের কোনও মানুষের মুখের বুলির সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার কোনও মানুষের এক ফোঁটা মিল কি পাওয়া যাবে? না। তা হলে দাঁড়াচ্ছে, পৃথিবীর সব দেশের পাখিদের কেউ কেউ একই ভাষায় কথা বলে। সেই ভাষাকে যদি ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ অফ বার্ডস বলা যায়, তা হলে নিশ্চয়ই খুব বাড়াবাড়ি হবে না। লুসি থামলেন।

ব্যাপারটা সত্যি ইন্টারেস্টিং। কিন্তু আপনি কেন ভয় পাবেন বুঝতে পারছি না।

প্রোফেসর মুলেন এই বিশেষ ডাকটাকে সাংকেতিক ভাষা হিসেবে তাঁর আবিষ্কারে ব্যবহার করতে চান। ধরুন, আপনার মোবাইলের মাধ্যমে কেউ কোনও খবর দিতে চায়। আপনার মোবাইলের ব্যাটারি তার ক্ষমতার রেঞ্জে আপনাকে পেলে তবেই বার্তা পেতে পারবেন। এই রেঞ্জটা খুব বেশি হলে সাধারণ একটি ঘরের মধ্যেই সীমিত। কিন্তু বিশেষ একটি পাখির ডাক আধমাইল দূর থেকেও শোনা যায়। আমি এর বেশি বলার অধিকারী নই। যে-পাখিটিকে অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে পেয়েছি, তারা আছে সারা পৃথিবী জুড়ে। ওই যে, বিপ বিপবিপ বলার পর হুইসলের শব্দ তোলে যে-পাখি! প্রোফেসর মুলেন ওই ডাকটাকে সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহার করতে চান। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওই সিগন্যাল পাখির ব্রেনে পৌঁছে গেলেই সে ডেকে উঠবে। আর সেই ডাক ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র। যারা পেটেন্ট চেয়েছিল, তারা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছে, আমি কেন ভারতে এসেছি। আমার উপর আঘাত করে ওরা প্রোফেসর মুলেনের মনে চাপ সৃষ্টি করতে চায়, যাতে উনি বাধ্য হন ওদের শর্ত মেনে নিতে।

এটা যখন বুঝতে পারছেন, তখন ঝুঁকি নিচ্ছেন কেন? নিজের নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা করেননি কেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

লুসি প্রশ্নটা শুনে মেজরের দিকে তাকালেন।

মেজর এতক্ষণ বেতের চেয়ারে শরীর এলিয়ে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। লুসি তাকাতে সোজা হয়ে বসলেন, আসলে ব্যাপারটা তোমাকে বলা হয়নি। বিষ্টসাহেব প্রোফেসর মুলেনের কাছে লুসির ভারতবর্ষের এদিকটায় আসার পরিকল্পনা শুনে আমাকে ফোন করেন। ওর নিরাপত্তা নিয়ে কথা হয়। পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চাইলে তাদের ব্যাপারটা বোঝানোই মুশকিল হয়ে যেত। তা ছাড়া প্রোফেসরের

গবেষণার বিষয়ে সম্পর্কে পুলিশ বিশদ জানতে চাইত। তখন ওর ভিসা নিয়েও অসুবিধে হত। তা ছাড়া প্রোফেসর মুলেন চাইছিলেন লুসির ভারতবর্ষে আসাটা যেন মিডিয়া না জানতে পারে। তখন আমি অমল সোমের সঙ্গে যোগাযোগ করি। প্রোফেসর মুলেনের সঙ্গেও অমল সোমের কথা হয়। তিনিই তোমার নাম প্রস্তাব করেন। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে যে-কোনও পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবে বলে ভরসা দেন। আমিও আমার অভিজ্ঞতা থেকে তোমাকে সমর্থন করি।

অর্জুন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, প্রোফেসর মুলেন কোন দেশের মানুষ? আমেরিকা তো সব দেশের মানুষের মিলনভূমি।

উনি জার্মান!

আচ্ছা! আর ওই মাফিয়ারা? ওরা নিশ্চয়ই ইতালির লোক!

মেজর মাথা নাড়লেন, মাফিয়া শব্দটা শুনে তুমি ভাবছ ওরা ইতালির লোক? না অর্জুন, এখন মাফিয়ারা আর কোনও একটা বিশেষ দেশে আটকে নেই। সর্বত্র ওদের যাতায়াত।

প্রোফেসরের এই আবিষ্কারের কথা আমেরিকান সরকার জানেন?

লুসি জবাব দিল, নিশ্চয়ই অজানা নয়। কিন্তু আবিষ্কার সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রোফেসর কারও সঙ্গে কথা বলতে চান না। তবে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানি খানিকটা আন্দাজ করে ব্যাবসা বাড়ানোর মতলব করছে। তার ফলেই ওইসব মাফিয়ারা এখন সক্রিয়।

অর্জুন দেখল বাংলোর সেই কর্মচারী, যে মেজরকে হাঁড়িয়া খাইয়েছিল, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ডাকল সে, কিছু বলবে?

বাবুর্চির খুব জ্বর এসেছে। লোকটি জবাব দিল।

তা হলে?

সাহেব যদি গাড়ির ড্রাইভারকে বলে দেন, তা হলে আমি এখন গিয়ে মাদারিহাট থেকে খাবার কিনে আনতে পারি।

সেটা করাই যেতে পারে। কিন্তু তোমরা কী খাবে?

আমরা? লোকটা স্পষ্টতই অবাক হল।

তোমরা যারা এখানে কাজ করো, তারা কী খাবে?

ভাত, ডিম, আলু। সাহেবরা তো তা খেতে পারবেন না। যাই?

আধঘণ্টা পরে এসে জেনে যেয়ো। অর্জুন বলল।

লোকটা ফিরে যাচ্ছিল, অর্জুন আবার তাকে ডাকল, এই যে ভাই!

লোকটা দাঁড়াল। মুখ ঘোরাল।

তুমি গত রাতে এবং আজ সকালে সাহেবকে হাঁড়িয়া এনে দিয়েছিলে। কোত্থেকে?

লছমনের কাছ থেকে।

লছমন কে?

ফরেস্ট অফিসের পিয়ন।

ও এসবের স্টক রাখে?

হ্যাঁ সাহেব। ওর কাছে সব পাবেন। বিলিতি মদও বিক্রি করে। তা ছাড়া, লেডিস ছাতা, সিগারেট... বিদেশি সিগারেট, বিদেশি সেন্ট।

বাঃ! চমৎকার। দ্যাখা যাবে জিনিসগুলো? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

আমি তা হলে ওকে খবর দিই?

বেশ।

লোকটি চলে গেলে মেজর জিজ্ঞেস করলেন, স্মাগলার?

ঠিক তা নয়। এরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় কেউ কেউ ওসব জিনিস টুরিস্টদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে। নর্থ বেঙ্গলে বাংলাদেশ আর ভুটানের দৌলতে বিদেশি জিনিসগুলো ঢালাও বিক্রি হয়। যাক গে, আজ রাতে আমরা বাংলোয় থাকব না। যারা গত রাতে সাপ ছুঁড়ে ফেলেছিল, তারা আজ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। অর্জুন বলল।

বাংলোয় থাকব না মানে? কোথায় থাকব? মেজর অবাক।

হয় খাবার আনার নাম করে আমরাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি। এখান থেকে সুভাষিণী চা-বাগান বেশি দূরে নয়। ওই বাগানের ম্যানেজার অনিন্দ্য আমার খুব পরিচিত। রাতটা ওদের গেস্টহাউজে কাটিয়ে দিতে পারি। ওখানে কেউ লুসির কাছে পৌঁছোতে পারবে না। নয়তো ডিনার আনিয়ে খেয়ে নিয়ে, ঘরে শুতে যাওয়ার বায়না করে চুপিসারে জঙ্গলে ঢুকে অপেক্ষা করতে পারি ওদের জন্য। অর্জুন বলল।

গোটা রাত? মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

দরকার হলে তাই।

কিন্তু রাতের জঙ্গলে নিশ্চয়ই মশা থিকথিক করছে। তা ছাড়া হাতিফাতি চলে এলে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে।

তা হলে প্রথমটাই করা যাক।

না। দ্বিতীয়টা অনেক বেশি থ্রিলিং। আমি অবশ্য আমার কথা ভেবে এসব বলছি না। বলছি লুসির কথা ভেবে। কঙ্গোর জঙ্গলে আমি তিন রাত গাছের উপরে বসে কাটিয়েছি। এক ওয়াটারবটল জল ছিল, তাই খেয়ে ছিলাম। গাছের নীচে সারারাত-দিন সিংহ, হায়েনা, টাইগার এমনকী, র‍্যাটল স্নেককেও ঘুরঘুর করতে দেখেছি। তবু নার্ভ শক্ত রেখেছিলাম, হ্যাঁ। মেজর বললেন।

কঙ্গোয় সিংহ পাওয়া যায়? প্লেন্টি!

ঠোঁট ওলটালেন মেজর।

তা হলে তো আপনার কোনও সমস্যা নেই। তা হলে লুসিকেই ওখানে রেখে আসি। ওঁকেই তো ওরা টার্গেট করেছে! অর্জুন দেখল লোকটি আবার এসে দাঁড়িয়েছে, ও একটু মাদারিহাট গিয়েছে সাহেব।

কী করে যাও তোমরা? হেঁটে?

না, সাইকেলে। খাবার আনতে যাব?

নাঃ! এখানে বসে থেকে সাহেবদের একঘেয়ে লাগছে। আমরাই যাই। গিয়ে ডিনার সেরে ফিরব। তুমি পদমবাহাদুরকে তৈরি হতে বলো।' অর্জুন মাথা নাড়ল। মনে হচ্ছিল, লোকটি বেশ হতাশ হয়েছে।

.

সন্ধে সাড়ে ছ'টায় ওরা গাড়িতে উঠে বসল। লুসি তাঁর টেপ রেকর্ডার এবং রেকর্ডেড ক্যাসেটগুলো সঙ্গে নিয়েছেন। নির্জন বনপথে গাড়ি চালাতে চালাতে পদমবাহাদুর বলল, ওই বাংলোয় ভূত আছে সাহেব।

ভূত? মেজর পিছনের সিটে লুসির পাশে বসেছিলেন, চমকে জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, সাহেব। কাল রাতে আমি নিজের চোখে দেখেছি। জঙ্গল থেকে বেরোচ্ছিল আবার ঢুকে যাচ্ছিল। পদমবাহাদুর বলল।

তুমি তখন কী করছিলে? পাশে বসা অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

আমি তো গাড়িতে শুয়ে ছিলাম। ওসব দেখে জানলার কাচ তুলে দিলাম। ভূতগুলো বুঝতে পারেনি আমি গাড়ির ভিতরে আছি।

ভূতগুলো মানে?

তিন জন। সাহেব, আজ রাতে আমি আর গাড়ির ভিতর শোব না।

তুমি তো ইচ্ছে করলে ডাইনিং রুমে শুতে পারতে।

ওরে বাপ! মশা আমাকে শেষ করে দিত।

কিন্তু গাড়িতে কেউ না থাকলে আবার ইঞ্জিনের বারোটা বাজাতে চাইবে ভূতগুলো। ঠিক আছে, আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে গাড়িতে থাকব। অর্জুন বলল।

তা হলে মুশকিল হবে না। আপনি পিছনে শোবেন, আমি সামনে। পদমবাহাদুর এই সমাধানে খুশি হল।

জঙ্গলে ঢোকার প্রধান গেটে নামধাম লিখিয়ে বেরোবার সময় অর্জুন জানাল, ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবে।

মাদারিহাটের দিকে না গিয়ে হাসিমারার দিকে গাড়ি চালাতে বলল অর্জুন। দু'পাশে ঘন অন্ধকার। একটা ব্রিজ পার হয়ে গেল গাড়ি। রাস্তাটা বাঁ দিকে ঘুরতেই অর্জুন চাপা গলায় পদমবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করল, হেডলাইট নিভিয়ে চালাতে পারবে?

পারব। তবে বেশি দূরে যেতে পারব না। খুব অন্ধকার।

চেষ্টা করো। গাড়ির সব আলো নিভিয়ে দিয়ে চলো।

সঙ্গেসঙ্গে ঝপাং করে যেন অন্ধকার ওদের গিলে ফেলল। ওই অবস্থায় গাড়ি চালানো মুশকিল। অর্জুন বলল, বাঁ দিকের জঙ্গলের মধ্যে নেমে যাও।

সাহেব, ওখানে গর্ত থাকতে পারে।

আমার মনে হচ্ছে নেই।

অতএব গাড়ির গতি শ্লথ করে পিচের রাস্তা ছেড়ে নড়বড় করতে করতে গাড়ি যেখানে দাঁড়াল, তার সামনে ঝোঁপঝাড়।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা কী হল?

আমাদের কেউ ফলো করছে কিনা দ্যাখা দরকার। অর্জুন বলল।

ওঃ! তাই বলো।

অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ জঙ্গল থেকে ভেসে আসছিল। লুসি বললেন, একটু বাইরে যেতে পারি?

অর্জুন বলল, খুব প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোই উচিত।

কেন? লুসি জিজ্ঞেস করলেন।

এই জঙ্গলের সাপ খুব বিখ্যাত। তা ছাড়া জোঁক তো আছেই।

মিনিটপাঁচেকের মধ্যে মাদারিহাট থেকে দুটো ট্রাক ছাড়া কোনও গাড়িকে আসতে দেখা গেল না। উলটো দিক থেকে আসা গাড়ির সংখ্যাই বেশি। যদি কেউ তাদের অনুসরণ করত, তা হলে এই সময়ের মধ্যেই বোঝা যেত।

অর্জুন যখন পদমবাহাদুরকে বলতে যাচ্ছিল আবার রওনা হতে, ঠিক তখনই হেডলাইটের আলো দ্যাখা গেল। গাড়িটা আসছে মাদারিহাট থেকে। গাড়ির গতি কমে গেল হঠাই। একটা লোক চিৎকার করে কথা বলছে মোবাইলে। বারংবার 'হ্যালো, হ্যালো' বলছে। এত দূর থেকে কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তারপর গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে আবার ফিরে গেল মাদারিহাটের দিকে। অর্জুন পদমবাহাদুরকে বলল, চলো।

লুসি জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার?

আমরা যে হাসিমারায় পৌঁছোইনি, এই খবরটা মোবাইলে জানানো হল। তাই ওরা ফিরে গেল মাদারিহাটেই আছি কিনা দেখতে। অর্জুন বলল।

তার মানে ওরা আমাদের অনুসরণ করছে! মেজর বললেন, কিন্তু মাদারিহাটে ফিরে গেল কেন? আমরা তো এই পথের অন্য কোথাও থাকতে পারি!

এর উত্তর একটাই। আমাদের পরপর যে-দুটো ট্রাক হাসিমারার দিকে গিয়েছে, তাদের কাছ থেকে ওরা শুনেছে, রাস্তায় এইরকম কোনও গাড়িকে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি।

তা হতে পারে, মেজর মাথা নাড়লেন, তার মানে হাসিমারা এবং জলদাপাড়া, দুটো জায়গাতেই ওদের লোক রয়েছে।

অর্জুন উত্তর দিল না।

ওরা যখন সুভাষিণী চা-বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর সামনে পৌঁছোল, তখন রাত আটটা। বাংলোর চৌকিদার জানাল, বড়সাহেব কলকাতায় গিয়েছেন মিটিং করতে। কিন্তু লোকটা অর্জুনকে চিনতে পারল। অর্জুন এই বাংলোয় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে কয়েকবার এসেছিল। অনিন্দ্য ম্যানেজার হয়ে আসার পরেও এসেছিল। কিন্তু দরোয়ানের ক্ষমতা নেই গেস্টহাউজের দরজা খুলে দেওয়ার। সে ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে খবর দিল।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চলে এলেন মিনিট আটেকের মধ্যে। অর্জুনকে তিনি ভাল করে চেনেন। তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফোন করে অনিন্দ্যকে ধরলেন। কথা বলে রিসিভার দিলেন অর্জুনকে।

অনিন্দ্য বললেন, কী আশ্চর্য! আপনি হঠাৎ...। একটু জানিয়ে আসবেন। তো!

অর্জুন বলল, আচমকা আসতে হল। বিপদে পড়েছি একটু। আমাদের সঙ্গে একজন আমেরিকান মহিলা আছেন। তাঁর জন্য একটা থাকার জায়গা দরকার।

আপনি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি ওখানে থাকলে কোনও সমস্যা হত না। একটু কথা বলে নিই...!

ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় অনিন্দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে নির্দেশ দিল লুসির থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। শুধু তাই নয়, ওঁর খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে যেন কোনও অযত্ন না হয়।

লুসিকে সুন্দর গেস্টহাউজে তুলে দিয়ে অর্জুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে অনুরোধ করল, বাইরের কেউ যেন ওঁর কাছে না ঘেঁষতে পারে। উনি এখানে আছেন, তা গোপন না রাখলে ওঁর ক্ষতি হবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বললেন, কোনও চিন্তা করবেন না। এখানে উনি নিরাপদে থাকবেন। কিন্তু আপনারা কি এখানে থাকছেন না?

না। আমাদের ফিরে যেতে হবে হলং বাংলোয়।

লুসিকে বিশ্রাম নিতে বললেন মেজর। বললেন, বাংলোর বাইরে যেয়ো না, অচেনা জায়গা। আমরা কাল সকালেই ফিরে আসছি।

লুসির পক্ষে বাংলা বোঝা সম্ভব ছিল না। ইংরেজিতে যে কটা কথা হয়েছে, তা থেকে তিনি অনুমান করেছেন যা করবার। এখন মেজরের কথা শুনে প্রতিবাদ করলেন, আমি বুঝতে চাই, আমাকে অর্জুন কী ভাবছেন? আমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই বোধহয় এখানে থাকতে বলা হচ্ছে। কিন্তু তুমি যদি অর্জুনের সঙ্গে থাকতে পারো, তা হলে আমি পারব না কেন? আমি তোমার চেয়ে অনেক জোরে দৌড়োত পারি। আমার শরীরে শক্তি খুব কম নেই। শুধু মহিলা বলে যদি আমাকে তোমরা এখানে থাকতে বলো, তা হলে আমি তার প্রতিবাদ করছি।

আমেরিকানরা যখন উত্তেজিত বা আবেগে আপ্লুত হয়ে কথা বলেন, তখন তাঁদের উচ্চারণ ঠিকঠাক বুঝতে পারা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্জুনের কানেও সব শব্দ অর্থবহ হয়ে উঠল না। মেজরেরও কথা বলার ধরন। পালটে গেল। অভ্যস্ত আমেরিকান অ্যাকসেন্টে তিনি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে হাল ছাড়লেন। অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বাংলায় বললেন, ও আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইছে। দ্যাখো, ওর সঙ্গে কথা বলে পারো কিনা বোঝাতে!

অর্জুন হাসল। ভারতীয় উচ্চারণে কেটে কেটে সে কথা বলল, লুসি, আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু ধরুন, আজ যদি আমার অথবা মেজরের চূড়ান্ত ক্ষতি হয়, তা হলে ডক্টর মুলেনের গবেষণা থেমে থাকবে না। আপনার কিছু হলে সেটা আঘাত পাবে। তা ছাড়া বোঝাই যাচ্ছে, ওদের লক্ষ্য আপনি। তাই জেনেশুনে ওদের কাজটাকে সহজ করে দেওয়া কি ঠিক হবে?

লুসি মাথা নাড়লেন, কথাটায় যুক্তি আছে। কিন্তু ওরা তো আপনাকেও মেরে ফেলতে পারে। আপনি কেন জেনেশুনে ঝুঁকি নিচ্ছেন?

আমি একজন সত্যসন্ধানী। বিষ্টসাহেব এবং মেজর আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, যাতে আপনি কাজ শেষ করে নিরাপদে ফিরে যেতে পারেন। আমি সেই দায়িত্ব পালন করছি। এটা আমার প্রফেশন। অর্জুন হাসল।

প্রফেশন? তা হলে নিশ্চয়ই আপনি ফি নিচ্ছেন! কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি জানি না, আপনি ইন্ডিয়ান টাকায় কত ফি নিয়ে থাকেন!

এর জন্য তো মেজর আছেন। আমি কাজটাকেই গুরুত্ব দিই। টাকা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করি না। আচ্ছা, গুডনাইট।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের অনুরোধে ডাইনিং রুমে গিয়ে কিছু জলখাবার খেয়ে অর্জুনরা যখন বেরোল, তখন সাড়ে নটা বেজে গিয়েছে।

পদমবাহাদুর বিড়বিড় করল, এখানে রাতটা থাকলেই তো ভাল হত!

অর্জুন বলল, এখানে থাকা আর জলপাইগুড়িতে রাত কাটানো একই ব্যাপার।

পদমবাহাদুর চুপ করে গেল।

গাড়ি চা-বাগান থেকে বেরোবার পর মেজর নড়েচড়ে বসলেন, অর্জুন!

বলুন। অর্জুন তাকাল।

লুসির কথা শুনে মনে হচ্ছে ভুলটা আমারই। তোমার সম্মানদক্ষিণা কত তা জানা হয়নি। সেটা যাই হোক, ও নিয়ে কোনও চিন্তা কোরো না, মেজর বাইরে তাকালেন।

কী আশ্চর্য! মেজর, আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন? অর্জুন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

না, কেন?

আপনার কাছে আমি টাকা চাইতে পারি? যা দেবেন, তাই মাথা পেতে নেব। অর্জুন বলল। সোজা জলদাপাড়ায় না গিয়ে মাদারিহাট বাজারের দিকে গাড়ি নিয়ে যেতে অর্জুন বলল পদমবাহাদুরকে। তখন বাজারের দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা পাঞ্জাবি ধাবার ভিতর আলো জ্বলছে। কিছু লোকজন তখনও রয়েছে দোকানে।

একটু আগে জলখাবার খাওয়ার কারণে মেজরের খাওয়ার ইচ্ছে নেই, অর্জুনেরও তাই। পদমবাহাদুরকে বলা হল রাতের খাবার খেয়ে নিতে। কিন্তু সে খেতে চাইল না এখন। বলল, খাবার প্যাকেটে নিয়ে বাংলোয় গিয়ে খাবে। মেজর তাকে ধমকালেন, ঠান্ডা হয়ে গেলে এসব খাবার খাওয়া যায় না। পদমবাহাদুর মাথা নাড়ল, ঠান্ডা খাবার খেতে সে অভ্যস্ত। অর্জুন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, কফি পাওয়া যাবে?

জি সাব।

দুটো কফি দাও।

মেজর বললেন, চিনি-দুধ ছাড়া একটা।

ভিতরে বসুন সাব।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে জনাআটেক লোক বিভিন্ন টেবিলে বসে খাচ্ছে। মেজর চেয়ারে বসে নাক টানলেন, সেই গন্ধ! বুঝলে অর্জুন, এখানে হাঁড়িয়াও বিক্রি হয়।

হলেও সেটা আইনসম্মত নয়।

বুঝতে পারছি।

কী?

তোমার ওই পদমবাহাদুর, এখানে ডিনার করল না! আমাদের সামনে তো হাঁড়িয়া পান করতে পারবে না। আবার ডিনার করে ফেললে ভরা পেটে হাঁড়িয়া খেয়ে সুখ পাবে না। তাই বাংলোয় খাবার নিয়ে

চলল। সেখানে গিয়ে জম্পেশ করে হাঁড়িয়া খেয়ে ডিনার সারবে। তখন খাবার ঠান্ডা না গরম, তা। নিয়ে কে মাথা ঘামাবে!

হঠাৎ কোনার টেবিল থেকে একটা রোগা লোক উঠে এসে সামনে দাঁড়াল, নমস্কার দাদা। আমাকে চিনতে পারছেন?

লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। চোখ আধবোজা। কয়েক সেকেন্ডে মনে পড়ে গেল রূপমায়া সিনেমার ব্ল্যাকারদের একজন। থানার একজন এস আই খুব মারছিল একে। অর্জুন বাধা দিয়ে বলেছিল, একে মেরে কী লাভ। পেটের দায়ে এই লোকটা কমিশনে কাজ করে। যে চক্র টিকিট ব্ল্যাক করায়, তাদের উচ্ছেদ করুন আগে। সেটা বন্ধ হলে এরা বিকল্প রোজগারের পথ ধরবে। অর্জুনের কথায় যুক্তি ছিল। লোকটাকে ছেড়ে দিয়েছিল এস. আই.।

মনে পড়েছে। তুমি এখানে? এখানে কি সিনেমা হল আছে? অর্জুন তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে জিভ বের করে নিজের কান ধরল লোকটা, ছি ছি ছি। ওসব কবে ছেড়ে দিয়েছি। আপনি আমাকে মার খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তারপর আর ও-লাইনে যাইনি। এই মাদারিহাটে ছোটখাটো ব্যাবসা করছি আজ দু'বছর।

বাঃ! ভাল। কফি এসে যাওয়ায় সেদিকে তাকাল অর্জুন।

কিন্তু আপনি দাদা এত রাতে এখানে?

কফি খেতে ঢুকলাম।

ও। লোকটি সোজা হওয়ার চেষ্টা করল, কোথায় উঠেছেন দাদা?

হলং ফরেস্ট বাংলোয়।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চোখ বড় করে তাকাল। তারপর নিচু গলায় বলল, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনও মেমসাহেব নেই! তাই তো?

অর্জুন কোনার টেবিলের দিকে তাকাল, ওরা কারা?

এখানকার লোক।

কফি যেটুকু খাওয়া গেল তাতেই খুব বিস্বাদ। পদমবাহাদুরের খাবার আর ওদের কফির দাম মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার সময় অর্জুন দেখল, লোকটাও পিছন পিছন আসছে। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, এখানে তোমার কাজ আছে?

এখন না। বারোটার পর...!

চলো, একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক। ভয় নেই, তোমাকে বারোটার আগেই এখানে নামিয়ে দেব। এসো।

মেজরকে পদমবাহাদুরের পাশে বসতে বলে, লোকটাকে নিয়ে পিছনের সিটে বসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, তোমার নামটা কী যেন!

সনাতন।

পদমবাহাদুর গাড়ি চালু করলে সনাতন জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন?

কোথাও না। একটু চক্কর মেরে আবার ফিরে আসব।

এসব জায়গা আঁধারে ভাল না দাদা।

কেন?

রাত বাড়লেই এখানে ধান্দাবাজি শুরু হয়ে যায়!

ও। এখন বলো তো, আমাদের সঙ্গে মেমসাহেব আছে কিনা কেন জিজ্ঞেস করছিলে?

কী বলব দাদা। এখানকার বাতাসে এখন একটাই খবর ভাসছে। হলং বাংলোয় একজন মেমসাহেব এসেছেন বাঙালিদের সঙ্গে, যাঁকে মেরে ফেললে দশ হাজার আর জ্যান্ত ধরে আনলে পঁচিশ হাজার পাওয়া যাবে। সনাতন বলল।

খবরটা কে ভাসাল?

জানি না। মুখে মুখে চাউর হয়ে গেছে।

টাকাটা কে দেবে?

সনাতন চুপ করে থাকল। হঠাৎ পদমবাহাদুর ড্রাইভিং সিটে বসেই গলা তুলে বলল, ও মিথ্যে কথা বলছে সাব। এক নম্বরের মিথ্যেবাদী।

তুমি ওকে চেনো? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

চিনব না? জলপাইগুড়িতে টিকিট ব্ল্যাক করেছে, মিনিবাসের খালাসির কাজ করেছে; ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চিৎকার করে কাস্টমার ধরে জোর করে টাকা নিতে গিয়ে রামধোলাইও খেয়েছে একবার। ওর বড় ছেলে

আমার পাড়ায় থাকে। অথচ এখানে আমাকে দেখে এমন ভান করছে, যেন কোনওদিন দ্যাখেনি! সনাতন, সত্যি কথা বল সাবকে, না হলে তুই জলপাইগুড়িতে ঢুকতে পারবি না। পদমবাহাদুর চেঁচাল।

আরে পদমদা নাকি! মাইরি বলছি, আঁধারে বুঝতেই পারিনি। তারপরে এক গলা হাড়িয়া খেয়ে চোখে ঝাপসা দেখছি...! বিশ্বাস করো।

মেজর একটু নড়েচড়ে বসলেন। সম্ভবত হাড়িয়া শব্দটা কানে যেতেই তার শরীর নড়ে উঠল।

অর্জুন বলল, এখানে তুমি কোথায় থাকো?

একটা ঝুপড়িতে। দু-তিনজন মিলে।

রাত বারোটায় তোমার কী কাজ থাকতে পারে?

একজনকে ফুন্টশোলিং পৌঁছোতে হবে। ওই যারা আমার সঙ্গে বসে ছিল, তাদের একজন ড্রাইভার। চারশো টাকা চেয়েছি। ওকে তিনশো দিতে হবে।

অত রাতে লোকটা কোত্থেকে আসবে?

জানি না দাদা। বলেছি ওই ধাবার সামনে আসতে। বিদেশি তো, তাই চিনতে অসুবিধে হবে না। আমি একটাও মিথ্যে বলছি না দাদা!

বিদেশি মানে? ভুটানি?

না, না। সাদা চামড়ার সাহেব।

কোন দেশের?

তা জানি না দাদা।

সেই সাহেবের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল?

হ্যাঁ, মানে, না দাদা!

পদমবাহাদুর বলল, বহুত জালি আদমি হ্যায়।

লোক দুটো শিলিগুড়িতে থাকে। বীরপাড়া থেকে প্রীতমের গাড়ি ভাড়া করে এখানে এসেছে। শিলিগুড়ির মাইকেল সাহেবের লোক।

মাইকেল! ঝাপসা মনে এল নামটা। শিলিগুড়ি মূলত মাফিয়াদের শহর। আর এই মাফিয়াদের নেতা এত দ্রুত বদলায় যে, তাল রাখা মুশকিল। কিন্তু ওই মাইকেল নামটা যেন বেশ কিছুদিন ধরে অর্জুন শুনছে।

পদমবাহাদুর জিজ্ঞেস করল, সাব, গেটে এসে গিয়েছি।

ভিতরে চলো।

পদমবাহাদুর গাড়ি থেকে নেমে গেটের রক্ষীদের কাছে গিয়ে কাগজপত্র দেখিয়ে সইসাবুদ করলে গেট খুলল। সেই সময় প্রহরীদের একজন জিজ্ঞেস করল, কিতনা আদমি হ্যায়?

আমাকে নিয়ে চারজন, পদমবাহাদুর জবাব দিল।

তো ঠিক হ্যায়।

গাড়ির ভিতর যে অন্ধকার, তা দরজা খোলা-বন্ধের সময় আলো জ্বলে উঠতেই উধাও হচ্ছিল। অর্জুন সে সময় সনাতনের মাথাটা নীচে নামিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছিল। গাড়ি চলতে শুরু করলে সনাতন ককিয়ে উঠল, এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

কোথায় যাচ্ছি তা তো বুঝতেই পারছ! অর্জুন বলল।

কিন্তু হলং বাংলোয় গিয়ে আমি কী করব? ওখান থেকে রাতের বেলা বেরোতে পারব না। হায়, হায়, আমার একশো টাকা চোট হয়ে যাবে আজ।

চোট হলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব। তা ছাড়া বলেছি তো, বারোটার আগেই তোমাকে পৌঁছে দেব। এখন বললো, টাকাটা কার কাছে পাওয়া যাবে।

সত্যি বলছি…!

বাধা দিল অর্জুন, ওই হলং বাংলোয় একজন আমেরিকান মেমসাহেব আছেন। আমি ওঁকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরে তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু কেন দেব? তুমি তো নিজেই পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে!

কোন বদমাশ হাওয়া হবে? আমি বেইমান নই দাদা। আপনি যদি ওকে ধরে জঙ্গল থেকে বের করে দিতে পারেন, তা হলে আপনার অর্ধেক, আমার অর্ধেক।

অসম্ভব। আমার পনেরো, তোমার দশ।

বেশ, ঠিক হ্যায়। কবে পারবেন?

কবে মানে? এসব কেসে কেউ দেরি করে? লোক নেমে গেছে, দেখব আমি কিছু করার আগেই কেউ ওকে হাওয়া করে দিয়েছে। অর্জুন বলল।

ঠিক কথা। ওরা আজ চেষ্টা করবেই।

কারা?

শিলিগুড়ির লোক দুটো। জ্যান্ত না আনতে পারলে মেরে ফেলবে।

সেটা আমি হতে দিচ্ছি না সনাতন। কিন্তু টাকাটা পাওয়া যাবে তো?

আমার উপর ছেড়ে দিন। মাল না দিলে ডেলিভারি দেব না।

কিন্তু কে মাল দেবে?

কেন? শিলিগুড়ির লোক দু'টো যার জন্য খাটছে, সে!

ওই বিদেশি ভদ্রলোক?

হ্যাঁ।

তুমি কী করে জানলে?

দাদা, হাওয়ায় কথা ভাসে?

চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। লোকটা কোথায় উঠেছে?

আমি জানি না দাদা। আমাদের সঙ্গে একবারও দেখা করেনি। শিলিগুড়ির লোক দুটোই কথা বলতে এসেছে, সনাতন বলল।

ট্রানজিটের খাঁচা ভেঙে সাপটাকে কে বের করেছে?

সাপ? কী সাপ?

তুমি শোনোনি, ফরেস্টের খাঁচা থেকে একটা সাপ চুরি করা হয়েছে?

না দাদা। কবে হয়েছে?

অর্জুন চুপ করে গেল। হয় লোকটা মিথ্যে বলছে, নয় সত্যি জানে না। কিন্তু এখানে থাকলে না জানার কোনও কারণ নেই। ছোট্ট জায়গা, এত বড় খবর না জেনে উপায় নেই। একে নিয়ে কী করা যায় ভাবছিল অর্জুন।

হঠাৎ ঝকানি দিয়ে গাড়ি থামাল পদমবাহাদুর। অর্জুন দেখল, তাদের গাড়ির হেডলাইটের সামনে একটা বিশাল চেহারার হাতি ঠিক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, এদিকেই মুখ করে।

অর্জুন চাপা গলায় বলল, হেডলাইট, সাইডলাইট সব নিভিয়ে দাও।

আলো নিভে যাওয়ামাত্র মেজরের মন্তব্য শোনা গেল, ভয়ংকর ভাল।

পদমবাহাদুর নিচু স্বরে বলল, কথা বলবেন না।

ঠিক আছে, মেজর গলা নামালেন, কিন্তু ওটা ওখানে কী করছে?

কাকতালীয়ভাবে হাতিটা শুড় তুলে গর্জন করতেই বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে পিলপিল করে বাচ্চা-বড় হাতির পাল বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরিয়ে ডান দিকের জঙ্গলে ঢুকে যেতে লাগল। নেতা হাতিটি একপা-ও নড়েনি। ঠায় চেয়ে ছিল গাড়ির দিকে। দলের শেষ সদস্য জঙ্গলে ঢুকে যাওয়ার পর সে বিজয়ীর ভঙ্গিতে পা বাড়াল। তারও মিনিটপাঁচেক পরে আবার হেডলাইট জ্বালাল পদমবাহাদুর।

সনাতন বলল, রাখে হরি মারে কে? গত মাসে চাপড়ামারিতে হেডলাইট জ্বলতে দেখে গাড়ি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল হাতিরা।

৪. বাংলোর সামনে গাড়ি

বাংলোর সামনে গাড়ি থেকে নামতেই সেই রোগা লোকটাকে দেখতে পাওয়া গেল। কাছাকাছি যেতে অর্জুন দেখল, লোকটি সনাতনকে দেখে খুব অবাক হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, একে চেনো?

না বলতে গিয়েও, হ্যাঁ বলল লোকটা।

আমি যেখান থেকে হাড়িয়া কিনি, কাল ও সেখান থেকে হাড়িয়া কিনে এনেছে। ঠিক আছে দাদা, আপনারা যান, আমি ওর সঙ্গে গল্প করি। কিন্তু জোর করে এত দূরে নিয়ে এলেন, বারোটার মধ্যে ফিরব কী করে ভাবছি, সনাতন কথাগুলো বলতে বলতে এগোচ্ছিল।

অর্জুন বলল, চিন্তা কোরো না। যেখানেই যাও, এগারোটার মধ্যে ফিরে এসো। তোমাকে পৌঁছোবার দায়িত্ব আমি তো নিয়েছি।

সনাতন বিড়বিড় করল, এই অন্ধকারে কোথায় যাব! তারপর রোগা লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, অ্যাই, লছমন কোথায় রে? ধাবায় যখন সে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন ওর কথা জড়ানো ছিল। এখন পরিষ্কার।

কী জানি, লোকটা উদাস গলায় বলল।

চলো, খুঁজে বের করি!

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে অর্জুনের ঘরে ঢুকে মেজর অনেকক্ষণ পরে কথা বললেন, কী বুঝছ? চেয়ার টেনে ধপ করে শরীর ছেড়ে দিলেন তিনি।

কিছু বুঝতে পেরেছি বলা এই মুহূর্তে ভুল হবে।

কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি। নিউ ইয়র্কের মাফিয়াদের এত ক্ষমতা যে, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি-জলদাপাড়াতেও স্বচ্ছন্দে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে! মেজর বললেন।

এদের নেটওয়ার্ক খুব ভাল। কিন্তু লুসিকে মেরে ফেলাই যদি ওদের উদ্দেশ্য, তা হলে গত কালই তো মেরে ফেলতে পারত। আজও প্রচুর সুযোগ পেয়েছে। মারছে না কেন?

আমরা সব সময় ওর পাশে থাকছি, তাই সাহস পাচ্ছে না! মেজর বললেন।

দুর! আজ সকালে যখন আপনারা হাতির পিঠে চেপে ঘুরতে গিয়েছিলেন, তখনই জঙ্গলের ভিতর ওকে শেষ করে দিতে পারত।

তার মানে তুমি বলতে চাইছ, লুসি ওদের টার্গেট নয়?

না।

তা হলে কি...!

না, আপনিও নন।

যাচ্চলে! তা হলে?

শুয়ে পড়ুন। একটু পরেই তো বেরোতে হবে।

আমি একবার শুলে আর উঠতে পারব না ভাই। তা ছাড়া কোথায় শোব? মাঝখানের ঘরে অবশ্য শোওয়া যায়। আজ লুসি নেই, মেজর উঠে দাঁড়ালেন।

চলুন, লুসির ঘরে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

নো, নো। তুমি আমার ফর্ম ভুলে যাচ্ছ। একা-একা সাহারা পেরিয়ে গিয়েছি, এ তো এ ঘর থেকে ও ঘর, বলতে বলতে পাশের ঘরে চলে এলেন তিনি। ভেজানো দরজা ঠেলে আলো জ্বেলে চট করে ঘরটা দেখে নিয়ে সোজা বাথরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন জেমস বন্ডের মতো। তারপর খাটের তলা, আলমারি দেখে নিয়ে বললেন, ওকে। কিন্তু মেয়েটা যে খাটের উপর পোশাক ছড়িয়ে গিয়েছে।

অর্জুন সেগুলোকে টেবিলে তুলে দিল, এমন কিছু গরম নেই, জানলা খুলবেন না।

পাগল!

অর্জুন ঘর থেকে বেরোতে যাবে, হঠাৎ মোবাইলের রিং শুনতে পেল। সে পকেট থেকে নিজের সেট বের করে দেখল সেটি অন্ধকার।

আপনার মোবাইল বাজছে?

নো, আমি ওই যন্ত্রটি ব্যবহার করি না।

ইতিমধ্যে শব্দটি থেমে গেল। অর্জুন চারপাশে লক্ষ করছিল। যেদিক থেকে শব্দটি ভেসে এসেছিল, সেদিকে লুসির ঢাউস সুটকেস পড়ে আছে। তবে কি মোবাইলটা লুসির? সুটকেসে রেখে গিয়েছে? সে বলল, মনে হচ্ছে লুসির মোবাইলে কল এসেছিল। ওটা সুটকেসের ভিতর রয়েছে।

থেমে গিয়েছে যখন, তখন ওটার কথা ভুলে যাও। মহিলাদের সুটকেস খোলা অভদ্রতা, খাটের উপর বসলেন মেজর।

ঠিক তখনই জলতরঙ্গ বাজল সুটকেসের মোবাইলে। ভারতবর্ষের কেউ নিশ্চয়ই লুসিকে কোনও খবর পাঠাতে চাইছে না। জলতরঙ্গ একবার বেজে থেমে যাওয়ার অর্থ হল মেসেজ এসেছে।

বিদেশের কেউ নিশ্চয়ই কিছু জানাতে চায় লুসিকে। সেটা খুব জরুরিও হতে পারে।

অর্জুন বলল কথাটা। মেজর মাথা নাড়লেন, হতে পারে। তা হলে বের করো ওটা।

সুটকেস খুলতেই মোবাইল সেটটাকে দেখতে পেল। বেশ দামি সেট। সঙ্গে ক্যামেরা তো আছেই, আরও অন্যান্য আধুনিক সুবিধেতে ঠাসা। পরদায় ফুটে উঠেছে, একটি মেসেজ এসেছে। বোতাম টিপে লক খুলে মেসেজ ইনবক্সে গেল অর্জুন। বোতাম টিপতে ফুটে উঠল ইংরেজি অক্ষরগুলো, এক্সেলেন্ট ওয়ার্ক। ডোন্ট ক্যারি ক্যাসেটস, ট্রাই টু ফাইন্ড এ কুরিয়ার সার্ভিস। কিপ ডিসট্যান্স উইথ দ্য টার্গেট নম্বর ওয়ান। কাম ব্যাক সুন।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, ব্যক্তিগত ব্যাপার?

হয়তো। শুধু একটা কথা বুঝতে পারছি না, মোবাইলটা মেজরকে দিল অর্জুন। মেজর চেঁচিয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, বেশ রহস্যময় মেসেজ। লুসিকে বলা হয়েছে, ক্যাসেটগুলো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে এবং টার্গেট নম্বর ওয়ানের থেকে দূরত্বে থাকতে। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতেও বলেছে। জানা দরকার, মেসেজটা কে পাঠিয়েছে?

অর্জুন মোবাইল সেট হাতে নিয়ে বোতাম টিপে বলল, প্রাইভেট নম্বর। যে পাঠিয়েছে তাকে শুধু লুসিই জানেন। বলতে বলতে মনে পড়ে গেল, তার মস্তিষ্কে যখন খবর আসে, তখন মোবাইলে ফুটে ওঠে প্রাইভেট নম্বর। পরে জানা গিয়েছে বিষ্টুসাহেব কথা বলেছেন। তা হলে কি এই মেসেজ বিষ্টুসাহেবই পাঠিয়েছেন?

কিন্তু তা হলে কাকে টার্গেট নম্বর ওয়ান বলেছেন? দূরত্ব রাখতে বলেছেন যখন, তখন সেই টার্গেট নম্বর ওয়ান ওঁর সঙ্গেই আছে? সঙ্গী বলতে তো মেজর এবং সে! অর্জুন ফাঁপরে পড়ল।

টার্গেট নম্বর ওয়ান! কার টার্গেট? হঠাৎ মনে হল গত রাতে যারা সাপটাকে ছুঁড়েছিল জানলা দিয়ে, তাদের টার্গেট কি মেজরই ছিলেন? ওরা ভুল ভেবেছিল? লুসি নন, মেজরই টার্গেট নম্বর ওয়ান? সেই কারণে লুসিকে একা পেয়েও মেরে ফেলেনি ওরা!

অথচ সনাতনের কাছে খবর, লুসিকে মেরে ফেললে দশ, ধরে নিয়ে গেলে পঁচিশ পাওয়া যাবে। এটা যদি সত্যি হয়, তা হলে লুসিরই টার্গেট হওয়া উচিত। কিন্তু এই মেসেজ লুসিকে সতর্ক করে বলছে, টার্গেট থেকে দূরে থাকতে! অর্জুনের মনে হল, লুসির সঙ্গে কথা বললে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। সে সন্তর্পণে মোবাইল সেটটাকে সুটকেসের যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই রেখে দিল। রাখার আগে বোতাম টিপে আগের অবস্থায় মোবাইলটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। অর্জুন মেজরকে বলল, লুসির যে মেসেজ এসেছে তা বলবার দরকার নেই।

কেন?

দেখুন না, উনি নিজে থেকে কিছু বলেন কিনা!

অর্জুন নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুতেই তার মোবাইল বেজে উঠল, একটা মেসেজ এসেছে। রোমানে লেখা, হাবুর কি মোবাইল আছে? থাকলে তার নম্বর এখনই এস এম এস করো। বিট্‌সাহেব।

অবাক হল অর্জুন। হাবু কথা বলতে পারে না। মোবাইলের প্রয়োজন ওর নেই। তা ছাড়া একটা মোবাইল কেনার ক্ষমতা বাড়ির কাজের লোক হাবুর থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও বিষ্ট্রসাহেব হাবুর মোবাইল নম্বর জানাতে বললেন? ওঁর তো অজানা নয় যে, হাবু মূক-বধির। তারপরই প্রশ্নটা মাথায় এল। যদি হাবুর মোবাইল থাকত, তা হলে সে কোনও নম্বরে এস এম এস পাঠালে, বিষ্টুসাহেব সেটা পেতেন? বিষ্টসাহেবের এস এম এস এসেছে। একটা প্রাইভেট নম্বর থেকে। কোনও নম্বর লেখা নেই। শুধু লেখা রয়েছে। প্রাইভেট নম্বর। তবু মেসেজের ইনবক্সে গিয়ে বোতাম টিপে সে রিপ্লাই-এ চলে এল। তারপর লিখল, হাবুর মোবাইল নেই। বোতাম টিপতেই সেন্ড ফুটে উঠল। সেন্ড টিপলে জানতে চাইল কোন নম্বরে মেসেজ পাঠাতে হবে? অর্জুন নম্বরের জায়গায় লিখল, প্রাইভেট নম্বর। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে লেখা ফুটে উঠল, মেসেজ ফেলড।

বিষ্টুসাহেব নিশ্চয়ই জানেন, তিনি প্রাইভেট নম্বর থেকে ফোন করছেন। তা হলে কী করে তাকে এস এম এস করতে বললেন?

হঠাৎ অর্জুনের খেয়াল হল। জলপাইগুড়ি থেকে আসার পর আর মা'র খবর নেওয়া হয়নি। সে নিজের বাড়ির নম্বর টিপল। মায়ের ঘুমোনোর সময় এখনও হয়নি। রিং হচ্ছিল। শেষে মা'র গলা পাওয়া গেল, হ্যালো।

কেমন আছ তুমি?

তুই? কী ছেলে রে বাবা। সেই যে গেলি, একটাও খবর নিলি না!

সরি মা। এত ঝামেলায় আছি, তুমিও তো মোবাইলে ফোন করোনি?

করিনি? করে করে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল। লাইনই পাইনি। তুই কবে আসছিস? ওরা কেমন আছে?

ওঁরা ভাল আছেন। কবে আসছি এখনই বলতে পারছি না।

এদিকে একটা খারাপ খবর আছে।

কী খবর?

কাল শেষ রাতে হাবুকে পাড়ার লোকজন হাসপাতালে ভরতি করেছে।

হাবুকে? কেন? কী হয়েছে ওর?

ও বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল। হাবুর হাত-পা বেঁধে ডাকাতরা তার দিয়ে কীসব করছিল। সেই অবস্থায় হাবু লড়াই করায় ওরা ওকে গুলি করে। গুলির শব্দে পাড়ার লোক উঠে পড়ার সময় ডাকাতরা পালিয়ে যায়।

হাবু কেমন আছে এখন?

আমি বিকেলে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। আই সি ইউ-তে রেখেছে। অপারেশন করে গুলি বের করেছে। কী হবে তা এখনই ডাক্তাররা বলতে পারছেন না।

ঠিক কখন ডাকাতি হয়েছে?

তা জানি না। গুলির শব্দ শোনা গিয়েছে ভোর চারটের সময়। ওরা নাকি একটা জিপে চেপে এসেছিল।

মা, তুমি ডাক্তারদের বলো, চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়। টাকাপয়সার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হাবুকে বাঁচাতেই হবে। অর্জুন বলল।

তুই এটা বলবি তা জানা থাকায় আজই আমি ডাক্তারদের বলে এসেছি। ওরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। যদি দরকার মনে করেন, তা হলে হাবুকে ওঁরা নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাবেন। তুই চিন্তা করিস না।

ঠিক আছে মা, রাখছি, মোবাইল বন্ধ করল অর্জুন।

অমল সোম হাবুর উপর বাড়ির দায়িত্ব ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রতি মাসে টাকা পাঠাতেন হাবুর নামে, যাতে সে নিজের খরচ এবং বাড়ির দেখাশোনা করতে পারে। কিন্তু ওই বাড়িতে যে ডাকাতি করে নিয়ে যাওয়ার মতো কিছু নেই, এ খবর জলপাইগুড়ির অধিকাংশ মানুষ জানে। তা হলে ডাকাতি করতে কারা গিয়েছিল? লোকগুলো যে নির্বোধ, তা ভাবা যাচ্ছে না। ওরা হাবুকে বেঁধে তার দিয়ে কী করছিল?

মাথায় ঢুকছিল না অর্জুনের। এইসময় নীচে বেশ গোলমাল হচ্ছে বলে সে বুঝতে পেরে পিছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সনাতনের সঙ্গে যে লোকটা ঝগড়া করতে করতে শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে পৌঁছোল, তার মুখ অন্ধকারে দ্যাখা যাচ্ছে না। তৃতীয় লোকটি, যে কিনা দর্শক, তাকে চিনতে অসুবিধে হল না।

অর্জুন ধমক দিল, অ্যাই! কী করছ তোমরা?

সাব, এই লোকটা আমার টাকা মেরে দিচ্ছে। মুখ তুলে যে বলল তাকে চিনতে পারল অর্জুন, লছমন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী। আজ ওকে জঙ্গলে দেখেছে।

না, দাদা। আমি বলেছি বাকি থাকবে। কাল দিয়ে দেব।

আমি আগেই বলেছি হাঁড়িয়া আমি বাকিতে দিই না। তারপর খেলি কেন? কাল টাকা আদায় করতে কোথায় ছুটব আমি? টাকা দে, নইলে তোকে এই জঙ্গল থেকে বেরোতে দেব না।

বেরোতে দিবি না? কেন, কী করবি তুই?

মরে যাবি সনাতন। গন্ডার লেলিয়ে দেব পিছনে।

গন্ডার? গন্ডাররা তোর চাকর নাকি? হা হা হা!

সাব, আমাকে দোষ দেবেন না পরে। লোকটা মুখ তুলল।

কত টাকা পাওনা হয়েছে তোমার? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

তিরিশ টাকা।

তুমি একজন সরকারি কর্মী হয়েও ওসব বিক্রি করছ কোন সাহসে? সাব, আমি বিক্রি না করলে বড়সাহেবরা এখানে এলে অসুবিধেয় পড়তেন। সত্যি বলছি সাব, আমি বেশি দাম নিই না। কাল টুরিস্ট সাহেবের জন্য ও হাঁড়িয়া কিনতে গিয়েছিল আমার কাছে। আমি এক নম্বর জিনিস দিয়েছি, মাত্র পাঁচ টাকা প্রফিট করে। একে আমি ছাড়ব না!

কী করে গন্ডার লেলিয়ে দেবে?

আমি ডাকলে গন্ডার ছুটে আসবে, ওকে ছাতু করে ফেলবে।

তুমি উপরে এসো।

সনাতনকে শাসাতে শাসাতে লছমন উপরে উঠে এল। লোকটাও যে নেশা করেছে, বোঝা যাচ্ছিল। সে দরজায় দাঁড়াতে অর্জুন বলল, দ্যাখো, তোমার যে ক্ষমতা আছে তা আমার নেই। তোমার ডাক গন্ডার শোনে, আমি হাজার ডাকলেও তারা কান দেবে না। ভগবান তোমাকে এত ক্ষমতা দিয়েছেন যখন, তখন তুমি এদের সঙ্গে ঝগড়া করছ কেন? আমার কাছে। থেকে টাকাটা নিয়ে নিয়ো।

ও ব্যাটা বদমাশ। এখানে কেন এসেছে জানেন? ধান্দায়। ও তো জানে না যে, মেমসাহেব এখন বাংলোয় নেই। ওরা জানে তাকে ধরে দিতে পারলেই পঁচিশ হাজার পেয়ে যাবে। আরে, এতই যদি সোজা হত, তা হলে আমি কি মরে গিয়েছি? এটা আমার এলাকা। আমি কামাই না করে তোদের কামাই করতে দেব? সাব, শুধু গন্ডার কেন, হাতিও আমার কথা শোনে। মাহুতকে জিজ্ঞেস করুন। কথা বলতে বলতে টলছিল লছমন।

শুনেছি এই জঙ্গলে বিষধর সাপ অনেক আছে।

সাপ? সাপ আমাকে ভয় পায়। একবার একটা কেউটে ভয় পেয়েই ছোবল মেরেছিল আমাকে। আমি মরলাম না, সাপটাই মরে গেল, সোজা হওয়ার চেষ্টা করল লছমন, তা হলে আপনিই টাকাটা দিয়ে দেবেন? এখনই দিন না।

কেন? আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না?

জিভ বের করে নিজের কান স্পর্শ করল লছমন, ছি, ছি। কী বলেন? তবে সাব, মানুষের জীবন তো, কিছুই বলা যায় না। রাতে যার সঙ্গে কথা বললাম, সকালে তাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হল শ্মশানে।

আমি অত সহজে মরব না লছমন। কাল যে সাপটাকে ট্রানজিট থেকে চুরি করে নিয়ে জানলা দিয়ে ঘরে ফেলা হয়েছিল, সেটাও তো কাউকে মারতে পারেনি। লছমন, সময়টা বলল, ঠিক কোন সময়ে সাপটাকে ছুঁড়েছিলে! অর্জুন তাকাল।

লছমন পিটপিট করে তাকাল। অর্জুন লোকটাকে ভাল করে দেখছিল। দেখতে পেল সেই ভরদুপুরে কানের পাশে গুঁজে রাখা সিগারেটটা এখনও স্থানচ্যুত হয়নি। হয়তো ওটার কথা ভুলেই গিয়েছে লোকটা। সে এগিয়ে গিয়ে হতভম্ব লছমনের কানের পাশ থেকে সিগারেটটা টেনে বের করে আলোর সামনে ধরল, ডানহিল। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করল, তুমি নিশ্চয়ই প্যাকেট খুলে নিজের জন্য একটা সিগারেট বের করে কানে খুঁজে রাখোনি? এর প্যাকেট কত দামে বিক্রি করো?

একশো টাকা।

কত করে কেনো?

সাপ্লাই বেশি এলে দাম কমে যায়। সব সময় ঠিক থাকে না।

ওই একটা সিগারেট কে দিয়েছে তোমাকে?

আপনি কী জানতে চাইছেন? হঠাৎ লছমনের গলার স্বর নরম হয়ে গেল।

সাপটা কি তুমি ছুঁড়েছিলে?

না, আমি ছুড়লে ওটা কাজে লাগত।

কী কাজ? মেজর না লুসিকে মেরে ফেলা? আমি কিছু জানি না। মাইকেলসাহেবের লোক এসেছিল। আমার কাছে একটা মই চাইল, দিলাম। ওরা অন্ধকারে কী করেছে দেখতে পাইনি। পরে শুনেছিলাম, ওরা সাপ ছুঁড়েছিল মারতে। জানে না কায়দা। ছোঁড়ার সময় যদি লেজটা মুচড়ে দিত, তা হলে বিছানায় পড়েই ফণা তুলে ছোবল মারত। তা করেনি বলে ভয়ে লুকোতে চেষ্টা করেছে।

মাইকেলসাহেব কে?

ওরে বাবা। শিলিগুড়ির অর্ধেক এলাকার মালিক। দু'শো জন ওর আন্ডারে কাজ করে। পুলিশ আজ পর্যন্ত মাইকেলকে ধরতে পারেনি। যখন তখন হিলকার্ট রোডে, চার-পাঁচজনের বডি ফেলে দিতে পারে। কাল রাতে মই না দিলে আমিই খতম হয়ে যেতাম, লছমন বলল, গুডনাইট সাব।

দাঁড়াও। আজ দুপুরে মাদারিহাট থেকে চোরাপথে খুব খুশিমনে ফিরে এসেছ। ভাল কামাই হয়েছে? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

আ-আপনি জানলেন কী করে?

যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও।

হ্যাঁ। সাহেব বলেছে দশ বোতল স্কচ আমাকে দেবে, দাম দিতে হবে না। দশ বোতলের দাম এখানে অন্তত কুড়ি হাজার টাকা হবে। তাই...।

কোন সাহেব?

নাম জানি না। মাইকেলের লোক দুটো আমাকে সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

আচ্ছা। তোমাকে দশটা স্কচ সাহেব উপহার দেবে, এমনি এমনি?

তা বলতে পারেন। জঙ্গলের নিয়ম হল, রাতে কোনও গাড়ি বের হবে। না, ঢুকবে না। এমার্জেন্সি হলে আলাদা কথা। রাতে জঙ্গলের পথে হাঁটাও বেআইনি। সাহেবের ইচ্ছে, রাত একটা নাগাদ জঙ্গলে ঢুকে গন্ডারদের ছবি তুলবেন। আমি ডাকলে গন্ডাররা আসবে। সেই সুযোগ করে দিলে, সাহেবের ছবি তুলতে সুবিধে হবে। তার জন্যই উনি আমাকে উপহার দিচ্ছেন, লছমন কপালে হাত ছোঁয়াল, জঙ্গলে ঢোকা আটকাতে গার্ড আছে। ওটা আমার কাজ না। তাদের ম্যানেজ করে যদি সাহেব ভিতরে আসতে পারে, তা হলে আমি ওই উপকারটা করেই দিতে পারি। এতে তো কারও ক্ষতি হবে না।

কিন্তু সনাতন বলল, সাহেব ওর কাছ থেকে লরি নিয়ে ফুন্টশোলিং চলে যাবেন বারোটার সময়। অর্জুন মনে করিয়ে দিল।

আমি জানি না। সাহেব এসে মাল দেবে, আমি কাজ করে দেব। আচ্ছা, লছমন চলে গেল।

বারোটার কিছু আগে অর্জুন নীচে নামল। পদমবাহাদুর গাড়িতেই ঘুমোচ্ছে। চারধার পাতলা অন্ধকারে ঢাকা। জোনাকি উড়ল জঙ্গলের গায়ে। ওপাশের বাংলোর স্টাফ কোয়ার্টাসে আলো জ্বলছে না। একটা দরজায় শব্দ করল অর্জুন। অনেকক্ষণ পরে হারিকেন হাতে রোগা লোকটা বেরিয়ে এল।

সনাতন কোথায়?

ও তো চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে? হেঁটে হেঁটে?

তা জানি না। লছমন যখন উপরে আপনার সঙ্গে কথা বলছিল, তখনই চুপচাপ চলে গেল।

ঠিক আছে, শুয়ে পড়ো।

উপরে উঠে এল অর্জুন। সনাতন বোধহয় তার উপর ভরসা করতে পারেনি। কিন্তু এত রাতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যে বিপজ্জনক, তা নিশ্চয়ই ও জানে। তবু ঝুঁকি নিল!

হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, আর নয়, অনেক হয়েছে। লুসি প্রচুর পাখির। ডাক রেকর্ড করেছেন। কাল সকালে জলপাইগুড়ি যাওয়া দরকার। হাবুকে। সুস্থ করে তোলাই তার এখন একমাত্র কাজ।

হাবুকে মারতে চাইল কেন? কারা মারতে চেয়েছিল? আর আজই বিষ্টুসাহেব জানতে চাইলেন হাবুর মোবাইল নম্বর কত। হাবু কি ওদের টার্গেট ছিল? কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে লুসি তো হাবুর ধারেকাছে কখনও ছিলেন না। হঠাৎ মনে হল, লুসিকে যে মেসেজ পাঠিয়েছে, সে টার্গেট বলতে তাকে বোঝায়নি তো! আর এটা লুসির জানা। অথচ লুসির কথাবার্তা বা ব্যবহারে সেটা একদম বোঝা যায়নি।

অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। অর্জুন বুঝতে পারছিল, এই বাংলোয় থাকা আর নিরাপদ নয়। দ্রুত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সে মেজরের ঘরে গেল। দরজা না বন্ধ করে শুয়েছেন মেজর। ঘরে ঢুকে তাঁকে ডাকতেই তিনি উঠে বসলেন।

একী! আপনি ঘুমোননি?

ঘুমিয়েছিলাম। একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল।

তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র প্যাক করে নিন।

কেন?

আমাদের এখনই বাংলো ছেড়ে চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে? মাঝরাতে চলে যেতে বললেই হল? মামদোবাজি? ডাকো রেঞ্জারকে, ওর বাবার নাম আমি ভুলিয়ে দেব! মেজর খেপে গেলেন।

কেউ আমাদের চলে যেতে বলেনি। আত্মরক্ষার জন্য আমরা চলে যাব।

ও, তাই বলো। এটা রণকৌশল।

ঝটপট রেডি হয়ে নিয়ে মেজর নীচে নামলেন। অর্জুন গাড়ির কাছে গিয়ে জানলায় শব্দ করতে পদমবাহাদুর জিজ্ঞেস করল, কৌন?

অর্জুন বলল, চুপচাপ বেরিয়ে এসো।

বিস্মিত পদমবাহাদুর দরজা খুলে বলল, সাব?

গাড়িটাকে ভালভাবে লক করে আমাদের সঙ্গে চলো।

পদমবাহাদুর কথা বাড়াল না।

নিঃশব্দে রেঞ্জারের অফিস ছাড়িয়ে ওরা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। মেজর বললেন, গাড়িটাকে নিয়ে এলে না কেন? অন্ধকারে হাঁটা যাচ্ছে না।

দুপুরের সেই কাঁচা রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে উপরের দিকে মুখ তুলে অর্জুন দেখল, আকাশ অনেকটাই ঢেকে গিয়েছে বড় বড় গাছের পাতায়। নিচু গলায় বলল, গাড়িটাকে ওখান থেকে সরালে ওরা সন্দেহ করত।

কারা?

যারা আমাকে মারতে চায়!

তোমাকে? কী বলছ? কারা মারতে চায়?

যারা চাইছে না প্রোফেসর মুলেনের গবেষণা সফল হোক। আসুন, আমরা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাই। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না।

জঙ্গলের মধ্যে একটা চমৎকার বসার জায়গা পেয়ে গেল ওরা। বেশ বড় বড় বোল্ডার পড়ে ছিল ওখানে। এখানে আকাশ অনেকটাই দৃশ্যমান বলে ফিনফিনে আলো অন্ধকারকে পাতলা করেছে।

লছমনের কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে ওদের এই পথ দিয়েই আসতে হবে। এত রাতে মূল গেট কখনওই খুলবে না। হঠাৎ মাথার ভিতরে অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল অর্জুনের। তারপরই বিপ বিপ শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলের আলো জ্বলে উঠল। ফুটে উঠল, প্রাইভেট নম্বর।

পরিষ্কার ইংরেজিতে বলা কথাগুলো মস্তিষ্ক গ্রহণ করল, অর্জুন, ডু ইউ হিয়ার মি? লুসি কি তোমার কাছে আছে? আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই, আমি প্রোফেসর মুলেন। যদি থাকে, তা হলে তোমাকে যে কথাগুলো বলব, তা ওকে বলে দিয়ে! যদি না থাকে, তা হলে তোমার মোবাইল সেট অফ করে দিয়ো।

অফ করে দেওয়াই উচিত। কিন্তু অর্জুন সেটা করল না।

তা হলে লুসি তোমার পাশেই আছে। লুসিকে জিজ্ঞেস করো, ও কি মোবাইল নিয়ে যায়নি? উত্তরটা হ্যাঁ হলে তোমার মোবাইল অফ কোরো না। কয়েক সেকেন্ড গেল, প্রোফেসর মুলেন আবার কথা বললেন, আশ্চর্য। এই কারণে আমি ওর কাছে পৌঁছোতে পারছি না। যা হোক, লুসিকে বলো, বিপ বিপ করে যে-পাখি ডাকে, তার দ্যাখা পেলে যেন অবশ্যই একটা ছবি তুলে নিয়ে আসে। আর আসার সময়টা আমাকে যেন আগেই জানিয়ে দেয়।

তারপর মাথার ভিতর ঝিমঝিম করে উঠল অর্জুনের, মোবাইলের আলো নিভে গেল। আজ মাথার অস্বস্তি দূর হয়ে গেল বেশ তাড়াতাড়ি। কিন্তু ব্যাপারটা কী? লুসি তো মোবাইল নিয়ে এসেছেন। সেই মোবাইলে মেসেজও আসছে। অথচ ওঁর বস প্রোফেসর মুলেন মনে করছেন, লুসি মোবাইল নিয়ে আসেননি। তা হলে এটা কি অন্য মোবাইল, যার নম্বর প্রোফেসরকে দিয়ে আসেননি লুসি! তা হলে তো...!

হঠাৎ একটা চাপা যান্ত্রিক শব্দ কানে এল। মেজর ফিসফিস করে বললেন, মনে হচ্ছে, একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ।

মিনিটতিনেকের মধ্যে ওরা জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে জিপটাকে দেখতে পেল। নাচতে নাচতে এগোচ্ছে। কোনও আলো জ্বালা হয়নি। জিপে তিনজন মানুষ বসে আছে। জিপ ওদের পেরিয়ে চলে যাওয়ার পর, ওরা পিছু নিল বেশ দুরত্ব রেখে। ফরেস্ট অফিসের কাছাকাছি গিয়ে জিপ থামল। তিনটে ছায়ামূর্তিকে জিপ থেকে নামতে দেখল অর্জুন। এই সময় একটা টর্চের আলো এগিয়ে আসছিল ফরেস্ট অফিসের দিক থেকে। চারটে লোক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল।

অর্জুন নিচু গলায় মেজরকে বলল, আপনি আমাদের ব্যাগগুলো নিয়ে এখানে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করুন। প্রয়োজনে আপনাকে ডাকব।

হোয়াই? আমাকে বসিয়ে দিতে চাইছ কেন? আমি কি মরে গিয়েছি?

ছি ছি! আপনি ফোর্ট আগলান। সেটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

.

নিঃশব্দে পদমবাহাদুরকে নিয়ে অর্জুন জিপের কাছাকাছি পৌঁছে গেল জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে। টর্চ হাতের লোকটা লছমন। বাকি দু'জনকে বুঝতে পারল অর্জুন। এদেরই সে দেখেছিল ময়নাগুড়ির ধাবায়, খুঁটিমারি বাংলোয়। চতুর্থজন বিদেশি। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স।

লছমন বলছে, আমি কথা দিয়েছি, আমি গন্ডারদের ডাকব। কিন্তু তার আগে গিভ মি স্কচ!

সাহেব বলল, নো প্রব্লেম। বাট কল রাইনো নাউ।

নো স্কচ, নো কল। লছমন মাথা নাড়ল।

বাঙালি লোক দুটোর একজন সাহেবকে চাপা গলায় কিছু বলতে সাহেব ইশারা করল। দ্বিতীয় লোকটা জিপের পিছনে গিয়ে একটা পিসবোর্ডের বাক্স বের করে মাটিতে রাখল, এই নাও।

লছমন এগিয়ে গিয়ে বাক্সের মুখ খুলে একটা বোতল বের করে মুখের সামনে তুলে ভাল করে দেখল। তারপর বোতলটাকে আবার বাক্সের মধ্যে রেখে সেটাকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

সাহেব বলল, কল দেম।

লছমন বলল, ওরা এখন বাংলোর ওপাশে নুন খেতে এসেছে। ওদিকে চলুন।

চারজন লোক একটু ঘুরে বাংলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সাহেব ইশারা করল ডাকার জন্য। লছমন রেলিং-এর উপর উঠে মুখের দু'পাশে হাত রেখে অদ্ভুত আওয়াজ তুলল। অর্জুন আর পদমবাহাদুর

ততক্ষণে চলে এসেছে। ওদের গাড়ির আড়ালে। অদ্ভুত গলায় আওয়াজ তুলে যাচ্ছে লছমন। হঠাৎ নীচের জঙ্গলে গাছ ভাঙার শব্দ শুরু হল। যেন দুদ্দাড় করে ছুটে আসছে কিছু প্রাণী।

ঠিক তখনই শিলিগুড়ি থেকে আসা মাইকেলের দুটো লোক চুপচাপ সরে এসে সিঁড়ি বেয়ে বাংলোর উপরে চলে গেল।

হঠাৎ লছমন চেঁচিয়ে উঠল, দেখুন সাহেব, দেখুন।

অর্জুন কিছু বোঝার আগেই একরাশ বুনো অন্ধকার যেন ছুটে গেল ওপাশে। ওগুলো যে গন্ডার, তা বুঝতে অসুবিধে হল না। তারপরই বেশ জোরে ভাঙচুরের শব্দ কানে এল। তখনই উপরের বারান্দায় চলে এসে লোক দুটোর একজন ইংরেজিতে ঘোষণা করল, কেউ নেই সাহেব। ওরা পালিয়েছে।

কী করে পালাবে? ওরা তো সন্ধের পরে এখানে ফিরে এসেছে। ওই তো ওদের গাড়ি এখানেই পড়ে আছে। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে। সাহেব বলল।

এইসময় সেই পায়ের আওয়াজ আবার ফিরে আসছিল। লছমনকে দৌড়োতে দেখে সাহেবও দৌড়ে বাংলোর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। অর্জুন পদমবাহাদুরকে বলল, দৌড়োও। তরতর করে ওরা নেমে গেল নীচে। তারপর একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল, গন্ডারগুলো যেন আছড়ে পড়ল বাংলোর উপর।

ওদিকে তখন রেঞ্জার অফিসের চৌকিদাররা পটকা ফাটাচ্ছে। গন্ডারদের ধাক্কায় বাংলোটা দুলছে। সাহেবের চিৎকার শোনা গেল, ওদের চলে যেতে বলো, নইলে আমাদের মেরে ফেলবে।

লছমনের ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা গেল, আমি ডাকতে জানি, থামাতে জানি । বাংলোর সিঁড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার পর গন্ডারগুলো শান্ত হল, কিন্তু জায়গা ছেড়ে গেল না। ঠিক তখনই বাংলোর বারান্দা থেকে মাইকেলের দু'জন লোক গুলি চালাল গন্ডারদের উদ্দেশে। সেটা দেখে খেপে গেল লছমন, গুলি করছেন কেন? খবরদার, গুলি করবেন না। ওদের গুলি করার কোনও কথা ছিল না।

অ্যাই চোপ। তুই নিশ্চয়ই তোক দুটোকে খবর দিয়েছিস, নইলে ওরা পালাবে কেন? বল, কোথায় রেখেছিস ওদের?

আমি কাউকে খবর দিইনি। আমি কথা দিয়েছিলাম গন্ডার দ্যাখাব, দেখিয়ে দিয়েছি। লছমন প্রতিবাদ করল।

দ্বিতীয় লোকটা বলল, এই ব্যাটা সাহেবটার কী দরকার ছিল গন্ডার দেখতে চাওয়ার। যে কাজে এসেছি তাই চুপচাপ করে চলে যাওয়া উচিত ছিল। যাক, গন্ডারগুলো চলে যাচ্ছে।

লছমন সেটা দেখে মাথা নাড়ল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, পালান, পালান এখান থেকে। হাতির দল আসছে।

দোতলার বারান্দা থেকে লাফিয়ে নামল সে। তারপর চোঁ-চোঁ দৌড়ল রেঞ্জারের অফিসের দিকে।

প্রথম লোকটা চেঁচাল, নামুন, গেটডাউন।

দ্বিতীয় লোকটা উপর থেকে লাফ দিয়েই আর্তনাদ করে উঠল, মরে গেছি, আমার পা... ওরে বাবা রে।

প্রথম লোকটা এবং সাহেব লাফিয়ে নীচে নেমে লোকটার কাছে গেল। প্রথম লোকটা তখন যন্ত্রণায় কাতর দ্বিতীয়কে জিজ্ঞেস করল, অ্যাই, হাঁটতে পারবি?

না, আমার ডান পা একদম গিয়েছে, উঃ, কেঁদে উঠল দ্বিতীয়জন।

প্রথম লোকটা ইতস্তত করছিল। ইংরেজিতে বলল, হাতি আসছে। এখানে ওকে পেলে মেরে ফেলবে।

সাহেব বলল, কোথায় হাতি? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ওই লোকটা আমাদের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে গেল। তুমি যাও, গাড়িটাকে এখানে নিয়ে এসো। না হলে একে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

লোকটা মাথা নাড়ল। তারপর বেশ ভয়ে ভয়ে পা বাড়াল।

পদমবাহাদুরকে ইশারা করে অর্জুন উপরে উঠে এল। মাটিতে পড়ে থাকা লোকটা সমানে ককিয়ে যাচ্ছে। সাহেব তাকে চুপ করতে বললেও সে থামছে না। হঠাৎ রেগে গিয়ে সাহেব তাকে লাথি কষাল, তাতে চিৎকার আরও বেড়ে গেল।

অর্জুন সোজা সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, আমার নাম অর্জুন। তোমার নামটা জানতে পারি?

চমকে গেল সাহেব, তুমি কে?

অর্জুন হাসল, নামটা শোনবার পরও জিজ্ঞেস করছ? আমি তোমার টার্গেট নম্বর ওয়ান। তোমার নাম কী?

কার্ল।

বাঃ! কিন্তু কার্ল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। চলো, ওখানে আমাদের গাড়ি আছে, চলো গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসি। অর্জুন বলল।

হঠাৎ পকেটে হাত দিল কার্ল, চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। মাথার উপর হাত তুলে পিছন ফিরে দাঁড়াও। কার্ল পিস্তল বের করল।

অর্জুন বাধ্য হল আদেশ মান্য করতে। পদমবাহাদুর এগিয়ে আসছিল মাটিতে পড়ে থাকা লোকটির পাশ দিয়ে। যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতেও লোকটা পদমবাহাদুরের পা ধরে এমন হ্যাঁচকা টান দিল যে, সে মুখ থুবড়ে পড়ল সামনে। এইসময় জিপের আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রথম লোকটা জিপ নিয়ে চলে এল সামনে। অর্জুনকে বেঁধে ফেলতে বেশি দেরি করল না সাহেব। পদমবাহাদুরকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হল বাংলোর ওপাশে। আহত লোকটিকে ওরা

সযত্নে তুলে নিল জিপে। কার্ল বলল, একটু দাঁড়াও। তারপর ভাঙা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে বাংলোর দোতলায় শরীরটা নিয়ে গেল জিমন্যাস্টের মতো। মিনিটদুয়েকের মধ্যে ফিরে এল লোকটা লুসির ব্যাগ নিয়ে।

অর্জুনকে পিছনে বসিয়ে ওরা জিপে উঠল। কার্ল বলল, চালাকি আমি পছন্দ করি না। দু'দিন ধরে খুব ভুগিয়েছ আমাদের। প্রাণে বাঁচতে চাও তো চুপচাপ বসে থাকো। আর এই যে, তুমি কি মনে করছ পৃথিবীতে এর আগে কারও পা ভাঙেনি? দয়া করে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করো।

জিপ চলছিল সেই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ প্রথম লোকটা চাপা গলায় বলে উঠল, সর্বনাশ। ওটা কী?

অন্ধকারে সামনের পথ স্পষ্ট না হলেও বোঝা যাচ্ছিল কিছু একটা পড়ে আছে রাস্তা জুড়ে। অত লম্বা কোনও প্রাণী হতে পারে না। প্রাণ থাকলে নড়াচড়া করত। একবার লাইট জ্বালিয়েই নিভিয়ে দিল প্রথমজন। একটা বিশাল গাছ রাস্তা আটকে রেখেছে। প্রথমজন বলল, ওরকম উদ্ভট শখ, কারও হয়? রাতের বেলায় গন্ডারদের ডাকো, দেখব। আর-একটু হলেই ওখানে প্রাণ যেত। আর এখানে ওদের ছুটন্ত শরীরের ধাক্কায় গাছ পড়েছে। এখন যাব কী করে?

কার্ল লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। পকেট থেকে টর্চ বের করে রাস্তাটা দেখে এসে বলল, হয়তো গন্ডাররাই গাছ ফেলেছে। কিন্তু গাছটাকে ওইভাবে রেখে যায়নি।

তার মানে? প্রথমজন খিঁচিয়ে উঠল।

কোনও মানুষ টেনে নিয়ে গিয়েছে। মাটিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার ছাপ স্পষ্ট।

এখানে মানুষ আসবে? এত রাতে?

সেই মোটকা পিপেটা কোথায় গেল, তা কি একবারও ভেবেছ?

প্রথমজন বলল, তাই তো।

অতএব দয়া করে নেমে এসো।

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। যেভাবে ওরা ওর হাত-পা বেঁধে রেখেছে, তাতে শোনা ছাড়া কিছু করবার নেই। কিন্তু মেজর অত বড় গাছটাকে টেনে রাস্তা বন্ধ করেছেন, এটা ভাবাই যাচ্ছে না। তা হলে নিশ্চয়ই তিনি আশপাশের জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন।

গাছটাকে সামান্য সরিয়ে গাড়ি চলার উপযোগী করে ওরা ফিরে এল। মিনিটকুড়ির মধ্যে নৌকোর মতো দুলতে দুলতে জিপ শেষ পর্যন্ত হাইওয়েতে উঠে পড়ল।

প্রথম লোকটা জিজ্ঞেস করল, ওকে নিয়ে কোন হাসপাতালে যাব?

সেটা আমার চেয়ে তুমিই ভাল জানেনা। কার্ল জবাব দিল।

মাদারিহাটের মধ্যে দিয়ে জিপ ছুটল। এখন এই মিনি শহরটা গভীর ঘুমে। একটা আলোও জ্বলছে না কোথাও।

ঠিক তখনই অর্জুনের মাথার অস্বস্তি শুরু হল। পকেটে রাখা মোবাইলে আলো দপদপ করছে। ঠিক তারপরেই প্রোফেসর মুলেনের গলা কানে এল, এখন ইন্ডিয়া টাইম অনুযায়ী তোমার ঘুমোবার কথা। তবু বাধ্য হয়েই তোমাকে জাগাচ্ছি। তুমি মেজরকে বলবে, আগামীকালই কলকাতা থেকে নিউ ইয়র্কে তোমাদের নিয়ে চলে আসতে। কথাটা লক্ষ করো, তোমাদের বলছি। অর্থাৎ তুমি আর লুসি। ওকে।

অর্জুন শ্বাস ফেলল। সে এখন কী অবস্থায় আছে, তা জানানো সম্ভব হচ্ছে। না। অতএব প্রোফেসর বুঝবেন কী করে, কেন ফেরা যাবে না।

আমি একটু নীচে নামব। অর্জুন চলন্ত জিপে বসে বলল।

কার্ল জিজ্ঞেস করল, কেন?

প্রকৃতি ডাক দিয়েছে।

অ। ওহে, গাড়িটা একটু থামাও।

গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে প্রথমজন বলল, ওকে সার্চ করা হয়নি। দেখুন পকেটে কোনও অস্ত্র আছে কি না।

অর্জুনকে জিপ থেকে নামিয়ে কার্ল অর্জুনের পকেটগুলো হাতড়াতে গিয়ে মোবাইল সেট পেয়ে গেল। অর্জুন বলল, আমার হাত খুলে না দিলে...

কার্ল প্রথম লোকটিকে বলল, ওকে হেল্প করো। আমি এই যন্ত্রটি দেখছি।

বোতাম টিপে টিপে কার্ল রিসিভড কলাম বের করে চেঁচিয়ে উঠল, মাই গড। ইট মাস্ট বি ওভারসিজ কল, মিনিটদুয়েক আগে এসেছে।

অর্জুন তখন জলবিয়োগ করছিল প্রথমজন হাত খুলে দেওয়ায়।

কে ফোন করেছিল?

কেউ ফোন করলে তো শুনতেই পেতেন। রিং হত। কাজ শেষ হতেই অর্জুনের হাত বেঁধে দেওয়া হল।

সঙ্গে সঙ্গে সজোরে চড় মারল কার্ল। পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিল অর্জুন। কার্ল গজরাল, আমাকে নির্বোধ ভাবো তুমি? তোমার সন্ধানে কেন এদেশে এসেছি? অ্যাঁ!

প্রথম লোকটা বলল, ঠিক আছে। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। এটা হাইওয়ে। পুলিশ এসে পড়তে পারে, উঠুন।অর্জুনকে উঠিয়ে দিল লোকটা। চোয়াল কনকন করছিল। জিপ চলতেই অর্জুন বলল, তোমার নাম বলছে তুমি জার্মান। প্রোফেসর মুলেনও তাই। এই একটা জায়গায় মিল দেখছি।

মুলেন তোমাকে গিনিপিগ করেছে, তা তুমি জানো?

না।

ও যে এক্সপেরিমেন্ট করছে, তা শতকরা দু'জন লোকের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। ওই টু পার্সেন্টের মধ্যে তুমি আছ।

তা হলে হাবুকে খুন করতে গিয়েছিলে কেন?

লোকটা বেআদব। ওর মাথার পাশে মোবাইল ফোন রেখে সেই নম্বর ব্যবহার করে দেখতে চেয়েছিলাম ওর মস্তিষ্কে খবর পৌঁছে দেওয়া যায় কিনা! কিন্তু বুদ্বুটা এমন শক্তি দ্যাখাতে চাইল যে, মেরে ফেলা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। আশা করি, তুমি ওই ভুল করবে না। কার্ল বলল।

অর্জুন স্বস্তি পেল। যাক, হাবু বেঁচে গিয়েছে, এই তথ্য এদের জানা নেই!

কিন্তু প্রোফেসর মুলেনের গোপন খবর কার্ল জানল কী করে? বিট্‌সাহেব প্রোফেসরের হয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। মেজর নর্থ বেঙ্গলে আসার সময় বলেছেন, লুসি পাখির ডাক রেকর্ড করতে এসেছেন। সে নিজে মোবাইল নিয়েছে মেজররা এদেশে আসার কয়েকদিন আগে। তার নম্বর পাঠিয়েছে, ব্রেন স্ক্যান এবং পি ই টি রিপোর্ট পাঠিয়েছে। আর আর সেই রিপোর্ট যে প্রোফেসর মুলেনকে মোবাইলের মাধ্যমে তার মস্তিষ্ক কোষে শব্দ পাঠাতে সাহায্য করেছে, এ-কথা কার্ল জানতে পারল কী করে?

হঠাৎ কোমরের কাছে ভিজে ভিজে অনুভূতি হওয়ায় মুখ ফেরাতেই আহত লোকটাকে দেখতে পেল অর্জুন। ওর আহত পা তার কোমরে ঠেকছে। সে চিৎকার করে গাড়ি থামাতে বলল। প্রথম লোকটা গাড়ির গতি কমিয়ে জিজ্ঞেস করল, আবার কী হল?

এই লোকটার শরীর থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। আমার জামা ভিজে গিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাল প্রথম লোকটা। দৌড়ে পিছনে এসে ডাকল, কী রে? ঠিক আছিস তো? এই সামু...। যাচ্চলে, এ তো কথা বলছে না! শরীর থেকে সব রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে নাকি? এখন কী করা যায়?

কার্ল বলল, ফুন্টশোলিং চলো। ওখানে ভাল ডাক্তার নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

এখনও অনেকটা পথ। তার আগেই তো ও ছবি হয়ে যাবে।

গেলে যাবে। টাকা নিয়ে প্রোফেশনাল হয়েছে, অথচ ঠিক মত লাফাতে জানে না!

অ্যাই, ও আমার জিগরি দোস্ত। এসব কথা বলবে না।

অর্জুন বলল, কাছেই একটা চা-বাগানের হাসপাতাল আছে। ওখানে নিয়ে গেলে বেঁচে যেতে পারে।

আপনি চেনেন?

হ্যাঁ।

চলুন, লোকটা আবার ড্রাইভিং সিটে ফিরে গেল। অর্জুনের নির্দেশমতো সুভাষিণী চা-বাগানে যখন জিপ ঢুকল তখন অর্জুন বলল, আমাকে এভাবে দেখলে ওরা আপনাদের প্রশ্ন করবে। কী উত্তর দেবেন?

লোকটা আবার গাড়ি থামিয়ে পিছনে এসে অর্জুনকে বন্ধনমুক্ত করতে যাচ্ছিল। কিন্তু কার্ল তাকে বাধা দিল, নো, নেভার। ওকে খুলে দিলে আমাদের বিপদে ফেলবেই। ওর ব্রেন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

কিন্তু আমার বন্ধুর চিকিৎসার জন্য ওর সাহায্য দরকার, প্রথম লোকটি চেঁচিয়ে বলল।

হাসপাতালের সামনে আলো জ্বলল। ছোট্ট হাসপাতাল। এখন ডাক্তারদের থাকার কথা নয়। নার্স ছিলেন। তাঁকে বলে একটি চৌকিদারকে পাঠানো হল ডাক্তারকে তাঁর কোয়ার্টার্স থেকে ডেকে আনতে। ভদ্রলোক বিছানা ছেড়ে চলেও এলেন খুব তাড়াতাড়ি। এসে সব দেখে বললেন, এই হাসপাতালে শুধু বাগানের কর্মীদের চিকিৎসা হয়। কিন্তু অর্জুনবাবু, আপনাকে আমি চিনি। আগেও এখানে দেখেছি। তা ছাড়া

কেসটা খারাপ দিকে যাচ্ছে, ভরতি করে নিচ্ছি। তবে কাল জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়িতে নিয়ে যাবেন। দ্বিতীয় লোকটিকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, কমপাউন্ড ফ্র্যাকচার। হাড় বেরিয়ে এসেছে। ফলে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে অনেকটাই। অপারেশন করতে হবে। আমি কয়েকটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলাম, যাতে ইনফেকশন না হয়। স্যালাইন আর অক্সিজেন চলছে। আপনাদের মধ্যে কারও 'ও' গ্রুপের রক্ত আছে?

প্রথম লোকটা বলল, আমার 'ও' গ্রুপ।

তাড়াতাড়ি ভিতরে আসুন।

ওরা ভিতরে চলে গেলে অর্জুন কার্লকে জিজ্ঞেস করল, কী চাও তুমি?

কার্ল কাঁধ ঝাঁকাল। উত্তর দিল না।

এইসময় গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা গেল। গাড়িটা অনেকটা কাছে এসে থেমে গেল। তারপর দু'জন লোকের অস্পষ্ট মূর্তি গাড়ি থেকে নামল।

অর্জুন চিৎকার করল, মেজর, এদিকে আসুন।

মিনিটখানেকের মধ্যেই পদমবাহাদুরকে নিয়ে মেজর চলে এলেন সামনে, এই উল্লুকটা, এই উল্লুকটাকে কী করে কঞ্জা করলে?

একে আপনি চেনেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

কস্মিনকালেও নয়। কিন্তু ও তোমাকে বেঁধে এনেছে, তাই তো?

কী করে জানলেন?

আমি জঙ্গলের আড়াল থেকে দেখলাম। আজ আমি গন্ডারের পায়ের তলায় আর-একটু হলে পড়ে গিয়েছিলাম। পুলিশকে খবর দিয়েছ? মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল বের করল কার্ল, পুলিশ? পুলিশের কথা ভুলে যাও। অর্জুন, তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

কোথায়?

থিম্পু। ক্যাপিটাল অফ ভুটান। কাল দুপুরের ফ্লাইটে দিল্লি থেকে প্রোফেসর মুলেনের প্রধান সহকারী থিম্পু আসছেন।

প্রধান সহকারী? তাকে তো দু'মাস আগে তাড়িয়ে দিয়েছেন প্রোফেসর মুলেন? লোকটা ফর্মুলা চুরি করছিল। মেজর বললেন।

এইসময় বাইরে বেরিয়ে এল প্রথম লোকটা, সঙ্গে ডাক্তার, এঁর জন্যই ওই ভদ্রলোক বেঁচে যাবেন। এত রাতে আপনারা আর কোথায় যাবেন। আমার অফিসঘরে বিশ্রাম করুন। ম্যানেজার এখন বাগানে নেই। অর্জুনবাবু, ঘটনাটা আপনি আগামীকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে বলে যাবেন। আর হ্যাঁ, কালই ওকে অপারেশনের জন্য নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু...।

কোনও সমস্যা? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

এরকম কেস হাসপাতালে এলে পুলিশকে জানানো নিয়ম।

আমরা কোনও পুলিশ চাই না ডাক্তার। ভোর হলেই যদি সমস্যা হয়, তা হলে এখনই ওকে শহরে নিয়ে যেতে পারি। প্রথমজন বলল।

অসম্ভব। এখন ওকে মুভ করানো যাবে না। সেটল হতে সময় দিতে হবে। তা ছাড়া নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স চাই। বীরপাড়া থেকে আনাতে হবে। এই ভদ্রলোকের হাতে পিস্তল কেন? ডাক্তার অবাক হলেন।

প্রথমজন বলল, ওটা পকেটে রেখে দিন সাহেব।

কার্ল যন্ত্রটা পকেটে রাখল। প্রথমজন বলল, বিদেশি তো, সব সময় বন্য জন্তুর ভয় পায়। ঠিক আছে, আপনি যান, বিশ্রাম নিন।

ডাক্তার চলে গেলে কার্ল জিজ্ঞেস করল, তুমি কাল চলে যাবে?

হ্যাঁ।

মাইকেল কথা দিয়েছিল কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে।

ঠিক। কিন্তু আমার বন্ধুর প্রাণ বাঁচানো অনেক জরুরি।

এটা কিন্তু চুক্তিভঙ্গ হচ্ছে।

আই অ্যাম সরি সাহেব।

বেশ। অর্জুনকে বেঁধে জিপে তুলে দাও। আমিই ওকে ফুন্টশোলিং-এ নিয়ে যাব। ওখান থেকে লোক জোগাড় করে থিম্পু যেতে অসুবিধে হবে না।

অর্জুন হাসল, তোমার বুদ্ধি দেখে হাসি পাচ্ছে আমার। উনি আমাকে বাঁধতে আসবেন আর আমি এখন এখানে সেটা করতে দেব? তখন আমি প্রায় একা ছিলাম। তুমি পিস্তল দেখিয়েছিলে, তাই মানতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন ওই চেষ্টা করতে গেলে ওকেও বন্ধুর পাশের বেড়ে গিয়ে শুতে হবে।

তুমি ভুলে যাচ্ছ আমার পকেটে পিস্তল আছে।

জানি। একটা গুলির আওয়াজ হলে শ'য়ে-শ'য়ে শ্রমিক ছুটে আসবে। তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। ছুঁড়ে দ্যাখো, অর্জুন হাসল।

হঠাৎ অসহায়ের মতো দু'হাতে পিস্তল তুলে মুঠোয় ধরল কার্ল, ওঃ! আই অ্যাম সো হেলপলেস। তারপর চোখ বন্ধ করে একটু ভাবল লোকটা। শেষে চোখ খুলল, অর্জুন, আমার নাম কার্ল। আমি দিল্লিতে থাকি। আমি গুন্ডা-বদমাশ নই। এই মোটকুরা যেদিন বাগডোগরায় নেমেছে, তার আগের দিন ওই একই ফ্লাইটে আমি এসেছি। দিল্লি থেকেই মাইকেলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল একজন। মাইকেল এই দুটো লোককে দিয়েছিল আমাকে সাহায্য করার জন্য। প্রোফেসর মুলেন যেমন মানুষের ব্রেন নিয়ে রিসার্চ করছেন, তেমনই ওঁর প্রধান সহকারী প্রোফেসর বেকারও একই কাজ করছেন। আমি ব্যবসার কাজে দিল্লিতে আছি। প্রোফেসর বেকার আমার আত্মীয়। উনি জানতে পেরেছেন প্রোফেসর মুলেন তোমার ব্রেন সেলে কথা পোঁছোতে পেরেছেন। অথচ সবার ব্রেনে এটা করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং গবেষকদের কাছে তোমার চাহিদা আছে। তুমি যদি কাল আমার সঙ্গে থিম্পুতে গিয়ে প্রোফেসর বেকারকে তোমাকে নিয়ে পরীক্ষা করার সুযোগ। দাও, তা হলে খুশি হব।

অসম্ভব, মেজর খেপে গেলেন, এক কোটি ডলার দিলেও তোমরা অর্জুনকে কিনতে পারবে না। প্রোফেসর মুলেন বিষ্টসাহেবের বন্ধু। তাই আমি বা অৰ্জুন তার সঙ্গেই থাকব। অর্জুন, এই হনুমানটাকে পুলিশের হাতে তুলে দাও।

ওঃ, আবার পুলিশ! অর্জুন, তুমি যাবে না?

অর্জুন হাসল। কথা বলল না।

কত টাকা পেলে তুমি যেতে পারবে?

আপাতত আমার টাকার খুব বেশি দরকার নেই কার্ল!

অ, থিতিয়ে গেল কার্ল। তারপর বলল, বেশ যেতে হবে না, কিন্তু তুমি আমাকে আধঘণ্টা সময় দেবে?

বেশ।

তা হলে চলো। শুধু তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

তা হয় না। মেজর আমার সঙ্গে যাবেন।

এখানকার গেস্টহাউজটা কোথায়?

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। কার্ল এই বাগানের গেস্টহাউজের কথা জানল কী করে? সে জিজ্ঞেস করল, আজ সন্ধের পর তুমি কি গেস্টহাউজে এসেছ?

না। এলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম না, কার্ল হাসল, আমি জানি লুসি আছে ওখানে। চলো।

লুসিকে খুন করলে বা জ্যান্ত ধরে দিলে টাকা দেবে, একথা প্রচার করেছিলে?

হ্যাঁ।

কেউ যদি খুন করে ফেলত?

পারত না।

তোমরাই তো লুসির ঘর ভুল করে সাপ ফেলেছিলে।

না, আমরা জানতাম লুসি ও ঘরে নেই, ওই মোটকুটা আছে। ও মুলেনের চামচে। তাই একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম।

কী? মেজর চেঁচালেন, আমাকে শিক্ষা দেবে? সাপটা যদি আমাকে কামড়াত তা হলে? তা হলে কী হত?

অর্জুন ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথম লোকটাকে বলল, আপনি এখনই বীরপাড়ায় চলে যান জিপ নিয়ে। ভোর হতে দেরি নেই। ওখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসুন। চলুন মেজর।

গেস্টহাউজের গেট খুলতেই বাধা পেল ওরা। প্রহরীরা বলল, ভিতরে যাওয়ার হুকুম নেই। কিন্তু তাদের একজন অর্জুনকে চিনতে পারল। লোকটা বলল, মেমসাহেব বাংলো থেকে বেরোতে চেয়েছিলেন, আমরা যেতে দিইনি।

ভাল করেছ। ওর সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি।

উপরে উঠে গেস্টরুমে ওরা বসতেই মেজর গিয়ে দরজায় শব্দ করলেন, লুসি, মাই লিটল সিস্টার, তুমি কি জেগে আছ?

দরজা খুললেন লুসি। বোঝা গেল তিনি ঘুমোননি। সবাইকে ভাল করে দেখলেন। কার্ল এগিয়ে গেল, আমি কার্ল।

আমি লুসি।

এভাবে কথা হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে।

ঠিক আছে, এরা কি সব জেনে গিয়েছে?

হ্যাঁ। না জানিয়ে উপায় ছিল না। আমার লোক দুটোর জন্য সব বিগড়ে গেল। আমি তোমার সঙ্গে ভিতরে গিয়ে কথা বলতে পারি?

নিশ্চয়ই।

কার্ল ভিতরে চলে গেল দরজা ভেজিয়ে। মেজর হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, এ কী! লুসি যে ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে। বেচারা জানে না, এই লোকটা প্রোফেসর মুলেনের শত্রু।

আমার মনে হয় উনি জানেন। অর্জুন বলল।

জানে? আমরা একসঙ্গে প্লেনে এলাম। ও তো প্রোফেসর বলতে অজ্ঞান।

অপেক্ষা করে দেখুন।

খানিক বাদে কার্ল দরজা খুলে অর্জুনের সামনে এল, আমাদের কাছে কোনও যন্ত্রপাতি নেই। তবু একটা এক্সপেরিমেন্ট করবে লুসি। তোমার মোবাইল অন আছে কি?

হ্যাঁ।

ওটা কানের উপর রাখো।

অর্জুন মোবাইলটা পকেট থেকে বের করতেই রিং হল সশব্দে। কার্ল বলল, এবার কানে চেপে ধরো। হ্যাঁ, আগে রিসিভ করো।

অর্জুন বোম টিপে কানের কাছে মোবাইল নিয়ে গেল। কোনও শব্দ নেই। তারপর হঠাৎ বিপবিপ বিপ শব্দ এবং তারপর হুইসলের আওয়াজ হয়ে মিলিয়ে গিয়ে পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। হঠাৎ মাথার ভিতর প্রবল অস্বস্তি। অস্বস্তিটা বাড়ছে কিন্তু কোনও গলা শুনতে পাচ্ছে না অর্জুন। ঠিক সেই প্রাইভেট নম্বর থেকে ফোন এলে এই বিপ বিপ শব্দে এইরকম অস্বস্তি হয়ে থাকে। সে মোবাইল সরিয়ে নিতে কার্ল প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার মাথায় কি কোনও অনুভূতি হচ্ছে?

হ্যাঁ। অস্বস্তি হতে হতে ফাঁকা হয়ে গেল মাথার ভিতরটা।

অর্জুন বলামাত্র কার্ল চিৎকার করে উঠল, লুসি, ট্রুলি ইটস ওয়ার্কিং।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, এসব কী হচ্ছে?

লুসি বেরিয়ে এলেন বাইরে, প্রোফেসর মুলেনের থিয়োরি হল পাখিদের শ্রবণশক্তি খুব বেশি। বিশেষ করে বিপবিপ বিপ ডাকটা যে-পাখি ডাকে, ওদের কানে শব্দটা পৌঁছে দিলেই ওরা ডেকে উঠবে। আর এই সিগনালটা ছড়িয়ে যাবে অনেক দূরে। নাউ, অর্জুন, অন বিহাফ অফ প্রোফেসর বেকার, তোমাকে এক লক্ষ ডলার অফার করছি। তোমার ব্রেনের স্ক্যান রিপোর্টের কপি আমার কাছে আছে। কিন্তু পিইটি রিপোর্ট পাইনি। তা ছাড়া তোমার ব্রেন কেন সিগনাল অ্যাকসেপ্ট করছে, এটা জানা দরকার। তুমি কি আগামীকাল থিম্পু যাবে?

সরি লুসি, অর্জুন উঠে দাঁড়াল, আমার মগজ আমি আপনাদের গবেষণার জন্যে দিতে রাজি নই। চলুন মেজর।

ওরা নীচে নেমে আসতেই দেখল দুটো পুলিশের জিপ বাংলোয় ঢুকছে। ডাক্তারবাবু ছুটে এলেন, কিছু হয়নি তো আপনার? লোকটার হাতে পিস্তল দেখে আমি থানায় খবর দিলাম। ইনি ওসি, মিস্টার সেন, ইনি অর্জুন।

মিস্টার সেন জিজ্ঞেস করলেন, শুনলাম, একজন বিদেশি পিস্তল দেখিয়েছেন?

হ্যাঁ। গত রাতে জলপাইগুড়ির একটি নিরীহ মানুষকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। আজ হলং বাংলো ওর জন্যই প্রায় চুরমার হয়েছে। দুটো পেশাদার লোককে ভাড়া করে এনেছিল আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অর্জুন বলল।

আর লুসি, লুসির কথা বলো।

না মেজর, লুসির বিরুদ্ধে কোনও চার্জ আনা যাবে না, অর্জুন বলল, হ্যাঁ, ওই লোকটি এখানকার ট্রানজিট থেকে সাপ চুরি করে এই ভদ্রলোককে মারবার চেষ্টা করেছিল। অর্জুনের কথা শেষ হতেই পুলিশবাহিনী উপরে উঠে গেল।

কী মনে হতে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে অর্জুন বলল, এটা সহ্য হচ্ছে না আমার। কী করা যায় এটাকে নিয়ে?

পদমবাহাদুর এগিয়ে এল সামনে, আমাকে দেবেন সাব?

অর্জুন হেসে ওর হাতে মোবাইলটা দিয়ে বলল, নিশ্চয়ই। তুমি জানো না, আমার কী উপকার করলে?

মানুষ পাচার (২০০৭)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১. চার দেওয়ালের মধ্যে

মানুষ পাচার (২০০৭)
অর্জুন সমগ্র ৫ – সমরেশ মজুমদার

‘চার দেওয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে…’ মান্না দে’র গাওয়া গানটাকে আজকাল প্রায়ই গুনগুন করে অর্জুন, বিশেষ করে যখন সে কম্পিউটারের সামনে বসে। নেটে ঢুকে পড়লে এই চার দেওয়ালের মধ্যে গোটা পৃথিবীটা টুক করে চলে আসে। কোথায় সানফ্রান্সিসকো, কোথায় সিঙ্গাপুর, কয়েক সেকেন্ডেই খবরাখবর নিয়ে আসা যায়। গত কাল অর্জুন মেজরকে মেল করেছিল। আজ দেখল, মেলের জবাব আসেনি। সুস্থ থাকলে মেজর প্রতিদিন মেল খোলেন। জবাব দেন। যাটে পৌঁছোনো মানুষটি এখনও বেশ যুবক আছেন। উত্তর না আসার কারণ দুটো হতে পারে। এক, মেজর তার নিউ ইয়র্কের ফ্ল্যাটে নেই। দুই, উনি খুব অসুস্থ।

ঘড়ি দেখল অর্জুন। এখন দুপুর তিনটে। নিউ ইয়র্কে ভোর হচ্ছে। মেজর নিশ্চয়ই গভীর ঘুমে। ঘুম থেকে উঠে, খেয়াল পড়লে চার ঘণ্টার আগে মেল পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অথচ শুভেন্দুবাবু তাকে চারটের মধ্যে দেখা করতে বলেছেন। ওই সময় তার সঙ্গে কথা বলে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। অর্জুন কম্পিউটার বন্ধ করল।

লাল বাইক নিয়ে কদমতলার মোড়ে চলে এল সে। সঙ্গে সঙ্গে ডাকটা ভেসে এল, অর্জুন! অ্যাই অর্জুন।

উলটো দিকের ফুটপাতে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখে অবাক হল অর্জুন। নির্মাল্য। ওরা একসঙ্গে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে পড়ত। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর ও নরেন্দ্রপুরে পড়তে চলে যায়। ওর বাবাও ট্রান্সফার হয়ে এই শহরের পাট চুকিয়ে চলে গিয়েছেন কিছুদিন পরে। মুখের আদল আগের মতো থাকলেও, নির্মাল্যর চেহারা বেশ ভাল দেখাচ্ছে। পরনের জামাপ্যান্টও বেশ দামি। বাইক ঘুরিয়ে ওর সামনে এসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, তুই এখানে?

কাজে এসেছি। উঠেছি ‘তিস্তা ভবনে। শহরটা একদম বদলে গিয়েছে রে। তুই কিন্তু খুব একটা পালটাসনি। নির্মাল্য কাছে এল।

কী কাজে এখানে এসেছিস?

বলা যাবে না। তারপর তুই তো আবার ডিটেকটিভ। আমি সরকারি কাজেই এসেছি। নির্মাল্য হাসল।

অর্জুন বলল, ভুল হল। আমি ডিটেকটিভ নই, সত্যসন্ধানী, ঘড়ি দেখল সে, এখনও চল্লিশ মিনিট বাকি আছে চারটে বাজতে। জিজ্ঞেস করল, চা খাবি?

চা? কোথায়?

আঙুল তুলে কদমতলার মোড়ে সেই প্রাচীন রেস্তরাঁটাকে দেখাল অর্জুন। এখন এই দুপুরে দোকান ফাঁকা। বেঞ্চিগুলো বেশ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

ওখানে? শহরে এখনও ভাল রেস্তরাঁ হয়নি? নির্মাল্য অপছন্দ জানাল।

হয়েছে। তবে এখানেই বেস্ট চা পাওয়া যায়। তুই স্কুলে পড়ার সময় এই দোকানে কখনও চা খাসনি? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল নির্মাল্য, তখন তো বাড়ির বাইরে গিয়ে খাওয়ার প্রয়োজন হত না।

ওরা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসল। নির্মাল্য বলল, এখন যারা আমাকে চেনে, তাদের কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি যে এমন পোড়ো চায়ের দোকানে বসে আছি, তা ভাবতেও পারবে না। তা তুই জলপাইগুড়িতেই পড়ে থাকলি?

হ্যাঁ। তুই? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

দিল্লিতে।

সরকারি কাজে এসেছিস বললি, কোন ডিপার্টমেন্ট?

নির্মাল্য তাকাল, শুনে কী করবি? ছেড়ে দে।

চা এসে গেল। নির্মাল্য নিজেকে রহস্যের আড়ালে রাখতে চাইছে বুঝতে পেরে অর্জুন আর প্রশ্ন করল না। চায়ে চুমুক দিয়ে নির্মাল্য বলল, বাঃ। গুড। তুই ঠিক বলেছিস।

তুই কদমতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে কী করছিলি?

কিছু না। সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আজকের মতো কাজ শেষ করে গাড়িটা ছেড়ে দিলাম। ভাবলাম, পুরনো শহরটাকে নতুন করে দেখি। তোর রোজগার কেমন হয়?

চলে যায়।

তুই দিল্লিতে চলে আয়। প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ওখানে খুব ডিমান্ড।

আবার ভুল করলি। আমি ডিটেকটিভ নই।

আরে ওই হল। সত্যিটা কী, তা জানতে তোকে লাখ লাখ টাকা দেবে।

কদ্দিন আছিস এখানে?

কাল বিকেলের ফ্লাইট ধরব বাগডোগরা থেকে।

চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে অর্জুন বলল, অনেক দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল। কিছু মনে করিস না, এখন আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।

সন্ধের পরে চলে আয় না তিস্তা ভবনে। গল্প করা যাবে।

ঠিক আছে। মনে হচ্ছে, যেতে পারব।

নির্মাল্যকে ফুটপাতে ছেড়ে বাইকে ওঠার পর অর্জুনের মনে হল, এটাই তো স্বাভাবিক। স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন যা স্বাভাবিক, তা পরবর্তী জীবনে পালটে যাবেই। চাকরির সুবাদে যে-জীবন নির্মাল্য পেয়েছে, তার সঙ্গে ছাত্রজীবনের কোনও মিল নেই। নিশ্চয়ই খুব উঁচু পদে আছে ও। স্টেটাস, টাকাপয়সা ইত্যাদির মাপকাঠিতে জীবনকে মাপা ওর অভ্যেসে এসে গিয়েছে। সকলেই তো আর জগুদা নয়।

শিল্পসমিতি পাড়ার যে-রাস্তায় সে বাইক থেকে নামল, সেটি বেশ ছিমছাম, দু'পাশে গাছগাছালি। বড় বড় বাড়িগুলো আরও চুপচাপ। পাড়াটা যে অভিজাতদের জন্য, তা বলার দরকার হয় না।

গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল অর্জুন। লম্বা-লম্বা ঝাউগাছ সুন্দর করে সাজানো। দু'পা এগোতেই কুকুরের চিৎকার ভেসে এল। একটা নয়, অনেক কুকুর দোতলার গ্রিল দেওয়া বারান্দা থেকে তাকে দেখে চিৎকার করছে। যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো না করা পর্যন্ত শান্ত হবে না ওরা। অর্জুন। গুনল। চারটে বিরাট চেহারার অ্যালসেশিয়ান বলে মনে হল। কুকুর চারটে একবার গ্রিলের কাছে ছুটে আসছে, আবার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। বোধহয় নামতে চাইছে ওরা। দরজা বন্ধ থাকায় পারছে না।

এই সময় একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ বাড়ির একতলা থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, বলুন!

শুভেন্দুশেখরবাবু তো এ-বাড়িতে থাকেন?

হ্যাঁ।

উনি আমাকে টেলিফোনে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতে বলেছিলেন।

আপনার নাম?

অর্জুন।

নাম শুনেই বোধহয় লোকটা একটু অবাক হয়ে তাকাল। তারপর ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে চলে গেল। কুকুর চারটে তখনও সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। অর্জুন চারপাশে ঘুরে দেখল। পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। পাঁচিলগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উঁচু। তার উপর কাঁচের টুকরো বসানো। এই ব্যবস্থা শহরের প্রাচীন বাড়িগুলোতে থাকত। এখনও কয়েকটিতে রয়েছে।

লোকটি বেরিয়ে এসে বলল, আসুন।

ভিতরে পা রেখেই অর্জুন বুঝতে পারল, পরিবারটি বনেদি। দেওয়ালে লম্বা লম্বা ছবি ফ্রেমে বাঁধানো। আসবাবও প্রাচীন, একফোঁটা ময়লা কোথাও পড়ে নেই।

উপরে যেতে হবে। লোকটি জানাল।

কুকুরগুলো...!

ওরা বারান্দায়। দরজা আটকানো রয়েছে।

দোতলায় উঠে এল। শ্বেতপাথরের মেঝে, মোটা দেওয়ালের বাড়ি। একটা হলঘরে অর্জুনকে নিয়ে গিয়ে বসতে বলে ভিতরে চলে গেল লোকটা। অর্জুন সোফায় বসল। দেওয়ালে যামিনী রায়, নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি টাঙানো। অর্জুন উলটে খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে চাইল, ওগুলো অরিজিনাল না রি-প্রিন্ট।

ছবির ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে নাকি?

গলাটা ভেসে আসতেই পিছন ফিরে তাকাল অর্জুন। ধবধবে সাদা চুল, সোনার মতো গায়ের রং, ঘি-রঙা সিল্কের পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা পরা শুভেন্দুশেখর এগিয়ে এলেন হুইলচেয়ার চালিয়ে।

না, তেমন কিছু নয়। নমস্কার।

নমস্কার। এ বাড়িতে যা কিছু আছে, তা অরিজিনাল। তা হলে তুমিই অর্জুন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বোসো। অর্জুন বসলে ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, আমাকে বলা হয়েছিল, তোমার বয়স অল্প। তার মানে তুমি যে নিতান্ত তরুণ, তা ভাবিনি।

সম্ভবত, আঠারো বছরের পর আর তরুণ বলা যায় না। সেই অর্থে আমি অনেক দিন যুবক হয়ে গিয়েছি। অর্জুন বলল।

আমার বয়স কত মনে হচ্ছে?

অর্জুন তাকাল। ভদ্রলোকের চুল সাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভুরু কালোই রয়েছে। গলার চামড়ায় ঈষৎ কুঞ্চন। অর্জুন বলল, সত্তরের আশপাশে।

নো। আই অ্যাম এইট্টি ওয়ান। কার অ্যাকসিডেন্টে এই পা দুটো অকেজো হয়ে গিয়েছে আঠারো বছর। আমার তখন তেষট্টি বছর বয়স। কিন্তু ইয়ংম্যান, যে সামনাসামনি দেখে আমার বয়স বলতে পারল না, তার উপর আস্থা রাখব কী করে? শুভেন্দুশেখর চোখ নাচালেন।

অর্জুন হাসল, আপনি যা ভাববেন, তাই করবেন। আমার তরফ থেকে একটা কথা বলতে পারি। আপনি যদি নর্মাল মানুষের মতো হাঁটাচলা করতেন, রোদ-বৃষ্টিতে বাইরে বেরোতেন, তা হলে তার প্রতিক্রিয়া আপনার শরীরে ফুটে উঠত। বয়স বুঝতে অসুবিধে হত না। যেহেতু আপনি দুর্ঘটনার জন্য ওই চেয়ারে বসে এঘর-ওঘর করেন, রোদে-বৃষ্টিতে বেরোবার প্রশ্ন নেই, তাই আপনার মুখে, চামড়ায় তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। বরং সাধারণের চেয়ে আপনার কাধ অনেক বেশি বড় এবং মজবুত। অর্থাৎ পায়ের বদলে আপনাকে হাত ব্যবহার করতে হয়। নিশ্চয়ই প্রয়োজনে ক্রাচ ব্যবহার করেন। আশি বছরেও একটিও চুল পাকেনি এমন মানুষ আমি দেখেছি। কিন্তু আপনার চুল সাদা অথচ, ভুরু কঁচা। যদি একাশি বছর সত্যি হয়, তা হলে আপনি শুধু ভুরুতে ডাই করেছেন। বুঝতেই পারছেন, আমাকে বিভ্রান্ত কেন হতে হয়েছে!

শুভেন্দুশেখর হাসলেন, এবার বুঝলাম, বিষ্ণুচরণবাবু কেন তোমার নাম রেকমেন্ড করেছেন। প্রথমে একটু পান করা যাক। কফি না চা?

চা। তবে দুধ এবং চিনি বাদ দিয়ে। অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল। চায়ের দোকানের চা দুধ-চিনি ছাড়া খাওয়া যায় না। স্বাদ ভাল হলে লিকারের গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু শুভেন্দুশেখরবাবুর এই বাড়িতে অবশ্যই দামি চা ব্যবহার করা হয়। অতএব তার সুগন্ধ দুধ-চিনিতে নষ্ট করতে সে ইচ্ছুক নয়। বেল টিপলেন শুভেন্দুশেখর।

আপনি নিউ ইয়র্কে থাকেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

না। নিউ ইয়র্কের বাইরে। অতলান্তিকের গায়ে।

সেই লোকটি এলে শুভেন্দুশেখর চায়ের হুকুম দিলেন। লোকটি চলে গেল।

কতদিন আছেন ওখানে?

একচল্লিশ বছর। অবশ্য শীতের সময় তিন সপ্তাহের জন্য এখানে এসে থাকি। এবার চার সপ্তাহের জন্যে এসেছি জলপাইগুড়িতে। শুভেন্দুশেখর বললেন, গরম একদম সহ্য করতে পারি না আমি।

এখানে কে থাকেন?

কেউ না। আমার স্ত্রী গত হয়েছেন দশ বছর আগে। যে-লোকটি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সে-ই দেখাশোনা করে বাড়িটা। প্রত্যেক বারই ভাবি, বিক্রি করে পাট চুকিয়ে দিয়ে চলে যাব। কিন্তু... চুপ করে গেলেন শুভেন্দুশেখর।

আপনি আমাকে কী কারণে ডেকেছেন?

ওয়েল অর্জুন, যে-কারণে ডেকেছি, সেটা বলার আগে একটা ভূমিকা করা দরকার। আমার একটিমাত্র ছেলে। তার নাম নভেন্দু। সে যখন আমার সঙ্গে আমেরিকায় যায়, তখন তার বয়স পাঁচ। আমার বিয়ের দশ বছর পরে সে জন্মেছিল। ছাত্রাবস্থায় ওর মতো বুদ্ধিমান ছেলের বাবা বলে স্কুল থেকে আমাকে কনগ্রাচুলেট করত। খুব দ্রুত নভেন্দু মেন স্ট্রিমের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আমেরিকান ইংরেজি যেভাবে বলত, তা শুনে সতেরো বছর বয়সেই গাদা গাদা বান্ধবী জুটে গেল তার। উনিশে পা দিতে না-দিতে বিয়ে করে ফেলল সে। মেয়েটি স্প্যানিশ। ভাঙা ইংরেজি বলে। ছেলে ইতিমধ্যে স্প্যানিশ শিখে ফেলেছে। আমার স্ত্রী এই বিয়ে মেনে নিতে পারেননি। আমার আপত্তির কারণ ছিল একটাই, স্বাবলম্বী না হয়ে বিয়ে করা। মেয়েটিকে আমার খারাপ লাগেনি। কিন্তু আমাদের আপত্তি শোনার পাত্র ও ছিল না। বিয়ের পর বউকে নিয়ে চলে এল বাড়িতে। প্রতিদিন আমার কাছে ডলার চাইত। দিতে না চাইলে বউকে পাঠাত। প্রথম প্রথম দিতাম। তারপর শুনলাম, ও পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। বউয়ের সঙ্গে ঝামেলা শুরু করেছে। বললাম, আমার বাড়িতে বসে ওসব করা চলবে না। শুনে বউকে ফেলে রেখে উধাও হয়ে গেল। ওদেশের মেয়েরা একা-একা শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থাকে না। মেয়েটিও চলে গেল একদিন। একটানা বলে থামলেন শুভেন্দুশেখর।

তারপর?

পাঁচ বছর ওর খবর পাইনি। এক রাত্রে ফিরে এল অসুস্থ হয়ে। বেশ জ্বর। ওর মা ওকে হাসপাতালে ভরতি করিয়ে এল। দিনদশেক পরে যখন সুস্থ হয়ে বাড়ি এল, তখন জানতে পারলাম, ওদের বিয়ে ভেঙে গিয়েছে। মাসখানেক সে বাড়ির বাইরে বের হয়নি। বাংলায় কথা বলা ভুলে গিয়েছিল। ডাল-ভাত খেতে তীব্র আপত্তি করত। আমেরিকান খাবার করতে হত ওর জন্য। ওর হাত থেকে বাঁচার জন্য ওকে নিয়ে জলপাইগুড়িতে এসেছিলাম বছর এগারো আগে।

তাই?

এখানে আসার পর বাড়ি থেকে বেরোত না। টিভির সামনে চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকত। হঠাৎ একদিন ফোন এল ওর। বলল, কয়েক দিনের জন্য বাংলাদেশ থেকে ঘুরে আসবে। ওর কোনও বন্ধু সেদেশে

থাকে। তার নিমন্ত্রণে যাবে। আমি আপত্তি করিনি। এখানে আসার পর সে যে সংযত আচরণ করেছিল, তাতে এটুকু বিলাসভ্রমণ তার পাওনা ছিল।

হঠাৎ খেয়াল হতে হুইলচেয়ারে লাগানো বোতাম টিপলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে বেল বাজল। সম্ভবত রিমোটে এই কাণ্ড হল। বেল বাজামাত্র লোকটি ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। তাতে চায়ের পট, কাপ, ডিশ, দুধ-চিনি আর প্লেটে বিস্কুট সাজানো।

হুইলচেয়ারে বসে পরিবেশন করলেন শুভেন্দুশেখর। চায়ে চুমুক দিল অর্জুন। অপূর্ব! স্বাদ এবং গন্ধ বলে দিচ্ছে খুব দামি চা। বলল, আপনি মকাইবাড়ির চা খান?

হ্যাঁ। বহুকালের অভ্যেস। আমেরিকাতেও এই চা ব্যবহার করি।

যে-কথা বলছিলেন...!

আমার সমস্যা হল নভেন্দু। সে এখন আমার সঙ্গে থাকে না। যেহেতু আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কম নয়, তাই আমার মৃত্যু কবে হবে, সেই অপেক্ষায় সে আছে। মনে হয়, বেশি দিন ধৈর্য সে ধরতে পারবে না। তার অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?

তারপর?

সেই ছেলে এখন এখানে।

এখানে?

না। এই বাড়িতে নয়। উত্তরবঙ্গ আর বাংলাদেশের মধ্যে ওর যাতায়াত। মাঝে মাঝে আমেরিকায় যায়। কিছুদিন আগে একটি মেয়ে আমাকে ফোন করে ওর কথা জিজ্ঞেস করে। তার নাকি খুব দরকার নভেন্দুকে। মেয়েটি নিউ ইয়র্কে থাকে। আমার কৌতূহল হল। তাকে দেখা করতে বললাম। নিজেই গাড়ি চালিয়ে এল মেয়েটি। ইংরেজিতে কথা বলছিল। বেশ সুন্দরী, বছর আঠাশের মধ্যে বয়স। মেয়েটির নাম নিমা। পাকিস্তানি। বলল, নভেন্দুর কাছে ওর এক লক্ষ ডলার আছে, কিন্তু সে গা-ঢাকা দিয়েছে। এত টাকা কেন নভেন্দুর কাছে সে পাবে, এই প্রশ্নের জবাব কিছুতেই দিতে চাইল না। কিছুদিন আগে অতলান্তিক সিটিতে একটি বাংলাদেশি যুবক খুন হয়। পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে, ছেলেটির কোনও বৈধ কাগজপত্র ছিল না। ভিসা তো দূরের কথা, পাসপোর্টই ছিল না। একটা বাংলাদেশি রেস্তরাঁয় বেআইনিভাবে কাজ করত। ওর কাগজপত্র নেই বলে, রেস্তরাঁর মালিক নামমাত্র টাকা দিত। নিমা যাওয়ার আগে জানিয়ে গেল, ওই খুনের সঙ্গে নভেন্দু যে জড়িত, তার প্রমাণ সে দিতে পারে। এক মাসের মধ্যে টাকা না পেলে সে পুলিশের কাছে যাবে। আমি যদি ছেলেকে বাঁচাতে চাই, তা হলে যেন তাকে ফোন করি। একটা কার্ডও রেখে গিয়েছে সে। চুপ করলেন শুভেন্দুশেখর। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলেন কিছু।

আপনি টাকাটা দিয়েছেন?

নো। কেন দেব? কেউ এসে ভয় দেখাল আর অমনি দিয়ে দেব? কোনও ভাল কাজে নয়, আমার বখে যাওয়া ছেলেকে বাঁচাতে আমি টাকা খরচ করব? কিন্তু আমি ভয় পেলাম। আমাকে খুন করলে ও কয়েক লক্ষ ডলারের মালিক হয়ে যাবে। সুযোগটা ও হাতছাড়া যে করবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? এই ছেলে সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই। গতকাল নিমাকে ফোন করে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি। নিমা অনুরোধ করল, এখানে তাকে কিছুদিন থাকতে দিতে পারি কিনা। কারণ, সে খবর পেয়েছে নভেন্দু এই প্রান্তের বর্ডারে কিছুদিন ধরে আছে।

এই প্রান্তের বর্ডার মানে? ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার?

হ্যাঁ। শুভেন্দুশেখর মাথা নাড়লেন, নিমা জিজ্ঞেস করছিল, বেরুবাড়ি নামে কোনও জায়গা এদিকে আছে কিনা। অর্থাৎ শয়তানটাকে বেরুবাড়িতেও দেখা গিয়েছে।

চা শেষ করল অর্জুন, আমাকে আপনি কী করতে বলছেন?

আমি আমার ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাই। কিন্তু আমি চাইলেই যে সে তা মেনে নেবে, তার কোনও লক্ষণ দেখছি না। তা হলে নিমা আমার কাছে আসত না। আমি মরে গেলে সে যাতে বিষয়-সম্পত্তি না পায়, তার ব্যবস্থা আমি করেছি। কিন্তু আমি চাই ও এখন কী করছে, তা জানতে। শুভেন্দুশেখর তাকালেন।

যার সম্পর্কে আপনি এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার সম্পর্কে জানতে চাইছেন কেন?

কারণ, আমার সন্দেহ, সে কোনও ভয়ংকর অন্যায় কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয়, তা হলে ওর শাস্তি পাওয়া উচিত। শুভেন্দুশেখর বললেন, তোমাকে সত্যটা সন্ধান করতে হবে। বিষ্ণুচরণবাবু আমার ঘনিষ্ঠ মানুষ, এসব কথা উনি জানেন। আমি এখানে আসছি জেনে বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে। এত কম বয়সের সত্যসন্ধানীর উপর ওঁর যখন গভীর আস্থা আছে, তখন আমি আর কোনও প্রশ্ন তুলছি না। এখন বলল, দায়িত্বটা নেবে?

আমাকে একটু ভাবতে দিন।

দ্যাখো, আমি আর বড়জোর কুড়ি দিন এখানে থাকতে পারি। এর মধ্যে যদি কাজটা শেষ করতে পারো, তা হলে খুশি হব। তোমার রেমুনারেশন কত?

অর্জুন হাসল, ওসব নিয়ে পরে কথা হবে।

না হে। আমি প্রোফেশনাল লোকের সঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করি।

বেশ। ভেবে দেখি। যদি মনে হয় করব, তা হলে আপনাকে জানাব। আর হ্যাঁ, নভেন্দুবাবুর একটা ফোটো পেতে পারি?

অবশ্যই। একটু বোসো, আমি আসছি। হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে ওপাশের ঘরে চলে গেলেন শুভেন্দুশেখর।

লোকটি অর্জুনকে আকর্ষণ করছেন। এই বাড়ি দেখেই বোঝা যায়, ইনি বেশ ধনী। তার উপর আমেরিকায় বাড়ি। প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও যাওয়া আসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র পুত্রের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাইছেন না। তাকে তো বঞ্চিত করবেনই, উলটে শাস্তি দিতে চাইছেন। কিন্তু আমেরিকায় বাংলাদেশি খুনের প্রসঙ্গ ছাড়া, ওর করা এমন কোনও অন্যায়ের কথা জানা নেই, যার জন্য ভারতবর্ষে নভেন্দুবাবুর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া যায়। তা ছাড়া বাংলাদেশের মানুষকে খুনের কথাও তো স্পষ্ট নয়। হ্যাঁ, টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করার ব্যাপারটা পুলিশকে বলা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে নিমা নামের মেয়েটিকে এখানে এসে অভিযোগ জানাতে হবে।

শুভেন্দুশেখর ফিরে এলেন, আই অ্যাম সরি অর্জুন। ওর এখনকার কোনও ফোটো এখানে নেই। ইনফ্যাক্ট এখন ও যা করছে, তাতে ফোটো তুলে বাড়িতে রাখার তো কোনও মানে হয় না। ওর যখন বছর পনেরো বয়স, তখন একটা গ্রুপ ফোটো ভোলা হয়েছিল। দ্যাখো, এটা থেকে যদি ওকে আন্দাজ করতে পারো।

ফোটোটি দেখল অর্জুন। শুভেন্দুশেখর তো সুপুরুষ, ওঁর স্ত্রীও যথেষ্ট সুন্দরী। ওঁদের মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠোঁটের পাশে কোয়ার্টার ইঞ্চি কাটা দাগ। সেটা দেখাল অর্জুন, এটা কি এখনও আছে?

ফোটোটা দেখলেন শুভেন্দুশেখর, হ্যাঁ, ও দাগ জন্মেও যাওয়ার নয়। স্কুলে মারপিট করে মুখ ফাটিয়েছিল। সেলাই করতে হয়েছিল। বলেছিল, প্লাস্টিক সার্জারি করলে দাগ মিলিয়ে যেত। কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই করাইনি। চিহ্নটা রেখে দিয়েছিলাম।

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, ফোটোটা পকেটে রাখল। বলল, সমস্যা হল, নভেন্দুবাবুকে কোথায় পাওয়া যাবে, তার কোনও নির্দিষ্ট জায়গার কথা বলতে পারছেন না!

আমি জানলে তবে তো জানাব।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত তো বেশ দীর্ঘ। আচ্ছা, আপনাকে কাল সকালে আমি ফোন করব। নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এল অর্জুন!

.

সোজা শহরের দিকে না গিয়ে মাষকলাইবাড়ির শ্মশানের পাশ দিয়ে হাইওয়েতেচলে এল অর্জুন। জায়গাটা খুব ফাঁকা, বাইক চালাতে ভাল লাগে। ধরধরা নদী পেরিয়ে একটা সাঁকোর কাছে বাইক

থামাতে দেখতে পেল, অগুনতি বক আকাশে উড়ে যাচ্ছে একটা ছবি আঁকতে আঁকতে। দেখলে মনে হয়, বকগুলো খুব ভাল ট্রেনিং নিয়েছে এরকমভাবে ওড়ার জন্য।

সন্ধে নামছে। পৃথিবীটা এখন মায়াবী ছায়ার চাদরে মোড়া। নভেন্দুর ফোটোটা বের করল অর্জুন। এই ফোটো তোলার সময় বাবার সঙ্গে ছেলের যে সম্পর্ক ছিল, এখন সেটা মৃত। বিশ্বাস চলে গেলে সম্পর্ক মরে যায়।

কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নভেন্দু কী করছে? ব্যাবসা? ওর সম্পর্কে যা শোনা গেল, তা সত্যি হলে নভেন্দুর মতো মানুষ পৃথিবীর এত জায়গা ছেড়ে এরকম জায়গায় সুস্থ ব্যাবসা করতে আসবে বলে বিশ্বাস করা যায় না। কী ব্যাবসা করবে সে? আমদানি-রপ্তানি? সে তো নিশ্চয়ই আমেরিকার নাগরিক। এখানে এই ধরনের ব্যাবসা করতে গেলে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স পাওয়া অত্যাবশ্যক ব্যাপার। সেটা সে পেতে পারে না। নিশ্চয়ই চাকরি বা সমাজসেবার কাজে সে এখানে বসে নেই! তা হলে একটাই পথ তার কাছে ভোলা, সেটা অসৎ ব্যাবসা। কী সেটা? এদিকে নেপাল বা বাংলাদেশ থেকে চোরা পথে বিদেশি জিনিস আনার কারবার অনেকেই করে। সরকারকে শুল্ক না দিয়ে সেগুলো বিক্রি করে মোটা টাকা লাভ করছে বছরের পর বছর। তেমন কিছু?

রাজবাড়ির পাড়ার কানা দুলাল ওই ব্যাবসা করত। প্রথমে সিনেমা হলে টিকিট ব্ল্যাক করা, তারপরে মালগাড়ি থেকে জিনিস হাওয়া করা এবং পরে সেটা করতে গিয়ে ট্রেন থেকে পড়ে পাথর ঢুকে একটা চোখ অন্ধ হয়ে যায়। জেল-হাসপাতাল হয়ে ফিরে আসে মাস ছয়েক পরে। তখন থেকে তার নাম হয়ে যায়, কানা দুলাল। সবসময় গগলস পরে থাকে সে। ওই জেলেই এমন একজনের সঙ্গে তার আলাপ হয়, যে তাকে বিদেশি জিনিস বেআইনি পথে এনে বিক্রির পরামর্শ দেয়। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বড়লোক হতে আরম্ভ করে কানা দুলাল। চোরা পথে বাংলাদেশে যাওয়া তার কাছে জল-ভাত ছিল। কিন্তু বিধি বাম হলে সে কী করতে পারে? একই সঙ্গে ব্লাডপ্রেশার, ব্লাডসুগার তাকে এমন কাহিল করে ফেলল যে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলল। এসব কাহিনির একটু আধটু জলপাইগুড়ির বাতাসে এককালে ভাসত।

বাইক চালিয়ে কানা দুলালের বাড়িতে পৌঁছে গেল অর্জুন। টাকা হলেও লোকের মুখে নামটা বদলায়নি। বারান্দায় বসে ছিল সে। হাড় জিরজিরে শরীর, দাড়ি না কামানো মুখে সাদা ছোপ। বাইক থেকে নামতে দেখেই। চিনতে পেরেছিল কানা দুলাল। এই সন্ধেবেলায় তার চোখে গগলস নেই। ক্রাচ হাতড়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি?

অর্জুন হাসল, এখন কেমন আছেন?

আর থাকা! চিতার দিকে পা বাড়িয়ে আছি, অথচ ভগবান টানছে না। এ যে কী যন্ত্রণা, তা আমিই জানি। কিন্তু আপনি হঠাৎ আমার এখানে? না-না। ওসব ধান্দা আমি অনেক আগে ছেড়ে দিয়েছি। এখন কয়েক পা হাঁটলেই দম বন্ধ হয়ে যায়। ওসব অতীত। আপনি ভুল খবর পেয়ে এসেছেন!

আমি কোনও খবর পেয়ে আপনার কাছে আসিনি। অর্জুন বলল।

তা হলে? একটু অবাক হল কানা দুলাল।

আপনার কাছে একটু সাহায্য চাইছি।

আমি? সাহায্য করব? হাসল কানা দুলাল, আমার সেই ক্ষমতা কোথায়?

আমি শুনেছি, আপনি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ভাল চেনেন। নিশ্চয়ই চোরা পথে অনেকবার বাংলাদেশে গিয়েছেন। তাই তো?

ওসব কথা এখন বলে কেন লজ্জায় ফেলছেন! ওসব অতীত। আমি আর মনে করতে চাই না। এখন সারাক্ষণ ভগবানকে ডাকি…

নিশ্চয়ই ডাকবেন। আপনার অন্যায় কাজের জন্য ভগবান আপনাকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছেন। বিচার করে জজসাহেব জেলে পাঠালে এত বড় শাস্তি হত না। কিন্তু এই অসুস্থ শরীরে যদি মানুষের উপকার করেন, তা হলে অনেক বেশি শান্তি পাবেন আপনি। অর্জুন বলল।

দৃষ্টিহীন চোখ নড়ল না। অন্যটি একটু সংকুচিত হল, বুঝলাম না!

আচ্ছা বলুন তো, বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে লাইসেন্স ছাড়াই কী কী ব্যাবসা চলে?

কী না চলে! কাপড়চোপড় থেকে সিগারেট, মদ, যন্ত্রপাতি, টর্চ, ব্যাটারি, সব।

কীরকম লাভ হয়?

আগে ভাল হত। এখন সরকারি নীতি বদলে যাওয়ায়, একমাত্র মোবাইল সেটে ভাল লাভ পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় নজরানা দিতে দিতে লাভ কমে যায়। অনেক হাত ঘোরে তো! কানা দুলাল বলল।

অর্জুন ভাবল, নভেন্দু এই ধরনের ব্যাবসা করার জন্য এখানে পড়ে থাকবে কেন? সে জিজ্ঞেস করল, বিদেশিরা এই ব্যাবসা করে?

তারা এসব পুঁটিমাছ ধরবে কেন? মাথা নাড়ল কানা দুলাল, তারা আরও বড় মাছ জালে তোলে!

কীরকম?

পাচার।

পাচার? কী পাচার করে?

মানুষ। পুরুষ মানুষ। দু'চোখ বন্ধ করল কানা দুলাল।

কীরকম? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ধরুন, আপনি কোনও দেশে যেতে চান। আপনার কাজ চাই। সেই দেশে কাজের লোক কম পাওয়া যায়। গেলেই চাকরি। কিন্তু আপনাকে সেই দেশের সরকার ঢোকার অনুমতি দিচ্ছে না। অতএব বেআইনি পথে আপনি সেই দেশে ঢুকবেন। এই ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করার জন্য রাঘববোয়ালরা বসে আছে। তারা আপনার কাছে মোটা টাকা নিয়ে ঠিক পৌঁছে দেবে। ওসব ক্ষমতা আমাদের ছিল না। কানা দুলাল বলল।

এতক্ষণে ছবিটা পরিষ্কার হল অর্জুনের কাছে। সে শুনেছে, বিদেশে বাংলাদেশের মানুষেরা প্রচুর পরিমাণে যান চাকরি করতে। গিয়ে টাকা পাঠান। নভেন্দু কি মানুষ পাচারের ব্যবসায় নেমেছে?

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আমাদের এখানে কেউ কি এই ব্যাবসা করেন?

এখন করে কিনা জানি না, তবে শিলিগুড়ির হরিরাম ঝুনঝুনওয়ালার নাম শুনেছি।

শিলিগুড়ির কোথায় থাকেন ভদ্রলোক?

টাউন স্টেশনের সামনে ওর বাড়ি। সবাই চেনে। খুব বড়লোক।

ঠিক আছে। অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল।

কানা দুলাল জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ওর কাছে যাবেন?

আপনার আপত্তি আছে?

না। কিন্তু দয়া করে আমার নাম করবেন না। দু'হাত জোড় করল কানা দুলাল।

কেন?

আমি অপঘাতে মরতে চাই না। ভগবান অসুখে ভুগিয়ে নিয়ে যাবেন, ঠিক আছে। কিন্তু ঝুনঝুনওয়ালার লোক আমাকে গুলি করে মারুক, তা চাই না। গলার স্বর করুণ হয়ে গেল কানা দুলালের।

ঠিক আছে। আপনার নাম আমি বলব না। অর্জুন প্রতিশ্রুতি দিল।

.

শিলিগুড়ির টাউন স্টেশনের এখন তেমন গুরুত্ব নেই। এককালে যখন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন দূরের কথা, শিলিগুড়ির জংশন স্টেশনই তৈরি হয়নি, তখন এখান থেকেই দূরপাল্লার ট্রেন ছাড়ত। স্বাধীনতার আগে থেকেই এখনকার বাংলাদেশ হয়ে ট্রেন যেত শিয়ালদহে, এই স্টেশন ছেড়ে। এখন প্রায় পোড়ো বাড়ির মতো অবস্থা স্টেশনটার।

পরদিন সকালে হরিরাম ঝুনঝুনওয়ালার বাড়ি যাচ্ছিল অর্জুন। বাইক থেকে নেমে একটা পানের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতেই ঝুনঝুনওয়ালার বাড়িটার হদিশ পেল অর্জুন। তিনতলা বিশাল বাড়ি, কিন্তু কোনও ছিরিছাঁদ নেই। বাড়ির একতলার দরজা খোলা। সেখানে পৌঁছোতেই একটা কাজের লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

হরিরামবাবু আছেন?

কোত্থেকে আসছেন?

জলপাইগুড়ি থেকে। আমার নাম অর্জুন।

বাবু এখন ঘুমোচ্ছেন।

ঘড়ি দেখল অর্জুন। সকাল নটা দশ। সে ঠিক এক ঘন্টা আগে জলপাইগুড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কোনও ব্যাবসাদার এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়?

আমার যে ওঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

তা হলে অপেক্ষা করুন। লোকটা ভিতরে চলে গেল।

অর্জুন বুঝল, লোকটা ভদ্রতার ধার ধারে না। সাধারণত এক্ষেত্রে তাকে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে বলাই ভদ্রতা। সে রাস্তার দিকে তাকাল। প্রচুর রিকশা যাচ্ছে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি শহরের ভিতরে যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা হল এটা। ধুলো উড়ছে। এই সময় দুটো মোটরবাইক এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। চারজন ছেলে নেমে এসে বাড়িতে ঢোকার সময় অর্জুনকে দেখল। একজন জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

হরিরামবাবুর সঙ্গে দেখা করব। উনি ঘুমোচ্ছেন, তাই দাঁড়িয়ে আছি।

ও। কী দরকার আমাকে বলুন, আমি, ওঁর ছেলে।

নমস্কার। ওঁর সঙ্গেই কথা বলতে চাই।

দেখুন মশাই, চাকরির ধান্দা থাকলে ফুটে যান।

অর্জুন হাসল, না। চাকরি চাই না।

কোত্থেকে আসছেন?

জলপাইগুড়ি থেকে।

ছেলেগুলো ভিতরে চলে গেল। চালচলন এবং মুখের ভাবভঙ্গি বলে দিচ্ছে, আর যাই হোক, নম্রতা বলে কোনও কিছুর সঙ্গে ওদের পরিচয় নেই।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে কাজের লোক অর্জুনকে ডেকে নিয়ে গেল যে ঘরে, সেখানে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে পান চিবোচ্ছেন। বেশ রোগা, মুখে বসন্তের দাগ স্পষ্ট। অর্জুন ঘরে ঢুকে বলল, নমস্কার।

নমস্কার। কী দরকার?

আপনি হরিরামবাবু?

পাবলিক তাই বলে।

আমি আপনার সঙ্গে একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই।

হরিরামবাবু তাকালেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, বসুন। তাড়াতাড়ি বলুন, আমার টাইম খুব কম। আপনার নাম?

অর্জুন।

কী করেন?

সত্যসন্ধান।

তার মানে?

আমি সত্যের সন্ধান করতে চাই। এটা করে আসছি বেশ কয়েক বছর। জলপাইগুড়ির মানুষ আমাকে চেনে।

অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র হরিরামবাবু পকেট থেকে মোবাইল বের করে নম্বর টিপলেন, হিন্দি ভাষায় কথা শুরু করলেন। নিজের নামটা শুনে অর্জুন বুঝল, তাকে নিয়েই কথা বলছেন ভদ্রলোক। যদিও অন্য কিছু শব্দ একেবারে অচেনা মনে হচ্ছিল না। মোবাইল বন্ধ করে হরিরামবাবু বললেন আরে, বসুন, বসুন। আপনি তো বিখ্যাত মানুষ। একবার নাম বলতেই আমার ভাই কিষেনচাঁদ চিনে ফেলল। দিনবাজারে ওর গদি। চেনেন?

মাথা নেড়ে না বলল অর্জুন।

দেখুন, আপনাকে কিন্তু ও চেনে! ভদ্রলোকের কথাবার্তার ধরনই বদলে গেল, বসুন অর্জুনবাবু, রোজ এত ফালতু লোক এসে বিরক্ত করে যে, খারাপ ব্যবহার না করে পারি না। বলুন, কী করতে পারি?

অর্জুন বসল। লোকটি অত্যন্ত ঘাঘু। খুব সাবধানে কথা বলতে হবে এঁর সঙ্গে। টেবিলের উপর একটা লম্বাটে কৌটোর দিকে তার নজর গেল। হরিরামবাবু বললেন, এ জিনিস নিশ্চয়ই দেখেছেন। কৌটো তুলে ঢাকনা খুলতেই মিষ্টি বাজনা বাজতে লাগল। হরিরামবাবু বললেন, খেলনা।

কোথাকার তৈরি?

চায়না। আরে এখন এখানে চিন-ভারত এক হয়ে গিয়েছে। নেপাল ভুটান-বাংলাদেশ হয়ে ঢুকে পড়ছে নর্থ বেঙ্গলে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

একটু-আধটু। আপনাদের মতো অনেক ব্যবসায়ী টাকা ঢেলেছেন ওই ব্যবসায়। প্রচুর লাভ করেছেন। অর্জুন হাসল।

তা আপনাকে মিথ্যে বলব না, করেছি। অনেক আগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এত লোক নেমে পড়ল লাইনে যে, টানা মাল বিক্রি করাই সমস্যা হয়ে গেল। তো আমি হাত তুলে নিলাম। একথা লোকাল পুলিশও জানে।

যখন ব্যাবসাটা করতেন, তখন ওরা স্টেপ নেয়নি?

হরিরামবাবু হাসলেন, নিলে কি আপনার সামনে বসে থাকতে পারতাম? এই যে আমি এসব গল্প আপনাকে করছি, কেন করছি জানেন?

অর্জুন মাথা নাড়ল।

আমি একজন দেশপ্রেমিক, তাই। আমি অন্যায় ব্যবসায় টাকা বানিয়েছি ঠিক, কিন্তু দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। পুলিশ স্বীকার করে, আমি খবরটা না দিলে ওরা জানতেও পারত না। আরে বলুন, কোন ব্যবসায় একটু আধটু অন্যায় মেশানো থাকে না? একদম ন্যায়ের পথে ব্যাবসা করলে আজকের দিনে বউয়ের শাড়িও কিনে দিতে পারবেন না। :

পুলিশের কথা কী বলছিলেন?

মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আপনি ঠিক মনে রেখে দিয়েছেন। ছাড়ুন ওসব কথা। হরিরামবাবু বলমাত্র সেই ছেলেটি ঘরে ঢুকল, বাবুজি।

হ্যাঁ! হরিরামবাবু তাকালেন।

আজ এক লাখ জমা দিতে হবে।

কত পিস আছে?

দশ হাজারের মতো।

হুঁ। পঞ্চাশ হাজার লস করিয়ে দিলি। শুনলাম, চল্লিশ হায়েস্ট বিড হয়েছিল। তোদের কোনও দরকার ছিল না এক লাফে এক লাখ বলার।

পঞ্চাশ বললে ওরা পঞ্চান্ন বলত। এক লাখ বলায় ওরা চেপে গেল। মনে হচ্ছে, ওরা সন্দেহ করেছিল, কিন্তু সাহস পায়নি। ছেলে বলল।

ঠিক আছে, আধঘণ্টা পরে এসো।

আমাকে যে এখনই বেরোতে হবে।

কোথায়?

ডেভিড একটা ব্যাবসার খবর এনেছে।

কত টাকার?

পঞ্চাশ লাখ।

না। ওই ব্যবসায় আমরা হাত দেব না।

ছেলেটি অখুশি হল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল। হরিরামবাবু বিড়বিড় করলেন, লোভ! লোভের চেয়ে বিষাক্ত সাপ দুনিয়ায় নেই। দশ হাজার ছেলেদের জুতো কাস্টমস সিজ করেছে। যারা বর্ডার পেরিয়ে আনছিল, তারা সব পালিয়েছে। তাই কাস্টমস নিলাম করল। এই ছেলে বুদ্ধু, এক লাখে নিলাম ডেকে নিল। পার জুতো দশ টাকা। তো ঠিক হ্যায়।

দশ টাকার জুতো? সে কী?

একেবারে চিনে তৈরি। ভাল চামড়া।

অবিশ্বাস্য।

না অর্জুনবাবু। জুতোগুলো সব বাঁ পায়ের। ডান পায়ের একটাও নেই। এক পায়ের জুতোর জন্যে আপনি কি দশ টাকা খরচ করবেন? এক পায়ে জুতো অন্য পা নাঙ্গা! হা হা হা। হাসলেন হরিরামবাবু।

আপনি কিনলেন কেন?

কিনলাম। লাক যদি ভাল থাকে, তা হলে ডান পায়েরটাও পেয়ে যাব। দুটো পাশাপাশি করলে খরচ হবে বিশ টাকা। তখন পাঁচশো টাকা চাইলে, আপনি লুফে নেবেন। নিলামে কেনা মাল মানে সেন্ট পার্সেন্ট লিগাল জিনিস। সৎপথে ব্যাবসা একেই বলে, বুঝলেন। কিন্তু ওই যে পঞ্চাশ লাখের ব্যাবসা। ওর মধ্যে আমি নেই। পঞ্চাশ লাখ ঢাললে কমসে কম দেড় কোটি পাওয়া যাবে তিন দিনে। কিন্তু আমি আমার মাদার ইন্ডিয়ার সঙ্গে বেইমানি করতে পারব না।

কীসের ব্যাবসা?

হরিরামবাবু তাকালেন, যে-ব্যাবসা আমি করি না, তার কথা ভাবতেই চাই না।

তবু...?

আরে মশাই, এই যে আমাদের দেশে এত সন্ত্রাসবাদী, উগ্রপন্থী হাঙ্গামা চালাচ্ছে, মানুষ খুন করছে, এরা অস্ত্র পাচ্ছে কোথায়? সাধারণ পুলিশের হাতে যে অস্ত্র নেই, তা এদের কাছে চলে আসছে। ওসবের মধ্যে আমি নেই। মাথা নাড়লেন তিনি।

কিন্তু আপনার ছেলের কাছে প্রস্তাব এসেছে!

আরে, ওরা ছেলেমানুষ। এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায় ধান্দা নিয়ে। কে কোথায় কী বলছে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। এই তো, কয়েক দিন ধরে আমার কাছে বায়না করছে, আমেরিকা যাবে বলে। হরিরামবাবু হাসলেন, আমাদের পঁয়তাল্লিশ টাকা নাকি আমেরিকায় এক টাকা। সেখানে গিয়ে ব্যাবসা করলে অনেক তাড়াতাড়ি টাকা কামাতে পারবে। আমি বলি, ধীরে ধীরে এগোও, তাড়াতাড়ি করলেই হোঁচট খাবে।

এই লাইনে বিদেশিরা আসছে?

আমি তো ধান্দা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, খবর রাখি না। তবে কোনও সাদা চামড়াকে আর এদিকে দেখতে পাওয়া যায় না। খোঁজ নিতে পারি।

প্লিজ, একটু খোঁজ নিন না।

আপনার আমার কাছে আসার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে বলুন তো?

দুই দেশের সীমান্ত ডিঙিয়ে যারা লাইসেন্সবিহীন ব্যাবসা করে, তাদের ব্যাবসার ধরন জানার প্রয়োজন হয়েছিল বলে এসেছি। অর্জুন বলল।

এ-খবর জানানোর জন্য আমিই যে উপযুক্ত ব্যক্তি, সেটা আপনাকে কে বলল?

হাওয়া। শিলিগুড়ির হাওয়ায় খবরটা ভাসছে।

আপনি বুদ্ধিমান। কিন্তু আমি এসব ব্যবসায় আর নেই। যা কারবার করি, কাস্টমস ডিউটি দিয়েই করি। এই অস্ত্র আমদানি আর মানুষ পাচার যারা করছে, তারা করুক।

মানুষ পাচার? অর্জুন সোজা হয়ে বসল।

আপনি বিদেশে যাবেন, পাসপোর্ট নেই, থাকলেও ভিসা পাচ্ছেন না, পাঁচ থেকে দশ লাখ ফেলুন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বাব্বা! এত্ত টাকা তো সাধারণ মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

ঘটি-বাটি, জমি বিক্রি করে দিচ্ছে। শুনেছে, ওদেশে গেলে দু-তিন বছরে কোটি টাকা রোজগার করা যায়।

এই জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের সাধারণ ঘরের ছেলেরা এভাবে যাচ্ছে?

দুর মশাই। এখানকার ছেলেদের অত হিম্মত কী করে হবে! যাচ্ছে বাংলাদেশের ছেলেরা। আচ্ছা ... হঠাৎ ঘড়ি দেখলেন হরিরামবাবু।

নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল অর্জুন। বারান্দায় দাঁড়াতেই দেখতে পেল ব্যস্ত শিলিগুড়ির রাস্তায় আরও ব্যস্ততা বেড়েছে।

নভেন্দুকে খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়। তা ছাড়া সে পশ্চিমবঙ্গে আছে না বাংলাদেশে, তাও জানা নেই। দুপুরে শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ায় এক বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া সেরে ফেরার পথে অর্জুন ঠিক করল, শুভেন্দুশেখরকে জানিয়ে দেবে, এই ব্যাপারে তার পক্ষে কিছু করা অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে অমল সোমের মুখ মনে পড়ল। অমল সোম বলতেন, আমাদের ডাক্তারদের মতো ভাবতে হবে। যতক্ষণ খাস ততক্ষণ আশ। মাঝরাস্তায় থেমে যেয়ো না। একজন সত্যান্বেষীকে ধৈর্যের শেষ পরীক্ষা দিতে হয়।

চুপচাপ বাইক চালিয়ে আসছিল সে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি রোডে এখন সবসময় ছুটন্ত গাড়ির ভিড়। একটু অসতর্ক হলেই দুর্ঘটনা ঘটে। হাতিমোড়ে এসে দেখল, গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার কথা ভাবামাত্রই যেন ওটা হয়ে গেল! বাইক বলেই অর্জুন রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে সামনে চলে এল। একটা সুমো জলপাইগুড়ি থেকে আসছিল। তার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে। শিলিগুড়ি থেকে যাওয়া টাটা

ভ্যানের। দুটো গাড়ির সামনের দিকে ক্ষতি হয়েছে। সুমো গাড়ির আরোহীর সংখ্যা বেশি বলে, তারাই দাপটে কথা বলছে। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি চেঁচাচ্ছে, তাকে চিনতে পারল অর্জুন। রায়কত পাড়ার সাধন। কনট্রাক্টরি করে। অর্জুন বাইক রেখে এগিয়ে যেতেই অবাক হল। টাটা ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে হরিরামবাবুর ছেলে এবং তার বন্ধু।

অর্জুনকে দেখে সবাই আরও উত্তেজিত, দ্যাখো, কী অবস্থা করেছে গাড়িটার। আর-একটু হলে আমরা সবাই মারা পড়তাম। ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাতে পারছে না। আসলে আছে কিনা সন্দেহ। পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমি ছাড়ছি না।

অর্জুন বলল, ঠিক বলেছ। তবে গাড়ি দুটো রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে যদি কথা বললো, তা হলে ভাল হয়। বিরাট জ্যাম হয়ে গিয়েছে।

ওকে সরাতে বললে পালিয়ে যাবে অর্জুন। সাধন বলল।

না। পালাবে না। ওকে আমি চিনি। অর্জুন বলল।

কিছুক্ষণ দোনামনার পরে দু'জনেই গাড়ি সরিয়ে নিল রাস্তার পাশে। যানবাহন চলা স্বাভাবিক হল।

হঠাৎ হরিরামবাবুর ছেলে তাকে ইশারায় কাছে ডাকল। অর্জুন যেতেই ছেলেটা বলল, ওকে বলুন, ফালতু ঝামেলা না করতে। এক-দু' হাজার দিয়ে দিচ্ছি।

দু'হাজারে ওর গাড়ি মেরামত করা যাবে না। অর্জুন হাসল।

আরে, আমার গাড়িও তো মেরামত করতে হবে। ঠিক আছে, পাঁচ নিতে বলুন।

অর্জুন সাধনকে প্রস্তাব জানাতে সে বলল, মাথা খারাপ? এগুলো মেরামত করা যায় না। রিপ্লেস করতে হয়। অন্তত বারো-পনেরোর ধাক্কা।

ইনশিয়োরেন্স আছে তো? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ। কেন?

ক্লেম করলে টাকাটা ইনশিওরেন্স থেকে পেয়ে যাবে। এই টাকা ওর টোকেন শাস্তি হিসেবে নিয়ে নাও। অর্জুন বলল।

ঠিক আছে। তবে পুলিশ এসে নোট করার পর ওকে ছাড়ব।

হরিরামবাবুর ছেলেকে কথাটা বলতে সে কাঁধ নাচাল। তারপর গাড়ির জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করল, আরে, আমার মোবাইল। মোবাইল কে নিল এখান থেকে? সে গাড়িতে উঠে তন্নতন্ন করে খুঁজল।

তার বন্ধুও সঙ্গী হল। তারপর ছেলেটা গাড়ি থেকে নেমে এসে বলল, আমার মোবাইল কেউ ঝেড়ে দিয়েছে।

সাধন চাপা গলায় বলল, নকশা হচ্ছে?

অবশ্য দুর্ঘটনার পর যে ভিড় জমেছিল, তাতে মোবাইল চুরি যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। অর্জুন তার বাইকের দিকে এগোচ্ছিল, হরিরামবাবুর ছেলে তাকে ডাকল, দাদা, আপনার কি মোবাইল আছে?

মাথা নাড়ল অর্জুন।

ও। আপনি কি জলপাইগুড়িতে ফিরে যাচ্ছেন? ছেলেটি জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ।

একটা উপকার করবেন? ছেলেটি ইতস্তত করল।

নিশ্চয়ই।

জলপাইগুড়ি বাইপাসে একটা নীল মারুতি ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন। ড্রাইভারকে বলবেন, এই ঝামেলায় আমি আটকে গিয়েছি। মোবাইল চুরি গিয়েছে। আমি পরে যোগাযোগ করে নেব। ও যেন অপেক্ষা না করে।

নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু আপনার নাম তো আমি জানি না। অর্জুন বলল।

শিবরাম।

অর্জুন আর দাঁড়াল না।

ব্যাপারটার মধ্যে রহস্যের গন্ধ পেল অর্জুন। শিলিগুড়ি থেকে শিবরাম এবং তার সঙ্গী নিশ্চয়ই একজন ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করতে জলপাইগুড়ি বাইপাসে আসবে না। ওই নীল মারুতি নিশ্চয়ই ওদের কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। বাপ-ছেলের সংলাপ মনে পড়ল। পঞ্চাশ লাখের ব্যাবসার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল শিবরাম, যা ওর বাবা নাকচ করে দিয়েছেন। আর বলেছিল, ডেভিড নামের একটা লোকের কথা। সেই ডেভিডের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল নাকি শিবরাম?

অবশ্য এসব নিয়ে ভেবে কোনও লাভ নেই। শুভেন্দুশেখর তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তার সঙ্গে হরিরামের ছেলের কোনও সম্পর্ক থাকার কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই লাইন, ছাই উড়িয়ে দ্যাখো, অমূল্য রতন পেয়েও যেতে পারো।

জলপাইগুড়ি শহরের শুরুর মুখে বাঁ দিকে জাতীয় সড়ক চলে গিয়েছে অসমের দিকে। অর্জুন শহরে না ঢুকে বাইপাস ধরতেই নীল মারুতিটাকে দেখতে পেল। ড্রাইভার বেশ অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখছে।

অর্জুন বাইক দাঁড় করাল, ডেভিডসাহেবের গাড়ি?

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, হাঁ সাব। আপনি অনেক দেরি করে ফেলেছেন। বলে গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করল। তাকে বাধা দিতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিল অর্জুন। তারপর নীল মারুতির পিছন পিছন বাইক নিয়ে চলতে লাগল।

লোকটা নির্ঘাত শিবরামকে দ্যাখেনি। সে খোঁজ করে নাম বলতেই ভেবে নিয়েছে, যার যাওয়ার কথা সে এসে গিয়েছে? মজা লাগল অর্জুনের। দেখাই যাক, গাড়িটা তাকে কার কাছে নিয়ে যায়।

তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে লাটাগুড়ি যাওয়ার শর্টকাট পথে নীল মারুতি হাইওয়ে ছেড়ে নেমে পড়ল। একটু পরে ডান দিকে ভারতবর্ষের বিখ্যাত রেলওয়ে স্টেশন দোমহনি পড়বে। ইংরেজ আমলে দোমহনি ছিল বিরাট জংশন স্টেশন। এখন একটা ট্রেন মালবাজার থেকে এসে ওখানে থামে, জিরোয় এবং ফিরে যায়। ট্রেনটায় থাকে একটি ইঞ্জিন এবং একটি যাত্রীবাহী কামরা। সারাদিনে দু'বার আসা-যাওয়া করে ওই ট্রেন। স্টেশনের একমাত্র কর্মচারী যিনি, তিনিই সব কিছু করেন। বাকি সময়টা গ্রামবাসীদের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে বসে তাস পেটান। ওই স্টেশনের দিকে চলল নীল মারুতি। রেললাইন ডিঙিয়ে একটা বাংলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এই বাংলো ব্রিটিশ আমলে কোনও রেলওয়ের কর্তার জন্য তৈরি হয়েছিল। দেখে বোঝা যায়, একসময় বেশ চাকচিক্য ছিল। এখন অবহেলায় কোনওমতে দাঁড়িয়ে আছে।

অর্জুন বাইক থেকে নেমে আসতেই বারমুডা আর গেঞ্জি পরা একটা গাট্টাগোট্টা লোক সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। এসে বলল, ইয়েস?

মিস্টার ডেভিড আছেন?

আপনি কোত্থেকে আসছেন?

শিলিগুড়ি থেকে।

নাম প্লিজ।

আমি শিবরামের খবর নিয়ে এসেছি।

বলুন।

উনি আমাকে ডেভিডের সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন।

ডেভিড একটু আগে বেরিয়ে গিয়েছে। ওর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে।

বেশ। ডেভিডকে বলে দেবেন, শিরবামের গাড়ি শিলিগুড়ি থেকে এখানে আসার পথে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। ওর মোবাইলও চুরি গিয়েছে।

তাই নাকি? কেমন আছে ও?

ওর কিছু হয়নি। গাড়ির ক্ষতি হয়েছে। তাই নিয়ে ঝামেলা হওয়ায় আটকে গিয়েছে।

ও কে! লোকটা মাথা নেড়ে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানে চলে গেল।

২. ইঞ্জিন চালু করে

ইঞ্জিন চালু করে অর্জুনের মনে হল, ব্যাপারটা স্বাভাবিক। শিবরাম ঠিক সময়ে পৌঁছোতে না পারায় ডেভিড অন্য কাজে চলে গিয়েছে। হরিরামবাবুর ইঙ্গিত বুঝলে ধরে নিতে হবে, ডেভিড কোনও বেআইনি ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত। তা, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ বেআইনি কাজ করে যাচ্ছে। তাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর দায়িত্ব কেউ তাকে দেয়নি।

রেললাইন পার হওয়ার সময় স্টেশনমাস্টারের মুখ মনে এল। সেই একই লোক আছে, না বদলি হয়ে গিয়েছে? কৌতূহলী অর্জুন বাইক ঘোরাল। দূর থেকেই দেখতে পেল প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা, তাসের আসর বসেনি। মানুষ দূরের কথা, একটা ছাগলও চরছে না প্ল্যাটফর্মের ঘাসে। একটাই ঘর। বাকিগুলো বহুদিন থেকেই তালা বন্ধ। বাইক থেকে নেমে অর্জুন চিৎকার করল, মাস্টারমশাই!

ওপাশ থেকে গলা ভেসে এল, আসছি।

সেদিকে এগিয়ে দৃশ্যটা দেখতে পেল অর্জুন। একটা গোরুকে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছেন গেঞ্জি আর লুঙ্গি-পরা স্টেশনমাস্টার। কাছে এসেই চিনতে পারলেন তিনি, আরে! আপনি? কী আশ্চর্য! .

গোরুটা কি ঝামেলা করেছিল?

পালিয়ে গিয়েছিল, ধরে নিয়ে এলাম। একটা খুঁটিতে ওটাকে বেঁধে হাত ঝেড়ে স্টেশনমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, বলুন?

এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম, দেখে আসি আপনি আছেন কিনা? অর্জুন হাসল।

নো চান্স। একশো আটটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি। রেল আমার জায়গায় বদলি করার লোকই পাচ্ছে না। ভাবুন ব্যাপারটা! শেষতক ভাবলাম, ভালই তো আছি। কোনওদিন ট্রেন আসে, তো কোনওদিন আসে না। আমি গোরু ছাগল, বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে শান্তিতেই আছি। স্টেশনমাস্টার বললেন।

আপনাদের তাস-পার্টি?

বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে এক ব্যাটা খেলতে আসত। সে নাকি পাকা চোর। কী করে জানব বলুন? পুলিশ এসে এখান থেকে হাতেনাতে ধরে নিয়ে গেল লোকটাকে। তারপর থেকে খেলা বন্ধ করে দিয়েছি। স্টেশনমাস্টার বললেন।

অর্জুন বাঁ দিকে তাকাতেই দূরে রেলের বাতিল বাংলোগুলো দেখতে পেল। সে জিজ্ঞেস করল, আগে তো ওই বাংলোগুলো বন্ধ থাকত, এখন কি লোক থাকছে?

স্টেশনমাস্টার বললেন, কিছু বলার নেই মশাই। উপরতলার চিঠি নিয়ে এসেছে। ওই পোড়ো বাড়িতে মানুষ যেত না ভুতের ভয়ে। আচ্ছা, ইংরেজিতে কথা বললে দিশি ভূত ভয় দেখাতে পারে না, না?

হেসে ফেলল অর্জুন, ব্যাপারটা আমি জানি না।

আপনি হাসছেন, কিন্তু ওরা ওখানে দিব্যি আছে। হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খায়। ইংরেজি ছাড়া কথা বলে না। ভেবেছিলাম, গিয়ে খোঁজ নেব। কিন্তু স্পোকেন ইংলিশটা ভাল নয় বলে, সাহস করলাম না। স্টেশনমাস্টার বললেন।

লোকগুলো কি অবাঙালি?

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কাজের লোক রাখলে তার কাছ থেকে জানা যেত। একটা ড্রাইভার আছে, কিন্তু সে কারও সঙ্গে মেশে না। একজনকে দেখলে সাহেব বলে মনে হয়। গায়ের রং টকটকে ফরসা, চোখে রোদচশমা। বেশ লম্বা। একবারই তাকে দেখতে পেয়েছিলাম দূর থেকে।

লোকটার নাম কি ডেভিড?

তা তো জানি না।

কিন্তু আপনার উচিত, দূর থেকে নজর রাখা। হাজার হোক বাংলোটা রেলের সম্পত্তি। মানুষ আর যাই হোক, ভূতের সঙ্গে পেরে উঠবে না। কিন্তু বলা তো যায় না। অর্জুন বাইকে ফিরে গেল। হঠাৎ কথাটা মনে পড়তে অর্জুন চেঁচিয়ে ডাকল, মাস্টারমশাই?

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, ইয়েস! বলুন?

যাকে সাহেব বলছেন, তার মুখটা মনে আছে?

ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলেন।

ওর ঠোঁটের পাশে কোনও কাটা দাগ দেখেছেন?

নাঃ। দূর থেকে দেখা তো, বাইনোকুলার তো নেই!

অর্জুন আর দাঁড়াল না। শৈশবের ছবি দেখালে কোনও কাজ হবে না।

·

পরদিন সকালে শুভেন্দুশেখরের বাড়িতে গেল অর্জুন। ভদ্রলোক তখন হুইলচেয়ারে বসে হ্যারি পটার পড়ছিলেন। কাজের লোক অর্জুনকে উপরে নিয়ে এলে বই পাশে সরিয়ে বললেন, এসো, এসো।

সামনের চেয়ারে বসে অর্জুন বলল, আপনি হ্যারি পটার পড়েন?

ওয়েল রিটন। সময়টা চমৎকার কাটে। কিন্তু আপশোস হয়।

কেন?

আমাদের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র আধুনিক সংস্করণ হল এই বই। ঠিকঠাক প্রচারিত হলে ঠাকুরমার ঝুলিকে বিদেশিরা লুফে নিত। তা এবার বলো, কত পারিশ্রমিক নেবে? শুভেন্দুশেখর জিজ্ঞেস করলেন।

অর্জুন হাসল, ওটা নিয়ে এত চিন্তা করছেন কেন? এখনও আমি বুঝতে পারছি না, কী করে নভেন্দুবাবুর সন্ধান পাব। ওকে খুঁজতে আমাকে হয়তো বাংলাদেশেও যেতে হতে পারে।

বেশ তো। তোমার পাসপোর্ট আমাকে দিয়ে যাও। কলকাতার এক চেনা ট্রাভেল এজেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিলে সে ভিসা করে দেবে। এদিকে সমস্যা বেড়েছে। নিমা কাল দিল্লিতে নামছে। সেখান থেকে প্লেন ধরে বাগডোগরায় আসবে। এসে কী লাভ হবে তার, আমি জানি না। ভদ্রতা রাখতে না বলতে পারিনি। শুভেন্দুশেখর মাথা নাড়লেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, উনি নিশ্চয়ই এই প্রথম ভারতবর্ষে আসছেন? বাগডোগরায় নেমে এখানে পৌঁছোবার রাস্তা জেনে নিয়েছেন?

ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর জানা থাকলে পৌঁছোতে অসুবিধে হবে না। তা এখন বলো, কত দূর এগিয়েছ তুমি? শুভেন্দুশেখর জিজ্ঞেস করলেন।

নভেন্দুবাবুর কোনও খবর এখনও পাইনি। আচ্ছা, ওঁর কি কোনও ডাকনাম আছে?

আছে। মাথা নাড়লেন শুভেন্দুশেখর।

ডেভিড?

না তো। ওকে আমরা 'নবু বলে ডাকতাম। শোনো অর্জুন, তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, ওর সন্ধান এনে দাও। না হলে আমি বিপদে পড়ে যাব।

কেন?

তোমাকে তো বলেইছি, ওর ধারণা, আমি মারা গেলে ও লাভবান হবে।

এই ব্যাপারে আপনি ইচ্ছে করলে সিকিউরিটি বাড়াতে পারেন।

ওসব আমার জানা আছে। দাঁড়াও। হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে ভিতরে চলে গেলেন শুভেন্দুশেখর। ফিরে এলেন একটু পরে, হাতে খাম।

এটা রাখো। দশ হাজার আছে। খোঁজখবর করার সময় টাকার অভাবে যাতে অসুবিধেয় না পড়ো, তাই দিচ্ছি।

অর্জুন তাকাল। তারপর চুপচাপ খামটা নিয়ে নিল।

ধন্যবাদ। শুভেন্দুশেখর বললেন।

উঠে দাঁড়াল অর্জুন। তারপর স্টেশনমাস্টারের দেখা প্রায়সাহেব লোকটার বর্ণনা শুনিয়ে জিজ্ঞেস করল, নভেন্দুবাবুকে কি এরকম দেখতে?

সে ফরসা, লম্বা, গগল্স পরে। তা এরকম লক্ষ লক্ষ ছেলেকে দেখতে পাবে। কাটা দাগ আছে? শুভেন্দুবাবু বিরক্ত হলেন।

যিনি দেখেছেন, তিনি দূর থেকে সেটা লক্ষ করতে পারেননি। অর্জুন আর কথা বাড়াল । আসছি’ বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

.

বিকেলে অমল সোমের বাড়িতে গেল অর্জুন। এই বাড়ির গেট খুলে ঢুকলেই অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়। অমল সোম এখন কদাচিৎ আসেন। ওঁর কাজের লোক হাবুরও বয়স হয়েছে। গত বছর মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল বেচারাকে। তখন অমল সোম ওকে দেখতে এসেছিলেন। হাবু সুস্থ হওয়ার পর আবার ফিরে গিয়েছেন পাহাড়ে। সত্যান্বেষণের হাতেখড়ি যার কাছে, তিনি এখন আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করেন। যদিও সন্ন্যাসী হয়ে যাননি। এই বাড়িতে ঢুকলেই অর্জুনের আত্মবিশ্বাস কেমন করে যেন বেড়ে যায়।

হাবু বসে ছিল বারান্দায়। নীচে অনেকটা উঁচু খড়ের গাদা। সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিল কিছু। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার হাবু?

হাবু কথা বলতে পারে না। কিন্তু ওর ইশারার অর্থ অর্জুন বোঝে। হাবু খুব চিন্তিত মুখে আঙুলের ইশারায় জানাল, সে একটা সেফটিপিন খুঁজে পাচ্ছে না। ওখানে ঘাসের উপর খড় ছিল। তার উপর পড়েছে। অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত খড়গুলো এক জায়গায় ভঁই করে রেখেছে। ওর ধারণা, ওর মধ্যেই সেফটিপিন লুকিয়ে আছে।

অর্জুন বলল, ছেড়ে দাও। আর যদি না থাকে, তো কয়েকটা কিনে দিচ্ছি।

হাবু তীব্রবেগে মাথা নেড়ে আঙুল ঘুরিয়ে জানাল, সে কিনবে না, ওটাকেই খুঁজে বের করবে।

অমলদার কোনও চিঠি এসেছে?

মাথা নাড়ল হাবু, না। তারপর কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় তড়াক করে উঠে ভিতরে চলে গেল। হাবুকে এখন বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে। অমলদার উচিত, এখান থেকে সরিয়ে ওকে নিজের সঙ্গে রাখা। কথাটা বলেওছিল সে। অমলদা বলেছিলেন, এ-বাড়ি বিক্রি করার কোনও বাসনা আমার নেই। উইল করেছি, আমার মৃত্যুর পরে হাবু এই বাড়ির মালিক হবে। তখন যদি ও বিক্রি করে, করতে পারে। সেই কারণেই ওর এখানে থাকা দরকার।

মিনিট পাঁচেক পর এক কাপ চা এনে হাবু অর্জুনকে দিল।

অর্জুন বলল, বাঃ। চমৎকার। শব্দ করে চুমুক দিল অর্জুন।

সেটা শুনে কপালে ভাঁজ পড়ল হাবুর। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলে গেল সে। ফিরে এল একটা ধাতব কাঠি নিয়ে। কাঠিটাকে খড়ের গাদায় ঢুকিয়ে একটু ঘুরিয়ে বের করে দেখতে লাগল হাবু। ওটা যে চুম্বক, তা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড লাগল অর্জুনের। হাবু যে এতটা বুদ্ধিমান, তা আন্দাজ করতে পারেনি সে। চুমুকের আওয়াজ ওর কানে যেতে পারে না। কারণ, সে কানে প্রায় শোনেই না। হয়তো চুমুক দেওয়ার সময় তার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে অনুমান করে নিয়েছে। চুমুক থেকে চুম্বকের কথা মনে পড়েছে ওর।

হঠাৎ হাবু লাফাতে লাগল। তার চুম্বকের প্রান্তে সেফটিপিন। বহু খুঁজেও যেটাকে সে পায়নি, তা চুম্বকের সাহায্যে পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নভেন্দুর কথা মনে পড়ল অর্জুনের। ওই খড়ের গাদায় হারিয়ে যাওয়া সেফটিপিনের মতো নভেন্দু সীমান্তের এপারে অথবা ওপারে কোথায় লুকিয়ে আছে। তার কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। একটা চুম্বক যেমন সেফটিপিনটাকে খুঁজে বের করে আনল, তেমন যদি কিছু পাওয়া যেত।

বাড়ি ফেরার পথে করলা নদীর ব্রিজের উপর বাইক থামাল অর্জুন। তার মাথায় এইমাত্র যে ভাবনাটা চলকে উঠল, তা কি সত্যি হবে? নভেন্দুকে খুঁজে বের করার জন্য একটা চুম্বকের প্রয়োজন। নিমা সেই চুম্বক হতে পারে? নিমা দেশের এই প্রান্তে এসেছে শুনলে নিশ্চয়ই নভেন্দু একটু সন্ত্রস্ত হবে। হয়তো ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে সমঝোতায় আসতে চাইতে পারে। আবার এও হতে পারে, যে সূত্র থেকে

নিমা জেনেছে নভেন্দু ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রয়েছে, সেই সূত্র ওকে নভেন্দুর সঠিক ঠিকানা জানিয়ে দিতে পারে। অর্জুন ঠিক করল, আগামী কাল বাগডোগরায় যাবে। শুভেন্দুশেখর বলেছেন যে, আগামী কাল নিমা আমেরিকা থেকে এসে দিল্লিতে নামবে। সাধারণত আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলো শেষ রাতে ভারতের এয়ারপোর্টে নামে। তারপর নিমা যদি বাগডোগরার ফ্লাইট ধরে, তা হলে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

.

বাইক নয়, মিনিবাসে শিলিগুড়িতে পৌঁছে অটো রিকশায় বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যখন অর্জুন চলে এল, তখন ঘড়িতে দুপুর বারোটা। জানতে পারল, দিল্লির ফ্লাইট আর চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ওখানে ল্যান্ড করবে। নিমা কি আমেরিকান? এখন অনেক আমেরিকান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তবে নিমা নামটি কখনওই আমেরিকান হতে পারে না। নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলা শাড়ি পরে আসবে না। প্যান্টই স্বাভাবিক! অর্জুন দেখল, প্লেনটা আকাশ ছেড়ে ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল। অ্যারাইভাল লাউঞ্জের এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল অর্জুন। যেসব যাত্রীর সঙ্গে হ্যান্ডব্যাগ ছাড়া কিছু নেই, তাঁরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। মিনিট দশেক বাদে মালপত্র ট্রলিতে চাপিয়ে বাকিরা বেরিয়ে এলেন। কয়েকজন তরুণীর পরনে প্যান্ট, কিন্তু তারা বিদেশ থেকে আসছে বলে মনে হল না অর্জুনের। এই সময় সালোয়ার-কামিজ পরা একজন যুবতীর দিকে তাকাতে অর্জুন ধন্দে পড়ল। মহিলার চেহারা, হাবভাব দেখে এদেশীয় ভাবার কোনও কারণ নেই। ওঁর ট্রলিতে রাখা সুটকেসের চেহারাও একই কথা বলছে। মহিলা হাঁটছেন একাই। ইনি নিমা নয়তো? অর্জুন এগোল।

গেটের ওপাশে অনেকেই হাতে নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনওটায় যাত্রীর নাম, কোনওটায় কোম্পানির নাম। একটা প্ল্যাকার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন মহিলা। লোকটাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি মাথা নেড়ে প্ল্যাকার্ড নামিয়ে এগিয়ে গেল পার্কিং-এর দিকে, ভদ্রমহিলার সুটকেস বহন করার ভদ্রতা দেখাল না।

ভদ্রমহিলা যখন লোকটার জন্য অপেক্ষা করছেন, তখন অর্জুন এগিয়ে গেল তাঁর কাছে। হেসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমেরিকা থেকে আসছেন?

হ্যাঁ, কেন? ভদ্রমহিলা অবাক।

আপনার নাম জানতে পারি?

কেন আপনাকে আমি আমার নাম জানাতে যাব? চোয়াল শক্ত ভদ্রমহিলার।

বেশ। আপনি কি কাউকে এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাতে বলেছিলেন?

হ্যাঁ। আর কিছু?

এই সময় লোকটা গাড়ি নিয়ে আসছে দেখে অর্জুন সরে দাঁড়াল এবং তখনই তার নজরে পড়ল, সুটকেসের পাশের দিকে এন এবং আই অক্ষর দুটো লেখা রয়েছে। তা হলে কি শুভেন্দুশেখর মত পরিবর্তন করে তাঁর অতিথির জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন? তা যদি হয়, তা হলে ড্রাইভার লোকটা একফোঁটা সৌজন্য দেখাল না কেন?

দ্রুত ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে আসতেই ভীম প্রধানকে দেখতে পেল অর্জুন। খাটো, রোগা চেহারার ভীম তার ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে সদ্য নামা এক যাত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। সাহাব, ভীম প্রধান কখনও কোনও কাস্টমারের কাছে যায় না। তারাই আসে। যেমন আপনি এসেছেন। আপনার যদি মনে হয়, আমি বেশি টাকা চাইছি, তা হলে অন্য ট্যাক্সিওয়ালার কাছে চলে যান।

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে সরে যেতেই অর্জুনকে দেখতে পেল ভীম। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে হাসি ফুটল, আরে দাদা, আপনি? কাউকে ছাড়তে এসেছিলেন?

না, রিসিভ করতে এসেছিলাম। কিন্তু তাকে আর-একজন নিয়ে চলে গেল। তুমি পার ঘণ্টা কত টাকা নাও? অর্জুন কাছে এল।

দরজা খুলে দিল ভীম, উঠুন, আপনি জলপাইগুড়িতে যাচ্ছেন না বুঝতে পারছি।

ট্যাক্সিতে উঠে অর্জুন বলল, আমি জানি না কোথায় যাচ্ছি। একটা প্রাইভেট গাড়ি এইমাত্র এয়ারপোর্ট ছেড়েছে। ওটা যেখানে যাবে, সেখানে যাব।

কী গাড়ি?

অ্যাম্বাসাডর। নম্বরটা বলল অর্জুন।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই প্রতিটি গাড়িতে লাইন দিয়ে অথরিটির কাছে জমা দেওয়া লাইসেন্স ফেরত নিতে হয়। একটু সময় লাগে সেখানে। ভীম ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে হেঁটে গেল অপেক্ষায় থাকা গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে। ফিরে এল পাঁচ মিনিট পরে। অর্জুন বলল, তাড়াতাড়ি হয়ে গেল!

দাদা, ভীমকে সবাই ভালবাসে। নীল রঙের গাড়ি, পিছনে লেডিস আছে।

নর্থ বেঙ্গলের বাস কনডাক্টর, ট্যাক্সি ড্রাইভাররা লেডি এবং লেডিসের মধ্যে কোনও ফারাক করে না। ভীম প্রধানও করল না। তার ট্যাক্সি স্ট্যান্ড কদমতলায়। যেতে-আসতে অনেকবার দেখা হয়েছে, অর্জুনকে দেখেই চেঁচিয়ে বলেছে, নমস্কার দাদা। বাংলা উচ্চারণ এত নিখুঁত যে, নেপালি বলে মনেই হয় না।

হাইওয়েতে ওঠার পর গাড়িটাকে দেখতে পেল অর্জুন। ভীম এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে বাধা দিল, কাছে যেয়ো না। ওরা যেন বুঝতে না পারে, আমরা ফলো করছি। ও যেখানে যাবে, সেখানেই আমরা যাব।

কী করেছে ওই মেমসাহাব? খুন না জালিয়াতি? ভীম জিজ্ঞেস করল।

কোনওটাই না। উনি কিছু করেননি। মনে হচ্ছে, ওঁকে ভুল বুঝিয়ে কেউ নিয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা! তা হলে ওকে ধরে মার লাগালেই তো হয়।

না। আমি জানতে চাইছি, মেমসাহেবকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

ও, বুঝতে পেরেছি।

শিলিগুড়িতে না ঢুকে বাইপাস দিয়ে সেবকের রাস্তা ধরল অ্যাম্বাসাডর। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, তোমার গাড়িতে কত তেল আছে?

ফুল ট্যাঙ্কি।

দুটো গাড়ির মধ্যে দেড়শো গজের পার্থক্য। মাঝে মাঝে দ্রুতগামী গাড়িগুলো তাদের ওভারটেক করে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন কিছুক্ষণের জন্য নীল অ্যাম্বাসাডরকে দেখা যাচ্ছে না। চট করে যদি গাড়িটা বাঁ বা ডান দিকের জঙ্গলে ঢুকে যায়, তা হলে তারা দেখতে পাবে না। অবশ্য এর ফলে সামনের ড্রাইভারের মনে সন্দেহও জাগছে না।

কালিম্পং-এর দিকে না গিয়ে তিস্তা-সেবক ব্রিজ পেরিয়ে নীল অ্যাম্বাসাডর মালবাজারের রাস্তা ধরল। দু'পাশে বড় বড় গাছের জঙ্গল, জনমানবশূন্য এলাকায় কালো পিচের রাস্তাটা গম্ভীর ভঙ্গিতে শুয়ে আছে।

ইতিমধ্যে অর্জুনের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, শুভেন্দুশেখর নিমাকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাননি। নিমা যে আসছে এবং কবে কোন ফ্লাইটে, তা নভেন্দু জানত। নিমা যদি জানিয়ে থাকে, তা হলে ওর কাছে নভেন্দুর ঠিকানা আছে। তখনই অর্জুনের মনে হল, নিমাকে নভেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া উচিত হবে না। এমনও হতে পারে, নিমা শুভেন্দুশেখরকে মিথ্যে বলেছে। হয়তো নভেন্দুর সঙ্গে এক হয়ে ষড়যন্ত্র করছে।

জঙ্গল কমে গেলে ঘটনটা ঘটল। দশ-বারোটা গোরু নিয়ে একটা লোক হঠাৎ রাস্তা পার হয়ে ওপারে যেতেই নীল অ্যাম্বাসাডর ব্রেক কষল। আশি নব্বই মাইল গতিতে ছোটা গাড়িটা ব্রেক সামলাতে পারল না। চাকা স্কিড করে একটা গোরুর গায়ে ধাক্কা মারল। গোরুটা পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল। পাহারাদার লোকটা ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গেল গাড়ির কাছে। দরজা খুলে ড্রাইভার লোকটাকে বের করে লাঠি মারতে লাগল হিংস্র হয়ে। লোকটা কোনও বাধাই দিতে পারছিল না। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা লোক ছুটে এসেছে জঙ্গল থেকে। ভীম খানিকটা দূরে তার ট্যাক্সি থামিয়ে দিয়েছিল।

অর্জুন দেখল, বাকি লোকগুলো এসে অনেক সুঝিয়ে রাগী লোকটাকে থামাল। এবার তারা নীল অ্যাম্বাসাডরের ড্রাইভারকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পাশের একটা গাছে আটকে দিল।

অর্জুন এবং ভীম ট্যাক্সি থেকে নেমে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখল, নীল অ্যাম্বাসাডরের ড্রাইভারের মুখ-মাথা থেকে রক্ত পড়ছে। মাথা নিচু করে রয়েছে সে।

অর্জুনকে দেখে লোকগুলো এগিয়ে এল। একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি ওকে চেনেন?

মাথা নাড়ল অর্জুন, না। তারপর জিজ্ঞেস করল, ওকে তো যথেষ্ট মেরেছ। কিন্তু তারপর বেঁধে রেখেছ কেন?

ওর লোক আসুক। তারা টাকা দিলে তবে ওকে ছাড়া হবে। আমাদের গোরুটা আর বাঁচবে না। এই গোরুটা অন্তত পাঁচটা বাচ্চা দিত। তাদের কত দুধ হত ভাবুন তো? আমরা দশ হাজার টাকা পেলে ওকে ছেড়ে দেব। দলের নেতা বলল।

কিন্তু ওর মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে। চিকিৎসার প্রয়োজন।

আপনার যখন এত দরদ, তখন আপনি টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যান।

অর্জুন গাড়ির ভিতরটা দেখল। নিমা তখনও ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে।

অর্জুন গলা তুলল, শুনছেন? দশ হাজার না দিলে আপনার ড্রাইভারকে ওরা ছাড়বে না। গোরু মারার শাস্তি। আপনি দিতে পারবেন?

নিমা হাত নামাল। ব্যাগ খুলে দেখল। তারপর ইংরেজিতে বলল, দুশো ডলারে হবে? আমার কাছে ইন্ডিয়ান কারেন্সি বেশি নেই।

অর্জুন তাকাল লোকগুলোর দিকে, উনি দুশো ডলার দিচ্ছেন। প্রায় ন'হাজার টাকা। ডলার নেবে তোমরা?

দলনেতা বলল, সেটা কী জিনিস?

আমেরিকার টাকা।

মাথা খারাপ! পাশের দেশ বাংলাদেশের টাকাই আজকাল দোকানদাররা নিতে চায় না, তো কত দূরের আমেরিকার টাকা কেন নেবে! দলনেতা বলল।

অর্জুন গাছে বাঁধা লোকটার সামনে গেল, নাম কী ভাই?

ননী, ননীগোপাল। বিড়বিড় করল লোকটা।

কোথায় যাচ্ছিলে? টেলিফোন নম্বর জানা আছে?

হ্যাঁ। নম্বরটা বলল ননীগোপাল।

এটা কোথাকার নম্বর?

দোমহনির।

কার নম্বর?

জানি না। আমার গাড়ি ভাড়ার। আমাকে বাঁচান বাবু।

অর্জুন ফিরে এল রাস্তায়, তোমাদের টাকা পাবে। কিন্তু ও মরে গেলে কিছুই পাবে না। ওর বাঁধন খুলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। আমি ফোন করে খবর দিচ্ছি। লোক এসে তোমাদের টাকা দিয়ে যাবে।

প্রস্তাব শুনে লোকগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। অর্জুন এগিয়ে গেল গাড়ির কাছে, ওরা ডলার নেবে না। আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন, তার ঠিকানা জানেন? তা হলে আমরা আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি।

মাথা নাড়ল নিমা, আমি টেলিফোন নম্বর জানি।

বলুন।

অর্জুন বলতেই ব্যাগ থেকে ছোট ডায়েরি বের করে নম্বর পড়ল নিমা।

নম্বর শুনে চিনতে পারল অর্জুন। ওটা শুভেন্দুশেখরের নম্বর।

আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি? এখানে বসে থাকলে কেউ না আসা পর্যন্ত যেতে পারবেন না। বিকেল থেকেই এই রাস্তায় বুনো হাতির দল পায়চারি করে।

কিন্তু আমি আপনাকে চিনি না... নিমা এবার মনে করতে পারল। তার মুখের চেহারা বদলাল।

আপনি, আপনি কে?

আমি আপনার হিতৈষী। মিস্টার শুভেন্দুশেখর আপনার কথা বলেছেন আমাকে। যাক গে, আপনি ইচ্ছে করলে আমার ট্যাক্সিতে উঠতে পারেন। আমি আপনাকে শুভেন্দুশেখরের বাড়িতে পৌঁছে দেব। চাপা পড়া গোরুটা মরে যাওয়ার আগে চলে যাওয়া ভাল। অর্জুন পরামর্শ দিল।

নিমা দরজা খুলল।

অর্জুন লোকগুলোকে বলল, আমরা মালবাজার থেকে ফোন করে দিচ্ছি, যাতে ওই লোকটিকে ছাড়াতে দশ হাজার টাকা নিয়ে কেউ চলে আসে।

দলনেতা একটু আশ্বস্ত হয়ে আদেশ দিলে নীল অ্যাম্বাসাডরের ড্রাইভারের বাঁধন খুলে নামিয়ে আনল দুটো লোক। শুইয়ে দিল রাস্তার পাশে।

ভীম নিমার মালপত্র নিজের ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছিল। এবার অর্জুন বসল সামনে, ভীমের পাশে। পিছনে নিমা। ট্যাক্সি চলল মালবাজারের দিকে। কেউ কোনও কথা বলছিল না। হঠাৎ ভীম শব্দ করে হাসল।

অর্জুন তাকাতে সে বলল, একবার আমি একটা মুরগি চাপা দিয়েছিলাম। লোকজন এসে ধরল, ক্ষতিপূরণ দাও। এক কেজি ওজনের মুরগি। আমি ষাট টাকা দিতে ওরা প্রায় মারতে এল। হ্যাঁ, মুরগিটার দাম গোটা কিনলে ষাট টাকা হতে পারে, কিন্তু ও অন্তত একশোটা ডিম দিত। তার দাম দুশো টাকা। সেই ডিম থেকে অন্তত দশটা বাচ্চা হত। ষাট টাকা করে হলে দশটার দাম হত ছ'শো টাকা। মোট আটশো ষাট টাকা। মানুষ চাপা পড়লে লোকে এত টাকা চায় না!

মালবাজার পৌঁছে একটা টেলিফোন বুথে ঢকল অর্জুন। নীল অ্যাম্বাসাডরের ড্রাইভারের বলা নম্বরটা ডায়াল করল সে। কম্পিউটার জানাল, দিস নম্বর ইজ নট অ্যাভেলে। অর্জুন হকচকিয়ে গেল। শোনা নম্বর মনে রাখতে গিয়ে ভুল করে বসল সে! না, তা তো হওয়ার কথা নয়। তা হলে লোকটাই তাকে মিথ্যে নম্বর দিয়েছে? ওই অবস্থায় তা কি কেউ দেয়? রি-ডায়াল বোতাম টিপল অর্জুন। পাঁচ গোনার আগেই রিং শুনতে পেল সে। তারপরেই একটা মোটা গলা 'হ্যালো' বলল।

অর্জুন গলাটা যতটা সম্ভব সহজ করল, হ্যালো! আমি মালবাজার থেকে বলছি। একটা নীল অ্যাম্বাসাডরের ড্রাইভার বাগরাকোটের কাছে হাইওয়ের উপর বড় অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন?

তো আমি কী করব?

ড্রাইভারকে লোকজন বেঁধে রেখেছে। একটা গোরু মারা গিয়েছে। ওরা দশ হাজার টাকা না দিলে কিছুতেই ছাড়বে না। অর্জুন বলল, ড্রাইভারের নাম ননীগোপাল। সে-ই আপনার নম্বর দিয়ে ফোন করতে বলল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর লোকটা জিজ্ঞেস করল, ঠিক কোন জায়গায়?

মালবাজার থেকে হাইওয়ে ধরে গেলে মিনিট আটেক দুরে।

কেউ মারা গিয়েছে?

এতক্ষণে গিয়েছে, একটা গোরু।

গাড়িতে আর কেউ ছিল?

হ্যাঁ। বলেই লাইনটা কেটে রিসিভার নামিয়ে রাখল অর্জুন। লোকটার ফোনে যদি সি এল আই থাকে, তা হলে নম্বর দেখে এখনই ফোন করতে পারে। ফোনের টাকা দিতে গিয়ে অর্জুন বুঝল, সে মোবাইলে ফোন করেছে। এই নম্বরটা সে মনে রেখেছিল ঠিকই, কিন্তু খেয়াল করেনি। ফেরত নিয়ে সে বিড়বিড় করল, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, কোচবিহারে যেতে হবে এখন। কথাটা নিশ্চয়ই এসটিডি বুথের ছেলেটি মনে রাখবে। কেউ খোঁজ করতে এলে জানিয়ে দেবে কোচবিহার যাওয়ার কথা।

দোমহনি হয়ে না গিয়ে, ময়নাগুড়ির মোড় ঘুরে তিস্তা ব্রিজের সামনে এসে ভীমকে গাড়ি থামাতে বলল অর্জুন। গাড়ি থেমে গেলে পিছন ফিরে দেখল, নিমা শক্ত হয়ে বসে আছে। অর্জুন বলল, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

নিমা নিশ্চুপ।

এয়ারপোর্টে নামার পর লোকটার গাড়িতে উঠেছিলেন আপনি। কোথায় যাচ্ছিলেন? .

আবার ডায়েরি দেখল নিমা, জলপাইগুড়ি।

আপনি কি ভেবেছিলেন, জলপাইগুড়ি থেকে মিস্টার শুভেন্দুশেখর আপনার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছিলেন?

আর কেউ তো জানে না আমি ওই ফ্লাইটে আসছি।

আপনি সত্যি কথা বলছেন?

আপনি কী বলতে চাইছেন?

আপনার বন্ধু নভেন্দু জানে আপনি আসছেন?

একসময় সে আমার বন্ধু ছিল, এখন নয়। তা ছাড়া আমার আসার কথা। তার জানা সম্ভব নয়।

আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি মিস্টার শুভেন্দুশেখর পাঠাননি, পাঠিয়েছিল নভেন্দু। অর্জুন বলল।

অসম্ভব। সে আমার সঙ্গে যোগাযোগই রাখে না। নিমা মাথা নাড়ল, কিন্তু এসব কথা আপনি কী করে জানলেন?

মিস্টার শুভেন্দুশেখর আমাকে বলেছেন।

কেন?

উত্তরটা ওঁর কাছেই জানতে চাইবেন। এয়ারপোর্টে গাড়ি উনি পাঠাননি। পাঠালে, ড্রাইভার আপনাকে জলপাইগুড়ির উলটো রাস্তায় নিয়ে যেত না।

উলটো রাস্তায়?

হ্যাঁ। অ্যাকসিডেন্টটা হওয়ায় আপনি বেঁচে গিয়েছেন। অবশ্য আপনার কথা যদি সত্যি হয়। ঘুরে বসল অর্জুন। ভীম গাড়ি চালু করল।

.

শুভেন্দুশেখর কোনও উত্তাপ দেখালেন না। মাথা নেড়ে বললেন, ওয়েলকাম, আমার এই বাড়িতে কোনও মহিলা নেই। থাকতে অসুবিধে হলে তোমাকে মানিয়ে নিতে হবে।

অনেক ধন্যবাদ। তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে নিমা বলল, আপনাকেও।

শুভেন্দুশেখর বললেন, তোমার সঙ্গে নিমার দেখা হল কী করে?

অর্জুন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে জানাল।

চুপচাপ শুনে শুভেন্দুশেখর বললেন, নিমা এসেছে নভেন্দুর সন্ধানে। ওই গাড়িতে থাকলে নিশ্চয়ই তার দেখা পেয়ে যেত। তুমি বাগড়া দিলে কেন? কথাগুলো ভদ্রলোক বলছিলেন বাংলায়।

নিশ্চয়ই পেতেন। তারপর ওঁর কী হত, সেটাও কল্পনা করতে পারি।

কীরকম?

আপনার কথা শুনে আমার মনে হয়েছে, এক লক্ষ ডলার নিমা কখনওই ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন না। নিমাকে হাতের মুঠোয় পেলে ও ওঁর মুখ বন্ধ করে দেবে অনায়াসে। তা ছাড়া যেখানে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, সেখানে নভেন্দু কখনওই নিজে আসবে না। লোক পাঠাত। তারাই নিমাকে নিয়ে যেত। আমরা নভেন্দুর হদিশ আর পেতাম না। অর্জুন বলল।

এখন কী করে পাবে?

এত দিন নিমা-ই নভেন্দুকে খুঁজেছেন, এখন নভেন্দু ওঁকে খুঁজবে। নিমা কার সঙ্গে কোথায় গিয়েছেন, তা ড্রাইভার ননীগোপালের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এসটিডি বুথের ছেলেটা বলবে, যে ফোন করেছিল সে কোচবিহার গিয়েছে। তাই না?

শুভেন্দুশেখর মাথা নাড়লেন, এসব না করে কিডন্যাপিং-এর অভিযোগ এনে ড্রাইভারটাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলে সে-ই নভেন্দুকে ধরিয়ে দিত।

পুলিশ কেন ধরবে নভেন্দুকে? ওর বিরুদ্ধে কী চার্জ আনবে? মাথা নাড়ল অর্জুন। আপনি এঁকে দু-তিন দিন এই বাড়ির বাইরে যেতে দেবেন না।

এতক্ষণ নিমা চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। একটি পাকিস্তানি মেয়ের পক্ষে বাংলা বোঝা সম্ভব নয়। এবার সে ইংরেজিতে বলল, এই ভদ্রলোক বলছেন, আমার আসার কথা নভেন্দু জানে। একেবারেই অসম্ভব। আমি তার ঠিকানা জানি না। আমাকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে সে। একমাত্র আপনাকে ছাড়া আমি কাউকে জানাইনি।

তা হলে কে তোমাকে জলপাইগুড়ির উলটো দিকে নিয়ে যেতে গাড়ি পাঠাল?

আমি জানি না। হয়তো ড্রাইভারটা ভেবেছিল, আমার কাছে অনেক ডলার আছে। নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছিনতাই করবে বলে ভেবেছিল। নিমা বলল।

তা হলে আপনার নাম প্ল্যাকার্ডে লিখে গেটে দাঁড়াবে কী করে?

ব্যাপারটা ভাবেনি নিমা। এবার বলল, ও, মাই গড!

শুভেন্দুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি প্লেনের টিকিট কিনেছিলে এয়ারলাইন্সের অফিসে গিয়ে না এজেন্টকে ফোন করেছিলে?

এজেন্টের কাছ থেকে। লোকটা খুব পপুলার বাংলাদেশি।

কী করে চিনলে ওকে? নভেন্দু কি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল?

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় হয়ে গেল নিমার। নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

তা হলে অর্জুন যা সন্দেহ করছে, তাই ঠিক। ওই এজেন্টের সঙ্গে নভেন্দুর এখনও যোগাযোগ রয়েছে। তোমার আসার খবর তার কাছ থেকেই পেয়েছে।

অর্জুন বলল, এখন আমি উঠি।

নিমা তাকাল। তারপর শুভেন্দুশেখরকে জিজ্ঞেস করল, ইনি কে?

ওর নাম অর্জুন। টুথ ইনভেস্টিগেটর। আমি ওকে একটা দায়িত্ব দিয়েছি। শুভেন্দুশেখর গম্ভীর গলায় বলে বেল টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজের লোক পৌঁছে গেল।

শুভেন্দুশেখর বললেন, মেমসাহেবকে গেস্টরুমে নিয়ে যা। আমেরিকা থেকে এসেছেন। ওর খাওয়া-থাকার যেন কোনও অসুবিধে না হয়!

অর্জুন বেরিয়ে এল।

.

পরের দিন সকালে খবরের কাগজের তিন নম্বর পাতায় নজর আটকে গেল অর্জুনের। বাগরাকোটের কাছে দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে রিপোর্টার জানিয়েছেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ড্রাইভারের পরিচিত লোক এসে দশ হাজার টাকা দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। ড্রাইভার ততক্ষণে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এখন অবধি তাকে কোনও হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে কিনা, জানা যায়নি। খবর পেয়ে ড্রাইভারের স্ত্রী উদবিগ্ন হয়ে থানায় খোঁজ করে বিফল হয়। সে এখন কোথায়, তা পুলিশ বলতে পারেনি।

রির্পোটারটিকে অর্জুন চেনে। ডায়েরি থেকে নম্বর বের করে ফোন করল সে।

রিপোর্টার বললেন, আপনি এই কেসটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড হলেন বলে ভাল লাগছে। ননীগোপালের স্ত্রীকে পুলিশ বিন্দুমাত্র সাহায্য করছে না।

ননীগোপালের বাড়ি কোথায়?

বার্নিশে। বার্নিশ বাজারের যে কেউ বলে দেবে।

যে-লোকটা টাকা মিটিয়ে ননীগোপালকে নিয়ে গিয়েছে, তার নাম জানা গিয়েছে?

না। গ্রামের লোকগুলো টাকা পেয়ে আর পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

লোকটা ননীগোপালকে নিয়ে কোথায় যেতে পারে বলে মনে হয় আপনার?

আমি বুঝতে পারছি না। কোনও হাসপাতালে যে নিয়ে যায়নি, তা আমি জানি।

টেলিফোন রেখে বাইক নিয়ে বের হল অর্জুন।

.

বার্নিশ পৌঁছোতে মিনিট কুড়ি লাগল। বাজারে ননীগোপালের খোঁজ করতে তিন-চারজন জুটে গেল। এরা সবাই জেনে গিয়েছে ননীগোপালের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে এবং তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। অর্জুনকে পুলিশের লোক বলে ভুল করেছিল ওরা।

অর্জুনকে একটু মিথ্যে বলতে হল, আমি খবরের কাগজ থেকে আসছি। আপনারা ননীগোপালকে চিনতেন?

একজন বয়স্ক লোক বললেন, ছেলেবেলা থেকে চিনি ওকে।

কীরকম লোক?

আগে তো ভালই ছিল। রোজ রাতে ট্যাক্সি চালিয়ে ফিরে আসত। মাসখানেক হল সাত দিন-দশ দিন পরে আসে। থাকে না, চলে যায়। শুনেছি, ওর বউকে নাকি মোটা টাকা দিয়ে যায়। বয়স্ক লোক বললেন।

কোথায় কাজ নিয়েছিল, কিছু বলেছে?

না। মাসখানেক হল, বাড়িতে এলে পাড়ার লোকদের এড়িয়ে চলত।

ওর স্ত্রী?

সে তো সকাল থেকে থানায় গিয়ে বসে আছে।

থানায় চলে এল অর্জুন। বারান্দার বেঞ্চিতে গ্রাম্য চেহারার একটি মহিলা চুপ করে বসে আছে। বাইক থেকে নেমে তার সামনে গিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ননীগোপালের স্ত্রী?

অবাক হয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল মহিলা।

ওর কোনও খবর পেলেন?

না।

পুলিশ কী বলছে?

কিছু না।

ডায়েরি করেছেন?

আমার সঙ্গে কথাই বলছে না।

আসুন আমার সঙ্গে।

অর্জুন ভিতরে ঢুকল। একনজর তাকিয়েই বুঝল, এখানকার কাউকে সে চেনে না। একজন সাব ইনস্পেক্টর চেঁচিয়ে উঠলেন, এই যে! আবার ভিতরে ঢুকেছ? তোমাকে নিষেধ করেছিলাম না। যাও, বাড়ি যাও।

অর্জুন অফিসারকে বলল, উনি আমার সঙ্গে এসেছেন।

আপনি কে?

বলছি। তার আগে বলুন, ওঁর স্বামীকে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ আপনারা এই অভিযোগটা ডায়েরিতে লিখছেন না কেন?

আমরা কী করছি বা না করছি, তার কৈফিয়ত আপনাকে কেন দেব? খিঁচিয়ে উঠলেন অফিসার, সবে একটা রাত গিয়েছে, হয়তো কোথাও বেড়াতে গিয়ে আটকে গিয়েছে ওর স্বামী, পাগল করে দিল!

চেয়ার টেনে বসল অর্জুন, ননীগোপালের বেড়াতে যাওয়া দূরের কথা, হাঁটার ক্ষমতাও ছিল না। একটা অ্যাকসিডেন্ট করার জন্য ওকে প্রচুর মারধর করা হয়েছিল। তারপর ওর পরিচিত কেউ টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোনও হাসপাতালে ওকে ভরতি করা হয়নি। আমার আশঙ্কা, ও বেঁচে না-ও থাকতে পারে।

আপনার আশঙ্কা? আপনি ননীগোপালের কে হন?

কেউ না।

তা হলে আমাদের কাজ করতে দিন।

অফিসার, এটাও কাজ।

ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, উঠে তাঁর সামনে দাঁড়াল অর্জুন, ব্যাপারটা জানার পরেও আপনি ডায়েরি নিচ্ছেন না কেন?

তা হলে দিনে হাজারখানেক ডায়েরি নিতে হয়!

এবার আপনার সততা সম্পর্কে সন্দেহ হচ্ছে আমার।

তার মানে?

মনে হচ্ছে, কারও নির্দেশে আপনি নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন।

তার মানে? একথা বলার জন্য আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি।

ক্ষমতা হাতে থাকলে মনে হয় সব কিছু করা যায়। কিন্তু মুশকিল হল, যে-কোনও ক্ষমতার একটা সীমা থাকে। অর্জুন হাসল।

এই সময় সাদা পোশাকের এক প্রবীণ ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার সাহা?

সাব ইনস্পেক্টর উত্তেজিত হয়ে ভদ্রলোকের কাছে অভিযোগ জানালেন।

অত্যন্ত অন্যায় কথা। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, আপনি কী বলতে চাইছেন? কার নির্দেশে আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারি?

আপনি?

আমি এই থানার ওসি।।

নমস্কার। আমি অভিযোগ ওঁর সম্পর্কে করেছি, আপনাদের কথা বলিনি।

আপনি কোথায় থাকেন?

জলপাইগুড়িতে।

কী নাম?

অর্জুন।

অর্জুনবাবু, আমি ভেবে পাচ্ছি না, দোমহনির এক ড্রাইভারের ব্যাপারে আপনি জলপাইগুড়ি থেকে এখানে ছুটে এসেছেন কেন? ওসি জিজ্ঞেস করলেন।

অর্জুন পকেট থেকে কার্ড বের করে এগিয়ে দিল।

ওসি সেটা নিয়ে দেখলেন, ও মাই গড! সরি অর্জুনবাবু, আপনাকে আমি চিনতে পারিনি। আসুন, আমার ঘরে আসুন।

মিনিট দশেকের মধ্যে ডায়েরি লেখা হয়ে গেল। ননীগোপালের স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন ওসি। ইতিমধ্যে চায়ের হুকুম দিয়েছিলেন। চা এল। অর্জুন বলল, এবার বলুন তো, ডায়েরি নিচ্ছিলেন না কেন?

ব্যাপারটা হল, এই এলাকার লোকজন এত আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে থানায় নালিশ জানাতে আসে যে, সেগুলো খাতায় তুলে দেখা যায়, এনকোয়্যারি করার কোনও মানে হয় না। অবশ্য এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। সাহাই হ্যাঁন্ডেল করছিল। ওসি কৈফিয়ত দেওয়ার মতো করে বললেন।

এখন ডায়েরি হওয়ার পরে যদি দয়া করে মিস্টার সাহা ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে তদন্ত করান, তা হলে ভাল হয়। অর্জুন বলল।

কেন বলুন তো? ওসির চোখ ছোট হল, এনি ফাউল প্লে?

না না। উনি তো ননীগোপালের স্ত্রীর উপর বেশ বিরক্ত হয়ে আছেন; তাই।

ও কে! আপনাকে কথা দিচ্ছি, এই কেসটা আমি নিজেই দেখব।

আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে কয়েকটা পয়েন্ট বলতে পারি?

শিয়োর। প্যাড টেনে নিয়ে কলম খুললেন ওসি।

এক নম্বর হল, ননীগোপাল গত এক মাস ধরে কার জন্য ট্যাক্সি চালাচ্ছে? ওর পরিচিতজনরা বলেছে, এর জন্য ও ভাল টাকা পেয়েছে। দুই, কাজের চাপে ও প্রায়ই বাড়ি ফিরতে পারত না। কোথায় থাকত? তিন, গতকাল দুপুরে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে ও কার নির্দেশে গিয়েছিল? ও হ্যাঁ, আপনার মোবাইল নম্বর পেতে পারি?

নিশ্চয়ই। পুলিশ জানার আগেই আপনারা যে কী করে এত জেনে যান!

অর্জুন উঠে দাঁড়াল। ওসি তাকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, ওই ব্যাপারটা ভুলে যান অর্জুনবাবু। বড়সাহেবদের কানে কথাটা... পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলেন তিনি।

না না। একান্ত বাধ্য না হলে নালিশ করার অভ্যেস আমার নেই। অর্জুন কার্ড পকেটে রাখল। সাব ইনস্পেক্টর সাহাকে ধারে-কাছে দেখতে পেল না অর্জুন।

বাইক নিয়ে জলপাইগুড়িতে ফিরতে গিয়ে মত বদলাল সে। অনুমান সত্যি হয়েছে কিনা, তা মিলিয়ে নেওয়া দরকার। ঝড়ের মতো বাইক চালিয়ে সে মালবাজারে পৌঁছে গেল পঞ্চাশ মিনিটে। গতকালের সেই টেলিফোন বুথে ঢুকে দেখল, ছেলেটা উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে। কালকের ছেলেটাই। অর্জুন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, চিনতে পারছ ভাই?

মাথা নাড়ল ছেলেটি, না।

এত লোক সারাদিনে ফোন করে যায়, মনে রাখা মুশকিল।

গতকাল এখানে ফোন করতে এসেছিলাম। একটা কাগজে নম্বরটা লেখা ছিল। বোধহয় এখানেই ফেলে গিয়েছি কাগজটা। অর্জুন বলল।

না। আমি দেখতে পাইনি।

ওঃ! কোথায় যে ফেললাম। তখন কোচবিহারে যাওয়ার এত তাড়া ছিল যে... আচ্ছা! অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। ছেলেটি উত্তেজিত হল, মনে পড়েছে। আপনি এখান থেকে ফোন করেছিলেন। তারপর... আচমকা থেমে গেল ছেলেটি।

আমার খোঁজ করতে কেউ এসেছিল। তাই তো?

হ্যাঁ। আমি তাকে বলেছিলাম, আপনি কোচবিহারে চলে গিয়েছেন। লোকটা জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কোচবিহারের কাউকে ফোন করেছেন কিনা? করেননি শুনে হতাশ হয়ে চলে গেল! ছেলেটা দ্রুত গতকালের রসিদ দেখে একটা কাগজে নম্বরটা লিখে এগিয়ে দিল, যদি লোকটা আবার আসে, তা হলে আপনার ঠিকানাটা বলব?

আমার কোনও ঠিকানা নেই। কাগজটা পকেটে রেখে বেরিয়ে এল অর্জুন। অনুমান সত্যি হলে বেশ ভাল লাগে।

.

পরের দিন সকালে শুভেন্দুশেখরের ফোন এল, অর্জুন, একবার এসো। বলেই রিসিভার রেখে দিলেন। ভদ্রলোকের স্বভাবে একনায়কতান্ত্রিক মেজাজ আছে। এমন মানুষই পারেন ছেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।

বাইকটা কাল একটু গোলমাল করেছিল। ওটাকে গ্যারাজে দিয়ে রূপশ্রীর সামনে আসতেই নিজের নাম শুনতে পেল অর্জুন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, নির্মাল্য দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুন কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই বলেছিলি দিল্লি ফিরে যাবি, তাই আর খোঁজ করিনি। তা হলে ক'দিন আছিস?

হ্যাঁ। থাকতে হচ্ছে।

সন্ধেবেলায় থাকবি? আড্ডা মারতে যেতে পারি। অর্জুন হাসল।

তোর কি এখন কোনও কাজ আছে? নির্মাল্য জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করব। মিনিট পনেরো লাগবে।

এক কাজ কর, ঠিক চল্লিশ মিনিট পরে রাজবাড়ির গেটের সামনে চলে আয়। দেরি হবে বুঝলে আসিস না। আমি পাঁচ মিনিট তোর জন্য অপেক্ষা করব।

কী ব্যাপার রে?

তুই ঘুরে আয়, বলব। তোর সাহায্য চাই।

ঠিক আছে। অর্জুন একটা রিকশা নিল।

৩. খাল কেটে কুমির আনা

শুভেন্দুশেখরবাবু বললেন, নিমাকে এ-বাড়িতে আনার অনুমতি দেওয়া যে খাল কেটে কুমির আনা, তা জানতাম না অর্জুন।

সমস্যাটা কী?

আবদার! তাকে গাড়ি ভাড়া করে দিতে হবে এবং সেই গাড়িতে চেপে সে নর্থ বেঙ্গল চষে বেড়াবে ছোকরাকে খুঁজে বের করার জন্য।

ওই জন্যই তো উনি এসেছেন।

হ্যাঁ। আমি তাকে বলেছি, নভেন্দুকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব তুমি নিয়েছ। কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলেই সে হদিশ পেয়ে যাবে। তখন যা ইচ্ছে, তাই করতে পারো। কিন্তু এমন অবাধ্য মেয়ে, আমার কথা শুনতেই চাইছে না। হাত নাড়লেন ভদ্রলোক, দ্যাখো, ওকে বুঝিয়ে বলতে পারো কিনা? বলে দিয়ো, ওসব করতে হলে এ-বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে।

অর্জুন শান্ত গলায় বলল, উনি অত দূর থেকে এসেছেন নভেন্দুকে খুঁজে বের করতে। বাড়িতে না বসে থেকে যদি সেই চেষ্টা করেন, তা হলে আপনি আপত্তি করছেন কেন? আপনিও তো নভেন্দুর ঠিকানা চান। আমি আর নিমা যদি দু'রকমভাবে খোঁজাখুঁজি করি, তা হলে...

জ্ঞান দিয়ো না আমাকে। আজ সকালে শিলিগুড়ির আকাশবাণীর খবরে শুনেছি, ওই যে ড্রাইভারটা, কী নাম যেন, হ্যাঁ, ননীগোপাল, তার ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে কাঠামবাড়ির কাছে। তুমি বলেছিলে, লোকটাকে পাবলিক মারধর করেছিল বটে, কিন্তু মেরে ফেলতে চায়নি। রাইট?

হ্যাঁ। টাকা আদায় করার জন্য।

তা হলে চিকিৎসা হলে মারা যেত না। মরল কেন?

আমরা নানারকমের অনুমান করতে পারি। সত্যি ঘটনাটা জানি না।

ওয়েল। এই মেয়েটাও আমার বাড়িতে থেকে ওসব করতে গিয়ে মারা যেতে পারে। আমি তা চাই না। আবার ওর আসল মতলবটা কী, তাও তো আমার জানা নেই। ভাল না মন্দ তা ঈশ্বর জানেন! বাড়িতে থাকলে চোখের উপর থাকবে, তাতে স্বস্তি পাব। তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো। বেল টিপলেন শুভেন্দুশেখর। সঙ্গে সঙ্গে কাজের লোকটি দেখা দিল। শুভেন্দুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, মেমসাহেব কী করছে এখন?

ঘুমোচ্ছেন।

হুম।

বোধহয় জেট ল্যাগ। আমি বরং বিকেলের দিকে আসব।

এসো।

.

নির্মাল্য বলল, ভাবছিলাম, তুই পৌঁছোতে পারবি না। ওঠ, তোর বাইক কোথায়? কাল তো বাইকে ঘুরছিলি।

গোলমাল করছিল, সারাতে দিয়েছি।

ওটা একটা অপদ। দু'চোখে দেখতে পারি না। দিল্লিতে ওই বাইক বাহিনীর দৌরাত্মে গাড়ি চালাতে ভয় হয়। বলে নির্মাল্য ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে বলল। এটা একটা টাটা সাফারি। ড্রাইভার নেপালি।

নির্মাল্য ইংরেজিতে কথা শুরু করল, বাংলা বললে এই লোকটা বুঝতে পারবে। তাই জরুরি কথাগুলো ইংরেজিতেই বলা যাক। আমি কি তোকে বিশ্বাস করতে পারি?

অর্জুন বলল, সেটা তোর উপর নির্ভর করছে।

দ্যাখ, আমি এখানে এসেছি একটা বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায়ই অভিযোগ করছে, এদিকের সীমান্ত পেরিয়ে প্রচুর মানুষ ঢুকে পড়ছে। সাধারণ মানুষ যেমন আসছে, তেমনই বাংলাদেশে তাড়া খাওয়া সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে এসে লুকিয়ে পড়ছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, সীমান্ত পাহারা দেওয়া যাদের কাজ, সেই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স কী করছে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিযোগ ঠিক হলে বলতে হবে, তারা তাদের কাজ ঠিকভাবে করছে না। কিছুদিন আগে দিল্লিতে যে বিস্ফোরণ সন্ত্রাসবাদীরা ঘটাল, তাতে কাদের সন্দেহ করা হচ্ছে? একান্ত গোপনে আমাদের এই এলাকার সীমান্তের গ্রামগুলোতে কথা বলে জানতে চেয়েছিলাম, ব্যাপারটা কী। তোকে বলতে দ্বিধা নেই। দিল্লিতে ফিরে গিয়ে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমর্থনে কোনও রিপোর্ট দিতে পারব না। নির্মাল্য বলল।

কেন?

অন্তত জনাপঞ্চাশেক লোককে জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু একজনও মুখ খোলেনি।

মানে?

কেউ কিছু জানে না, শোনেনি, দ্যাখেনি।

তা হলে?

তা হলে ঘটনাটা ঘটছে না।

সেই রকমই তো বলতে হয়।

কিন্তু আজ সকালে এই চিঠিটা পেয়েছি। দরোয়ানকে দিয়ে গিয়েছিল। যে দিয়েছে, তাকে দরোয়ান কখনও দ্যাখেনি। পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে এগিয়ে ধরল নির্মাল্য। ইংরেজিতে লেখা। আপনি সীমান্তে ঘোরাঘুরি করে মানুষজনকে আতঙ্কগ্রস্ত করছেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। অবশ্য জীবনের জন্য মায়া না থাকলে, আপনি থাকতে পারেন। নীচে লেখা, ওয়েল উইশার।

এই চিঠির মানে, তোর গতিবিধি আর গোপন নেই। তুই কোথায় উঠেছিস, তাও কিছু লোক জেনে গিয়েছে। এরা কারা? অর্জুন চিঠি ফেরত দিল।

যারা তোক পারাপারের ব্যাবসা করে। স্বার্থে ঘা লাগছে তাদেরই।

তুই থানাকে জানিয়েছিস?

না। এত তাড়াতাড়ি নিজেকে এক্সপোজ করতে চাই না।

গাড়ি ততক্ষণে তিস্তা ব্রিজ ছাড়িয়েছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

ওই জন্যই তোর সাহায্য চাইছি। তুই গীতলদহের নাম শুনেছিস?

গীতলদহ? নিশ্চয়ই কথাটা অবশ্য গীদালের দহ অর্থাৎ নাম! গীদাল হল ওখানকার মানুষের ভাষায় গায়ক। গায়কের গ্রাম। গীদাল থেকে গীতাল। গীতাল মানে যারা গীত গায়। এরা কোচবিহারে তো বটেই, বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। তুই গীতলদহে যাচ্ছিস কেন? অর্জুন বলল।

একজন গীতালের সঙ্গে দেখা করতে। নির্মাল্য বলল।

কেন?

এই লোকটির কাছে সঠিক খবর পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু আমি তোকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

দ্যাখ, আমি জানি না কেউ আমাকে ফলো করছে কিনা। এই গাড়ি নিয়ে আমি গীতলদহে যাব না। তুই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে গিয়ে লোকটার সঙ্গে দেখা করবি। বাজিয়ে দ্যাখ, ও কিছু জানে কিনা। তোকে কেউ সন্দেহ করবে না। নির্মাল্য বলল।

লোকটার নাম কী?

পাগল বর্মন।

অদ্ভুত নাম তো!

নির্দিষ্ট জায়গায় আবার দেখা হবে এবং সেটা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে।

ট্যাক্সি নিয়ে সোজা গীতলদহে চলে গেল অর্জুন। ট্যাক্সিওয়ালাকে নাম বলতেই লোকটা হাসল, হ্যাঁ, চিনি। ওঁকে কে না চেনে! পাগলদাকে বাংলাদেশের মানুষও চেনে।

অতএব পাগল বর্মনের বাড়িতে পৌঁছোতে অসুবিধে হল না। বাড়ির সামনে কয়েকটি সুপারি গাছ। সুপারি পাড়ছে একটি কিশোর। নীচে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একটি লোক, খালি গা, পরনে লুঙ্গি। ড্রাইভার বলল, ওই তো পাগলদা।

ট্যাক্সি থেকে নেমে কাছে গিয়ে ‘নমস্কার’ বলতেই লোকটি কপালে দুটো হাত ঠেকিয়ে বলে উঠল, আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য। তা মহাশয় অপরিচিত, কোত্থেকে আগমন?

জলপাইগুড়ি থেকে।

অভিপ্রায়?

আপনার গানের কথা খুব শুনেছি, এবার গান শুনতে চাই। অর্জুন বলল।

পাগল বর্মন হাসলেন। হরি বলো মন অসনা/মানব দেহটার গৈরব কৈরো না। চমৎকার গলায় দুটি লাইন গেয়ে বললেন, কোথায় যেতে হবে গো?

জলপাইগুড়ি।

যাব। নিশ্চয়ই যাব। দিনটা কবে?

সামনের মাসে। আমরা আপনাকে জানিয়ে দেব।

দিয়ো।

কত দক্ষিণা আপনার?

যা তোমার মন খুশি হয় দেবে। এই তো, গেল মাসে রংপুরে গাইলাম, ওরা আমাকে বারোখানা লুঙ্গি দিল। বলল, বারো মাসে পরবেন। প্রত্যেক মাসে নতুন নতুন লুঙ্গি। কী মজা! শিশুর মতো হাসলেন পাগল বর্মন।

আপনি রংপুরে গান গাইতে যান?

কেন যাব না? যারা ভালবেসে ডাকে, তাদের কাছে কেন যাব না?

আপনার নিশ্চয়ই পাসপোর্ট আছে। ভিসাও নিতে হয়।

হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন পাগল বর্মন, ওই যে ওই চিল, এখানে উড়ছে আবার বাংলাদেশেও উড়ে বেড়াচ্ছে। ওর কোনও পাসপোর্ট ভিসার প্রয়োজন হয়? নদী বয়ে যায় এপার থেকে ওপারে, আটকাও দেখি কেমন ক্ষমতা। আমি ভালবাসার গান গাই। সবাই জানে। যখন যাই, তখন। মিলিটারিরা বলে, ওই চলল পাগলা। আমি তো অন্যায় করছি না, বাধা দেবে কেন? দেয় না।

কিন্তু যাদের মনে কুমতলব আছে, তাদের নিশ্চয়ই আটকানো হয়।

তারা সব জল গো। মুঠোয় ধরে চাপ দাও, আঙুলের ফাঁক গলে ঠিক বেরিয়ে যাবে। বলতে বলতে একটি লোকের দিকে নজর পড়ল পাগল বর্মনের। লোকটি এই পথে আসছিল। সম্ভবত ট্যাক্সি দেখে কৌতূহলী হয়েছে।

এই যে কালিপদ, ইদিকে এসো ভাই! পাগল বর্মন হাত তুলে ডাকলেন, এ ব্যাটা মহা শয়তান। মাগলিং করে।

মাগলিং মানে?

ওই যে এদিকের জিনিস ওদিকে, আবার ওদিকের জিনিস এদিকে নিয়ে এসে বিক্রি করে দেয়। ও একা নয়, দল আছে। ও কালিপদ, তোমাকে এখন মাসে কতবার বাংলাদেশে যেতে হয়? কাছে এসে দাঁড়ানো কালিপদকে জিজ্ঞেস করলেন পাগল বর্মন, সরল গলায়।

আঃ, কী হচ্ছে কী? বাইরের লোকের সামনে এসব কথা কেন? কালিপদ বিরক্ত।

আহা। তুমি তো সেই ঢাকা, ময়মনসিংহ ঘুরে এসেছ। এ তো গৌরবের কথা! তুমি তো একা যাও না, দলে যাও?

অর্জুন কথা বলল, ভিসা-পাসপোর্ট ছাড়া ওদেশে যাওয়া যায়?

হাসল কালিপদ, মশাইয়ের কী করা হয়?

ব্যাবসা।

যাওয়ার বাসনা আছে?

নিশ্চয়ই। কত নাম শুনেছি জায়গাগুলোর!

বেশি না, লোক আছে। হাজারখানেক দিলে একেবারে ঢাকায় পৌঁছে দেবে। কালিপদ বলল, ওদের টাকার চেয়ে আমাদের টাকা দামি। তাই ওদের দেশে যেতে মাত্র এক হাজারেই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওদের কাগজ ছাড়া এদেশে আসতে হলে সম্ভবত দশ হাজার নগদ গুনে দিতে হয়।

ওরেব্বাস! এত দিতে হয় কেন?

আরে মশাই, আপনি বংলাদেশে গেলে ঘুরে-ফিরে কাজ শেষ করে ফিরে আসবেন। পাকাপাকি তো থাকবেন না। কিন্তু ওদের দশজনের মধ্যে ন'জন থেকে যাওয়ার জন্য আসে। এসে রেশন কার্ড বানায়, ভোট দেয়। তাই এখানে আসার জন্য টাকাটা বেশি চাইবে দালালরা।

কিন্তু পাগল বর্মন মশাই...

ওঃ, ছেড়ে দিন। গায়ক বলে সাত খুন মাপ। আচ্ছা, চলি।

একটা কথা।

বলুন। কালিপদ দাঁড়াল।

যদি যাই, তা হলে বিপদে পড়ব না তো? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল কালিপদ, আপনি রাম-রহিমের ব্যানারে গেলে কেউ কিছু বলবে না?

সেটা আবার কী?

দু'জন লোক। একজন ইন্ডিয়ার অন্যজন বাংলাদেশের মানুষ। আসল নাম কী, তা আমরাও জানি না। একজন ওপারের সীমান্ত পার করে, আর একজন এপার থেকে নিয়ে যায়। ওদের দলে গেলে কেউ কিছু

বলবে না। পরশুদিন আমার যাওয়ার কথা। যেতে চান, চলে আসবেন বিকেলের আগে। আমি বলে রাখব। কিন্তু যাবেন কোথায়?

ঢাকায়।

বাংলাদেশের টাকা কিনতে হবে কিন্তু। আমাদের সত্তর টাকায় ওদের একশো পাবেন। ব্ল্যাকে কিনবেন বলে দাম বেশি পড়বে।

ঠিক আছে। বলতেই কালিপদ চলে গেল।

চুপচাপ শুনছিলেন পাগল বর্মন। এবার বললেন, একটা কথা বলি। আমাকে সবাই চেনে। ভালবাসে। জানে, আমার কোনও ধান্দা নেই। কিন্তু তুমি ভাই ন্যায়ের পথে না গিয়ে অন্যায়ের পথে যাবে কেন? শুনেছি, কলকাতার অফিসে আবেদন করলে সরকারি অনুমতি পাওয়া যায়। তাই নিয়ে গেলেই তো হয়। যেসব ছেলে ওপার থেকে আসে, তাদের মুখ দেখলে বড় কষ্ট হয়। সবসময় ভয়ে কুঁকড়ে থাকে।

আপনি ওদের দেখেছেন?

এই একটা দুর্ভাগ্য আমার মাঝে মাঝে হয়। হাতে-পায়ে ধরে, না বললে চোখ রাঙাবে। মেনে নিতে হয়। মাঝে মাঝে রাত্তিরবেলায় দু-চারজনকে নিয়ে এসে আমার এখানে রাখে। ভোর হওয়ার আগেই নিয়ে চলে যায়। ওদের ধারণা, আমার এখানে নিরাপদে থাকবে, কেউ সন্দেহ করবে না। চোখ-কান বুজে থাকি। কিন্তু মনের চোখ বুজব কী করে?

শেষ কবে এসেছিল?

গত হপ্তায়। বলে গিয়েছে, আজ আসতে পারে। আমি যেন কোথাও না যাই। বিষণ্ণ গলায় বললেন পাগল বর্মন।

.

জলপাইগুড়িতে ফেরার পথে নির্মাল্যকে সমস্ত ঘটনা জানাল অর্জুন।

নির্মাল্য বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, মুশকিল কী জানিস, সরকারিভাবে খোঁজ করতে গেলে কেউ মুখ খুলবে না। ওই রাম-রহিমের নাম কখনও কেউ শোনেইনি। তুই যা বললি, তা আমি রিপোর্টে লিখতে পারব না। কারণ, কোনও প্রমাণ দিতে পারছি না। ওই পাগল বর্মনই অস্বীকার করবেন এসব কথা।

অর্জুন বলল, মানুষটি কিন্তু খুব ভাল।

অস্বীকার করছি না। কিন্তু প্রাণের দায় বড় দায়।

প্রমাণ চাস? অর্জুন বলল, পুলিশকে বল, আজ রাতে পাগল বর্মনের বাড়িতে রেড করতে। কপাল ভাল থাকলে হাতেনাতে পেয়ে যাবি ওদের।

দুটো সমস্যা আছে। ধর, ওরা আজ পাগলের বাড়িতে এল না। খালি হাতে শুধু ফিরেই আসতে হবে না, খবরটা চাউর হয়ে যাবে। হাস্যাস্পদ হব। দ্বিতীয়ত, সরাসরি আমি পুলিশের কাছে যাব না। আমাকে দিল্লিতে জানাতে হবে। দিল্লি থেকে লোকাল পুলিশকে ইনফর্ম করবে। এক্ষেত্রে খবরটা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকছে। পাখি আগেই উড়ে যাবে। নির্মাল্য বলল।

তা হলে?

তোর মাথায় কিছু আসছে না?

অমল সোমের কথা মনে পড়ল অর্জুনের। অমলদা বলেছিলেন, শেয়াল কী করে কাঁকড়া ধরে জানো? কাঁকড়ার গর্তে লেজ ঢুকিয়ে দেয়। সেই লেজ যে নিরীহ তা বুঝে কাঁকড়া আক্রমণ করে। তখন ধীরে ধীরে লেজ বের করে আনে শেয়াল। লেজ ধরে ঝোলা কাঁকড়া তার খাদ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ ভিতরে গিয়ে আক্রমণ না করে প্রতিপক্ষকে বাইরে এনে তারপর শিকার করে শেয়াল।

অর্জুন উত্তেজিত হল। এইসময় একটা সিগারেট খেতে পারলে ভাল লাগত। মা ঝামেলা করায় আজকাল প্যাকেট কেনা বন্ধ করেছে বলে সঙ্গে সিগারেট নেই। নির্মাল্যর দিকে তাকাল অর্জুন। তারপর বলল, তোকে আজ আমার সঙ্গে রাত জাগতে হবে। এই গাড়ি যদি কেউ চিনে ফেলে, তাই ঝুঁকি নিয়ে অন্য গাড়ি ভাড়া কর। তোর তিস্তা ভবনে আমি রাত এগারোটায় পৌঁছে যাব।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? অবাক হল নির্মাল্য।

আর-একটু ভেবে নিই। রাতে তোকে বলব। অর্জুন হাসল, তোর পাল্লায় পড়ে আজ সারাদিন না খেয়ে আছি। বাড়িতে ঢুকলে মা ফায়ার করবেন। কিন্তু তার আগে এখনই একটু খাওয়া যাক। খিদে বেড়ে গেলে আমার মাথা কাজ করে না।

হাইওয়ের পাশে যে ধাবা রমরম করে চলে, সেখানে বসে খেতে নির্মাল্যর প্রবল আপত্তি। তার ধারণা, ওখানে খুব অযত্নে রান্না হয়। তা ছাড়া খাঁটিয়ায় বসে পাবলিকের সঙ্গে খাওয়া তার পক্ষে ঠিক হবে না। অতএব, ধাবার কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অর্জুন বাংলায় ড্রাইভারকে অনুরোধ করল, দু'প্লেট মটন চাপ আর চারটে রুমালি রুটি নিয়ে আসতে। তাদের খাবার এনে দিয়ে সে নিজেও যেন খেয়ে নেয়। নির্মাল্য বলল, তার আগে দুটো জলের বোতল কিনে নিয়ে এসো। টাকা দিয়ে দিল সে।

লোকটা চলে গেলে নির্মাল্য জিজ্ঞেস করল, কী ভাবলি?

দাঁড়া, আগে পেটে কিছু পড়ুক। অর্জুন ঘড়ি দেখল। বিকেল হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে ঢুকে আর বেরোতে ইচ্ছে করবে না। ফেরার পথে শুভেন্দুশেখরের বাড়ি ঘুরে যেতে হবে।

খাবার এল। নির্মাল্যকেও স্বীকার করতে হল, দিল্লির যে-কোনও ভাল রেস্তরাঁর চেয়ে কোনও অংশে খারাপ নয়। বিল মিটিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, তুই কি রাতে বেরোতে চাইছিস?

হ্যাঁ। ভোরের দিকে বেরোলেই হত। কিন্তু আমি রিস্ক নিতে চাইছি না।

কোথায় যাবি?

গীতলদহ।

ওই পাগলা বর্মনের বাড়িতে?

না। কাছাকাছি। ও হ্যাঁ। তুই কি আজই দিল্লিতে রির্পোট পাঠাবি?

হ্যাঁ।

কিন্তু তুই তো আমার মুখ থেকে শুনেছিস। অন্যের কথা কি প্রমাণ হিসেবে ওরা মানবে? তার চেয়ে আজ থাক, প্রয়োজন হলে আগামীকাল রিপোর্ট পাঠাস। অর্জুন বলল।

মাথা নাড়ল নির্মাল্য, ঠিক আছে।

শুভেন্দুশেখরের বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামতে নামতে অর্জুনের মনে পড়ল, যারা নির্মাল্যর উপর নজর রেখেছে, তারাও গাড়ি ভাড়া করতে চাইলেই জানতে পারবে। তার চেয়ে ভীমকে যদি পাওয়া যায়, তা হলে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে। নির্মাল্যকে গাড়ি ভাড়া করতে নিষেধ করল সে। রাতে সে ট্যাক্সি নিয়েই তিস্তা ভবনে যাবে, নির্মাল্য যেন তৈরি থাকে।

শুভেন্দুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, কী হে, কত দূর এগোলে?

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অর্জুন বসল।

আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। ওই মেয়ে, নিমা বাইরে বেরিয়ে নভেন্দুকে খুঁজতে চাইছে। আমি আপত্তি করছি। কিন্তু ধরো, আমি যদি আপত্তি না করি? শুভেন্দুশেখর হাসলেন।

তার মানে? আপনি তো সকালেও বলছিলেন...।

এখন বিকেল। সকালের ভাবনা বিকেলে পালটে যেতেই পারে!

কিন্তু কেন মত বদলালেন?

তুমি বাংলা সাহিত্য পড়ো? শুভেন্দুশেখর সামনে ঝুঁকলেন।

বাংলা বই পড়তে আমার ভাল লাগে।

গুড। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলে একজন লেখক ছিলেন, জানো?

অর্জুন হাসল, জানি।

গুড। ওঁর লেখা একটা গল্পের নাম ‘টোপ’। ছাগলকে টোপ করেও যখন বাঘকে লোভী করা গেল না, তখন একটি শিশুকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করাতে কাজ হল। গল্পের শেষটা নিয়ে কিছু বলছি না, কিন্তু এই নিমাকে বাইরে যেতে দিলে নভেন্দু নিজের প্রয়োজনেই ওর কাছে আসবে। সেই সুযোগটা তোমাকে কাজে লাগাতে হবে। বুঝতে পেরেছ? শেষ দিকে কথাগুলো নিচু গলায় বলছিলেন ভদ্রলোক।

কিন্তু এতে নিমার প্রাণের ঝুঁকি থাকছে। অর্জুন বলল।

নো রিস্ক নো গেন।

একটাই প্রশ্ন, নভেন্দুকে পেলে আপনি কী করবেন?

আমেরিকান পুলিশের হাতে তুলে দেব।

আমি তা হলে এখন যাচ্ছি। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলার তো আর । কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি তো ওঁকে বাইরে যেতে দিচ্ছেন।

না। তুমি একটু অভিনয় করবে।

কীরকম?

ওর সঙ্গে দেখা করো। এদেশের কিছুই ওর জানা নেই। ওর সঙ্গে বসে তুমি কোথায় কোথায় ও নভেন্দুকে খুঁজবে, তার পরিকল্পনা তৈরি করে দাও। তা হলে ওর গতিবিধি তোমার জানা থাকবে। শুভেন্দুশেখর উপদেশ দিলেন।

ওঁর নির্দেশমতো কাজের লোক অর্জুনকে নিয়ে এল দোতলার পশ্চিম দিকের ঘরে। দরজায় নক করল লোকটা। তারপর সেটা ঈষৎ খুলে অর্জুনকে ভিতরে যেতে বলল। দরজা ঠেলে ঘরে পা দিতেই টিভির আওয়াজ কানে এল। সোফায় বসে টিভির খবরের দিকে তাকিয়ে ছিল নিমা। অর্জুনকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে বলল, এসব কী হচ্ছে? ওই বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে বন্দি করে রেখেছেন কেন?

আপনি মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন। অর্জুন হাসল।

মিছিমিছি! আমাকে উনি স্পষ্ট বলেছেন, একমাত্র এয়ারপোর্ট ছাড়া অন্য কোথাও যেতে পারব না। উনি চাইছেন না, আমি ওঁর ছেলেকে বিরক্ত করি। কিন্তু আমি এসব সহ্য করব না। ঠিক আছে, আমি দেশে

ফিরে যাচ্ছি, উনি আমাকে ডলারগুলো ফেরত দিয়ে দিন। সোজা বসে উঁচু গলায় কথাগুলো বলল নিমা।

আমি আপনাকে বলছি, আমার সঙ্গে কথা বলার পর উনি মত বদলেছেন। উনি ভয় পেয়েছিলেন, একা ঘুরলে আপনার বিপদ হতে পারে। আপনার ভাল চেয়েছিলেন উনি। কিন্তু আমি ওঁকে বোঝালাম, যিনি নিউ ইয়র্ক থেকে নর্থ বেঙ্গলে একা আসতে পারেন, তিনি নিজের নিরাপত্তার কথা নিশ্চয়ই ভাববেন। উনি কথাটা মেনে নিয়েছেন। এখন বলুন, আপনি কোথায় কোথায় যেতে চান। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। অর্জুন সোফায় বসল।

থ্যাঙ্ক ইউ।নিমা যেন একটু শান্ত হল। পাশে রাখা প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরাতে গিয়েও থেমে প্যাকেট এগিয়ে ধরল।

সিগারেটের ইচ্ছেটা চলে গিয়েছিল, কিন্তু নিমার সঙ্গে ভাব জমাবার উদ্দেশ্যেই একটা নিল অর্জুন। নিজেরটা ধরিয়ে নিমা অর্জুনের সিগারেটে আগুন দিল।

অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে নিমা বলল, আপনার কথা যদি ঠিক হয়, এয়ারপোর্টে যদি নভেন্দু গাড়ি পাঠিয়ে থাকে, তা হলে ওই ড্রাইভার ওর ঠিকানা জানে। আচ্ছা, এদিকে বার্নিশ বলে কোনও জায়গা আছে?

হ্যাঁ। আছে।

গুড। নামটা ঠিক মনে রেখেছি। এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় একটা জায়গায় ড্রাইভার লাইসেন্স নিতে গিয়েছিল। ও যখন ফিরছিল, তখন ওর পরিচিত একজন কিছু জিজ্ঞেস করেছিল। তার মধ্যে বার্নিশ শব্দটা ছিল। বাংলায় বলেছিল বলে বুঝতে না পারায় জিজ্ঞেস করেছিলাম। লোকটা কোনওমতে ইংরেজিতে বলেছিল, মাই হোম, বার্নিশ। শব্দটা ভাল লাগায় মনে রেখে দিয়েছিলাম। হাসল নিমা, আমি প্রথমে বার্নিশে গিয়ে ওই ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সেটা এখন আর সম্ভব নয়। কেন?

কত বড় জায়গা? তা নয়।

লোকটা আর বেঁচে নেই।

মাই গড! কী বলছেন আপনি? ও খুব মার খেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে মরে যাওয়ার মতো মার খায়নি। নিমার মুখে বিষাদের ছায়া।

আমি আপনার সঙ্গে একমত।

তা হলে মরল কেন?

আমি জানি না। হয়তো কেউ চায়নি ওই দুর্ঘটনার পরে ও বেঁচে থাকুক।

আশ্চর্য! দুর্ঘটনা তো ইচ্ছে করে ও ঘটায়নি। মাথা নাড়ল নিমা, ইস, একটা ভাল সোর্স চলে গেল। তারপরেই মনে পড়ে যাওয়ায় বলল, গাড়ির নম্বর থেকে এদেশে বাড়ি খুঁজে বের করা যায়?

নিশ্চয়ই যায়।

তা হলে পুলিশ স্টেশনে চলুন। আমি গাড়ির নম্বর আমার ডায়েরিতে নোট করে রেখেছি। পুলিশকে বলি, ঠিকানাটা বের করে দিতে।

হ্যাঁ, এটা করা যেতেই পারে। তবে তার জন্য আপনাকে যেতে হবে না। আমাকে নম্বর দিন, আমিই যাচ্ছি।

থ্যাঙ্ক ইউ। ডায়েরির একটা পাতা ছিঁড়ে নম্বর লিখে দিল নিমা।

কাগজটা নিয়ে অর্জুন উঠল, তা হলে আজ বাইরে যাওয়ার কোনও দরকার নেই। কাল থেকে অভিযান শুরু করবেন।

মাথা নাড়ল নিমা, কিন্তু আমার যে এভাবে চুপচাপ একা বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আপনাদের শহরটা একটু ঘুরে দেখব না?

সব ব্যাপারে না বলতে খারাপ লাগল অর্জুনের।

বাইরে বেরিয়ে এসে শুভেন্দুশেখরকে সে নিমার অভিপ্রায়ের কথা জানাতে, তিনি কাঁধ নাচালেন, যাও। তবে বেশি রাত কোরো না। আমি তাড়াতাড়ি ডিনার করি। নইলে ঘুম হয় না।

.

সন্ধের অন্ধকার শহরে নেমে এলেও প্যান্ট-শার্ট পরা বিদেশিনি অর্জুনের পাশে হাঁটছে দেখে রাস্তার লোকজন কৌতূহলী হল। দু-তিনজন পরিচিত মুখ আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কে অর্জুন?

বাধ্য হয়ে রিকশা নিল অর্জুন। জীবনে এর আগে কখনও রিকশায় চড়েনি নিমা। হেসে বলল, আমেরিকার অতলান্তিক সিটিতে এইরকম রিকশা আছে। লোকে মজা পাওয়ার জন্য চড়ে।

রিকশায় দু'জনের জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে না। নিমার জামাকাপড় থেকে দারুণ সুগন্ধ বেরোচ্ছে। নিমা জিজ্ঞেস করল, এই শহরে কী কী দ্রষ্টব্য আছে?

অর্জুন ঝট করে কিছু ভেবে পেল না। জলপাইগুড়ি শহরটাকে তার ভাল লাগে। কিন্তু টুরিস্টরা আকর্ষণ বোধ করবে, এমন কিছুর কথা তার মনে পড়ছে না। সে মাথা নাড়ল, তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

আসলে এই শহরটা থেকে জঙ্গল, চা-বাগান, পাহাড়ে সহজে পৌঁছে যাওয়া যায়।

এখান থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত কত দূর?

খুব কাছে।

আমরা সেদিকে যেতে পারি?

সেখানে দিনের বেলায় যাওয়াই ভাল।

আপনি কি কাল সকালে আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন?

অবশ্যই। আমাকে ওল্ড ম্যান বললেন, আপনি নাকি সত্যসন্ধান করেন?

চেষ্টা করি।

কদমতলার ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে রিকশা দাঁড় করিয়ে চারপাশে তাকাতে ভীমকে দেখতে পেল অর্জুন। রিকশা থেকে নেমে ভীমের কাছে যেতে সে একগাল হাসল, নমস্কার। হুকুম করুন।

তুমি কি আজ রাতে ছুটি নিয়ে নিয়েছ?

রোজগার করতে নেমে ছুটি নিলে চলে! কী করতে হবে বলুন।

ধরো, সারারাত গাড়ির দরকার হবে। কত নেবে?

কখন থেকে?

এগারোটা।

আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাব?

হ্যাঁ। কিন্তু টাকার কথা বলো।

তেল আর পাঁচশো দেবেন।

ঠিক আছে। আমার বাড়িতে পৌনে এগারোটায় আসবে। আর একথা যেন কেউ না জানতে পারে। তোমাকে বিশ্বাস করছি।

বউকেও বলব না। ভীম হাসল।

রিকশার কাছে একটা ছোট্ট ভিড়। সবাই কৌতূহলী চোখে নিমাকে দেখছে। রিকশায় উঠে বসে অর্জুন বলল, রাতে ঘুরে কোনও লাভ নেই। আপনি বরং বাড়ি ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করুন।

আপনি কোথায় যাবেন?

বাড়িতে। সেই সকাল থেকে ঘুরছি।

নিমাকে শুভেন্দুশেখরের বাড়িতে পৌঁছে, বাড়ি ফিরে গেল অর্জুন।

৪. তিস্তা ভবনের গেটে

তিস্তা ভবনের গেটে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে নেমে এল অর্জুন। একটু এগোতেই শুনতে পেল, কে? কী চাই?

দরোয়ান এগিয়ে এসেই চিনতে পারল, ও, আপনি স্যার!

আমার এক বন্ধু এখানে উঠেছেন। নির্মাল্য...

হ্যাঁ। আসুন।

দোতলায় নির্মাল্যর ঘরের দরজায় পৌঁছে দিল লোকটা। নির্মাল্য তৈরি ছিল। বলল, এসে গিয়েছিস? এক মিনিট!

ডিনার করিসনি তো? অর্জুন জিজ্ঞেস করল। হ্যাঁ।

কেন? অবাক হল নির্মাল্য।

কেন করলি? ওদিকে মা তোর জন্য বসে আছেন। কিছু না খেলে দুঃখ পাবেন। বলে অর্জুন দরোয়ানের দিকে তাকাল। সাহেবকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। যদি দেরি হয়ে যায়, তা হলে আমার ওখানেই থেকে যাবে।

ঠিক আছে। দরোয়ান মাথা নাড়ল।

.

ট্যাক্সিতে উঠে নির্মাল্য বলল, তুই তো ভাল নাটক করতে পারিস!

না করলে লোকটা ভাবত, কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তোকে। এখন কেউ ওর কাছে জানতে চাইলে বলবে, আমার বাড়িতে খেতে যাচ্ছিস।

বাংলায় কথা বলবি?

হ্যাঁ। ওর নাম ভীম, আমার পরিচিত।

ভীম গাড়ি চালাতে চালাতে বাঁ হাত তুলে নাচাল।

ভীমকে নির্দেশ দেওয়াই ছিল। শহর ছাড়িয়ে গাড়ি যখন হাইওয়েতে পড়েছে, তখন নির্মাল্য জিজ্ঞেস করল, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

গীতলদহের মুখে কোনও একটা জায়গায়, যেখানে গাড়ি লুকিয়ে রাখা যাবে। গীতলদহ থেকে বেরোবার একটাই রাস্তা। পাগল বর্মনের বাড়িতে যদি আজ রাতে লোক আসে, তাদের নিশ্চয়ই ভোরের আগে ওই রাস্তা দিয়েই নিয়ে আসবে। আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে ওদের জন্য। অর্জুন বলল।

যদি না আসে?

দ্যাখ, এটা একটা চান্স নেওয়া। না এলে রাত জাগাই সার হবে।

রাত কেন জাগব! ঘড়ি দেখল নির্মাল্য, কয়েক ঘণ্টা দিব্যি ট্যাক্সিতে বসে ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে। নির্মাল্য হাসল, কিন্তু সত্যি যদি ওরা ওখান থেকে বের হয়, তা হলে আমরা কী করব? মুখোমুখি হব?

কখনও না। আমাদের কাছে কোনও আর্মস নেই। অবশ্য তোর কাছে আছে কিনা জানি না। অর্জুন বলল।

না, নেই।

ওদের কাছে থাকবেই। আমরা ওদের অনুসরণ করব। কোথায় শেল্টার নিচ্ছে, সেটা দেখব। তারপর ভাবা যাবে!

মাঝরাতে রাস্তায় কয়েকটা ছুটন্ত লরি ছাড়া অন্য কিছুর দেখা পাওয়া গেল না। যে ধাবায় ওরা বিকেলে গিয়েছিল, তার সামনে বেশ ভিড়। গীতলদহ থেকে আধ মাইল দূরে একটা বাঁকের মুখে এসে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল অর্জুন। দু'পাশের জঙ্গলে আজ কালো অন্ধকার। ভীমকে সেটা দেখিয়ে বলল, তোমার ট্যাক্সি এই জঙ্গলের কোনওখানে এমনভাবে নিয়ে যাও যে, রাস্তা থেকে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। কিন্তু আমরা যেন একটু দূর থেকেই গীতলদহ থেকে বেরিয়ে আসা গাড়ি দেখতে পাই।

ভীম ট্যাক্সি থেকে নেমে এপাশ-ওপাশ দেখে এসে বলল, খুব ভাল জায়গা পেয়ে গিয়েছি। ট্যাক্সিটাকে একটু এগিয়ে নিয়ে সে ব্যাক করে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। ওইখানে একটা পায়ে চলা পথ থাকায় বেশি গাছপালা ভাঙতে হল না। যদিও এখানে সবই পলকা গাছ, যার আড়ালে চলে গেল ট্যাক্সিটা। হাত লাগিয়ে সামনের কাচ পরিষ্কার করল ভীম।

ভোর হতে এখনও তিন ঘণ্টা। ঘুমোনো যাক। নির্মাল্য বলল।

কাচ তুলে দিন। বহুত মশা এখানে। ভীম সতর্ক করল।

কাচ তুলতে তুলতে নির্মাল্য বলল, কোনও বন্য জন্তু নেই তো?

না সাহেব। তবে সাপ আর হাতি আছে। ভীম জবাব দিল।

ওগুলো বুঝি বন্য জন্তু নয়!

অর্জুন হেসে ফেলল, সাপকে কেউ জন্তু বলেছে বলে শুনিনি!

নির্মাল্য হেলান দিল। অর্জুন সামনে তাকাল। রাস্তাটার অনেকটাই সামনে, যদিও তার পুরোটাই অন্ধকারে ঢাকা। একটা লরি আসছে। হেডলাইটের আলোয় দু'দিক আলোকিত করে গীতলদহের দিকে চলে গেল। অর্জুন বুঝল, গীতলদহ থেকে গাড়ি বেরিয়ে এলে সেটা চোখ এড়াবে না। কিন্তু কোন গাড়িতে রাম-রহিমের লোক মানুষ স্মাগল করছে, সেটা বোঝা সম্ভব নয়।

চারটে বাজল। নির্মাল্য ঘুমোচ্ছে হেলান দিয়ে। ভীম ঢুলছে। অর্জুন তাকে জানাল, একটু নামতে হবে ভীম।

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হল ভীম, চলুন।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার দু'পাশে তাকাল অর্জুন। তারপর ভীমকে বলল, রাস্তার পাশ থেকে বড় বড় পাথরগুলো তুলে এনে মাঝখানে রাখতে হবে, যাতে এখানে এসে গাড়ি থেমে যায়।

ওই সাহেবকে ডাকব?

না। আমরাই চেষ্টা করি। অর্জুন বলল।

মিনিট দশেকের মধ্যে রাস্তার উপর তিন ফুট দুরত্বে পাথরের স্তূপ বানিয়ে ফেলল ওরা। যে-কোনও গাড়িকে যেতে হলে ওই তূপ সরাতে হবে। নিশ্চিত হয়ে ওরা গাড়িতে ফিরে এল। অর্জুন মনে মনে প্রার্থনা করল, এই পথে যেন অন্য কোনও গাড়ি না আসে। দরজা বন্ধ করার শব্দে ঘুম ভাঙল নির্মাল্যর, কী হল?

এখনও কিছু হয়নি। অর্জুন বলল।

নাঃ। তোর আইডিয়া কাজে লাগল না।

বোধহয়।

বলতে না-বলতেই দূরে গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। গীতলদহ থেকে আসছে। অর্জুন নির্মাল্যকে চাপা গলায় বলল, কথা বলিস না।

ভীম বলল, মারুতি ভ্যান বলে মনে হচ্ছে।

গাড়িটা তীব্র বেগে আসতে আসতে ব্রেক কষে একেবারে সামনে পাথরের স্তূপের কাছে থেমে গেল। এক মিনিট চুপচাপ। কোনও কথা শোনা গেল না। তারপর সামনের সিট থেকে একজন এবং ড্রাইভার নেমে দাঁড়াল। অন্ধকার এখন অনেকটা পাতলা। অর্জুন দেখল, একজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। লোকটা চিৎকার করল, কে পাথর রেখেছে? ডাকাতি করবি? এগিয়ে আয় সামনে।

ভীম মাথা নাড়তেই অর্জুন তাকে ইশারা করল চুপ করে থাকার জন্য। আরও কয়েকবার চেঁচামেচি করে কারও সাড়া না পেয়ে ড্রাইভার বলল, কেউ মজা করেছে।

না। ডাকাতির মতলবে ছিল। কিন্তু রাতে কোনও গাড়ি এ-রাস্তায় যায়নি দেখে শেষ পর্যন্ত কেটে পড়েছে। রাত শেষ হতে দেরি নেই। ওদের ডাকো, পাথর ক্লিয়ার করুক। দ্বিতীয় লোকটা, যার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, হুকুম দিল।

ড্রাইভার ভ্যানের কাছে গিয়ে বলল, নেমে এসো, হাত লাগাও।

অর্জুন অবাক হয়ে দেখল, চারটে ছেলে বেশ ভয়ে ভয়ে নেমে এল ভ্যান থেকে। মিনিট দুইয়ের মধ্যে একটা স্তূপ সরিয়ে ফেলায় ড্রাইভার গাড়িতে উঠতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালু হল এবং বেরিয়ে গেল সামনে থেকে।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করে অর্জুন ভীমকে বলল ভ্যানটাকে অনুসরণ করতে। এই নির্জন শেষ রাতে রাস্তায় ওদের সামনে শুধু ওই ভ্যানটাই থাকবে। দূর থেকে গাড়ির আলো দেখে চলতে হবে, যাতে ওদের মনে সন্দেহ না আসে। রাস্তা ছেড়ে ভ্যান যদি বা ডান দিকে ঢুকে যায়, তা হলেও থেমে যাওয়া চলবে না।

অনুসরণ করতে অসুবিধে হচ্ছিল না। দুটো গাড়ির দূরত্ব অনেকখানি। তাই ওরা সন্দেহ করবে না বলে অর্জুনের মনে হয়েছিল। হঠাৎ ভীম বলল, গাড়িটা থেমে যাচ্ছে। থামল রাস্তার পাশে। কী করব?।

সোজা বেরিয়ে যাও। একটুও স্পিড কমাবে না। অর্জুন বলল।

ভীম যখন ভ্যানের পাশ দিয়ে চলে এল, তখন অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভ্যানের জানলার কাচ বন্ধ।

নির্মাল্য এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এখন জিজ্ঞেস করল, তুই কি ভ্যানটাকে সন্দেহ করছিস? ব্যাপারটা ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো!

ওদের হাতে আধুনিক অস্ত্র আছে। বহু দূরে আমাদের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও যাচাই করে নিল, আমরা অনুসরণ করছি কি না। সন্দেহজনক মানুষই তো এরকম করে।

অর্জুন বলল, ওরা দেখতে চেয়েছিল, ওদের দেখাদেখি আমরাও থামি কিনা!

ভীম জিজ্ঞেস করল, আমরা কি সামনের কোথাও লুকিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করব? এর পরে অনেকটা রাস্তা জঙ্গল পাব না।

না? সোজা ময়নাগুড়ির মোড়ে চলে যাও। ওরা যদি এই পথে আসে, তা হলে ওই মোড় পেরিয়ে যেতে হবে। অর্জুন বলল।

নির্মাল্য বলল, তুই যদি এত ডেফিনিট হয়ে থাকিস, তা হলে এখনই পুলিশকে ইনফর্ম করে ওদের আটকালে ভাল হয় না?

আর্মসের জন্য লাইসেন্স সঙ্গে রাখতে পারে। যে-ছেলেগুলো পাথর সরাল, তারা স্থানীয় হতে পারে। পুলিশকে তখন কী বলব আমরা? অর্জুন তাকাল।

ময়নাগুড়ির মোড়ে পৌঁছোতে আকাশ ফরসা হয়ে গেল। দোকানপাট এখনও বন্ধ, কিন্তু একটা চায়ের দোকান খুলেছে। অর্জুনের নির্দেশে ভীম তার ট্যাক্সিটাকে একটা বাড়ির আড়ালে রেখে এল। চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসল ওরা। অর্জুন তিনটে চায়ের কথা বলতে নির্মাল্য আপত্তি জানাল। সে এখন চা খাবে না।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন চায়ের খদ্দের এসে গিয়েছে। অর্জুন যখন চা শেষ করছে, তখন ভ্যানটাকে দেখতে পেল। স্বাভাবিক গতিতে এসে লাটাগুড়ির দিকে চলে গেল। দাম মিটিয়ে ভীমকে ট্যাক্সি নিয়ে আসতে বলল সে। নির্মাল্যও লক্ষ করেছিল ভ্যানটাকে। এবার জিজ্ঞেস করল, এখন কী করবি?

আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তা হলে অনেক কিছু করা যেতে পারে।

লাটাগুড়িতে যাওয়ার রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে আসার পর বাঁ দিকে বাঁক নিল ভীম, অর্জুনের নির্দেশে। রাস্তাটা এখনও মসৃণ হয়নি। এই রাস্তা সোজা দোমহনি পেরিয়ে তিস্তা ব্রিজের কাছে হাইওয়েতে গিয়ে মিশেছে। দোমহনি বাজারে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরা।

আরে! আপনি? এত সকালে এখানে?

অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে স্টেশনমাস্টারকে দেখতে পেল। লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে বাজারের ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সে এগিয়ে গেল, নমস্কার। এত তাড়াতাড়ি বাজার করবেন?

আর বলবেন না। মালবাজারে বড়কর্তাদের হুকুমে যেতে হবে সকাল ন'টার মধ্যে। বাজার করে না গেলে, বাড়ির লোক খাবে কী? কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, সারারাত ঘুমোননি। কী ব্যাপার? স্টেশনমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন।

বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। ও হ্যাঁ, ওই লোকটাকে লক্ষ করেছেন?

না মশাই। একবারও আমার চোখের সামনে আসেনি। তবে তোকজন আসা-যাওয়া করে।

তাই?

হ্যাঁ, একটু আগে একটা মারুতি ভ্যান বোঝাই লোক ভূতবাংলোর দিকে চলে গেল। ভাবছি, মালবাজারে গিয়ে কর্তাদের ব্যাপারটা জানাব কিনা।

নিশ্চয়ই জানাবেন।

মুশকিল কী জানেন, ওঁরা হয়তো উলটে ধমকাবেন, নিজের কাজ করো। অন্য ব্যাপারে নাক গলিয়ো না। আচ্ছা যাই, বাজার সেরে ফেলি।

ঠিক আছে। এখানে এসটিডি বুথটা কোথায়?

ওই তো। একটু এগোলেই বাঁ দিকে। স্টেশনমাস্টার চলে গেলেন।

এসটিডি বুথ খোলা ছিল। ভিতরে গিয়ে ওসির মোবাইলে ফোন করল অর্জুন। ভদ্রলোক বোধহয় ঘুমোচ্ছিলেন। বেশ কয়েকবার রিং হওয়ার পর ওসির জড়ানো গলা কানে এল, হ্যালো।

আমি অর্জুন। আপনার ঘুম ভাঙালাম বলে দুঃখিত।

আরে না না, বলুন।

এখনই দোমহনির রেলস্টেশনে চলে আসতে পারবেন?

শিয়োর।

একা এলে হবে না। এদের সঙ্গে আর্মস আছে।

ওরা কারা?

যারা ননীগোপালকে খুন করেছে।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে আসছি।

দ্বিতীয় ফোনটা সে করল শুভেন্দুশেখরকে। দু'বার রিং হতেই ভদ্রলোক ফোন ধরলেন, হ্যালো।

অর্জুন বলছি। খুব যদি ভুল না হয়ে থাকে, তা হলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আপনার ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হবে। অর্জুন বলল।

ইজ ইট? সে কোথায়?

দোমহনিতে।

আমি ওকে দেখতে চাই। এখানে নিয়ে আসতে পারবে?

কথা দিতে পারছি না, চেষ্টা করব।

আমি ড্রাইভারকে বলছি, নিমাকে ওখানে নিয়ে যেতে।

না। আমার ফোন পেলে তবে ওঁকে পাঠাবেন। রিসিভার নামাল অর্জুন।

তৃতীয় টেলিফোনটির নম্বর ঘুরিয়ে অবাক হল সে। কম্পিউটার ভয়েস বলছে, দি নম্বর ইউ কল্ড, ইজ আউট অফ অর্ডার।

দু'দিন আগে ফোনটা চালু ছিল। নম্বর বাইরের লোক জেনে গিয়েছে বলেই কি আউট অফ অর্ডার করে দেওয়া হল? এসটিডি বুথের ছেলেটিকে নম্বরটা দেখাল অর্জুন, এই নম্বর চেনেন ভাই?

মাথা নাড়ল ছেলেটি, না। এটা তো সরকারি টেলিফোনের নম্বর নয়।

সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল অর্জুনের, কী আশ্চর্য! এই সাধারণ সত্যিটা সে লক্ষ করেনি? একটা প্রাইভেট কোম্পানি থেকে ফোনটা নেওয়া হয়েছে। ব্যাটারিতে চলে বলে গাড়িতে নিয়ে ঘোরা যায়। তবে ওই কোম্পানির সম্প্রসারণের চৌহদ্দিতে থামতে হবে। এই ফোন নেওয়ার সময় নাম-ঠিকানা জানাতে হয়। নিশ্চয়ই সঠিক নাম-ঠিকানা এক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি।

ওসির জিপ দেখা গেল। টেলিফোনের টাকা মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল অর্জুন। নির্মাল্য বলল, ও, তুই পুলিশকে খবর দিয়েছিস? শোন, আমার পরিচয় গোপন রাখবি। বলবি, সহপাঠী ছিলাম, বন্ধু।

ওসি নেমে এলেন জিপ থেকে, কী ব্যাপার অর্জুনবাবু?

বলছি। আপনার সঙ্গে ক'জন লোক আছেন?

চারজন। খুব টাফ ওরা।

মিস্টার সাহা জানেন যে, আপনারা এখানে আসছেন?

আপনি বোধহয় ওঁর সম্পর্কে বায়াস হয়ে পড়েছেন। ওসি হাসলেন, উনি গত কাল সন্ধেয় ছুটি নিয়ে শিলিগুড়ি গিয়েছেন। আজ বিকেলে ফিরবেন।

এই সময় স্টেশনমাস্টার বাজারের ব্যাগ হাতে ফিরছিলেন। পুলিশের জিপ দেখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েই আবার পা চালালেন। অর্জুন ডাকল, মাস্টারমশাই...।

খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। সেই মালবাজারে যেতে হবে। স্টেশনমাস্টার বললেন, ঠিক ন'টায় ট্রেনটা আসবে। ন'টা দশে ফিরে যাবে। আমাকেও ওই ট্রেনে যেতে হবে।

ন'টা বাজতে অনেক দেরি আছে। আর আমরা তো আপনাদের কোয়ার্টার্সের পাশ দিয়েই যাব। উঠে আসুন, তা হলে সময়ও বাঁচবে আপনার। আসুন।

তেতো গেলার মতো মুখ করে ট্যাক্সিতে উঠলেন স্টেশনমাস্টার। অর্জুন পুলিশের জিপে ওসির অনুমতি নিয়ে উঠল। কোন দিকে যেতে হবে ড্রাইভারকে জানিয়ে সে ওসিকে সংক্ষেপে ঘটনাগুলো জানাল।

সে কী! এখানে? আমার এলাকায়? অথচ আমি কিছুই জানি না? ওই স্টেশনমাস্টার ঘুমোচ্ছিল নাকি? ও কিছুই জানায়নি আমাদের। ওসি তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখালেন।

এখন সকাল। রোদ উঠে গিয়েছে। স্টেশন এলাকায় মানুষজন কম। রেললাইন পেরিয়ে অর্জুন গাড়ি দুটোকে দাঁড় করাল। তারপর স্টেশনমাস্টারকে বলল, আপনাকে একটা অপ্রিয় কাজ করতে হবে মাস্টারমশাই।

স্টেশনমাস্টার বললেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝিয়ে বলছি। আপনি এখন ভূতবাংলোয় যাবেন। যে লোকটা বেরিয়ে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবে, তাকে বলবেন, হেডকোয়ার্টার্স থেকে অর্ডার এসেছে, এখনই বাংলো খালি করে দিতে হবে। ওরা কী বলে শুনবেন। কিন্তু কিছুতেই আপনার পয়েন্ট থেকে সরবেন না।

দ্রুত মাথা নাড়লেন স্টেশনমাস্টার, অসম্ভব। লোকগুলো সুবিধের নয়। আমার মতো একজন ছাপোষা মানুষকে কেন বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন বলুন তো? বলেই ভদ্রলোক দ্রুত হাঁটতে লাগলেন তাঁর কোয়ার্টার্সের দিকে।

ওসি হেসে ফেললেন ওঁর হাঁটার ধরন দেখে, বুঝলেন অর্জুনবাবু, গাধাকে যতই পেটান, সে কিছুতেই ঘোড়া হতে চাইবে না। তার চেয়ে চলুন, আমরা সবাই একসঙ্গে ওই বাংলোয় যাই। কী যেন নাম, ও,

ভূতবাংলো।

আমি চাইছিলাম, ওরা বেরিয়ে আসুক। অর্জুন বলল। তারপর ট্যাক্সিতে বসা নির্মাল্যকে বলল, তোকে একটু অভিনয় করতে হবে। তুই ভীমকে নিয়ে ভূতবাংলোয় যা। বলবি, এন জে পি থেকে এসেছিস। রেলের বড়কর্তারা পাঠিয়েছেন ওই বাংলোর ব্যাপারে। ওরা যেন এখনই খালি করে দেয়।

নির্মাল্য একটু ভাবল। তারপর বলল, আমার কি এসবের সঙ্গে জড়ানো উচিত হবে! আই অ্যাম নট সাপোজড টু...

অর্জুন মাথা নাড়ল। কেন্দ্রীয় সরকার নির্মাল্যকে গোপনে তদন্ত করতে পাঠিয়েছে। যদি ওরা নির্মাল্যকে মারধর করে, তা হলে ওকে সরকারের কাছে জবাবদিহি দিতে হবে। ওসি চুপচাপ শুনছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে?

অর্জুন চটপট বলল, কলকাতার রিপোর্টার।

ও।

এই সময় ভীম এসে জানাল, মারুতি ভ্যানটা ফিরে আসছে। অর্জুন খুশি হল, যাক, একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

নীল মারুতি যে চালাচ্ছে, তার পাশে কেউ নেই। এই লোকটাই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এসেছে। রেললাইনের পাশে পুলিশের জিপকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা গাড়ির গতি কমিয়েই বাড়িয়ে দিল। কিন্তু ওসি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ওকে থামতে বলায় ভ্যানটা থামতে বাধ্য হল।

ওসি বললেন, নেমে এসো।

কেন? ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

ওসি কড়া চোখে তাকাতে লোকটা নেমে এল।

এই ভ্যান কার?

মালিকের।

কোথায় থাকে? কী নাম?

গীতলদহের বাবুরাম শেঠ।

কী নাম তোমার?

বাচ্চু।

কেন এসেছিলে এখানে?

প্যাসেঞ্জার নিয়ে এসেছি, ভাড়ায়।

কারা প্যাসেঞ্জার ছিল?

আমি চিনি না।

কে ভাড়া করেছিল?

একটা অচেনা লোক।

কখন বেরিয়েছ গীতলদহ থেকে?

ভোরবেলায়।

তোমার প্যাসেঞ্জারের হাতে বন্দুক ছিল? অর্জুন প্রশ্নটা করল।

আমি জানি না। লোকটা বলামাত্র ওসি সপাটে চড় মারলেন লোকটার গালে। অনেকটা ছিটকে গেল লোকটা। ওসি এগিয়ে গেলেন, সত্যি কথা বলো।

আমি, আমি ...!

অর্জুন বলল, রাস্তার মাঝখানে পাথরের স্তূপ সরানোর সময় তোমার সঙ্গে যে প্রথমে নীচে নেমেছিল, তার হাতে কী ছিল?

লোকটা খুব অবাক হয়ে গেল।

অর্জুন বলল, তারপর লোকটার হুকুমে ভ্যান থেকে চারটে ছেলে নেমে এসে ওই পাথর সরায়নি? মনে পড়ছে?

লোকটা এবার ভেঙে পড়ল, বিশ্বাস করুন, আমি ওই দলে নেই। মাঝে মাঝে ভাড়া করে আমার ভ্যান। আমি পৌঁছে দিই।

কাদের পৌঁছেও? ওসি জিজ্ঞেস করলেন।

ছেলেদের।

কোন ছেলে?

আমি জানি না।

ওসি হাসলেন, রাম সিংহ, যতক্ষণ ও সত্যি কথা না বলছে, ততক্ষণ ওকে এমনভাবে আড়ং ধোলাই দেবে, যাতে রক্ত বেরোবে না, কিন্তু দাঁড়াতে পারবে না এ জীবনে। নিয়ে যাও।

পুলিশের জিপ থেকে বিশাল চেহারার একজন বেরিয়ে এল লাঠি হাতে। তাকে দেখেই ড্রাইভার মাটিতে বসে পড়ল, স্যার, মুখ খুললে ওরা মেরে ফেলবে।

তা হলে হাড়গোড় ভেঙে বেঁচে থাকো।

রাম সিংহ এসে লোকটার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই সে ককিয়ে উঠল, ছেলেগুলো বাংলাদেশের। কিন্তু সত্যি বলছি, কেন এখানে নিয়ে আসে জানি না। শুধু বুঝতে পারি, ওদের কাছে কাগজপত্র নেই।

ওসি রাম সিংহকে বললেন, ওকে হাতকড়া পরিয়ে জিপে তোলো।

লোকটার হাতে হাতকড়া পরাতেই সে বলে উঠল, আমাকে ওদের ওখানে নিয়ে যাবেন না স্যার।

কেন?

ওরা ভাববে, আমি বেইমানি করেছি।

ওরা কারা? কী নাম?

বিশ্বাস করুন, আমি কারও নাম জানি না। আমার সামনে ওরা নিজেদের নাম করে না।

ঠিক আছে।

ভীম ট্যাক্সিটা নিয়ে ওখানেই অপেক্ষা করবে, নির্মাল্য ট্যাক্সিতে থাকবে। অর্জুন পুলিশের গাড়িতে উঠল। মিনিট তিনেকের মধ্যে ভূতবাংলোর সামনে গাড়ি পৌঁছে গেল। ড্রাইভারকে হর্ন বাজাতে বললেন ওসি। হর্নের শব্দ শুনে একটা লোক উপর থেকে নেমে এল। অর্জুন চিনতে পারল। এই লোকটাই শেষ রাতে ভ্যান থেকে আর্স হাতে নেমেছিল।

ওসি নামলেন, এই বাংলোয় কে থাকে?

আমরা।

আপনারা কি রেলের কর্মচারী?

না, কিন্তু থাকার পারমিশন পেয়েছি, লোকটা বলল।

ক'জন এখানে থাকেন?

তিন জন।

ডাকুন ওদের। চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

লোকটা দোনামনা করল। ওসি বললেন, আমি লোকাল থানার ওসি।

লোকটা হাসল, আসুন স্যার।

ওসি ইশারা করতে অর্জুনও ওদের সঙ্গে এগোল। ওসি বললেন, আমাদের কাছে কমপ্লেন এসেছে, কেউ এই বাংলো দখল করে আছে। তাই বাধ্য হলাম রুটিন চেকে আসতে।

বারান্দায় পড়ে থাকা চেয়ারগুলো দেখিয়ে লোকটা বলল, বসুন।

আপনার নামটা কী যেন?

কমল। লোকটা ভিতরে চলে গেল।

ওসি বললেন, লোকটা বাংলাদেশের নয়, বাচনভঙ্গি এদেশের।

অর্জুন চারপাশে তাকাচ্ছিল। বহুকাল অব্যবহৃত বাড়িটাকে একটু বাসযোগ্য করে নেওয়া হয়েছে। কমল বেরিয়ে এল যাকে নিয়ে, তাকে চিনতে পারল অর্জুন। শিবরামের খবর নিয়ে এখানে এসে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। লোকটার তাকে চেনা উচিত। চেনামাত্র যে প্রতিক্রিয়া হবে, তার জন্য তৈরি হল অর্জুন।

ওসি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম?

জন।

জন কী?

আমাকে সবাই জন বলে।

বাবা তো একটা টাইটেল দিয়েছিলেন?

সেটা জেনে কী হবে আপনার? এই নিন, এখানে থাকার পারমিশন।

ওসি কাগজটা নিয়ে দেখলেন, এন এস রায়। ইনি কে?

উনি একজন এন আর আই। এদিকে ইন্ডাস্ট্রি করবেন বলে এসেছেন। নর্থ বেঙ্গলের বেকার ছেলেদের চাকরি হবে সেখানে।

আচ্ছা। ওসি বললেন, উনি কোথায়?

উনি খুব অসুস্থ। এখানকার জল সহ্য হচ্ছে না ওঁর।

ডাক্তার দেখিয়েছেন?

এখানে ভাল ডাক্তার কোথায়? ওঁর সঙ্গে ওষুধ ছিল, তাই দিয়ে ...।

আজ দুপুরের ফ্লাইটে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

তা হলে অসুখটা খুব বড় ধরনের?

হ্যাঁ। এখন ঘুমোচ্ছেন। একেবারে যাওয়ার সময় ডাকব।

জন কথা বলে যাচ্ছিল। এবার কমল বলল, এখানে তো কিছুই পাওয়া যায় না। তবু স্যার যদি চান, একটু কফি খাওয়াতে পারি।

জন বলল, তোমার কিছুই মনে থাকে না। কফি শেষ হয়ে গিয়েছে, আজ কিনে আনার কথা ছিল!

ওঃ হো! তাই তো! আচ্ছা স্যার, কে কমপ্লেন করেছে আমাদের বিরুদ্ধে?

সেটা আপনাদের জেনে কী লাভ হবে? রাম সিংহ...! চিৎকার করে ডাকলেন ওসি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রাম সিংহ এবং আর একজন সেপাই উপরে উঠে এল। ওসি বললেন, এটা রুটিন চেকিং। রাম সিংহ, ভিতরে গিয়ে দেখে এসো। একজন সাহেব অসুস্থ, ঘুমোচ্ছেন। তাকে ডিসটার্ব করবে না।

জন চেঁচিয়ে উঠল, আপনার কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?

ওসি হাসলেন, এতক্ষণ বেশ চলছিল। আপনি হঠাৎ আইনের প্রশ্ন। তুললেন। তার মানে, এতক্ষণ যা বলছিলেন, তা সত্যি নয়?

সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া আপনি ওদের ভিতরে যেতে বলতে পারেন না।

সেটা আমি বুঝব। রাম সিংহ!

রাম সিংহ এগোতেই জন দু'হাতে দরজা আগলে দাঁড়াল। রাম সিংহ তাকে ধাক্কা মারতেই সে কোমরে গুঁজে রাখা রিভলভার জামার ভিতর থেকে দ্রুত বের করল। কিন্তু রাম সিংহের হাত চলল আরও দ্রুত গতিতে। তার আঘাতে রিভলভার ছিটকে গেল জনের হাত থেকে।

মাটিতে পড়ামাত্র ওসি একটা রুমাল বের করে সেটা দিয়ে অস্ত্রটাকে তুলে নিয়ে পকেটে রাখলেন। রাম সিংহ ততক্ষণে পেড়ে ফেলেছে জনকে। কমল হাত জোড় করল, স্যার, ও খুব রগচটা, ওকে মাপ করে দিন।

ওসির নির্দেশে দু'জনকে দুটো চেয়ারে বসানো হল। রাম সিংহ ডাকতে পুলিশের জিপ থেকে আর-একজন সেপাই হাতকড়া নিয়ে উপরে চলে এল। লোকটা দু'জনকে হাতকড়া পরিয়ে দিতেই, ওসি অর্জুনকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। প্রথম ঘরে কেউ নেই। দ্বিতীয় ঘরটিও খালি। তৃতীয় ঘরে একটা তাপোশে বিছানা পাতা। কয়েকটা জামাপ্যান্ট পড়ে রয়েছে। একটা সুটকেসও। কিন্তু কেউ নেই। ওসি বললেন, অসুস্থ লোকটার তো এখানেই থাকার কথা!

অর্জুন পিছন দিকে হাঁটতেই একটা ঘোরানো মরচে পড়া সিঁড়ি দেখে চেঁচিয়ে উঠল, এখান দিয়ে পালিয়েছে?

ওসি ছুটে এলেন। নীচের কঁচা মাটিতে জুতোর ছাপ। দু'রকমের জুতো। তার মানে একজন নয়, দু'জন লোক পালিয়েছে এখান থেকে। একটা নর্থস্টার, অন্যটা সাধারণ।

এই সময় রাম সিংহের গলা পাওয়া গেল, সাহাব, সাহাব, মিল গিয়া। ইধার আইয়ে।

অর্জুন ছুটে গেল আগে। ওপাশের বারান্দা থেকে চারটে ছেলেকে টেনে নিয়ে আসছে রাম সিংহ এবং তার সঙ্গী। এই ছেলেগুলোই কাল পাথর সরিয়েছিল। তা হলে নভেন্দু কোনও সঙ্গীকে নিয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে পালিয়েছে? পালাতে হলে ওদের দোমহনির বাস স্ট্যান্ডে যেতে হবে। সেখান থেকে ওরা ট্যাক্সিও পেয়ে যেতে পারে। এখনই ওদের অনুসরণ করা দরকার।

ওসি ততক্ষণে ছেলে চারটের সঙ্গে কথা শুরু করেছেন। সত্যি কথা বলতে, বেশি চাপ দিতে হল না। এরা চারজনই আমেরিকায় চাকরি করতে যেতে চায়। বাংলাদেশ থেকে আমেরিকান কনসুলেট ওদের ভিসা দেয়নি। বাংলাদেশি দশ লক্ষ টাকা মাথাপিছু দিলে, তাদের আমেরিকায় পৌঁছে দেওয়া হবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায়, ওদের বাবারা জমি বিক্রি করে, ধার নিয়ে টাকাটা জোগাড় করে দিয়েছে। রাম-রহিমের সঙ্গে ডেভিড নামের একটি লোক এর আগেও কয়েকবার ছেলেদের পৌঁছে দিয়েছে আমেরিকায়। তাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে বিশ্বাস হয়েছে এদের। কলকাতা থেকে তাদের পাসপোর্ট দেওয়া হবে ছবিসমেত। টিকিটও হয়ে গিয়েছে। তবে নামতে হবে মেক্সিকোতে। সেখান থেকে স্থলপথে ওরা পৌঁছে দেবে আমেরিকায়।

ওসি খুব উত্তেজিত। খুব বড় কেস পেয়ে গিয়েছেন তিনি। এদের নিয়ে থানায় যেতে চান। সেখানে গিয়ে পুরো কেস লিপিবদ্ধ করে উপরওয়ালাকে জানাবেন।

অর্জুন ব্যস্ত হল। সে বলল, এত লোককে নিয়ে আপনার গাড়ি যেতে পারবে না। আমি আপনার গাড়ি নিয়ে রেল ক্রসিং-এর কাছে যাচ্ছি। যদি কেউ গাড়ি চালাতে পারে, তা হলে তাকে সঙ্গে দিন। ভ্যানটাকে নিয়ে আসবে।

প্রস্তাব পছন্দ হল ওসির। সেপাইদের উপর ছ'জনের দায়িত্ব দিয়ে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে তিনি অর্জুনের সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন। সঙ্গে একজন সেপাই, যে গাড়ি চালাতে জানে।

অর্জুন বলল, যে করেই হোক নভেন্দুকে আটকাতে হবে। যদি ও দোমহনির বাজারে গিয়ে ট্যাক্সি পেয়ে যায়, তা হলে হাওয়া হয়ে যাবে।

ওহো। তাই তো! ওকেই তো অসুস্থ বলে আড়াল করতে চাইছিল লোকগুলো।

আমার ধারণা নভেই বেআইনিভাবে আমেরিকায় লোক পাচার করে।

কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কেন? এখান থেকেই তো ছেলে জোগাড় করতে পারত।

মাথা নাড়ল অর্জুন, এখানকার ছেলেরা বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে তেমন উদ্যোগী নয়। অন্তত দশ লক্ষ টাকা খরচ করে তো নয়ই। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ছেলে ভাবে, বিদেশে না গেলে আরামে থাকা যাবে না। এরা সেই সুযোগটা নিচ্ছে।

ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল নির্মাল্য। তাকে সংক্ষেপে ঘটনাটা বলতেই তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আমি ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ওসি বললেন, আপনি ভ্যানে উঠুন। ড্রাইভার, তোমরা ওখানে গিয়ে ওদের নিয়ে থানায় চলে এসো। আমি একটু পরেই আসছি। পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন তিনি। পুলিশের গাড়ি এবং ভ্যান ফিরে গেল।

ট্যাক্সিতে উঠলেন ওসি। ভীম গাড়ি চালু করলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি নিজের গাড়ি ছেড়ে দিলেন যে!

পুলিশের গাড়ি দেখলেই তোক চিনতে পারে। মনে হল, লোকটাকে ধরতে ট্যাক্সিতে গেলে সুবিধে হবে। ওসি বললেন।

নভেন্দু একা নয়, সঙ্গে আর-একজন আছে।

ও হ্যাঁ। জুতোর ছাপ তো তাই বলছে। লোকটাকে দেখেছেন?

না।

কী করে চিনবেন?

বর্ণনা পেয়েছি। চিনতে পারব।

দোমহনির বাজার তখন জমজমাট। বাস স্ট্যান্ডে ট্যাক্সি পঁড় করাতেই, একটা লোক এসে সেলাম করল ওসিকে, আপনি স্যার! ট্যাক্সিতে?

বেড়াতে বেরিয়েছি। আর বদমাইশি করছিস না তো!

কানে হাত দিল লোকটা, না স্যার। একদম না।

গুড। একটা খবর আন তো। আধঘণ্টার মধ্যে দুটো লোক এখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে গিয়েছে কিনা! ওসি বললেন।

না স্যার। আজ একটাই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসেছে। ওই তো, দাঁড়িয়ে আছে।

অচেনা দুটো লোককে চোখে পড়ছে?

না স্যার!

খোঁজ নে, আর কেউ দেখেছে কিনা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ট্যাক্সির চারপাশে ভিড় হয়ে গেল। সবাই হলফ করে বলতে লাগল, ভোরের আগে নাকি দুটো লোক ট্যাক্সি করে এসেছিল। তারা চলে যাওয়ার পর এখানে নতুন কেউ আসেনি। একটি লোক সাইকেলে চেপে আসছিল। ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে গেল কী হয়েছে জানতে। শুনে সে চেঁচিয়ে উঠল, দু'জন লোককে তিস্তা ব্রিজের দিকে হাঁটতে দেখেছি। একজনের মুখ রুমালে ঢাকা ছিল।

অর্জুন চিৎকার করল, গায়ের রং কেমন?

একজন, যার মুখ রুমালে ঢাকা, সে শ্যামলা। অন্যজন সাহেবের মতো।

অর্জুন বলল, ভীম, তাড়াতাড়ি...।

ভীম গাড়ি চালু করল।

দোমহনি ছাড়িয়ে দু'পাশে চাষের মাঠের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা চলে গিয়েছে হাইওয়ের দিকে। অনেকটা দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে, কোনও মানুষের চিহ্ন নেই।

অর্জুন বলল, তা হলে কি ওরা রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমেছে?

মাঠেও তো আড়াল নেই। দাঁড়ান, একটা সাইকেল আসছে। ওসি বললেন।

ততক্ষণে ট্যাক্সি থেকেই তিস্তা ব্রিজ দেখতে পেয়েছে অর্জুন। জুতোর ছাপ দেখামাত্রই যদি ওদের পিছনে ছোটা যেত, তা হলে পালানোর সুযোগ পেত না। খুব আপশোস হচ্ছিল তার।

ওসি হাত বাড়িয়ে সাইকেল আরোহীকে দাঁড় করালেন, আপনি কোত্থেকে আসছেন ভাই?

ইস্টিশন থেকে।

দুটো লোককে দেখেছেন? হাঁটছিল। একজনের মুখে রুমাল, আর অন্যজন খুব ফরসা? চোখে পড়েছে? ওসি জিজ্ঞেস করলেন।

সাহেবদের মতো ফরসা? লোকটি মাথা নাড়ল, দেখেছি। গাড়িতে উঠল।

গাড়িতে? কার গাড়িতে?

এদিকের গাড়ি নয়। পিছনে একটা মেয়ে ছিল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গে মোবাইল আছে?

হ্যাঁ।

নম্বরটা ধরুন তো!

মোবাইলের বোতাম টিপলেন ওসি। রিং হতেই এগিয়ে দিলেন অর্জুনের দিকে। অর্জুন কানে চাপতেই শুভেন্দুশেখরের গলা পেল, হ্যাল্লো!

আমি অর্জুন বলছি।

পেয়েছ?

না। কিন্তু নিমাকে কি আপনি পাঠিয়েছেন?

হ্যাঁ। একটু দেরি হল। জলপাইগুড়িতে এলে একটি ছেলে আমাকে ভাড়ায় গাড়ি দেয়। তাকে ফোন করে আনতে যেটুকু সময়। মনে হয়, পৌঁছে গিয়েছে।

কী গাড়ি?

সাদা অ্যাম্বাসাডর।

লাইন কেটে দিল অর্জুন। সাইকেল আরোহী তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, যে গাড়িতে ওরা উঠল, সেটা কি সাদা অ্যাম্বাসাডর?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কোন দিকে গেল?

হাত বাড়িতে তিস্তার ওপার দেখিয়ে দিল লোকটা। অর্জুন বলল, ভীম, চলো। যে করেই হোক গাড়িটাকে ধরতে হবে।

গাড়ি চলতে শুরু করলে ওসি জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাটি কে? তিনি ওই নভেন্দুকে চিনলেন কী করে?

বিরাট কাহিনি। কিন্তু আমি খুব ধন্দে পড়ে গিয়েছি। নিমা তার শত্রুকে গাড়িতে তুললেন কেন? বুঝতে পারছি না। অর্জুন নিজের মনে বলল।

তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ি যখন জলপাইগুড়ির মোড়ে এল, তখন ভীম জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাব?

অর্জুন দ্বিধায় পড়ল। ওরা কি শহরে যাবে? কোথায় যাবে? শুভেন্দুশেখরের বাড়িতে কি নিমা নভেন্দুকে নিয়ে যাবে? অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, আর একটি লোক ওদের সঙ্গে আছে। সেই লোকটি যদি স্থানীয় হয়, তা হলে শহরে না গিয়ে শিলিগুড়ির দিকে যেতে পারে। শিলিগুড়ির নাম মনে আসতেই বাগডোগরা এয়ারপোর্টের কথা মনে এল। ওরা এয়ারপোর্টে যাচ্ছে না তো প্লেন ধরতে? নিমা কি ওর পাসপোর্ট নিয়ে বেরিয়েছে?

অর্জুন বলল, না শহরে নয়, সোজা চলো।

ভীম গাড়ির গতি বাড়াল। ফাটাপুকুর ছাড়াতেই দূরে একটি লোককে হাত নাড়তে দেখা গেল। ভীম বলল, আরে! লছমন এখানে কী করছে। গাড়ি থামাচ্ছি একটু।

গাড়ি থামিয়ে ভীম জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে লছমন?

ও! তুই। ওরা আমাকে জোর করে সরিয়ে দিয়েছে গাড়ি থেকে?

কারা?

দু’জন লোক, আর একটা মেয়ে।

অর্জুন বলল, ভীম, ওকে গাড়িতে উঠতে বলো।

ভীম বলতেই লছমন সামনের সিটে উঠে বসল, আমাকে তুই থানায় নামিয়ে দে ভীম।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

লছমন তাকাল, আমাকে বুড়োবাবু বললেন, ভদ্রমহিলাকে দোমহনির বাজারে নিয়ে যেতে। তাই যাচ্ছিলাম। বুড়োবাবু যখনই জলপাইগুড়িতে আসেন, আমার গাড়ি নেন। তিস্তা ব্রিজ পার হতেই দেখলাম, দু’জন লোক আসছে। তাদের দেখে ভদ্রমহিলা চেঁচিয়ে গাড়ি থামাতে বললেন। দুজনের মধ্যে একজন সাহেবের মতো দেখতে। তার সঙ্গে ভদ্রমহিলা উত্তেজিত হয়ে ইংরেজিতে কী সব বলে আমায় বললেন গাড়ি ঘোরাতে।

ইংরেজিতে বললেন?

না। হিন্দিতে। ততক্ষণে ওই দু’জনের একজন পিছনে, আর-একজন সামনে উঠে বসেছে। সামনে বসা লোকটার মুখ রুমালে ঢাকা। আমি ভাবলাম, ওরা বুড়োবাবুর বাড়িতে ফিরে যাবে। কিন্তু সাহেবটা বাংলায় বলল, সোজা চলো। বুড়োবাবু সেকথা বলেননি। আমি আপত্তি জানিয়েও এত দূরে চলে এসে গাড়ি থামালাম। ওরা কোথায় যেতে চায় জানতে চাইলাম। দু’জনে আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ঘুসি মেরে ফেলে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। এখন থানায় গিয়ে ডায়েরি করতে হবে। ওরা যদি গাড়ি নিয়ে হাওয়া হয়ে যায়, তা হলে মালিক আমাকে মেরে ফেলবে। লছমন বলল।

তোমার কোনও ভয় নেই। শুভেন্দুবাবুকে আমি বলব সব।

আপনি বুড়োবাবুকে চেনেন?

হ্যাঁ। অর্জুন বলল, ওরা কোথায় যেতে চাইছিল?

কিছু বলছিল। রুমালবাঁধা লোকটা বলছিল বাংলায়, সোজা চলো।

অর্জুন বলল, ভীম, তুমি বাইপাস হয়ে এয়ারপোর্টের রাস্তা ধরবে।

গাড়িতে তেল বেশি নেই। ওদের তেল নিতে থামতে হবেই।

ওসি চুপচাপ শুনছিলেন। বললেন, থ্যাঙ্ক গড!

মিনিট দশেক পরে একটা পেট্রল পাম্প দেখে গাড়ি থামিয়ে লছমনকে পাঠাল অর্জুন। সে উত্তেজিত হয়ে ফিরে এসে জানাল, পাঁচ মিনিট আগে দশ লিটার তেল ভরে ওরা চলে গিয়েছে। আমাকে থানায় নিয়ে যান স্যার।

ভীম তাকে ধমকাল, চুপ কর। পিছনে কে আছেন জানিস? ওসি সাহেব।

লছমন ঘুরে নমস্কার করল, স্যার, আমাকে বাঁচান।

ওসি কিছু বললেন না।

বাগডোগরা এয়ারপোর্টে ফোন করে জানা গেল, পরের ফ্লাইট ঘণ্টা দু'য়েক পরে। দিল্লি যাবে। তারপর কলকাতা এবং গুয়াহাটি ফ্লাইট।

ওসি বললেন, সময় আছে। চলুন, থানায় যাই। লোকাল থানার সাহায্য চাই।

দেরি হয়ে যাবে না?

না না। কাছেই থানা।

পনেরো মিনিট পরে দুটো গাড়ি এয়ারপোর্টের মুখে এসে দাঁড়াল। ভীম তার লাইসেন্স রাখতে গিয়ে জেনে এল, অ্যাম্বাসাডর গাড়ির নম্বর খাতায় লেখা আছে। তার মানে, অর্জুনের অনুমান নির্ভুল।

নতুন এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর সামনে বেশি গাড়ির ভিড় নেই। লছমন চিৎকার করল, ওই তো, আমার গাড়ি!

ভীম ট্যাক্সি থামাতেই সে ছুটে গিয়ে দরজা টেনে দেখল, লক করা আছে। উঁকি মেরে চাবি দেখতে না পেয়ে হতাশ হল, চাবি নিয়ে গিয়েছে।

অর্জুন তাকে বলল, তুমি আর ভীম এখানে অপেক্ষা করো। কেউ এলে তাকে আটকাবে।

বাগডোগরা থেকে ওসি এসেছেন দু'জন সেপাইকে নিয়ে। ভদ্রলোক অর্জুনের নাম শুনেছেন। তাঁকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলেছে অর্জুন। ভিতরে ঢোকার টিকিট কাটার দায়িত্ব নিলেন তিনি। যদিও সরকারি প্রয়োজন দেখিয়ে ওঁরা চারজন বিনা টিকিটে যেতে পারতেন। টিকিট কাউন্টারে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন, উনি যা জানতে চান, তা যদি দয়া করে জানান।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, এই একটু আগে তিনজন কি টিকিট কিনেছে?

কোথাকার?

তা জানি না। ওদের দুজনের নাম জানি। নিমা, নভেন্দু...!

ইয়েস। তিনজন নয়। দু'জন টিকিট কিনেছে।

দু'জন? অর্জুন হতাশ হল।

হ্যাঁ। দিল্লির টিকিট। উপরের লাউঞ্জে পাবেন।

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এল। কিছু যাত্রী ইতিমধ্যে এসে গিয়েছেন। এখনও সিকিউরিটি চেকিং শুরু হয়নি। একটি সোফায় নিমাকে বসে থাকতে দেখল অর্জুন। সোজা এগিয়ে সামনে দাঁড়াল সে, নিমা?

আপনি এখানে?

প্রশ্নটা আমি করেছি।

এখনই দেশে ফিরে যাচ্ছি।

শুভেন্দুশেখর জানেন?

কারও অনুমতি নিয়ে যখন আসিনি, তখন জানানোর প্রয়োজন নেই।

আপনার লাগেজ?

ওগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

নভেন্দু কোথায়?

নভেন্দু! আমি কী করে বলব? আপনি খুঁজুন।

আপনার আর ডলার দরকার নেই তা হলে?

ওয়াইল্ড গুজকে চেজ করার কোনও মানে হয় না।

এয়ারপোর্টে এলে কীভাবে?

ট্যাক্সিতে।

ও। কিন্তু আপনার যে যাওয়া হবে না। অন্তত আজ তো নয়ই।

হোয়াট? আমি একজন আমেরিকান সিটিজেন। আমাকে বাধা দিতে পারেন না। চিৎকার করে উঠল নিমা। দু'জন ওসি এগিয়ে এলেন। দোমহনির ওসি নিজের কার্ড বের করে দেখালেন, ম্যাডাম, আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে। থানায় যেতে হবে।

আমি, আমি কনসুলেটকে ফোন করব।

অবশ্যই করবেন। থানায় চলুন। সেখানে ফোন আছে।

অর্জুন ততক্ষণে মুখ ঘুরিয়ে নভেন্দুকে খুঁজছিল। তাকে চারপাশে দেখা যাচ্ছে না। সে বলল, শুভেন্দুশেখর যে-গাড়িতে আপনাকে পাঠিয়েছিলেন, সেটা বাইরের পার্কিং লটে পঁড়িয়ে আছে। যে ড্রাইভারকে আপনারা মেরে নামিয়ে দিয়েছেন, সেও সঙ্গে আছে। আপনি তো কোনও অন্যায় করেননি। নভেন্দু কোথায়?

এবার ভেঙে পড়ল নিমা। দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, টয়লেটে।

আপনি কি সত্যি ডলারের জন্য এসেছিলেন?

মাথা ঝাঁকাল নিমা, হাতে মুখ চেপে বলল, আই লাভ হিম।

.

টয়লেট থেকে বেরোতেই ধরা পড়ে গেল নভেন্দু। প্রতিবাদ, ধস্তাধস্তিতে কাজ হল না। তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে নীচে নামাতেই অর্জুন দেখল, লছমনের গাড়ির পাশে ভিড় জমেছে। ভীম ছুটে এল, ধরা পড়েছে। লোকটাকে আটকেছি।

ভিড় সরিয়ে কাছে যেতে দেখা গেল, লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আর তার পিঠে বসে আছে লছমন। অর্জুনকে দেখে লছমন বলল, স্যার, চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে পালাচ্ছিল। দুজনে মিলে কাত করেছি!

ওসির নির্দেশে দু'জন সেপাই লোকটাকে তুলতেই দোমহনির ওসি বলে উঠলেন, আরে! সাহা? তুমি?

দোমহনি থানার এস আই মাথা নিচু করলেন।

ওসির কাছ থেকে মোবাইল চেয়ে নিয়ে অর্জুন শুভেন্দুশেখরকে ফোন করল, নভেন্দুকে পাওয়া গিয়েছে। ও এখন পুলিশের হাতে।

আমি ওকে দেখতে চাই।

তা হলে আপনাকে থানায় যেতে হবে।

ওকে আমার বাড়িতে আনা যাবে না?

এখনই না।

নিমা কোথায়?

ওঁকেও আটকানো হয়েছে। উনি আপনার ছেলের শত্রু নন। উলটে সাহায্য করতে এসেছেন। ওরা বাংলাদেশের যে-চারটে ছেলেকে আমেরিকায় পাচার করতে চেয়েছিল, তাদেরও থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খারাপ লাগছে। ওদের জন্য। বেচারারা লোভে পড়ে সর্বনাশ ডেকে আনল। রাখছি।

তুমি কোথায়? শুভেন্দুশেখর জিজ্ঞেস করলেন।

বাগডোগরা এয়ারপোর্টে। অর্জুন উত্তর দিল।

ওয়েল। ফেরার পথে আমার বাড়ি হয়ে যাবে। তোমার চেক তৈরি করে রাখছি। লাইন কেটে দিলেন শুভেন্দুশেখর।

নবাবগঞ্জের নরখাদক (২০০৮)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১. খ্যাতনামা সত্যসন্ধানী

নবাবগঞ্জের নরখাদক (২০০৮)
অর্জুন সমগ্র ৫ – সমরেশ মজুমদার

প্রিয়বরেষু, প্রথমেই বলে রাখি, আপনার মতো একজন খ্যাতনামা সত্যসন্ধানীকে এই চিঠি লেখার সময় আশ্বস্ত আছি এই ভেবে যে, চিঠির বিষয় আপনি গোপন রাখবেন। ডাক্তার এবং আপনাদের কাছে যেমন কোনও তথ্য গোপন করা উচিত নয়, তেমনই সাহায্যপ্রার্থীর বিষয় তৃতীয় ব্যক্তিকে না জানানোর শিষ্টাচার নিশ্চয়ই আপনার কাছে আশা করতে পারি।

আমার বয়স আগামী পয়লা কার্তিক একাত্তর পূর্ণ হবে। এখনও বার্ধক্যজনিত উপসর্গ আমাকে আক্রমণ করেনি। কিন্তু আমার স্ত্রী পঁয়ষট্টি বছর বয়সে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কিছুদিন আগে তার পেটে ক্যান্সার রোগ ধরা পড়েছে। মুম্বইয়ের এক নামী হাসপাতাল জানিয়ে দিয়েছে, ডাক্তারিশাস্ত্রে আর কিছু করণীয় নেই।

এই পৃথিবীতে বর্তমানে স্ত্রী ছাড়া আমার কেউ নেই। তাঁর মৃত্যুর পর আমার জীবিত থাকার কোনও কারণ দেখছি না। এই সময় একটি ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়ল। বিজ্ঞাপনটি যদি সত্যি হয়, তা হলে আমৃত্যু আমি আমার স্ত্রীকে সঙ্গিনী হিসেবে কাছে পাব। কথাবার্তা হবে না, চলাফেরাও নয়, নাই হোক, তাকে এখনকার চেহারায় ঠিকঠাক দেখলেও আমার প্রাণ শান্ত হবে।

এই চিঠির সঙ্গে বিজ্ঞাপনটির ফোটোকপি আপনাকে পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট। আপনাকে অনুরোধ, এই বিজ্ঞাপনের সত্যাসত্য সন্ধান করে দ্রুত আমাকে জানান। এই বয়সে প্রতারিত হতে চাই না বলে আপনার শরণাপন্ন হলাম।

ইতি
শুভেচ্ছাসহ
কানাইলাল চৌধুরী
লাটাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

চিঠি পড়ে অবাক হল অর্জুন। চিঠির সঙ্গে তার নামে করা ব্যাঙ্ক ড্রাফটটাকে দেখল সে। তারপর ফোটোকপি করা বিজ্ঞাপনটি চোখের সামনে ধরল।

অভূতপূর্ব আবিষ্কার। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর গবেষণার পর মানুষের শরীর বিষয়ে নতুন আলোকপাত। বৈদিক ভেষজ প্রক্রিয়াকে আধুনিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে সাফল্য পেয়েছেন আয়ুর্বেদাচার্য ডক্টর নীলমোহন বকসি।

আপনার প্রিয়জনের মৃত্যু হলে শাস্ত্রমতে দাহ অথবা সমাধি দিয়ে শরীর বিনষ্ট করাই স্বাভাবিক কাজ। মৃত মানুষটির শরীর তারপর শুধু স্মৃতি বা ছবিতে থাকে। কিন্তু ভেষজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডক্টর বকসি সেই মৃতদেহকে অবিকল একই চেহারায় রেখে দিতে পারেন চল্লিশ বছর পর্যন্ত। এজন্য সেই দেহটিকে কোনও জারক রসে ডুবিয়ে রাখতে হবে না। আপনার কাছে তিনি নির্বাক হয়েই থেকে যাবেন জীবিত চেহারায়। শুধু তার হৃৎস্পন্দন থাকবে না। বিশদ বিবরণের জন্যে যোগাযোগ করুন। বক্স নম্বর...।

বিজ্ঞাপনটি ইংরেজিতে লেখা। কাগজটি ছাপা হয় উত্তর ভারত থেকে। হেসে ফেলল অর্জুন। ডক্টর নীলমোহন বকসি যতই আয়ুর্বেদাচার্য হোন, তিনি যে একটি আস্ত উন্মাদ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একটি মানুষ মরে গেল, মরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকে তার শরীরে পচনপ্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বরফে চাপা দিয়ে সেটা দু-তিনদিন ঠেকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু তিনি দিব্যি জামাকাপড় পরে একই চেহারায় ঘরে বসে থাকবেন চল্লিশ বছর পর্যন্ত? তা যদি সম্ভব হত, তা হলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যেত। নোবেল পেয়ে যেতেন ডক্টর বকসি।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা প্রতারক সংস্থা থেকে প্রচারিত বিজ্ঞাপন। মানুষের দুর্বলতাকে ওরা ব্যবহার করে টাকা রোজগার করতে চাইছে। অবিলম্বে পুলিশকে জানানো দরকার। এরকম বিজ্ঞাপন খবরের কাগজ কী করে ছাপল? অর্জুন ঠিক করল ব্যাঙ্ক ড্রাফট কানাইলাল চৌধুরীকে ফেরত দিয়ে দেবে।

কানাইলাল চৌধুরীর লেখা চিঠির একপাশে তার ফোন নম্বর রয়েছে। অর্জুন সেই নম্বরে ডায়াল করল। আজকাল এই উত্তরবঙ্গেও টেলিফোন ব্যবস্থা খুব উন্নত হয়েছে। লাইন পাওয়া গেল সহজেই। তারপর গলা শুনতে পেল, হ্যালো! কে বলছেন?

আমি শ্রীকানাইলাল চৌধুরী মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই। বলছি। নমস্কার! আমি অর্জুন। আপনার চিঠি এইমাত্র পেলাম। নমস্কার! নমস্কার! আপনার স্ত্রী এখন কেমন আছেন?

আজ সকালে একটু ভাল। কিন্তু এখন তো লিকুইড ছাড়া ও খেতে পারছে না। কানাইলাল বললেন, অর্জুনবাবু, আমার ভয় হচ্ছে বেশি সময় হাতে নেই। আপনি যদি একটু তাড়াতাড়ি খোঁজখবর নেন। আমি জানি আপনারা যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করেন, তার তুলনায় এটা অতি সাধারণ। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, আমি কী রকম টেনশনে আছি। কানাইলাল চৌধুরী প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বললেন।

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। একটু ভেবে সে জিজ্ঞেস করল, এরকম বিজ্ঞাপন বাস্তবে সম্ভব বলে আপনি কি বিশ্বাস করেন?।

আমি জানি না। এরকম হতে পারে কখনও শুনিনি। কিন্তু ছেলেবেলায় আমি ভাবতেই পারতাম না, চাঁদের বুকে কেউ হাঁটতে পারে। মহাকাশে ছ'মাস থাকা সম্ভব? এমনকী এই কিছুদিন আগেও ভাবতে পারিনি রাস্তায়, ট্রেনে, গাড়িতে বসে টেলিফোনে কথা বলতে পারব। সেলফোন শব্দটাও শুনিনি। ইন্টারনেট কী তাই জানতাম না। তাই এই ঘটনা সত্যি না মিথ্যে, তার প্রমাণ না-পাওয়া পর্যন্ত বলতে পারব না বিশ্বাস করি কি না! কানাইলাল বললেন, আপনার উপর ভরসা করে আছি ভাই। টাকার দরকার হলেই জানাবেন।

ফোন রেখে দিল অর্জুন। ভদ্রলোক যেসব যুক্তি দিলেন তা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য। কিন্তু একটি মৃতদেহের হৃদযন্ত্র বন্ধ হওয়ার পর, রক্ত নিশ্চল হয়ে গেলে কিছুতেই শরীরকে আগের অবস্থায় রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু নিজস্ব ভাবনা যতই বাস্তব হোক, সরেজমিনে দেখে কানাইলাল চৌধুরীকে জানানো সঠিক হবে।

.

অর্জুনের লাল মোটরবাইক করলা নদীর পাশ দিয়ে কংক্রিটের ব্রিজ পেরিয়ে বাবুপাড়ায় যখন ঢুকল তখন সকাল দশটা। বাবুপাড়া এমনিতেই বেশ নির্জন। ছাড়া-ছাড়া বাড়ি। ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে তিন নম্বর বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল অর্জুন।

ভিতর থেকে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন ভেসে এল, পরিচয়?

আমি অর্জুন।

দরজা খুললেন যে বৃদ্ধ, তার বয়স আশি ছাড়িয়েছে। মাথায় শণের মতো চুল। খুব রোগা। গলাবন্ধ গেঞ্জি আর ধুতি পরা। ওঁকে দেখলেই অর্জুনের মনে পড়ে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে দেখা অভিনেতা হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। হাসলেন ভদ্রলোক, কী সংবাদ তৃতীয় পাণ্ডব? এসো, ভিতরে এসো।

এই বাড়ির সব ঘরে বই ঠাসা। অর্জুন চেয়ারে বসল বই সরিয়ে। সুধাময় সান্যাল বসলেন মাটিতে, সামনে জলচৌকি, তার উপর বই খোলা।

সুধাময় সান্যাল বললেন, তুমি তো এখন বেশ নামটাম করেছ। ভাল, তবু । বলব, অনুমানের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না। বলো, কী ব্যাপার?

আচ্ছা, আপনি কি বিশ্বাস করেন কোনও মৃতদেহকে অবিকৃত অবস্থায় চল্লিশ বছর রাখা সম্ভব? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

ধুতির খুঁটে চশমার কাচ মুছতে মুছতে সুধাময় সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ?

হঠাৎ নয়, এটা দেখুন। বিজ্ঞাপনের কপি পকেট থেকে বের করে অর্জুন এগিয়ে ধরল সামনে। ওটা নিয়ে পড়লেন বৃদ্ধ। পড়ে হাসলেন, কী বলতে চাও?

এটা অসম্ভব। বুজরুকি। বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষের দুর্বলতাকে ভাঙিয়ে টাকা লুঠতে চাইছে। এখনই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অর্জুন বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বলল।

সুধাময় সান্যাল মাথা নাড়লেন, প্রতারক হলে তাই তো করা উচিত। কিন্তু তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? লোকটা প্রতারক কি না তা এখানে বসে আমার পক্ষে তো বলা সম্ভব নয়।

অর্জুন মাথা নাড়ল, আপনার অভিজ্ঞতায় এরকম ঘটনা আছে কি না। তাই জানতে এসেছি।

ও। কিন্তু তুমি তো ব্যাপারটা প্রতারণা ভেবেই রেখেছ। ওই কথাটা আবার আসছে কেন? যত অবিশ্বাস্যই হোক, যাচাই না করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা কখনওই উচিত নয়। সুধাময় সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দেওয়ালের পাশে গিয়ে একটা আঁকশি দিয়ে একেবারে উপরের তাক থেকে একটা বই নামিয়ে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন।

হ্যাঁ। এই যে! আবার জলচৌকির সামনে বসে বইটা তার উপর রেখে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন। ইংরেজি লাইনগুলো পড়ার পর চোখ তুলে তাকালেন সুধাময় সান্যাল, বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই!

অর্জুন মাথা নাড়ল। সুধাময় সান্যাল বললেন, মৃতদেহ অবিকৃত করে রাখার পদ্ধতি মিশরীয় চিকিৎসকরা আবিষ্কার করেছিলেন কয়েক হাজার বছর আগে। তখন ব্যাপারটা এত ব্যয়সাধ্য ছিল যে, বাদশা, মন্ত্রী বা ধনী ব্যক্তি ছাড়া আর কারও পক্ষে ওই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া সম্ভব ছিল না। ধরে নিতে পারি, যদি সম্ভব হত তা হলেও বাদশা বা শাসনকর্তা সেটা পছন্দ করতেন না। একজন অখ্যাত মানুষকে মৃত্যুর পরও রেখে দেওয়ার অনুমতি তাঁরা দিতেই পারেন না। সেইসব মৃতদেহকে মমি করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সময় এবং ওষুধের গুণে সেই মৃতদেহগুলো পচেগলে না গিয়ে ফসিল হয়ে গিয়েছে। আজ ওই মমিদের নিয়ে গবেষণা করেও বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেননি ঠিক কী ওষুধ তখন ব্যবহার করা হয়েছিল। একটা কথা মনে রাখতে হবে, তখন চিকিৎসাপদ্ধতি ভেষজ-নির্ভর ছিল। অ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথির কথা মানুষ জানত না। ব্যাপারটা যে বুজরুকি নয়, তা মমির ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। তার মানে এও নয়, ডক্টর নীলমোহন বকসি ওই একই পদ্ধতিতে মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। হয়তো তার পুরো দাবিই মিথ্যে। আবার সেটা মিথ্যে কিনা, তা যাচাই না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। তবে এটুকু বলা যেতেই পারে, এই দাবি যদি সত্যি হয়, তা হলে গোটা পৃথিবী আলোড়িত হবে। চা খাবে?

মাথা নাড়ল অর্জুন, না।

বিজ্ঞাপনের এই ফোটোকপি তুমি কোথায় পেলে? যতটা জানি তাতে বলতে পারি আমাদের শহরে কেউ এই কাগজ রাখে না।

লাটাগুড়ি থেকে এক ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। তিনি কী করে পেলেন, তা বলেননি। তাঁর স্ত্রীর ক্যান্সার হয়েছে। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তাই তিনি চান এই বিজ্ঞাপন যদি সঠিক হয়, তা হলে ডক্টর বকসির সাহায্য নেবেন। অর্জুন বলল।

তোমার উপর তিনি নির্ভর করছেন?

হ্যাঁ।

সুধাময় সান্যাল বললেন, তা হলে তোমার উচিত ডক্টর বকসির সঙ্গে দেখা করা।

তা হলে আমাকে লখনউ যেতে হবে, অর্জুন বলল।

বড় ভাল জায়গা। ঐতিহাসিক শহর। কত স্মৃতি, সৌজন্যবোধের শহর। যাওয়ার আগে লখনউ সম্পর্কে ভালকরে পড়ে নিয়ো। জেনে গেলে অনেক সুবিধে, সুধাময় সান্যাল উপদেশ দিলেন।

.

উত্তরবঙ্গ থেকে ভারতের অন্য প্রান্তে যেতে হলে আজকাল আর কলকাতায় আসার দরকার পড়ে না। গুয়াহাটি থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন হয়ে বিহার দিয়ে দিল্লি যায় দ্রুত গতিতে। কানাইলাল চৌধুরীকে টেলিফোনে জানিয়ে সেই ট্রেনে উঠে বসল অর্জুন নিউ জলপাইগুড়িতে গিয়ে। এসি থ্রি-টিয়ারের টিকিট কেটেছিল সে। বেশ আরামদায়ক ব্যবস্থা। কিন্তু অর্জুন লক্ষ করল, তার কামরার যাত্রীরা কী রকম গম্ভীর মুখ করে বসে আছেন। তার সামনে একজন গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক, এই অল্প আলোয় রোদচশমা পরে বসে আছেন। লোকটাকে দেখলেই মনে হয় সব সময় মতলব ভাঁজছেন। তার পাশে সিল্কের পাঞ্জাবি পরা মারোয়াড়ি ভদ্রলোক, চোখ বন্ধ করে পানমশলা চিবিয়ে যাচ্ছেন। মারোয়াড়ি ভদ্রলোকের পাশে মোটাসোটা এক মহিলা, মাথার অনেকটাই ঘোমটার আড়ালে, হাতে বড় বড় বালা, চুড়ি। ঘোমটার আঁচলের ডগা হাতের মুঠো থেকে ছাড়ছেনই না।

অর্জুনের বাঁ দিকে বসে এক বাঙালি প্রৌঢ় খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন ধরুন, একটু পরে উগ্রপন্থীদের রেখে। দেওয়া বিস্ফোরকে ট্রেনটা উড়ে গেল। আপনি কী করবেন?

হকচকিয়ে গেল অর্জুন। তারপর হেসে ফেলল, নেমে যাব নীচে।

সঙ্গে সঙ্গে মারোয়াড়ি ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঁড়ি নাচিয়ে বলে উঠলেন, আরে মশাই! ট্রেন উড়ে গেলে আপনি থোড়াই বেঁচে থাকবেন। নামবেন কী করে?

অর্জুন হাসিমুখে মারোয়াড়ি ভদ্রলোককে বলল, আপনি যখন উত্তরটা জানেন, তখন এই ভদ্রলোকেরও তা জানা আছে। তা হলে প্রশ্নটা করলেন কেন?

সচ কথা। আপনি কেন প্রশ্ন করলেন? মারোয়াড়ি ভদ্রলোক প্রৌঢ়র দিকে তাকালেন। বেশ সিরিয়াস মুখ।

প্রৌঢ় সোজা হয়ে বসে বললেন, হঠাৎ মনে হল, এই চলন্ত ট্রেনে যদি বিস্ফোরণ হয়, তা হলে আমি কী করব? ভেবে না পেয়ে ফস করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম। সত্যি তো, আমিও উড়ে যাব। হাত-পা-মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। উঃ! কিন্তু এসব জেনেও আমরা ট্রেনে উঠছি। ঠিক যেভাবে লোকে ক্যান্সার হতে পারে জেনেও সিগারেট খায়।

অর্জুন বলল, ব্যাপার দুটো বোধ হয় এক নয়। তা ছাড়া আজকাল স্টেশনে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হয় কোনও রকম বিস্ফোরক রাখা আছে কিনা ট্রেনে।

দুর! এত বড় ট্রেন, কত কামরা। কোথায় কে কী লুকিয়ে রেখেছে, তা সব সময় টের পাওয়া যায়? আমি কীরকম নার্ভাস বোধ করছি।

ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করলেন। অর্জুন খবরের কাগজটা টেনে নিল। অসমের ডিব্রুগড়ের কাছে উগ্রপন্থীরা ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। লাইনে পাতা বিস্ফোরক ট্রেন আসার আগেই ফেটে যাওয়ায় ড্রাইভার ট্রেন থামিয়ে দিতে পেরেছিলেন ঠিক সময়ে। নইলে কয়েকশো যাত্রী প্রাণ হারাতেন।

অর্জুন প্রৌঢ়ের দিকে তাকাল। এরকম খবর পড়লে ট্রেনে বসে একটু নার্ভাস হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। হঠাৎ তার মনে হল, এখন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় উগ্রপন্থীরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষ মারছে। কিন্তু তাদের ক'জন ধরা পড়ছে? এটাও তো হত্যাকাণ্ড। কিন্তু খবরটা পুরনো হলেই সকলে ভুলে যাচ্ছে।

.

ট্রেন ছুটছিল। অর্জুন দেখল গোঁফওয়ালা, রঙিন চশমায় চোখঢাকা লোকটি উঠে দাঁড়াল। তারপর করিডোর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। লোকটা চোখের আড়ালে যাওয়ামাত্র পাশের প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, লক্ষ করেছেন?

কী?

আড়াই ঘণ্টা হয়ে গেল, গুঁফো একটাও কথা বলেনি। চেহারায় কীরকম উগ্রপন্থী ছাপ রয়েছে। হয়তো বাথরুমে বিস্ফোরক রেখে সামনের স্টেশনে নেমে যাবে। ভুল বলছি?

আপ্তবাক্যটি মনে পড়ল অর্জুনের, কেউ সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। সে মাথা নাড়ল, হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। চেহারা দেখলে সব সময় সত্যিটা বোঝা যায় না। এই যেমন আপনি। আচ্ছা, আপনি কি

পেটের গোলমালে খুব ভোগেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

অ্যাকিউট কোষ্ঠকাঠিন্য! ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

তা সত্ত্বেও আপনি বোমা রেখে এই ট্রেন উড়িয়ে দিতে পারেন।

আমি? আ-আ-আমি? চোখ বড় হয়ে গেল ভদ্রলোকের।

কেন নয়! বলা হয়েছে যতক্ষণ না নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ কেউ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

আমাকে কী দেখে নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে না আপনার? মুখ শুকিয়ে গিয়েছে ভদ্রলোকের।

আমাকে কী মনে হচ্ছে আপনার? আগে কখনও দ্যাখেননি। অর্জুন হাসল।

তা ঠিক, তবু... এই ধরুন, এই ভদ্রলোক। আজ অবধি কোনও মারোয়াড়ি উগ্রপন্থীর কথা কাগজে পড়িনি। ভদ্রলোক উলটো দিকের লোকটিকে চোখের ইশারায় দেখালেন।

অর্জুন কাঁচের দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। হাত ধোওয়ার বেসিনের সামনে জায়গাটা ফাঁকা। দু পাশে বাথরুমে ঢোকার দরজা দুটোর একটা বন্ধ। ট্রেনের গতি কমে আসছে। অর্জুন দরজার সামনে গিয়ে ছিটকিনি তুলতে-না তুলতে প্ল্যাটফর্ম এসে গেল। ধীরে ধীরে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। কয়েকজন যাত্রী উঠে পড়লেন ট্রেনে। টিটিই এসে গেলেন। যাত্রীরা ভিতরে ঢুকে যাওয়ার পর অর্জুন দেখল, বাথরুমের দরজা খুলে গোঁফওয়ালা লোকটি বেরিয়ে এসে সোজা প্ল্যাটফর্মে নেমে গেল। এবং তখনই ট্রেন ছেড়ে দিল। মুখ বাড়িয়ে অর্জুন দেখল, লোকটা হেঁটে চলেছে।

দরজা বন্ধ করে দিন। পাশে এসে দাঁড়ালেন টিটিই।

অর্জুন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, একজন প্যাসেঞ্জার এইমাত্র নেমে গেলেন।

যেতেই পারেন।

ফিরে এসে বাঙালি প্রৌঢ়কে ব্যাপারটা বলতেই তিনি চেঁচামেচি শুরু করলেন। তার চিৎকারে ভিড় জমে গেল। রেলের ইউনিফর্ম পরা দুজন অফিসার ছুটে এলেন। সব শুনে একজন রেলরক্ষীকে নিয়ে ওঁরা ছুটে গেলেন বাথরুমের দিকে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেঁচাচ্ছিলেন, ট্রেন থামাতে হবে। চেন টানুন, চেন টানুন। উঃ! যে-কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে। মা কালী, মা দুর্গা, মা সরস্বতী! আমি এখনই মারা যাব!

ভদ্রলোকের উন্মাদ-আচরণ সংক্রমিত হল। রেলের একজন অফিসার চেন টানতে বাধ্য হলেন। গাড়ি থামামাত্র সবাই হইহই করে নীচে নেমে মাঠে গিয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণে প্রৌঢ় স্বস্তিতে ফিরলেন, যাক, বেঁচে গেলাম! ফাটুক এবার। আমাদের তো আর মারতে পারবে না।

.

প্রায় একঘণ্টা ধরে রেলের অফিসাররা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পেলেন না। তবু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওই কামরা খালি রেখে যাত্রীদের অন্য কামরায় পরবর্তী স্টেশন পর্যন্ত তুলে নেওয়া হল। বসার জায়গা পাওয়া । যায়নি। ছুটন্ত ট্রেনে অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোক মাঝে মাঝে চমকে উঠছিলেন অন্যরকম কোনও শব্দ কানে এলেই।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামলে বম্ব স্কোয়াডের লোকজন এসে অনুসন্ধান করে জানিয়ে দিল কোনও বিস্ফোরক ট্রেনে নেই। আগের কামরায় ফিরে এল ওরা।

অর্জুন বলল, নার্ভাস হয়ে গিয়ে কী কাণ্ডই করলেন বলুন তো?

না না! সাবধানের মার নেই।

কিন্তু ট্রেন লেট হয়ে গিয়েছে। তার উপর হ্যারাসমেন্ট।

তা হোক। প্লেনে বিস্ফোরক আছে সন্দেহ করলে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা হয় না? এখন কিছু নেই তাই একথা বলছেন, থাকলে কী হত ভেবে দেখুন! প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথা শেষ হতে না-হতে রেলের দু'জন অফিসার সামনে এসে দাঁড়ালেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পুরো নামটা বলুন।

পিনাকেশ মিত্র।

ঠিকানা?

কাঁসিরাম মার্গ, লখনউ।

আপনি কী করেন?

স্কুলে পড়াই।

মিস্টার মিত্র, আপনিই প্রথম ট্রেনে বিস্ফোরক আছে সন্দেহ করে চিৎকার করেছিলেন। আপনার চিৎকারে অন্য যাত্রীরা ভীত হয়ে পড়েন। কী কারণে আপনার মনে ওই সন্দেহ এল?

আসবে না? বলেন কী! একটা গোঁফওয়ালা লোক চোখে কালো চশমা পরে ঠায় বসে থাকল সামনে, কারও সঙ্গে কোনও কথা বলল না। তারপর উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। আর ট্রেন থামতেই টুক করে

কেটে পড়ল। সঙ্গে কোনও সুটকেস দূরের কথা, ব্যাগও ছিল না। এতে সন্দেহ হবে না?

ব্যাগ বা সুটকেস না থাকলে বিস্ফোরক রাখবে কোথায়?

অ্যাঁ! পকেটে রাখতে পারে না?

সচরাচর যে বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়, তা পকেটে নিয়ে বসে থাকা যায় । তা ছাড়া আপনি যার কথা বলছেন, তিনি রেলপুলিশের একজন বড়কা। ওঁর ওই স্টেশনেই থামার কথা ছিল। ভদ্রলোক কে, তা আপনি টিটিইকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। তা না করে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন।

বিপদ মানে?

আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিনা কারণে যাত্রীদের ভয় পাইয়েছেন। তাদের একত্রিত করে রেলের অফিসারকে চেন টানতে বাধ্য করেছেন। অহেতুক ট্রেনটাকে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে আপনার জন্য। টিকিট কেটেও দীর্ঘসময় এই কামরার যাত্রীরা অন্য কামরায় দাঁড়িয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে আপনার কৃতকর্মের জন্য। আপনাকে পরের স্টেশনে আমরা রেলপুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছি। আপনার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হবে। উঠুন।

সে কী! আমি, আমি তো ভালর জন্যই করেছিলাম...

আদালতে যা বলার বলবেন।

হঠাৎ প্রৌঢ় ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন, এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল ছিল। আমার শরীর ছিন্নভিন্ন হলে আমি তো দেখতে আসতাম না। অর্জুনের দিকে তাকালেন তিনি, লোকটার নেমে যাওয়ার খবর আপনি যদি আমাকে না দিতেন, তা হলে আমি রিঅ্যাক্ট করতাম না।

অফিসার বললেন, উনি আপনাকে অনেকবার বলেছেন শান্ত হতে।

অন্য যাত্রীরা উঠে এসে সব শুনলেন। তারা এবার অনুরোধ করলেন, মানুষটি সরল, শিক্ষক, এঁকে ছেড়ে দিন।

অফিসার জানালেন, আমাদের কিছু করার নেই। পুরো ঘটনাটা কর্তৃপক্ষ জেনে গিয়েছেন। বম্ব স্কোয়াডকে ডাকামাত্র তারা জানতে পেরেছেন। ঠিক আছে, আপনি এখানেই এখন বসে থাকুন। ট্রেন থামলে আমরা আসব।

অফিসাররা চলে যাওয়ার পর পিনাকেশ মিত্র দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। অর্জুন বলল, শান্ত হন। একজন ভাল উকিলকে সব কথা খুলে বললে তিনি নিশ্চয়ই জামিনের ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমি মুখ দেখাতে পারব না। আমার চাকরি চলে যাবে।

শেষপর্যন্ত ভদ্রলোক শান্ত হলেও গুম হয়ে বসে রইলেন। এই সময় মারোয়াড়ি ভদ্রলোক তাকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে কিছু বলতেই তার চোখ চকচক করে উঠল। খানিকক্ষণ উসখুস করলেন। তারপর অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

লখনউ।

উঃ! ঈশ্বর আছেন। শুনুন। আমি ওঁদের ঠিকানাটা ভুল বলেছি। আমি থাকি লখনউ বেঙ্গলি ক্লাবের পাশে। পিনাকেশ নয়, পিনাকীরঞ্জন আসল নাম। ভয়ের চোটে যা মুখে এল, বলে ফেলেছিলাম।

ও।

আমার এই সুটকেসটা বাড়িতে পৌঁছে দেবেন?

বেশ, অর্জুন বলল।

এসব ঘটনার কথা একবারও বলবেন না প্লিজ।

তাই হবে।

ঘণ্টাদুয়েক টানা ছুটে ট্রেন গতি কমাতে আরম্ভ করতেই ভদ্রলোক বললেন, যাই, বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।

ধীরে ধীরে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

ট্রেন থামল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন রেলপুলিশ নিয়ে অফিসার চলে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, পিনাকেশবাবু কোথায়?

টয়লেটে গিয়েছেন।

ও।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়ালেন অফিসার। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কোন টয়লেটে গিয়েছেন উনি?

অর্জুন সঠিক দিকটা দেখিয়ে দিতে তারা চলে গেলেন সেখানে। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছিল। একটি টয়লেট থেকে একজন মহিলা বেরোলেন। অন্যটি থেকে আর-একজন বৃদ্ধ। ট্রেন দুলে উঠতেই অফিসার চিৎকার করে উঠলেন, পালিয়েছে। লোকটা পালিয়েছে। প্ল্যাটফর্মে খুঁজুন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হুড়মুড়িয়ে নেমে গেলেন রেলপুলিশের কনস্টেবল এবং অফিসার।

ট্রেন গতি বাড়িয়েছে। নিজের জায়গায় ফিরে এসে অর্জুন দেখল, মারোয়াড়ি ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে পানমশলা চিবিয়ে চলেছেন।

অর্জুন বলল, একজন সরল মানুষকে আপনি এমন বুদ্ধি দিলেন যে, এখন উনি অপরাধী হয়ে গেলেন।

চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লেন মারোয়াড়ি ভদ্রলোক, এ ছাড়া উনি বাঁচতে পারতেন না। পুলিশ ওঁকে জেলে দিত। সরকারের কাজে ব্যাঘাত তৈরি করার জন্য দু'-তিন বছর জেলে থাকলে চাকরিটাও চলে যেত। উনি যে ভয় পেয়ে বোকামি করেছেন, এটা বুঝতে পারলেও ছাড়ত না। কেন ছাড়ত না জানেন? ওরা পাবলিককে দেখাত যে, ওরা কত ভাল ডিউটি করছে। এখন যদি বুদ্ধি করে হাওয়া হয়ে যেতে পারেন, তা হলে এসব থেকে বেঁচে যাবেন উনি। তা ছাড়া আমি কে? তোক তো কত কিছু বলে, সব শুনতে হবে? উনি ভাল মনে করেছেন বলে শুনেছেন?

অর্জুন আর কথা বাড়াল ।

.

লখনউ স্টেশনে যখন ট্রেন পৌঁছোল, তখন সকাল সাতটা। অনেক চেষ্টা করেও ম্যানেজ করতে পারেননি ট্রেনচালক, ট্রেন এক ঘণ্টার উপর দেরি করে স্টেশনে ঢুকল। নিজের ব্যাগ নিয়ে অর্জুন নামতে যাচ্ছিল, মারোয়াড়ি ভদ্রলোক ইশারায় পিনাকেশবাবুর সুটকেস দেখিয়ে দিলেন।

একটু ইতস্তত করল অর্জুন। সে যদি পৌঁছে না দেয়, তা হলে এই সুটকেস দিল্লি চলে গিয়ে রেলের সম্পত্তি হয়ে যাবে। আপত্তি থাকলে তখনই পিনাকেশবাবুকে জানানো উচিত ছিল। সে সুটকেসটা তুলে নিল। ভাগ্যিস বেশি ভারী নয়!

জলপাইগুড়ির কদমতলার জগুদা কিছুদিন লখনউয়ে ছিলেন। রওনা হওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে থাকার জায়গার খোঁজ নিয়েছিল অর্জন। জগুদা বলেছিলেন, বড় হোটেলগুলোতে বিস্তর টাকা লাগে। তুমি এক কাজ করো, মদনমোহন মালব্য রোডে চলে যাবে। ওখানে অল্প দামে কিছু ভাল গেস্ট হাউস আছে। তার একটায় উঠতে পারো। কোনও অসুবিধে হবে না।

স্টেশন থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে মদনমোহন মালব্য রোডে আসার সময় পুরনো দিনের বদলে আধুনিক শহর চোখে পড়ল। তবে লখনউ শহরের স্টেশনটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মুঘল আমলের আদলে স্টেশনবাড়িটি তৈরি করা হয়েছে। ট্যাক্সিওয়ালা হোটেলের নাম জানে, কিন্তু ওখানে কোনও গেস্ট হাউস আছে কিনা, তার খবর রাখে না।

মদনমোহন মালব্য রোডে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অর্জুন কয়েকজন পথচারীকে পরপর জিজ্ঞেস করে যখন হদিশ পেল না, তখন জগুদার উপর অতিরিক্ত আস্থা রাখার জন্য নিজের উপরও

তার রাগ হচ্ছিল। আর-একটা ট্যাক্সি ডেকে অল্প দামি কোনও হোটেলে নিয়ে যেতে বলবে বলে ভাবতেই একটা গাড়ি তার সামনে এসে দাঁড়াল।

এনি প্রবলেম ভাই?

অর্জুন দেখল, যিনি গাড়ি চালাচ্ছেন, তিনিই প্রশ্নটা করলেন। মধ্যবয়সি মানুষটিকে তার অবাঙালি বলে মনে হল। আরে মানুষ কি এই শহরে গায়েপড়ে কথা বলে! সে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, এখানে কি কোনও গেস্ট হাউস আছে?

চোস্ত উর্দুতে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, অবশ্যই আছে। পার্টিকুলার কোনও গেস্ট হাউসের ঠিকানা কি সঙ্গে আছে?

না।

দরজা খুলে দিলেন ভদ্রলোক। পিছনের এবং পাশের। উঠে পড়ুন, জিনিসগুলো পিছনের সিটে রেখে দিন।

পাশে বসামাত্র ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে আসছেন?

জলপাইগুড়ি।

যা ব্বাবা! আপনি বাঙালি? তা হলে ইংরেজিতে কথা বলছিলেন কেন? এবার হাসতে হাসতে বাংলায় বললেন ভদ্রলোক।

ওহো! আপনিও বাঙালি। কিন্তু দেখে তো মনে হয় না, অর্জুন হাসল।

কী করে হবে! আমি জন্মেছি ইলাহাবাদে, বড় হয়েছি কানপুরে, চাকরি করি এই লখনউয়ে। বিয়ে করেছি রাঁচির মহিলাকে। শরীরটায় তার ছাপ তো পড়বেই। কিন্তু মনে মনে আমি সেন্ট পার্সেন্ট বাঙালি। আমার নাম অমিতাভ। গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলে গেলেন অমিতাভ।

আমি অর্জুন।

কী উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে, বেড়াতে?

না, একটা কাজ নিয়ে এসেছি।

ব্যাবসা না চাকরি?

কোনওটাই নয়। আমি মানুষের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করি।

মাই গড! আপনাকে দেখে ভাই ধর্মগুরু বলে মনে হয় না। তারা ওসব করে থাকেন। এই যে, এখানে! ব্রেক চেপে গাড়ি দাঁড় করালেন অমিতাভ। আগে চলুন, দেখি ঘর পাওয়া যাচ্ছে কিনা! অমিতাভ দরজা খুললেন।

গেস্ট হাউসে জায়গা পাওয়া গেল। অমিতাভ নিজের পরিচয় দিলে ভাড়া অনেকটাই কমিয়ে দিলেন ম্যানেজার। মালপত্র নিয়ে ঘরে ঢোকার পর অমিতাভ বললেন, সকালে নিশ্চয়ই চা খাওয়া হয়নি। ফ্রেশ হয়ে নিন, আমি চা বলে দিয়ে যাচ্ছি।

আপনি কত দূরে থাকেন?

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে ধরলেন অমিতাভ, ঠিক পাঁচটা বাড়ি পর একটা হাউসিং কমপ্লেক্সে, গেটের দরোয়ানকে নাম বললেই দেখিয়ে দেবে। একটা ফোন করে চলে আসবেন। আচ্ছা, নো মোর আপনি। তুমি বয়সে অনেক ছোট, তুমি' বললে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না।

অর্জুন হেসে ফেলল, বিন্দুমাত্র না। দু'কাপ চা বলুন। আপনার না হয় একটু দেরি হবে। প্রথম আলাপেই যখন তুমিতে নামলেন, তখন একসঙ্গে চা খেয়ে সেলিব্রেট করা যাক।

.

মিনিটদশেক পরে বাথরুম থেকে তরতাজা হয়ে বেরিয়ে এসে অর্জুন দেখল, অমিতাভ খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছেন। সামনের টেবিলে ট্রে-র উপর টি-পট টিকেজিতে ঢাকা রয়েছে। কাগজ সরিয়ে রেখে অমিতাভ বললেন, নিশ্চয়ই চিনি খাও।

হ্যাঁ।

চা তৈরি করে এগিয়ে দিলেন অমিতাভ।

চায়ে চুমুক দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনাদের এখানে একটা বেঙ্গলি ক্লাব আছে, যার নাম আমি জলপাইগুড়িতে শুনেছি। নাটক প্রতিযোগিতা করে বিখ্যাত হয়েছে।

হ্যাঁ, ওই ক্লাব নিয়েই আমরা আছি।

ক্লাবটা এখান থেকে কত দূর?

আধঘণ্টার পথ। আজ সন্ধ্যায় যাবে নাকি?

যাওয়া যেতে পারে। এখানকার বাঙালিরা সকলে ক্লাবে যান?

না, না। ভাগাভাগি তো থাকবেই। পুজোও হয় অনেক।

আপনি সকলকে চেনেন?

অনেককেই চিনি, কিন্তু সকলকে চেনা অসম্ভব।

বেঙ্গলি ক্লাবের কাছাকাছি এক ভদ্রলোক থাকেন। স্কুলমাস্টার, নাম পিনাকীরঞ্জন মিত্র। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। চিনতে পারছেন?

স্কুলে পড়ান? পিনাকীরঞ্জন মিত্র? নাঃ! মনে পড়ছে না তো।

যাচ্চলে! সমস্যায় পড়লাম।

কী ব্যাপার?

অর্জুন ট্রেনের ঘটনাটা খুলে বলল। পিনাকীরঞ্জনের সুটকেসটা দেখিয়ে বলল, ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে বের করতে মনে হচ্ছে হিমসিম খেতে হবে।

কীরকম দেখতে বলো তো? চা শেষ করলেন অমিতাভ।

অর্জুন বর্ণনা দিয়ে বলল, মনে হয় পেটের অসুখে ভোগেন।

মাথা নাড়লেন অমিতাভ, পিনাকীরঞ্জন মিত্র? স্কুলমাস্টার? উঁহু!

অমিতাভ উঠে দাঁড়ালেন, এখনই খুঁজতে বেরিয়ো না। আমি একটু দেখি। আচ্ছা!

আর-একটা কথা। ডেলি নিউজ পত্রিকার অফিসে কীভাবে যাব?

এখান থেকে মাইলতিনেক দূরে। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেই হবে। অমিতাভ বেরিয়ে গেলেন।

সকালেই স্নান সেরে নিল অর্জুন। এটা গেস্ট হাউস বটে, কিন্তু হোটেলের ঘরের সঙ্গে তেমন কোনও পার্থক্য নেই। ম্যানেজার বলেছিলেন ব্রেকফাস্টের জন্য গেস্টদের কাছে কোনও বিল যায় না। তবে সেটা সাড়ে নটায় সেরে ফেলতে হবে।

একেবারে তৈরি হয়ে পকেটে টাকা রাখতেই দরজায় শব্দ হল। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে সেটা খুলতেই দেখল, গাট্টাগোট্টা একটা লোক গেস্ট হাউসের ইউনিফর্ম পরে দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে সেলাম করল, রুম পরিষ্কার করব স্যার? হিন্দিতে বলল।

আমি তো এইমাত্র ঘরে ঢুকলাম। রুম কি পরিষ্কার ছিল না? হিন্দিতেই জবাব দিল অর্জুন।

লোকটি হাসল, অনেকে কোনও জামা একবার পরেই কাচতে দেয়, আবার কেউ কেউ দু'দিন ধরে পরে। আপনি তো স্নান করেছেন, হয়তো বিছানায় শুয়েছেন। তাই মনে হল জিজ্ঞেস করি ঘর পরিষ্কার করতে হবে কিনা!

বাঃ! তুমি তো বেশ সুন্দর কথা বলো। অর্জুন টেবিলে রাখা একটা খাম পকেটে ভরে নিল।

স্যার, আমার কথা যদি আপনার শুনতে ভাল লাগে, তা হলে জানবেন এটা লখনউ শহরের দান। আপনি কি এর আগে এখানে এসেছেন? লোকটি দরজাতেই দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

না, এই প্রথমবার।

তা হলে আপনি নিশ্চয়ই লখনউ শহর ঘুরে দেখবেন। একা ঘুরলে আপনার কাছে অনেক কিছু অজানা থেকে যাবে। আমার এক ভাই ট্যাক্সি চালায়। আপনি চাইলে ও আপনাকে খুব যত্ন করে ঘোরাবে, লোকটি বলল।

কী নাম তোমার?

আবদুল। আমার ভাইয়ের নাম আফজল।

দরকার হলে বলব।

ডাইনিং টেবিলে বসে মনে মনে হাসছিল অর্জুন। আবদুল নিশ্চয়ই তাকে পকেটভরতি করে নিয়ে আসা একজন টুরিস্ট বলে ভেবেছে। কানাইলাল চৌধুরীর পাঠানো টাকার বেশ কিছুটা গিয়েছে ট্রেনের আসা-যাওয়ায় টিকিটে, বাকিটা তিনদিনেই শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য কানাইলাল বলেছেন, টাকার দরকার হলে তাকে জানাতে। কিন্তু নিজের বেড়ানোর জন্য খরচ করার টাকা ওঁর কাছে চাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ডাইনিং রুমটি বেশ বড়। গোটাআটেক টেবিল মানে, এই গেস্ট হাউসে অন্তত আটটি ঘর রয়েছে। বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা টেবিলে অন্তত পাঁচটি পদ। লুচি-তরকারির সঙ্গে স্যান্ডউইচ, পোচ, মিষ্টির সহাবস্থান। অর্জুন পাঁচটি পদই নিয়েছিল প্লেটে, যাতে বিকেলের আগে খাওয়ার দরকার না হয়। খেতে বসেছিল যখন, তখন ডাইনিং টেবিলে কেউ ছিল না। এখন একজন বৃদ্ধ এলেন। পাকা আমের মতো চেহারা, পরনে কমপ্লিট ধূসর রঙের সুট। বয়স আশির কাছাকাছি। বেশ গোলগাল চেহারা, উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির মতো। ভদ্রলোকের ডান হাঁটুতে সমস্যা আছে। হাঁটার ভঙ্গি তো তাই বলছে।

টেবিল থেকে খাবার প্লেটে তুলে বৃদ্ধ চারপাশে তাকালেন। অর্জুনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি হেসে বললেন, গুড মর্নিং!

গুড মর্নিং!

ক্যান আই জয়েন ইউ?

ওঃ। শিয়ের! অর্জুন সোজা হয়ে বসল।

ভদ্রলোক উলটো দিকের চেয়ারে বসলেন, যদি ভুল না করি, তা হলে মহাশয় একজন বঙ্গসন্তান, তাই কি?

অবশ্যই।

বাঃ! সকালটা বেশ ভাল কাটবে। আমার কয়েকটা দোষ আছে ভায়া, আমি একা একা খেতে পারি না। তেমন হলে টিভি চালিয়ে দিই। মানুষজন কথা বলেন, শুনতে শুনতে খাই। তখন মনে হয় না আমি একা। ওহো, আমি চন্দ্রশেখর গাঙ্গুলি। ইলাহাবাদের বাঙালি। ভদ্রলোক প্লেটের দিকে তাকালেন। সেখানে দুটি চিকেন স্যান্ডউইচ আর কাটাচামচ। ওঁর প্লেটের তুলনায় নিজের প্লেটটার উপর প্রায় পাহাড় রয়েছে বলে মনে হল অর্জুনের।

ভায়ার পরিচয়? স্যান্ডউইচের টুকরো মুখে তুললেন চন্দ্রশেখর গাঙ্গুলি।

আমি অর্জুন। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে থাকি।

অর্জুন! গাঙ্গুলিমশাই মুখ তুলে কিছুক্ষণ দেখলেন, তারপর মাথা নাড়লেন, কবে আসা হল এই শহরে?

আজই।

আমি এসেছি গত সন্ধ্যায়। আমার মেয়ে-জামাই এখানেই থাকে। মেয়ে খুব অসুস্থ খবর পেয়ে এলাম। জামাই চেয়েছিল আমি ওর ওখানে উঠি। কিন্তু আমি গেলে সে বিব্রত হবেই। কাল রাতে মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। সে আমাকে বোঝে। গাঙ্গুলিমশাই মুখ তুললেন, কী নেবে? চা না কফি?

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, আমি নিয়ে আসছি! কী আনব আপনার জন্য?

কফি। ব্ল্যাক এবং নো শুগার। গাঙ্গুলিমশাই বললেন।

.

কফি খেতে খেতে গাঙ্গুলিমশাই জিজ্ঞেস করলেন, কাজ নিয়ে না বেড়াতে আসা হয়েছে?

কাজ নিয়ে। আমাকে প্রথমে ডেলি নিউজ পত্রিকার অফিসে যেতে হবে।

ভায়া কি খবরের কাগজের সঙ্গে যুক্ত?।

না। ওই কাগজে বক্স নম্বর দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। যে ভদ্রলোক বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তার ঠিকানাটা দরকার।

মাথা নাড়লেন গাঙ্গুলিমশাই, পরিচিত কেউ আছেন ওখানে?

না।

তা হলে পাওয়াটা মুশকিল হয়ে যাবে। যিনি বক্স নম্বরের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করবেন, তিনি নিজেকে গোপন রাখতে চাইবেন। খবরের কাগজ সেই গোপনীয়তা বজায় রাখে। গাঙ্গুলিমশাই বললেন, ঠিকানাটা কি খুব জরুরি?

হ্যাঁ। ওটা পেলে আমি যে জন্য লখনউ এসেছি, তা করা সম্ভব হবে।

দ্যাখো চেষ্টা করে, কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ, যদি ওরা ঠিকানা দিতে না চায়, তা হলে অক্ষয় গুপ্তার সঙ্গে দেখা করবে। তাকে আমার নাম বোলো। ও যদি বোঝে তোমার প্রয়োজন খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হলে তোমাকে সাহায্য করতে পারে।

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, অক্ষয় গুপ্তা কী পজিশনে আছেন?

অক্ষয় ডেলি নিউজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ঠিক বারোটায় অফিসে পৌঁছোয়। চন্দ্রশেখর গাঙ্গুলি হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ট্যাক্সিওয়ালা ডেলি নিউজ অফিসে পৌঁছে দিল অর্জুনকে। লোকটা যে তাকে বেশি পথ অনাবশ্যক ঘুরিয়ে বেশি ভাড়া নেয়নি, তা মিটার দেখে বুঝতে পারল অর্জুন। খবরের কাগজের অফিসের রিসেপশনে দাঁড়িয়ে অর্জুন বলল, বিজ্ঞাপন বিভাগের প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন।

ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আপনি তিন নম্বর কাউন্টারে গেলেই জানতে পারবেন, রিসেপশনের মহিলা হাসিমুখে বললেন।

অগত্যা কাউন্টার খুঁজে তিন নম্বরের সামনে লাইনে দাঁড়াল অর্জুন। মিনিটপাঁচেকের মধ্যে কাউন্টারের ওপাশের ভদ্রলোক বললেন, বলুন, আপনার কী সেবা করতে পারি?

লখনউ শহর আর বিনয় বোধ হয় মিলেমিশে আছে। অর্জুন তার প্রয়োজনের কথা বলতেই ভদ্রলোক বললেন, আপনার আগে দু'জন একই উদ্দেশে এসেছিলেন। কিন্তু আমরা ক্লায়েন্টের স্বার্থ বজায় রাখতে চাই। বক্স নম্বরের বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানা জানানো অনৈতিক কাজ হবে। এর আগের দু'জনকে যা জানিয়েছি, আপনাকেও তাই বলছি।

ভদ্রলোকের বলার ভঙ্গি দেখে অর্জুন আর কথা বাড়াল না। সে ফিরে গিয়ে রিসেপশনিস্টকে বলল, আমি মিস্টার অক্ষয় গুপ্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। উনি কি অফিসে আছেন?

উনি মিটিং-এ আছেন, একটা স্লিপ এগিয়ে দিল মেয়েটি। সেটি ভরতি করে রেফারেন্স হিসেবে চন্দ্রশেখর গাঙ্গুলির নাম লিখল অর্জুন।

.

চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর এক ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভিজিটরদের চেয়ারে বসে ছিল অর্জুন। ভদ্রলোক বললেন, মিস্টার অর্জুন?

ইয়েস।

আমরা খুবই দুঃখিত আপনাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হল বলে। এম ডি খুব জরুরি মিটিং-এ ছিলেন। আসুন আমার সঙ্গে, উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে লিফটে তিনতলায় উঠে এল অর্জুন। ছিমছাম অফিস। চারপাশে কাঁচের ঘর, মাঝখানে সুদৃশ্য কার্পেটমোড়া প্যাসেজ।

এম ডি লেখা ঘরের দরজায় আলতো শব্দ করে ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকলেন, প্লিজ, কাম ইন।

ডিম্বাকৃতি একটা বিশাল টেবিলের একপ্রান্তে বসে ছিলেন যিনি, তার মাথায় একফোঁটা চুল নেই। বয়স হয়েছে, পরনে দামি সুট।

প্লিজ, বি সিটেড। হাত বাড়িয়ে চেয়ার দেখিয়ে দিলেন অক্ষয় গুপ্তা।

অর্জুন বসল।

ভদ্রলোক হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, গাঙ্গুলিসাবকে আপনি চেনেন?

পরিচয় হয়েছে। উনিই বলেছেন রেফারেন্স হিসেবে আপনার নাম দিতে।

কিন্তু উনি তো এখন ইলাহাবাদে নেই!

উনি কাল সন্ধেবেলায় লখনউ এসেছেন।

আচ্ছা! বলুন, কী করতে পারি।

খাম থেকে বিজ্ঞাপনের ফোটোকপি বের করে সামনে রাখল অর্জুন, এই বিজ্ঞাপন আপনার কাগজের ক্লাসিফায়েড কলামে ছাপা হয়েছে, বক্স নম্বরে। আমি পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহর থেকে আসছি। যিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি। আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, অর্জুন বলল।

কাগজটার দিকে না তাকিয়ে অক্ষয় গুপ্তা বললেন, আপনি বক্স নম্বরে চিঠি লিখলে আমরা ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দেব। তিনি প্রয়োজন মনে করলে দেখা করবেন।

এতে অনেকটা সময় চলে যাবে। আমার ক্লায়েন্ট মনে করছেন সেই সময় তার হাতে নেই। সেই জন্য আমাকে ছুটে আসতে হল।

আপনার ক্লায়েন্ট? আপনি কি ল-ইয়ার?

মাথা নাড়ল অর্জুন, না, আমি সত্যসন্ধানী।

বুঝলাম না?

কোনও সমস্যার পিছনে যে সত্যি ঘটনাটা চাপা থাকে, সেটা খুঁজে বের করাই আমার কাজ। অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল।

তার মানে আপনি একজন গোয়েন্দা?

না, একজন গোয়েন্দা যা-যা করতে পারেন এবং করেন, তা আমি করি না। ক্লায়েন্ট দক্ষিণা দিলেই নীতিবিরুদ্ধ কোনও কাজ আমি করি না।

ভদ্রলোক এবার বিজ্ঞাপনের ফোটোকপি হাতে তুলে পড়লেন, ইন্টারেস্টিং! তারপর হাসলেন, আমার স্ত্রী বলেন যে, আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি। কথাটা মিথ্যে নয়। নইলে আমার কাগজে এই বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে অথচ, আমার নজর এড়িয়েছে, অক্ষয় ইন্টারকমের বোতাম টিপে জিজ্ঞেস করলেন, শর্মা, মানুষ মারা যাওয়ার পর তার শরীর টিকিয়ে রাখার ক্লেম করে এক ডক্টর বকসির বিজ্ঞাপন তুমি ছেপেছ?

ওপাশের বক্তব্য শুনে অক্ষয় গুপ্তা বললেন, নো। এটা ঠিক হয়নি। এই বিজ্ঞাপন অনেক পাঠককে উসকে দেবে। তুমি এটাকে জাস্ট এক ধরনের ফান বলে ছাপতে পারো না, ইন্টারকম বন্ধ করে অক্ষয় গুপ্তা বললেন, এই বিজ্ঞাপন দেখে আপনি সুদূর জলপাইগুড়ি থেকে ছুটে এসেছেন! ছি ছি! কিন্তু অর্জুন, আপনার ক্লায়েন্টের সমস্যাটা জানতে পারি?

ভদ্রলোককে পছন্দ হয়ে গেল অর্জুনের। সে কানাইলাল চৌধুরীর চিঠি এবং অনুরোধের বিষয়টা খুলে বলল। হতাশায় মাথা নাড়লেন অক্ষয় গুপ্তা, আপনার উচিত ছিল ওই ভদ্রলোককে এই বলে বোঝানো

যে, মানুষের শরীর অবিকৃত অবস্থায় মৃত্যুর পর বেশিদিন রাখতে বিজ্ঞান এখনও সক্ষম হয়নি। উনি ওঁর স্ত্রীকে মৃত্যুর পরও চেয়ারে বসা অবস্থায় দেখলে খুশি হবেন হয়তো, কিন্তু...

উনি যুক্তি মানছেন না।

আর আপনি ওঁকে প্রশ্রয় দিতে লখনউ চলে এলেন?

না। আমি সত্যিটা জানতে চাই।

এটা যে বুজরুকি তা জানতে কি এত দূর আসতে হয়?

আপাতচোখে বুজরুকি মনে হচ্ছে। কিন্তু খোলাখুলি বিজ্ঞাপন দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে এর পিছনে অন্য কোনও সত্য লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে। অর্জুন অক্ষয় গুপ্তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল।

ভদ্রলোক একটু ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, মিস্টার গাঙ্গুলি এখন কোথায়?

গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। বোধহয় মেয়েকে দেখতে গিয়েছেন, অর্জুন জানাল।

ওয়েল, মিস্টার গাঙ্গুলিকে আমি খুব রেসপেক্ট করি। উনি আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। ওঁর অনারে আপনাকে এই ডক্টর নীলমোহন বকসির ঠিকানা দেব। কিন্তু একটি শর্তে। আপনি যে সত্য আবিষ্কার করতে চাইছেন, তার বিশদ বর্ণনা আমার কাগজের জন্য লিখতে হবে। আপনাকে

আমি এই কাজের জন্য দায়িত্ব দিলে ঠিকানা দেওয়াটা আর অনৈতিক কাজ। হবে না, অক্ষয় গুপ্তা হাসলেন।

অর্জুন হেসে ফেলল, ধরুন, যা মনে হচ্ছে তার বাইরে কিছু পেলাম না। লোকটা স্রেফ ভণ্ড, তা হলে?

তা হলে তো আরও ভাল। আমার পাঠকদের সচেতন করা যাবে। এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে পুলিশ লোকটাকে গ্রেপ্তার করতেই পারে।

বেশ। ঠিক আছে।

অক্ষয় গুপ্তা আবার বেল টিপলেন।

২. খবরের কাগজের অফিস

খবরের কাগজের অফিসের বাইরে এসে অর্জুন কয়েক সেকেন্ড ভাবল। ডক্টর নীলমোহন বকসির বাড়ি নবাবগঞ্জ পক্ষীনিবাসের কাছে। জায়গাটা লখনউ শহর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। সেখানে যেতে হলে ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রচুর টাকা চাইবে। অপেক্ষা করতে হলে যা ভাড়া দিতে হবে, তা অনুমান করা মুশকিল। পাশেই হাইওয়ে, বাস যায়, কিন্তু সেই বাস কোথায় গেলে পাবে, তা জিজ্ঞেস করার জন্য অর্জুন একটা পানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মাথায় গাঁধীটুপি, চোখে সুরমা দেওয়া পানওয়ালা হেসে বলল, বলিয়ে সাব! আমার কাছে সেই পান আছে, যা একদিন নবাব বাহাদুর শাহ পছন্দ করতেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, ধন্যবাদ। আমি আপনার কাছে জানতে চাই নবাবগঞ্জের বাস কোথায় গেলে পাওয়া যাবে?

লোকটা হাত ঘুরিয়ে বলল, বাবু, আমি পান বিক্রি করি, এর বাইরে কোনও খবর রাখি না। আপনি কিছু মনে করবেন না, কোনও বাসওয়ালাকে জিজ্ঞেস করুন।

এরকম অভিনব উত্তর শুনে অর্জুন হেসে ফেলল। ঘুরিয়ে চমৎকার কথা বলে লোকটা বুঝিয়ে দিল ও সাহায্য করবে না।

খানিকটা হাঁটতেই একটা বাস চোখে পড়ল। লোকে বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে। এরকম বাসে চেপে তাকে নবাবগঞ্জে যেতে হবে নাকি? গেস্ট হাউসের কর্মচারী বলেছিল, ওর ভাই ট্যাক্সি চালায়। লোকটা যদি ওর ভাইকে কম টাকায় ব্যবস্থা করে দেয়, তা হলে আর ঝামেলা থাকে না।

দুপুরে গেস্ট হাউসে ফিরে এসে খোঁজ নিয়ে অর্জুন জানতে পারল, আবদুলের এখন ছুটি। বিকেলে সে ফিরবে। তার সমস্যার কথা শুনে ম্যানেজার বললেন, আপনি নতুন লোক। অত দূরে একা না যাওয়াই উচিত। ওই সব এলাকা তো ভাল নয়। গাড়ি নিয়ে গেলে সমস্যা অনেক কমে যাবে। অমিতাভজিকে বলুন, উনি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করবেন। ওঁর ফোন নম্বর আপনার কাছে আছে?

পকেট থেকে অমিতাভবাবুর দেওয়া কার্ড বের করল অর্জুন। ম্যানেজার ফোন এগিয়ে দিলে সে ডায়াল করল মেবাইলে। অমিতাভ হ্যালো বলতেই সে সাড়া দিল, হ্যালো, আমি অর্জুন। চিনতে পারছেন?

বিলক্ষণ।

আমি একটা গাড়ি খুব কম ভাড়ায় পেতে পারি? নবাবগঞ্জে যাব।

কখন?

এখন।

এখন তো হবে না ভাই, সাড়ে চারটে নাগাদ পেলে চলবে?

বেশ, অর্জুন বলল, ভাড়াটা আন্দাজ কীরকম হবে?

গাড়ি আর ড্রাইভার ফ্রি, তেলের দাম খুব ইচ্ছে হলে দিতে পারো, ফোন রেখে দিলেন অমিতাভ।

রিসিভার নামিয়ে রেখে অর্জুন ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিতেই তিনি বললেন, ওহ্হ! মিস্টার গাঙ্গুলি একটু আগে ফিরেছেন। উনি আপনার খোঁজ করছিলেন।

কেন কিছু বলেছেন?

না, ম্যানেজার একটি বেয়ারাকে ডেকে বললেন, মিস্টার গাঙ্গুলির ঘর অর্জুনকে দেখিয়ে দিতে। একটু ইতস্তত করে অনুসরণ করল অর্জুন।

দরজায় দ্বিতীয়বার টোকা দিতে গলা ভেসে এল, আইয়ে জি।

অর্জুন দরজা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। ঘরের মাঝখানে টেবিলের একপাশের চেয়ারে ফতুয়া পরে বসে আছেন বৃদ্ধ। সামনে দাবার বোর্ড। ওকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, জিভের দোষ ভাই। আজন্ম প্রবাসে থেকে জিভ প্রথমে হিন্দি বলা অভ্যেস করে ফেলেছে। বোসো, বোসো।

অর্জুন উলটো দিকে বসলে মিস্টার গাঙ্গুলি বললেন, অভ্যেস আছে?

অল্পস্বল্প।

বাঃ। এসো, এক হাত হয়ে যাক। সবে সাজিয়েছি।

আপনি একা-একাই দাবা খেলেন?

হ্যাঁ, নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই। নিজেই জিতি, নিজেই হারি। নাও, চাল দিলাম, দুটো বোড়ে এগিয়ে দিলেন মিস্টার গাঙ্গুলি।

অনেক দিনের অনভ্যেস। অর্জুন ঠিক করল আক্রমণাত্মক খেলবে। সে ঘোড়া তুলে আনল বোড়ের সামনে। বোর্ডের দিকে তাকিয়ে মিস্টার গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস করলেন, অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা হল?

হ্যাঁ। আপনার রেফারেন্স না থাকলে ঠিকানা পেতাম না গজের মুখ খুলল অর্জুন, উনি আপনাকে খুঁজছিলেন।

কথা বলে নেব। ঠিকানা কি লখনউয়ের?

একটু বাইরে। নবাবগঞ্জে।

মিস্টার গাঙ্গুলি সোজা হয়ে বসলেন, সে তো বেশ দূরে। তুমি তো প্রথমবার এই শহরে এলে। যদি কিছু মনে না করো, যাঁর কাছে যাবে তিনি কি বাঙালি?

নাম দেখে বাঙালি বলেই মনে হয়।

উঁহু। না ভায়া। ধরো, হরিহর রায়। তোমার কাছে বাঙালি বলে মনে হবে তো?

নিশ্চয়ই।

আলাপ করলে বুঝবে তিনি হয়তো গোড়া ইউপিবাসী ব্রাহ্মণসন্তান। কিস্তি সামলাও হে, গজ গিলে ঘোড়া বসালেন মিস্টার গাঙ্গুলি। অর্জুন দেখল, রাজাকে না সরিয়ে উপায় নেই।

প্রথম গেমে হেরে গেল অর্জুন। দ্বিতীয়টি যখন বেশ জমে উঠেছে, মিস্টার গাঙ্গুলির রাজা প্রায় কোণঠাসা, আর দুই কি তিন চালেই মাত করবে অর্জুন, ওই সময় দরজায় শব্দ হল। মিস্টার গাঙ্গুলি মুখ তুলে বললেন, আইয়ে জি।

দরজা খুলল। মিস্টার গাঙ্গুলি চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে অমিতাভ! তুমি এখানে কী করে?

অমিতাভ ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে নিলেন, রিসেপশনিস্ট বলল অর্জুন আপনার ঘরে। জানতে পারলাম আপনি এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। আজকাল লখনউ এলে তো আমাদের স্মরণে রাখেন না। তাই সটান চলে এলাম।

তুমি এই শ্রীমানকে চেনো? মিস্টার গাঙ্গুলি হাসলেন।

আজ সকালেই আলাপ হয়েছে। তারপর দুপুরে অফিসে মিসেস দত্তকে সে কথা বলতে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছে, অমিতাভ হাসলেন।

কীরকম?

মিসেস দত্ত বাংলা বইয়ের পোকা। আমাদের বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন লাইব্রেরির সব বই উনি গিলে খেয়েছেন। বললেন, জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে, নাম বলেছে অর্জুন? কত বয়স বলুন তো?' আমি আন্দাজে বলতে মিসেস দত্ত বললেন, জিজ্ঞেস করবেন তো জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়ার অমল সোম ওঁর গুরু কিনা!' আমি ব্যাপারটা জানতে চাইলে বাবুর পরিচয় বেরিয়ে পড়ল।মিসেস দত্তর অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে ইনি সত্যসন্ধানী। বেশ জোর দিয়ে বললেন অমিতাভ।

সত্যসন্ধানী! মিস্টার গাঙ্গুলি মাথা নাড়লেন, ইন্টারেস্টিং।

অর্জুন বলল, আপনার চাল কিন্তু পেন্ডিং আছে।

অমিতাভ বললেন, আরে রাখো চাল। আগে বলো যা শুনেছি, তা কি ঠিক?

অর্জুন হাসল, মিসেস দত্ত আপনাকে সঠিক তথ্য দিয়েছেন।

তুমি লখনউয়ে এসেছ কোনও রহস্যের সমাধান করতে?

মাথা নাড়ল অর্জুন, না, সত্যসন্ধান করতে।

ব্যাপারটা কী, তা আমাদের খুলে বলতে অসুবিধে আছে? চাঁদুদা, মানে এই মিস্টার গাঙ্গুলি যদিও ইলাহাবাদে থাকেন, কিন্তু লখনউয়ের বাঙালিদের সঙ্গে এঁর প্রায় অর্ধশতাব্দীর ঘনিষ্ঠতা। আগে অতুলপ্রসাদের গান গাইতেন খুব ভাল। এখনও মুখ খুললে সেটা বোঝা যায়, অমিতাভ বললেন।

চন্দ্রশেখর গাঙ্গুলি বললেন, দ্যাখো অমিতাভ, যারা বেশি কথা বলে, তারা কথা খোঁজে। না পেলে তাদের বাজে কথা বলতেই হয়। তুমি সেই দলে ভিড় বাড়াচ্ছ কেন?

অমিতাভ অর্জুনকে বলল, এই হল চাঁদুদা। এমন চমৎকারভাবে বকুনি আর কেউ দিতে পারে না। কী বলো! নবাবগঞ্জে গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করতে চাইছ?

ডক্টর নীলমোহন বকসির সঙ্গে।

অমিতাভ মিস্টার গাঙ্গুলির দিকে তাকালেন। তিনি মাথা নেড়ে জানালেন যে, চিনতে পারছেন না। অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা কী?

অর্জুন পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলতেই অমিতাভ চিৎকার করলেন, ফ্রড! এই বিজ্ঞাপন ডেলি নিউজ ছাপল কী করে?

মিস্টার গাঙ্গুলি অমিতাভর দিকে তাকালেন, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে প্রশ্ন করছি, ওই বিজ্ঞাপন দেখে অর্জুনবাবু এত দূরে আসার পরিশ্রম কেন করলেন? তার ক্লায়েন্টকে তো বলেই দিতে

পারতেন এটা বুজরুকি!

অমিতাভ অর্জুনের দিকে তাকালেন, তুমি কি এই বিজ্ঞাপন বিশ্বাস করছ?

না। কিন্তু একজন যখন খবরের কাগজে এরকম বিজ্ঞাপন ছাপাতে পারে তখন ধরেই নিতে হবে, তার কোনও উদ্দেশ্য আছে। আমি সেটাই জানতে এসেছি।

উদ্দেশ্য তো বোঝাই যাচ্ছে। ভড়ংটড়ং দিয়ে টাকা রোজগার করা।

ভেবে দেখুন, প্রথম ক্লায়েন্টকে ঠকানোমাত্র সে চুপ করে বসে থাকবে । হইহই করবে, পুলিশের কাছে যাবে। কাগজ বা মিডিয়া এটাকে একটা ইসু করবে। তা হলে আর ব্যাবসা করবে কী করে লোকটা। না, আমার মনে হয় না, এই ডক্টর নীলমোহন বকসি এরকম নির্বোধ মানুষ। তিনি যে ঠিক কী, তা জানতে চাই। অর্জুন ভেবেচিন্তে কথাগুলো বলল।

মিস্টার গাঙ্গুলি বললেন, অর্জুনের কথায় যুক্তি আছে।

তা হলে চলুন, তিনজনেই ঘুরে আসি ওখান থেকে, অমিতাভ বললেন।

এই বুড়ো মানুষটাকে ছেড়ে দাও মিস্টার গাঙ্গুলি বললেন, মেয়েকে কথা দিয়েছি বিকেলে দেখা করতে যাব। বেচারা আশা করে থাকবে।

অমিতাভ বললেন, শুনেছিলাম ও অসুস্থ?

হ্যাঁ। রোগটা ঠিক কী, তা নাকি ডাক্তার ধরতে পারছেন না। আজ আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব। তেমন হলে দিল্লি বা মুম্বইয়ে ওকে নিয়ে যেতে হবে। মিস্টার সান্যাল দাবার খুঁটি কৌটোয় ভরতে লাগলেন।

সেটা দেখে অর্জুন বলল, এবার আপনার হার অবধারিত ছিল।

হারলাম না। বৃষ্টির জন্য যেমন ক্রিকেট খেলা বাতিল হয়ে যায়, তেমনই অমিতাভর আগমনে খেলাটার মীমাংসা হল না। যাক গে, আমি অপেক্ষা করব। তোমাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘুমোব না। মিস্টার সান্যাল উঠে টেবিলে রাখা পার্স থেকে কার্ড বের করে এগিয়ে ধরলেন অর্জুনের সামনে, এতে আমার মোবাইল নম্বর আছে। দরকার বুঝলে ফোন করবে।

.

গাড়ি চালাতে চালাতে অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, অর্জুন, আমাদের এই প্রবাসী বাঙালিদের তোমার কেমন লাগে? আমার মেয়েরা বাংলা ভালই বলে। কিন্তু বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে হিন্দি বা

ইংরেজিতেই কথা বলা পছন্দ করে। এই আমার বাংলাতেই কুছ কুছ হিন্দু-উর্দু শব্দ এসে গিয়েছে। কিন্তু ইলাহাবাদে জন্মেও চাঁদুদার বাংলা এখনও এক নম্বরে।

চন্দ্রশেখর নামকে ছোট করে দুদা বলছেন যখন, তখন আপনি ওঁর খুব ঘনিষ্ঠ। অনেক দিন দেখছেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

সেই ছেলেবেলা থেকে। লখনউয়ে আসতেন গানের দল নিয়ে। বছরে অন্তত চারবার। একবার নাটকও করেছিলেন। মাইডিয়ার লোক। মেয়ে এখানকার ছেলেকেবিয়ে করেছিল। বিয়েটা বউদিমানতে পারেননি। নিজে তো কখনও মেয়ের বাড়িতে আসেননি, চাঁদুদাকে দিয়েও প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন, যাতে তিনি মেয়ের বাড়িতে না আসেন। অমিতাভ বললেন।

ওঁর মেয়ে খুব অসুস্থ।

হুঁ, যাক গে! আমাদের তোমার বাঙালি বলে মনে হচ্ছে তো?

অর্জুন হেসে ফেলল, বাঃ। কেন হবে না? আপনি কলকাতায় অনেক বাঙালির চেয়েও বেশি বাঙালি। আগে একশো-দেড়শো বছর ধরে কোনও পরিবার প্রবাসে থাকলে সেখানকার মানুষ হয়ে যেত। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক বাঙালি আছেন, যাঁর পূর্বপুরুষ অবাঙালি ছিলেন। আপনারা তবু বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছেন।

মাথা নাড়লেন অমিতাভ।

এখনও রোদ আছে। লখনউ শহর ছাড়তেই রুক্ষ মাঠ, মাঝে মাঝে তার ভিতর কারখানার গেট দেখা যাচ্ছিল। অমিতাভ বললেন, এখন এসেছ বলে তুমি বুঝতে পারবে না, শীতকালে যেরকম ভয়ংকর শীত এখানে পড়ে, তেমনই গরমকালের দুপুরে পাখি তো দূরের কথা, কুকুরও রাস্তায় দেখা যায় না।

এদিকে লোকবসতিও নেই নাকি? আছে। ভিতরে দূরে দূরে গ্রাম ছড়িয়ে আছে। হাইওয়ে চওড়া এবং মসৃণ। গাড়ি ছুটছিল দ্রুত গতিতে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি নবাবগঞ্জে নিশ্চয়ই গিয়েছেন?

একবার, শীতকালে। ওখানকার লেকে সাইবেরিয়া থেকে পাখি এসেছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। প্রচুর পাখি তখন আসত। আচ্ছা, পাখিরা আকাশে ওড়ার সময় কী করে বুঝতে পারত ভারতের লখনউ শহরের নবাবগঞ্জ কোথায়? শুনেছি একই পাখি প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে আসে। কোথায় সাইবেরিয়া, বলো! অমিতাভ তাকালেন।

অর্জুন বলল, ব্যাপারটা বিস্ময়কর। তবে কোথায় যেন পড়েছিলাম ঠান্ডা বাড়লেই যে পাখিরা ভারতের বিভিন্ন লেকে উড়ে এসে বসে, তাদের বাড়ি হিমালয়ে, সাইবেরিয়ায় নয়। হিমালয়ে মানস সরোবরের মতো অনেক লেক রয়েছে। এখানে গরম পড়লেই ওরা সেখানে ফিরে যায়।

আচ্ছা! তা হলে পথটা তো ছোট হয়ে গেল।

পাখির তুলনায় ছোট নয়। কয়েকবার হল্ট নিতে হয় নিশ্চয়ই। বলতে বলতে কয়েকটা ময়ূর দেখতে পেয়ে অর্জুন মুগ্ধ হল। এরকম নীরস প্রকৃতি হঠাৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠল ময়ূরগুলোর জন্য।

আমরা নবাবগঞ্জের কাছাকাছি এসে গিয়েছি, অমিতাভ ঘোষণা করলেন।

এবার কিছু বাড়িঘর চোখে পড়ছে। কিন্তু সেগুলো বেশ ছাড়া ছাড়া। একটা পেট্রল পাম্পে অমিতাভ গাড়ি রেখে দিলেন। বিশ লিটার তেল দিতে বলে অর্জুনের দিকে তাকালেন, তোমার ওই ডক্টর বকসির খোঁজখবর নেব নাকি?

এরা বলতে পারবে?

না বলার কোনও কারণ নেই। নবাবগঞ্জ শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি যদি বিখ্যাত আয়ুর্বেদ হন, তা হলে অপরিচিত কেন হবেন?

পেট্রলের দাম দেওয়ার সময় অমিতাভ লখনউয়ের হিন্দিতে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ভাই, নবাবগঞ্জে একজন বিখ্যাত আয়ুর্বেদ আছেন, ডক্টর নীলমোহন বকসি, তাঁর বাড়িটা কোথায়?

আয়ুর্বেদ! ওটা কী ব্যাপার? ছেলেটি বুঝতে পারল না।

যাচ্চলে! কোনও ডাক্তার বকসি এখানে থাকেন?

আমি জানি না।

হাইওয়েতে গাড়ি তুলে অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে খবরের কাগজ থেকে কী ঠিকানা দিয়েছে?

অর্জুন পকেট থেকে কাগজটা বের করল। ডক্টর নীলমোহন বকসি, নিয়ার নবাবগঞ্জ বার্ড স্যাংচুয়ারি, আয়ুর্বেদ লজ, লখনউ, ইউ পি।

নবাবগঞ্জের পাখিদের আস্তানার সামনে গাড়ি থামালেন অমিতাভ। বললেন, এর আশপাশেই ওঁর বাড়ি হওয়া উচিত। বাড়িটা খুঁজে পেলে আমি কি গাড়িতে অপেক্ষা করব?

তা কেন? আপনিও আমার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে যেতে পারেন!

খুশি হলেন অমিতাভ, আমি তো জানি না, তুমি কীভাবে ওই প্রসঙ্গে যাবে?

মানে?

খবরের কাগজ থেকে ঠিকানা জোগাড় করেছ একথা বলবে?

সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে। রোদ পড়ে গিয়েছে। চলুন, আগে ওঁর বাড়িটা খুঁজে বের করি।

বার্ড স্যাংচুয়ারির দরোয়ানকে বলতেই সে মাথা নাড়ল, আমাদের বাউন্ডারির পাশ দিয়ে চলে যান। রাস্তাটা যেখানে বাঁ দিকে বাঁক নিচ্ছে, তার গায়েই ওঁর বাংলো। গেটে নাম লেখা আছে।

স্যাংচুয়ারির পাশের রাস্তা ধরলেন অমিতাভ। দু'পাশে গাছগাছালি। আর কোনও বাড়িঘর নেই। রাস্তাটা যেখানে বাঁ দিকে বাঁক নিচ্ছে, সেখানেই বন্ধ গেট দেখা গেল। গেটের গায়ে লেখা, আয়ুর্বেদ লজ, ডক্টর এন এম বকসি।

গেটের ওপাশে ঘাসের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে ভিতর দিকে। চট করে দেখলে মনে হয় গাছগাছালির ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে রাস্তাটা।

অর্জুন বলল, ভদ্রলোকের বাড়িটা মনে হচ্ছে অনেকখানি জায়গা নিয়ে। যদি অনেক দিনের লোক হন, তা হলে আপনার চেনা উচিত ছিল।

ছিল, যদি উনি বাঙালি হন এবং লখনউয়ের বাঙালিদের সঙ্গে মিশতেন। আমি হলফ করে বলতে পারি এরকম নামের কোনও মানুষকে আমাদের বেঙ্গলি ক্লাবে কখনও দেখিনি। গাড়িটাকে ঘুরিয়ে বাইরেই রেখে দেওয়া যাক, অমিতাভ বললেন।

গেট খুলে ওরা ভিতরে ঢুকল। সন্ধে হতে দেরি নেই। গাছে গাছে পাখিরা চিৎকার শুরু করেছে। রাস্তাটা বাঁ দিকে ঘুরতেই ওরা প্রথমে ঝিল, পরে বাড়িটাকে দেখতে পেল। ঝিলের ধারে বাড়ি। বাড়িটা দোতলা এবং বেশ বড়। সবকটা জানলা এবং ঢোকার দরজা বন্ধ। বাড়ির দু'দিকে জঙ্গল একদিকে ঝিল, সামনে একটা ছোট্ট লন।

অমিতাভ বললেন, ইস! এই অবধি গাড়ি নিয়ে আসা যেত।

অর্জুন বাড়িটাকে দেখছিল। প্রায় দুর্গের মতো দেখাচ্ছে। সে বলল, ভিতরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। চলুন, নক করা যাক।

সে এগিয়ে গিয়ে দরজার পাশে ঝোলা একটা পিতলের চেন ধরে টানতেই ঘণ্টা বাজতে লাগল। অনেকটা চার্চের ঘণ্টার মতো আওয়াজ।

অমিতাভ বললেন, বেশ শৌখিন লোক তো!

আওয়াজ থামল কিন্তু কেউ দরজা খুলল না। অর্জুন চারপাশে তাকাল। দরজার ওপাশে বাড়ির গায়ে একটা লেটার বক্স। কাছে গিয়ে দেখল বাক্স চিঠিতে ভরতি হয়ে আছে। পরিষ্কার হল, ডক্টর বকসি বা

তার বাড়ির লোকজন বাড়িতে থাকলে লেটার বক্স ভরতি থাকত না।

ঝিলের উপর সন্ধে নেমেছে। এখনও শীত নামেনি কিন্তু ঝিলের জলে প্রচুর পাখি প্রায় বাজার বসিয়ে দিয়েছে। অমিতাভ বললেন, এরা কিন্তু এ বছরের পাখি নয়।

মানে?

এখনও সাইবেরিয়া অথবা তোমার কথামতো হিমালয় থেকে পাখিদের আসার সময় হয়নি। গতবার যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে যারা ডিম পেড়েছিল, তারা দলের সঙ্গে না ফিরে গিয়ে এখানেই থেকে গিয়েছিল। এই এক বছর ধরে সেই ডিম থেকে পাওয়া বাচ্চাদের বড় করেছে। এবার যে পাখিরা আসবে, তাদের দলে ভিড়ে ওরা ফিরে যাবে, অমিতাভ বুঝিয়ে বললেন।

অর্জুন পাখিদের দেখল। জলপাইগুড়িতে বড়সড় ডাহুক দেখা যেত করলা নদীতে। এগুলো সেই চেহারার।

অর্জুন বলল, কিন্তু কী করা যায় বলুন তো!

উনি বাড়িতে না থাকলে আমরা কী করতে পারি?

ওরকম একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর কেউ বাড়ি থেকে উধাও হয়?

দেওয়ার পর ভেবেছেন, ওঁর বুজরুকি পুলিশ ধরে ফেলতে পারে, তাই গা-ঢাকা দিয়েছেন। এই জন্য বলা হয়, ভাবিয়া করিয়ে কাজ করিয়া ভাবিয়ো না।

হঠাৎ বাড়িটার কোথাও অ্যালার্ম ক্লকের শব্দ শোনা গেল। কয়েক সেকেন্ড। তারপর থেমে গেল। অমিতাভ বললেন, ব্যাপারটা কী হল?

অর্জুন বাড়িটা দেখল। শব্দটা এসেছে বাড়ির যে দিকটা জঙ্গলের গায়ে, সেখান থেকে। সে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এই সময় একটি লোক সাইকেলে সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল পপাস্ট অফিসের কর্মী। বেশ জোরে চেপে লেটার বক্সে চিঠি ঢুকিয়ে দিয়ে লোকটা হিন্দিতে বলল, আগে চিঠি আসত না বলা চলে। এখন দু'বেলা আসছে, অথচ বাক্স থেকে নেওয়ার লোক বাড়িতে নেই। আপনারা কি এই বাড়িতে থাকেন?

অমিতাভ বললেন, না ভাই!

লোকটি আবার সাইকেলে চেপে চলে গেল।

অমিতাভ বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে কোনও কাজ হবে বলে মনে হয় না।

হ্যাঁ, চলুন। ওরা যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন আবার অ্যালার্ম ক্লক বেজে উঠল। অর্জুন দৌড়ে গেল বাঁকটার কাছে। দূরে পোস্টম্যান তখন গেট বন্ধ করছে। গেট বন্ধ হয়ে যেতেই অ্যালার্ম ক্লক থেমে গেল। অর্জুন ঘুরে বাড়িটাকে দেখল। অন্ধকারের ছায়া বাড়িটাকে ভুতুড়ে করে তুলেছে।

কাছে এসে অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, কী হল?

চলুন। গেটটাকে একটু দেখা যাক, অর্জুন হাঁটতে লাগল।

গেটের মধ্যে কি কোনও বিশেষত্ব আছে? অমিতাভ সঙ্গী হলেন।

কথা না বলে অর্জুন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখতে লাগল। এখন আলো নেই বললেই হয়। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার উপায় নেই। সে গেট খুলতেই কানে অ্যালার্ম ক্লকের আওয়াজ ভেসে এল। সেটা এখান থেকে এত মৃদু শোনাচ্ছে যে, ঢোকার সময় খেয়ালই করেনি।

শুনতে পাচ্ছেন?

চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড শোনার পর অমিতাভ বললেন, হ্যাঁ। অ্যালার্ম ক্লক বাজছে। মাই গড! ডক্টর বকসি বাড়ির গেটে নিশ্চয়ই যন্ত্র বসিয়েছেন। কেউ গেট খুললেই উনি টের পেয়ে যান।

গেট বন্ধ করলেন অমিতাভ। আবার শুনে বললেন, থেমে গিয়েছে। কী ব্যাপার?

সতর্কমূলক ব্যবস্থা। নির্জনে থাকেন তাই... অর্জুন কথা শেষ করল না।

গাড়িতে চেপে ওরা আবার বার্ড স্যাংচুয়ারির গেটে চলে এল। গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যে লোকটা তাদের ডক্টর বকসির হদিশ দিয়েছিল, সে এখন ইউনিফর্ম ছেড়ে নিজের পোশাক পরে বাড়ি ফিরছে। অমিতাভ তাকেই ডাকলেন, ছুটি হয়ে গেল?

হ্যাঁ সাহেব।

আমরা গিয়েছিলাম ডাক্তারসাহেবের বাড়িতে। বাড়িতে কেউ নেই বলে মনে হল।

একটা দাড়িওয়ালা লোককে দ্যাখেননি?

না তো!

আজ দুপুরে দেখেছিলাম ওকে ঝিলের ধারের দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। খুব লম্বা, ভারী চেহারা। ও হল ডাক্তারসাহেবের কাজের লোক। ডাক্তারসাহেব কখন থাকেন, কখন যান, তাই আমরা টের পাই না, লোকটি চলে গেল উলটো দিকে। অমিতাভ তাকালেন অর্জুনের দিকে।

অর্জুন বলল, চলুন। আপনার অনেক সময় নষ্ট হল।

মোটেই না। এতক্ষণে ব্যাপারটাকে বেশ ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে। দাড়িওয়ালা লোকটাকে যদি দুপুরে ওই বাড়িতে দেখা গিয়ে থাকে, তা হলে সে এখন কোথায়? অমিতাভ চোখ বন্ধ করলেন।

দুটোর মধ্যে যে-কোনও একটা জায়গায় থাকা উচিত।

কীরকম, কীরকম?

হয় বাড়ির বাইরে, নয়তো বাড়ির ভিতরে।

ওঃ! তুমি ব্যাপারটাকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছ না।

দিলে কোনও লাভ হবে না। ও যদি বাড়ির ভিতর থাকে, তা হলে ডক্টর বকসি চাইছেন না বলেই বাইরে বেরোবে না। দরজার তালা তো তাই বলছে। শুধু শুধু ভেবে ভেবে ব্রেনকে নিরর্থক খাটানো। চলুন! অর্জুন বলল।

.

লখনউয়ের বেঙ্গলি ক্লাবে অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। সন্ধে সাড়ে সাতটায় অর্জুন আর চন্দ্রশেখর গাঙ্গুলিকে নিয়ে অমিতাভ ক্লাবে গেলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করে জেনেছে মিস্টার গাঙ্গুলির মেয়ে আজ অনেকটা ভাল আছেন।

চন্দ্রশেখর গাঙ্গুলিকে দেখে বেঙ্গলি ক্লাবে হইচই পড়ে গেল। দীর্ঘদিন পর তাকে পেয়ে সকলে পরম সমাদরে সেক্রেটারির ঘরে নিয়ে গেল। সেক্রেটারি অরুণবাবু নিজের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বললেন, চাঁদুদা, আপনি এখানে বসুন।

মিস্টার গাঙ্গুলি বললেন, তা হয় না। ওই চেয়ারের সম্মানহানি করতে আমি আদৌ রাজি নই। তারপর বলল তোমাদের খবর কী?

ভাল। আপনি এতদিন লখনউ আসেননি কেন? অরুণবাবু জানতে চাইলেন।

বয়স হয়েছে ভায়া। এখন জায়গা বদল করতে আলস্য লাগে। ওহো, তোমরা এঁকে চিনতে পারছ না। অমিতাভ, তোমার উচিত ছিল প্রথমেই ওঁর সঙ্গে সকলের আলাপ করিয়ে দেওয়া। এই ভায়ার নাম অর্জুন। জলপাইগুড়িতে থাকেন।

এক ভদ্রমহিলা চুপচাপ বসে শুনছিলেন। এবার সোজা হয়ে বললেন, আমি আপনাকে নিয়ে লেখা প্রতিটি অভিযানের গল্প পড়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অমিতাভ বললেন, আচ্ছা, তোমরা কেউ ডক্টর নীলমোহন বকসির নাম শুনেছ?

সকলে চুপ করে রইল। মিস্টার গাঙ্গুলি বললেন, তোমরা বিকেলে বেরিয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ভাবলাম। ভেবে দেখলাম, বকসি পদবির একজনকে আমি জানতাম। ইলাহাবাদ মর্গের ডাক্তার ছিলেন তিনি। বছরপঁচিশেক আগে হঠাৎ তিনি চাকরি ছেড়ে দেন।

সকলে হেসে উঠল রসিকতা ভেবে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, কীরকম দেখতে ছিলেন ভদ্রলোক?

রোগা, খাটো চেহারা। এর বেশি মনে নেই।

অমিতাভ ঘোষণা করলেন, অর্জুন এসেছে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। আজ বিকেলে আমরা ওঁর নবাবগঞ্জের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল। কিন্তু ভদ্রলোক বাড়িতে তালা দিয়ে কোথায় যেন গিয়েছেন। বলেই মাথা নাড়লেন অমিতাভ, একজন মর্গের ডাক্তার অত বড় সম্পত্তির মালিক হতে পারেন না।

কিছুক্ষণ পর অর্জুন একাই বাইরের মাঠে এসে দাঁড়াল। পিনাকীরঞ্জন মিত্রের সুটকেস তার ঘরে পড়ে আছে। অন্যের জিনিস, তার উপর সেটা তালাবন্ধ, ভিতরে কী আছে, জানা নেই, ঘরে রাখা খুব বিপজ্জনক। পিনাকীরঞ্জন বলেছিলেন তার বাড়ি লখনউ বেঙ্গলি ক্লাবের পাশে। অমিতাভ ওঁকে চিনতে পারেননি। কিন্তু এখানে অন্য যেসব সদস্য আছেন, তারা নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন।

মোটাসোটা চেহারার এক ভদ্রলোক ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, আপনি একা এখানে দাঁড়িয়ে? ভিতরে আসুন।

যাচ্ছি। আপনি এই শহরে কত দিন?

জন্মেছি এখানে। বাবা এসেছিলেন পাঁচ বছর বয়সে ঠাকুরদার সঙ্গে।

ও! এখানে আর কোনও বেঙ্গলি ক্লাব আছে?

না, সবেধন নীলমণি এই একটিই।

এই ক্লাবের কাছাকাছি পিনাকীরঞ্জন মিত্র নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। তাকে চেনেন?

পিনাকীরঞ্জন মিত্র!

একটু ভেবে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, সরি! খেয়াল করতে পারছি না। কী করেন ভদ্রলোক?

স্কুলটিচার বলে শুনেছিলাম।

না। ওহো, দাঁড়ান দাঁড়ান! আপনি কি পি কে মিত্তিরের কথা বলছেন?

পি কে মিত্তির! কী করেন তিনি?

বছরদশেক আগে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও চাকরি নিয়ে গিয়েছেন বলে শুনেছি। এখানে ওঁর একটা বাড়ি আছে। ওঁর পরিবার এখানেই থাকেন। এখানে সকলে ওঁকে 'পি কে' বলেই চেনে। দশ বছর ওঁকে দেখিনি। লখনউ এলেও বেশি দিন থাকেন না বলে মনে হয়। ইনি আর আপনার পিনাকীরঞ্জন মিত্র একই লোক হলেও হতে পারেন, ভদ্রলোক আর-একজনকে ডাকলেন, এই ছোটু, তোর পি কে-কে কি মনে আছে?

ছোটু যাঁর নাম, তিনি বেশ সুদর্শন যুবক, হাসলেন, পি কে মানে নার্ভাস পি কে? তিনি তো এখানে থাকেন না।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, নার্ভাস পি কে মানে?

ছোটু বললেন, ভদ্রলোক অকারণেই নার্ভাস হয়ে পড়তেন। আমরা যখন ফুটবল খেলতাম, উনি তখন চিৎকার করতেন, বল লেগে ওঁর বাড়ির কাঁচের জানলা ভেঙে যেতে পারে বলে ওঁর মনে হত। অথচ ওঁর বাড়ির অনেক দূরে আমরা খেলতাম।

বাড়িটা চেনেন?

অবশ্যই।

একটু নিয়ে যাবেন?

ছোটু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মোটরবাইক নিয়ে এলেন। অর্জুন বাইকের পিছনে বসতেই ছোটু বেরিয়ে এলেন ক্লাবের গেট দিয়ে। পি কে মিত্তিরের বাড়িতে পৌঁছোতে মিনিট আড়াই লাগল। এলাকাটা ঘিঞ্জি, গায়ে গায়ে বাড়ি। বেঙ্গলি ক্লাবের পাড়া হলেও বাসিন্দারা অবাঙালি বলাই ভাল।

দোতলা বাড়ির সামনে বাইক থামিয়ে ওরা দেখল, দরজা খোলা। একটি ছেলে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। অর্জুন বাইক থেকে নেমে এগিয়ে গেল, আচ্ছা, পি কে মিত্রর বাড়ি এটা?

ছেলেটা নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

ওঁর ভাল নাম কি পিনাকীরঞ্জন মিত্র?

কেন বলুন তো? ছেলেটি এবার সন্দিগ্ধ।

বলছি।

হ্যাঁ।

ওঁর কি আজ বাড়িতে ফেরার কথা ছিল?

হ্যাঁ। আপনি কে?।

আমার সঙ্গে ট্রেনে ওঁর আলাপ হয়। উনি নেমে যান মাঝপথে। নামার আগে একটা সুটকেস আমাকে দিয়ে বলেন, সেটা এই বাড়িতে পৌঁছে দিতে। আমি লখনউ আসছি জেনেই উনি অনুরোধ করেন। অর্জুন বলল।

হঠাৎ ছেলেটি চিৎকার করল, মাম্মি, মাম্মি! জলদি এসো! চিৎকার শুনে এক মধ্যবয়সিনী মহিলা ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, কী হল?

ইনি বলছেন বাবা ওঁর সঙ্গে ট্রেনে আসছিলেন, মাঝরাস্তায় পালটি করে নেমে যান। ওঁকে সুটকেস দিয়ে বলেছেন আমাদের পৌঁছে দিতে। ছেলেটি বলল।

ওমা! ও নেমে গেল কেন? কোনও বিপদ হয়নি তো? ওর মতো মানুষ ট্রেন থেকে নেমে পড়বে কোনও কারণ ছাড়া একথা আমি বিশ্বাসই করি না। ভদ্রমহিলা বেশ জোরে জোরে কথাগুলো বলতে রাস্তার কিছু লোক এদিকে তাকাল।

অর্জুন বলল, দেখুন, আপনি চেঁচিয়ে কথা বলবেন না। তাতে পিনাকীবাবুই বিপদে পড়বেন। পুলিশ ওঁকে খুঁজছে।

সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর নেমে গেল ভদ্রমহিলার, পুলিশ! কী করেছে ও?

উনি ভয় পেয়ে বলেছিলেন ট্রেনে বিস্ফোরক আছে। অন্য যাত্রীদের উত্তেজিত করে ট্রেন থামিয়েছিলেন চেন টেনে। পরে জানা গিয়েছে ট্রেনে কোনও বিস্ফোরক নেই। অহেতুক ভয় দেখিয়ে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটানোর অভিযোগ ওঁর বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার হবেন বুঝে উনি ট্রেন থামতেই নেমে পড়েন। নামার আগে আমায় অনুরোধ করেন সুটকেসটা পৌঁছে দিতে। অর্জুন বলল।

মাথা নাড়লেন ভদ্রমহিলা, হ্যাঁ এরকম ওর পক্ষেই করা সম্ভব। যখন এখানে ছিল, জ্বলেপুড়ে মরতাম। চাকরি করতে গেল যখন, তখন ভাবলাম স্বস্তিতে থাকব। এখন কী হবে? কোথায় গেল সে! ধরা পড়ল নাকি! কিন্তু কই, পুলিশ তো এখনও এখানে আসেনি।

উনি রেলের পুলিশকে নিজের ঠিক পরিচয় দেননি।

ও! সুটকেস কোথায়?

আমি যে গেস্ট হাউসে উঠেছি, সেখানে। আমার নাম অর্জুন। অর্জুন গেস্ট হাউসের নাম-ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে বলল, ব্যাপারটা জানাজানি হলে পিনাকীবাবুকে ধরতে পুলিশের সুবিধে হবে। আচ্ছা নমস্কার।

ছোটুর বাইকে চেপে ক্লাবে ফিরে এল অর্জুন।

ছোটু বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বলুন।

আপনি তো অপরাধীদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। কিন্তু দেখলাম, আপনি পি কে-কে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, পুলিশে দিচ্ছেন না। ছোটু বললেন।

দেখুন, উনি অন্যায় করেছেন ঠিকই। কিন্তু ইচ্ছে করে তো করেননি। এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন যে, বুঝতেই পারেননি অন্যায় করেছেন। যখন করলেন, তখন বাঁচার তাগিদে নিজের পরিচয় গোপন করে ট্রেন থেকে নেমে গেলেন। ওঁর কাজের জন্য কারও তেমন ক্ষতি হয়নি। পুলিশ ধরলে কয়েক মাস জেলে পুরে দিত। উনি চাকরি করেন। এটুকু উপেক্ষা করলে তো কোনও ক্ষতি হবে না! অর্জুন বলল।

.

রাত দশটায় গেস্ট হাউসে ফিরে চমকে উঠল অর্জুন। স্বয়ং পিনাকীরঞ্জন মিত্র বসে আছেন তার অপেক্ষায়। ওকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালেন।

আপনি?

বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। আপনি আমার বাড়িতে খবর দেওয়ার পরই ফিরেছি। খুব বকুনি শুনতে হল স্ত্রীর কাছে। দিন সুটকেসটা।

পিনাকীরঞ্জনকে ঘরে নিয়ে এল অর্জুন। বলল, বসুন। আপনার অ্যাডভেঞ্চারের গল্পটা আগে বলুন।

পিনাকীরঞ্জন ঘরে এসে বললেন, আমি একগ্লাস জল খাব।

গ্লাসে জল ঢেলে এগিয়ে দিল অর্জুন। কয়েক ঢোকে জল শেষ করে দিলেন তিনি।

অর্জুন বলল, ওই আপনার সুটকেস।

আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব!

তার দরকার নেই। কিন্তু আপনি আমাকে ঝুঁকি নিতে বাধ্য করেছিলেন। ওই সুটকেসে যদি চোরাই মাল, মাদক অথবা পিস্তল টিস্তল থাকে, তা হলে আমার কী হত ভেবে দেখুন। আশা করি সেসব কিছু নেই। অর্জুন বলল।

না না। বিশ্বাস করুন ভাই, আমি সত্যি নিরীহ লোক।

একেবারে নিরীহ নন, তা হলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যেতেন।

আমি জানি না কেন ধরা পড়লাম না। হয়তো পুলিশ আমাকে তেমনভাবে খোঁজাখুঁজি করেনি। আচ্ছা, যে জলটা দিলেন, সেটা ফোঁটানো তো? ভদ্রলোকের চোখে-মুখে হঠাৎ অস্বস্তি ফুটে উঠল।

নিশ্চিন্ত থাকুন। এবার বলুন, ট্রেন থেকে নেমে কী করলেন?

সোজা মেন গেট দিয়ে বাইরে চলে এলাম। কোনও চেকার ছিল না, তাই টিকিট দেখাতে হয়নি। বেরিয়ে একটা রিকশায় চেপে শহরের বাস টার্মিনাসে পৌঁছে বাস বদলে বদলে কানপুরে পৌঁছাতে সন্ধে হয়ে গেল। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল এই বুঝি পুলিশ ধরল! কিন্তু ধরেনি। পিনাকীরঞ্জন বললেন।

ধরলে আপনি আমার সামনে বসে থাকতেন না, অর্জুন মাথা নেড়ে বলল, কানপুর থেকে ট্যাক্সি নিলেন?

না। একা ট্যাক্সিতে উঠতে কীরকম নার্ভাস লাগে।

কেন?

ভয় হয় যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে, তা হলে আমি মরে যাব। আর বাড়ির লোকজন জানতেও পারবে না আমি কোথায় পড়ে আছি। তার উপর কানপুর লখনউ হাইওয়েতে ড্রাইভাররা খুব জোরে গাড়ি চালায়।

তা হলে এলেন কী করে?

হাইওয়ের মুখ পর্যন্ত রিকশায় এলাম। ট্রেনে আসতে পারতাম, কিন্তু রেলওয়ে পুলিশকে এড়াতে স্টেশনে যাইনি। হাইওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে গাড়ি থামাতে চাইলাম। বড় ট্রাকে জায়গা পেলে ভয় কমে যায়। অ্যাক্সিডেন্ট হলে ছোট গাড়ির ক্ষতি হবে, কিন্তু ট্রাক ঠিক থাকবে। কিন্তু ট্রাকগুলো থামছিল না। শেষপর্যন্ত একটা বড় গাড়ি থামতেই আমি ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম লখনউ যাবে কিনা। গাড়ি চালাচ্ছিলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাথা নেড়ে ইশারায় জানালেন, যাচ্ছে।

আমি উঠে পড়তেই গাড়ি চলতে শুরু করল। ঘণ্টাখানেক কোনও কথাবার্তা নেই। অন্ধকারে হেডলাইট জ্বেলে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। একঘণ্টা ধৈর্য ধরার পর বললাম, কিছু মনে করবেন না, বেশিক্ষণ চুপ করে থাকলে আমার কীরকম লাগে। আপনি লখনউয়ের কোথায় যাচ্ছেন?

হিন্দিতেই জিজ্ঞেস করলাম। ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে নবাবগঞ্জে নামিয়ে দিলে অসুবিধে হবে?

একেবারে লখনউয়ের হিন্দি! বললাম, স্যার, এত রাতে ওখানে কি বাস পাব?

আমি নিশ্চয়ই আপনাকে আপনার বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিতে পারি না।

না স্যার, তার কোনও দরকার নেই।

আপনি কানপুর থেকে ট্রেনে এলেন না কেন?

আমি স্যার কানপুর থেকে আসিনি, বললাম, কোচবিহার থেকে আসছি।

খালি হাতে? ভদ্রলোক অবাক হলেন।

বুঝলাম কোচবিহারের কথা বলে ভুল করে ফেলেছি।

আমার মনে হচ্ছে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। মিথ্যেবাদীদের আমি লিফট দিই না। ভদ্রলোক গাড়ির গতি কমালেন।

ওই খাঁ-খাঁ প্রান্তরের অন্ধকারে যদি গাড়ি থেকে নেমে যেতে হয়, তা হলে আর সকাল দেখতে হবে না। তাড়াতাড়ি বললাম, বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যে বলছি না। আমি কোচবিহার থেকে ট্রেনে উঠেছিলাম। মাঝরাস্তায় প্ল্যাটফর্মে নেমে আর ট্রেনে উঠতে পারিনি। তারপর থেকে বাস বদলে কানপুরে পৌঁছেছি। আমার জিনিসপত্র ট্রেনে পড়ে আছে।

আপনার নাম?

পিনাকী, বলেই খেয়াল হল, পিনাকেশ মিত্র।

বাঙালি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

গাড়ি আবার চলা শুরু করল, কী করেন?

আজ্ঞে, একটা ছোটখাটো চাকরি করি।

আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য আছে?

আজ্ঞে?

সকালে পেট পরিষ্কার হয় কি?

না। কয়েকবার যেতে হয়।

আগের রাতে জলে ত্রিফলা ভিজিয়ে রাখবেন, ভোরবেলায় খাবেন। কোনও ফোন নম্বর আছে?

না।

তারপর চুপচাপ। নবাবগঞ্জ আসতেই দেখলাম, একটা বাস লখনউ যাচ্ছে। ভদ্রলোক সেটা ধরিয়ে দিয়ে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বললেন, দু'দিন ত্রিফলা খেয়ে আমাকে ফোনে জানাবেন উপকার হল কিনা।

ধন্যবাদ জানিয়ে সেই বাসে চেপে ফিরে এসেছি। ওঃ! এরকম জানি আমি এর আগে কখনও করিনি, পিনাকীরঞ্জন মিত্র বললেন।

নিজের নামটা ভদ্রলোককে ঠিক বললেন না কেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

লোকটাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যদি পুলিশ হয়!

ইউ পি-র লোক?

মনে হল। হিন্দিতে উর্দু শব্দ মেশানো। খুব পার্সোনালিটি আছে। আচ্ছা, আমি এবার যাব। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। আর সারাদিন যা গেল, এখন বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতে পারলে বাঁচি।

পিনাকীরঞ্জন এগিয়ে গিয়ে সুটকেস তুলে নিলেন, খুব ভারী না? তবু তো আপনি বয়ে এনেছেন। আচ্ছা, আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।

অর্জুন। জলপাইগুড়িতে থাকি। তা হলে আজ থেকে আপনি ত্রিফলা খাচ্ছেন?

আজ আর কেনা হবে না। সত্যি কি উপকার হয়?

অবশ্যই হয়। শুধু কোষ্ঠকাঠিন্য কেন, আরও অনেক কিছুতে কাজে লাগে।

দেখুন, কার জন্য কোথায় কী অপেক্ষা করছে, তা কেউ জানে না। যদি কাজ হয় ভদ্রলোককে ফোন করে ধন্যবাদ জানাব। সুটকেস তুলে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন পিনাকীরঞ্জন। অর্জুনের হঠাৎ খেয়াল হল, এক মিনিট।

ভদ্রলোক তাকালেন।

আপনার কাছে ওঁর কার্ডটা এখন আছে?

না। বাড়িতে রেখে এসেছি। জামাপ্যান্ট চেঞ্জ করেছি তো?

আশপাশে টেলিফোন বুথ আছে?

একেবারে উলটো দিকে।

গেস্ট হাউসের টেলিফোনের তলায় ছাপা নির্দেশাবলি থেকে নম্বর দেখে একটা কাগজে সেটা লিখে পিনাকীরঞ্জনকে দিল অর্জুন, যদি একটু কষ্ট করেন, ভদ্রলোকের নাম আর টেলিফোন নম্বরটা যদি আমাকে ফোন করে বলেন!

কষ্ট কী! নিশ্চয়ই করব। মনে হচ্ছে আপনারও কোষ্ঠকাঠিন্য আছে! পিনাকীরঞ্জন চলে গেলেন।

৩. অর্জুন রিসিভার তুলল

আধঘণ্টা পরে ফোন বাজতেই অর্জুন রিসিভার তুলল।

কী হে! খাওয়াদাওয়া হয়েছে? অমিতাভর গলা।

আপনারা ক্লাবে যা খাইয়ে দিয়েছেন, তারপর আর গলা দিয়ে নামবে না।

সে কী! জলখাবারে রাতের খাবারের প্রয়োজন মিটে গেল। ও হ্যাঁ, আমার মাথা থেকে চিন্তাটা কিছুতেই যাচ্ছে না।

কীসের চিন্তা?

ওই ডক্টর নীলমোহন বকসি!

শুয়ে পড়ুন। কাল কথা হবে, হেসে ফোন রেখে দিল অর্জুন। ঘুম ঘুম লাগতেই বিছানায় শুয়ে আলো নিভিয়ে দিল। ঘুমোনোর আগে সারাদিনের ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তা করা ইদানীং তার অভ্যেস হয়েছে। তাতে ঘুম তাড়াতাড়ি আসে। আজ এখানে এসে অমিতাভর সঙ্গে আলাপটা প্রাপ্তি বলা চলে। মানুষটার মধ্যে কোথাও জটিলতা নেই। চন্দ্রশেখর গাঙ্গুলিমশাই একটু আলাদা ধরনের। গায়ে পড়ে মেশেন না, ভদ্রতার সীমা বজায় রাখেন। যদিও ডাইনিং রুমে বৃদ্ধ নিজেই তার সঙ্গে আলাপ করেছেন, কিন্তু, অমিতাভর মতো ঘনিষ্ঠ হওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। এই বয়সেও উনি অতুলপ্রসাদের গান চমৎকার গাইতে পারেন।

ফোনটা বেজে উঠল।

অর্জুনের ঘুম আসছিল। উঠতে ইচ্ছে না করলেও শেষ পর্যন্ত উঠতে হল। রিসিভার তুলে বলল, হ্যালো!

আমি পিনাকীরঞ্জন মিত্র।

ও!

ভদ্রলোকের মোবাইল নম্বর ৯৪১৫৪০২৮১১।

আবার বলুন, লিখে নিচ্ছি! অর্জুন বলল।

কাগজ টেনে নিয়ে কলম খুলল সে। পিনাকীরঞ্জন নম্বরটা দ্বিতীয়বার বলতে লিখে নিল। জিজ্ঞেস করল, ভদ্রলোকের নাম কী?

ডক্টর নীলমোহন বকসি। তা হলে রাখছি! লাইন কেটে দিলেন পিনাকীরঞ্জন।

স্তম্ভিত অর্জুন। এক লহমায় তার চোখ থেকে সব ঘুম উধাও।

.

সকাল সাতটা নাগাদ গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে ঠিক পাঁচটা বাড়ি পার হতেই একটা হাউসিং কমপ্লেক্সের গেট দেখতে পেল অর্জুন। পাশেই গেটকিপারের ঘর। অমিতাভর নাম বলতেই সে কীভাবে ফ্ল্যাটে যেতে হবে বলে একটা খাতায় নাম-ঠিকানা লিখে ফোন করল। বিদেশি শুনে বলল, যাইয়ে।

অমিতাভ নীচে নেমে এসেছিলেন। লিফটে চেপে উপরে উঠে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে অমিতাভ ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলার নাম এণাক্ষী। বললেন, কাল আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর মনে হচ্ছে কাজকর্ম ছেড়ে ও বোধহয় গোয়েন্দাগিরি করতে পারলে খুশি হয়।

নো! গোয়েন্দাগিরি চলবে না। দিস ইজ সত্যসন্ধান।

বাব্বা! এণাক্ষী অর্জুনকে বসতে বলে চা নিয়ে আসতে গেলেন।

তুমি যে ভাই এরকম সারপ্রাইজ দেবে কল্পনাও করিনি। বাড়ি চিনতে কোনও অসুবিধে হয়নি নিশ্চয়ই। অমিতাভ হাসিমুখে বললেন।

না, আজ ডক্টর বকসির সঙ্গে দেখা করতে যাব! অর্জুন বলল।

উনি তো নেই।

ফিরে এসেছেন কাল রাতে।

অ্যাঁ! তুমি জানলে কী করে?

জেনেছি। ওঁর ফোন নম্বরও পেয়েছি।

সে কী! কাল সারা বিকেল-সন্ধে, মায় রাত দশটা পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তোমাদের গেস্ট হাউসে নামিয়ে আমি বাড়ি ফিরেছি। এখন সবে সকাল। এর মধ্যে তুমি কী করে এত খবর পেলে? অমিতাভর গলায় অবিশ্বাস।

অর্জুন হাসল, জবাব দিল না।

অমিতাভ বললেন, আমার দ্বারা সত্যসন্ধান করা হবে না। কখন যাবে?

একটা ফোন করব। ডক্টর বকসি যখন যেতে বলেন...

নম্বর আছে?

হ্যাঁ। কিন্তু ল্যান্ড লাইন থেকে করব।

অমিতাভ উঠে টেলিফোনের সেটটা এনে সামনে রাখলে অর্জুন পকেট থেকে কাগজটা বের করে নম্বর দেখে বোতাম টিপল। ওপাশে রিং হচ্ছে। তারপর মিহি গলায় কিন্তু পরিষ্কার উচ্চারণে একজন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, কে টেলিফোন করছেন?

আমি ডেলি নিউজের একজন রিপোর্টার। আমার নাম অর্জুন। আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাকে মিনিট পনেরো সময় দেবেন?

কেন?

আমার সম্পাদক চাইছেন আপনার গবেষণার বিষয় নিয়ে কাগজে ভালভাবে একটা রাইট আপ তৈরি করতে। অর্জুন ইংরেজিতে জবাব দিচ্ছিল।

ডক্টর বকসি বললেন, সরি। আমি কোনও রিপোর্টারের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলব না। কিছুদিন পর যখন প্রেস কনফারেন্স করব, তখনই কথা বলবেন। ফোন রেখে দিলেন ডক্টর বকসি।

ভদ্রলোকের বক্তব্য অমিতাভকে জানাল অর্জুন। অমিতাভ গম্ভীর হলেন, খুব শক্ত লোক বলে মনে হচ্ছে। যাক গে, গেলে যদি তোমার আইডেন্টিটি প্রুফ চাইত, তা হলে বিপদে পড়তে। তুমি ডেলি নিউজের রিপোর্টার নও এটা বুঝে যেত।

না। ডেলি নিউজ এই ব্যাপারে একটা চিঠি আমাকে দিয়েছে।

অ! তার চেয়ে এক কাজ করি। সোজা গিয়ে দরজা ধাক্কাই। তুমি তো বলছ কাল রাতে ফিরে এসেছেন, তা হলে নিশ্চয়ই বাড়িতে পাওয়া যাবে। একবার মুখোমুখি হতে পারলে যা জানার তা জেনে নিতে পারবে। অমিতাভ পরামর্শ দিলেন।

ঘরে ঢুকে এণাক্ষী বললেন, আসুন।

অমিতাভ বললেন, এখানেই চা দাও না।

উনি প্রথমবার এলেন, শুধু চা দিই কী করে। আসুন।

অতএব যেতে হল। টেবিলে রাজ্যের খাবার। এণাক্ষী জোর করছিলেন সব খাওয়ার জন্য। অর্জুন হাতজোড় করল, বিশ্বাস করুন, সকালবেলায় এত খাওয়া আমার অভ্যেস নেই। ঠিক আছে, কিছু নিচ্ছি।

এণাক্ষী আর চাপ দিলেন না। ওঁর মুখ গম্ভীর দেখে হেসে ফেলল অর্জুন, নাঃ, প্রবাসে থেকেও আপনি ষোলো আনা বাঙালি হয়ে আছেন।

মানে? ভ্রূ কোঁচকালেন এণাক্ষী।

যে-কোনও বাঙালি মা-দিদি-বউদি খাওয়াতে ভালবাসেন। আপনিও তাই।

এবার হেসে ফেললেন এণাক্ষী।

খাওয়া শেষ হলে অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, ডক্টর বকসির ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে যাচ্ছে। কী করবে?

দেখি। ভাবি।

ভাবো। ভেবে একটা কিছু বের করে আমাকে ফোন করলেই আমি হাজির হব। লোকটাকে দেখতে আমারও ইচ্ছে করছে।

সে কী! আপনার অফিস...

ছুটি নিয়ে নেব। প্রচুর ছুটি জমা আছে।

.

ঘরে ফিরে মাথায় আসা ভাবনাগুলোকে একের পর এক বাতিল করে দিল অর্জুন। ওই বাড়িতে ডক্টর বকসিকে এড়িয়ে ঢোকা যাবে না। সোজা গিয়ে বেল বাজালে উনি নিজে না দরজা খুলে ওঁর সেই দাড়িওয়ালা কাজের লোককে পাঠাতে পারেন। লোকটার যা বর্ণনা স্যাংচুয়ারির লোকটি দিয়েছে, তাতে ওকে হটিয়ে ভিতরে ঢোকা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

দরজায় শব্দ হল। অর্জুন দরজা খুলতে সেই বেয়ারাটি বলল, স্যার, ব্রেকফাস্ট টাইম শেষ হতে যাচ্ছে। গাঙ্গুলিসাহেব আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

কোথায় তিনি?

ওঁর ঘরে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে এইমাত্র ঘরে গেলেন।

অর্জুন ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দরজায় টোকা দিতেই মিস্টার গাঙ্গুলির গলা ভেসে এল, আইয়ে জি।

অর্জুন ভিতরে ঢুকে দেখল তিনি দাবার বোর্ডের সামনে বসে আছেন।

বাঃ। মেঘ না চাইতেই জল। ব্রেকফাস্ট হয়েছে? মিস্টার গাঙ্গুলি হাসলেন।

আজ খেললে আপনাকে হারাতে পারব না।

কেন?

অন্য চিন্তা মাথায়।

কীরকম? বলেই মিস্টার গাঙ্গুলি কাঁধ নাচালেন, ব্যক্তিগত হলে শুনতে চাই না।

ব্যাপারটা ডক্টর নীলমোহন বকসি সংক্রান্ত।

ও। কাল তো তোমরা ওঁর দেখা পাওনি। হয়তো বাইরে গিয়েছেন। দেখা করাটা খুব জরুরি হলে ওঁর না ফেরা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। সিম্পল ব্যাপার।

মিস্টার গাঙ্গুলি বোর্ডের চাল দিলেন। বোড়ে কিস্তি দিল ঘোড়াকে। আড়াআড়ি। গজ দিয়ে বোড়েটাকে তুলে নিলে সেটা আর-একটা বোড়ের শিকার হবে।

ব্যাপারটা আর সিম্পল নয়। আজ টেলিফোনে আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আপনার সূত্রে পরিচিত হয়ে অক্ষয় গুপ্তা ওঁর সম্পর্কে কাগজ লিখতে বলেছিলেন। আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইলে উনি এককথায় তা নাকচ করে দিয়েছেন। অর্জুন চেয়ারে বসল।

ওঁর ফোন নম্বর কী করে পেলে? কোথায় আছেন এখন?

কাল রাতে উনি ফিরেছেন, অর্জুন পিনাকীরঞ্জন মিত্রের ঘটনাটা বিশদে বলল। মিস্টার গাঙ্গুলির চোখ বড় হল, তাজ্জব মানুষ!

তারপর চেয়ারের পিছনে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করলেন। মিনিটদুয়েক ওইভাবে বসে থাকলেন ভদ্রলোক। অর্জুন দাবার বোর্ডের দিকে তাকাল। আক্রান্ত ঘোড়ায় যাওয়ার সব ঘরে বোড়ে থাকায় ওকে বাঁচাতে গজকে বিসর্জন দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সেটা হলে ঘোড়া তুলে প্রতিপক্ষের রাজাকে কিস্তি দেওয়া যেতে পারে। রাজা সরলেই দ্বিতীয়বারের কিস্তিতে রাজার সঙ্গে প্রতিপক্ষের গজকে পাওয়া যাবে। তা হলে দু’পক্ষের বল সমান সমান।

অর্জুন ঝুঁকে গজ তুলে বোড়েকে খেয়ে নিল। চোখ খুললেন মিস্টার গাঙ্গুলি, গজটা তো এবার যাবে।

যাক।

মিস্টার গাঙ্গুলি বোড়ে দিয়ে গজ তুলে নিতেই অর্জুন ঘোড়া এগিয়ে রাজাকে কিস্তি দিল। মিস্টার গাঙ্গুলি এক ঘর সরতেই দ্বিতীয় কিস্তি। বিপদ বুঝতে পারলেন মিস্টার গাঙ্গুলি, বাঃ! ভাল খেলেছ। বল সমান করে ফেললে। কিন্তু এই পিনাকীরঞ্জন কি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ?

ওঁর সুটকেস বয়ে নিয়ে এসেছি, বাড়িতে খবর দিয়েছি। হয়তো...

কোনও কোনও মানুষ কৃতজ্ঞতা ব্যাপারটা বোঝে না।

এঁর ক্ষেত্রে সেটা বোধহয় না। মুখে অনেকবার বলেছেন।

হুঁ! মিস্টার গাঙ্গুলি আবার চোখ বন্ধ করলেন।

একটা ব্যাপার আমাকে ধন্দে ফেলেছে, অর্জুন বলল। কিন্তু মিস্টার গাঙ্গুলি চোখ খুললেন না, মুখে কিছু বললেনও না।

ডক্টর বকসির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে ওঁকে যা মনে হল, তার সঙ্গে অচেনা, অজানা পিনাকীরঞ্জন মিত্রকে নিজের ভিজিটিং কার্ড দেওয়াটা কিছুতেই মিলছে না। অথচ, তিনি সেটা দিয়েছেন এবং সেটা দেখে ভদ্রলোক আমাকে নম্বর বলেছেন। কেন আগবাড়িয়ে নেমকার্ড দিলেন ডক্টর বকসি? অর্জুন বলে যাচ্ছিল।

চোখ খুললেন মিস্টার গাঙ্গুলি, মানুষ একটি বিচিত্র প্রাণী! সে কখন কী আচরণ করবে, তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু হঠাৎ মনে হচ্ছে, তোমার সামনে একটা ভাল রাস্তা খোলা আছে।

তার মানে?

সোজা হয়ে বসলেন বৃদ্ধ, আচ্ছা বলো, দাবার বোর্ডে বোড়ের ভূমিকা কতটুকু?

মন্ত্রী, গজ, ঘোড়া বা নৌকোর তুলনায় কিছুই না। শুধু রাজাকে দুর্গের ভিতর রাখার জন্য বোড়েদের দরকার হয়, অর্জুন বলল।

নো। বোড়ে হল পদাতিক সেনাবাহিনী। তুমি শত্রুপক্ষকে আকাশ থেকে বোমা ফেলে অথবা জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করে ধ্বংস করতে পারো, কিন্তু সেই শত্রুর দেশ দখল করতে তোমাকে পদাতিক বাহিনীকে পাঠাতে হবে। বোড়ে সেই পদাতিক সেনা। এক্ষেত্রে তুমি অন্তত একজন পদাতিক সেনা বা বোড়ে পেয়ে গিয়েছ অর্জুন। হাসলেন মিস্টার গাঙ্গুলি।

ঠিক পরিষ্কার হল না।

না হওয়ার কোনও কারণ নেই। এই পিনাকীরঞ্জন মিত্রই হল সেই বোড়ে।

তাই তো! উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল অর্জুন।

পিনাকীরঞ্জন মিত্রকে নিজের কার্ড দিয়ে ডক্টর বকসি বলেছেন ত্রিফলার রস খেয়ে কেমন আছে তা জানাতে। ত্রিফলা যে ভাল কাজ করে, তা সবাই জানে। সেটা জানার জন্য ডক্টর বকসির আগ্রহ অবশ্যই অস্বাভাবিক।

ঠিক কথা। অর্জুন মাথা নাড়ল।

এর পিছনে ডক্টর বকসির অন্য মতলব কাজ করতে পারে।

কী মতলব?

কী আশ্চর্য! আমি কি অন্তর্যামী যে, মতলবটা বুঝে ফেলব! কিন্তু উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। তোমাকে তার সুযোগ নিতে হবে।

কীভাবে?

পিনাকীরঞ্জনকে ডেকে তাকে কনভিন্স করো। তোমার জন্য তাকে অভিনয় করতে রাজি করাও। যদি কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে ওঁর, তুমি এগোতে পারবে।

বেশ। আমার অনুরোধে না হয় রাজি হলেন ভদ্রলোক। কিন্তু...

ডক্টর বকসি ওঁকে ফোন করতে বলেছেন। উনি করবেন। করে জানাবেন ত্রিফলা খেয়েও ওঁর কোষ্ঠকাঠিন্য কমেনি। অ্যালোপ্যাথি ওষুধ ওঁর সাময়িক উপকার করে। তাই ডক্টর বকসির কাছে জানতে চাইবেন, কোনও আয়ুর্বেদিক ওষুধ আছে কি না, যাতে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারবেন। দ্যাখো না, জবাবে ডক্টর বকসি কী বলেন। হয়তো তার কাছে যেতেও বলতে পারেন। সেটা বললে তুমি ওঁর ভাগনে হয়ে সঙ্গ নিয়ো। মিস্টার গাঙ্গুলি মাথা নাড়লেন।

যদি ওঁকে ঢুকতে দেন কিন্তু আমাকে অ্যালাউ না করেন?

বলবেন ওঁর শরীর খুব দুর্বল। তাই এসকর্ট নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

বেশ। ভদ্রলোকের বাড়িতে টেলিফোন নেই। আমাকেই ওঁর কাছে যেতে হবে।

এসব কথা ওঁর পরিবারের লোকের সামনে বোলো না। অমিতাভকে ফোন করে বলো ওঁকে খবর দিতে। উনি এখানে এলে আলোচনা করবে। আশা করি, কী হল আমাকে তা ফোনে জানাবে। উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার গাঙ্গুলি।

সে কী! আপনি কি চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। এখানকার কাজ হয়ে গিয়েছে। মেয়ে সুস্থ হচ্ছে, এবার ঘরে ফিরি।

ইলাহাবাদে আপনার সঙ্গে কে কে আছেন?

ঈশ্বর! হাসলেন মিস্টার গাঙ্গুলি, এমন কপাল, আমার কাজের লোকটিকে তার বাবা ওই নাম রেখেছিল। ডাকাডাকি করলে আমারও পুণ্য অর্জন করা হয়।

মিস্টার গাঙ্গুলি একটা কাগজে নাম-ঠিকানা-টেলিফোন নম্বর লিখে এগিয়ে ধরলেন, তোমার সাফল্য কামনা করি। গুড লাক!

আপনি কি আজই চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। দুপুরেই। কাগজটা অর্জুনের হাতে দিয়ে দিলেন মিস্টার গাঙ্গুলি।

.

ট্যাক্সি নয়, একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করল অর্জন। মাত্র একশো টাকায় লখনউয়ের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো ঘুরিয়ে দেখাবে। সবিনয়ে চালক বলল, শুধু ভুলভুলাইয়ায় আপনি আধঘণ্টা থাকতে পারেন। বাকিগুলো বাইরে থেকে দেখলেই চলবে।

ঘোড়ার গাড়িতে ওঠার পর অর্জুনের বেশ ভাল লাগছিল। টগবগ শব্দ তুলে ঘোড়া ছুটছে। তার সঙ্গে অবিরাম কথা বলে চলেছে চালক। মাঝে মাঝে সে কথা থামিয়ে পিছন ফিরে অর্জুনকে জানিয়ে দিচ্ছে পাশের ইমারতটির ঐতিহাসিক নাম কী। বেশ ভাল লাগছিল অর্জুনের। মোগল সাম্রাজ্যের শেষ বাদশা এই শহরেই ছিলেন, এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল তাঁকে।

একটা বড় গেটের সামনে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াল। চালক বলল, চলে যান সাহেব। তবে আধঘণ্টার বেশি থাকবেন না।

এটাই ভুলভুলাইয়া?

জি।

গেট পেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে বিরাট বাড়িটায় ঢুকতে টিকিট কাটতে হল অর্জুনকে। একতলায় নবাবের সমাধি ছাড়া আর যা স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে তাতে আকর্ষণ বোধ করল না সে। বেরিয়ে এসে বাড়িটার একপাশে সিঁড়িটা দেখতে পেয়ে উপরে উঠতে লাগল। তার সামনে কয়েকজন টুরিস্ট উপরে উঠছে। তারা একজন গাইড সঙ্গে নিয়েছে। গাইড তাদের সতর্ক করছিল, কেউ যেন দলছাড়া না হয়। হলে তার পক্ষে বাইরে বেরিয়ে আসা মুশকিল হবে। এক ভদ্রলোক নাকি সাতদিন এখানে আটকে ছিলেন। একটা ছোট কপাটবিহীন দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই আলো কমে গেল। এ দরজা দিয়ে ঢুকে ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেখানে পৌঁছোল, সেখানে আলো নেই। গাইড বলে যাচ্ছিল, নবাবকে হত্যা করতে যদি কোনও গুপ্তঘাতক এখানে ঢুকত, সে বিভ্রান্ত হয়ে যেত। কিছুতেই নবাবের কাছে তার পক্ষে পৌঁছোনো সম্ভব ছিল না। দেওয়ালগুলো খুব মোটা। তার গায়ে কান চেপে ধরতে মনে হল ওপাশে কেউ যেন চিৎকার করছে। মন দিয়ে আওয়াজটা শোনার চেষ্টা করতে আধমিনিট চলে গিয়েছিল। খেয়াল হতে সে দেখল, গাইড টুরিস্টদের দলটাকে নিয়ে চলে গিয়েছে। এঘর থেকে বেরোবার দরজা তিনটে, প্রায় পনেরো মিনিট পাক খেল অর্জুন। মনে ঈষৎ ভয় ঢুকল। যদি এই ভুলভুলাইয়া থেকে সে বের হতে না পারে? অর্জুন ঠিক করল সে বাঁ দিক দিয়ে হাঁটবে। একটা দিকে স্থির থাকলে নিশ্চয়ই সূর্যের আলো দেখতে পাবে।

অনেক অন্ধকার সুড়ঙ্গ পার হয়ে এল অর্জুন। আসার পথে দু'দিকে বেশ কিছু দরজা পাওয়া সত্ত্বেও সে পা বাড়াল । তারপর হঠাৎ গাঢ় ছায়া পাতলা হয়ে গেল। সে একটা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দাটা চারপাশ দিয়ে গিয়েছে, মাঝখানে কোনও ঘর না থাকায় সেখানে একতলার মেঝে দেখা যাচ্ছে। অর্জুন দাঁড়িয়ে আছে তিনতলার বারান্দায়। এই সময় গাইড টুরিস্টদের নিয়ে উলটো দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। অন্তত পঞ্চাশ গজ পার্থক্যে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। গাইড অর্জুনকে দেখে চিৎকার করল, ভাইসাব, আমি একটা দেশলাই জ্বালাচ্ছি। দেখুন তো আপনি দেশলাইকাঠি জ্বালার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কিনা?

লোকটাকে দেশলাইকাঠি বাক্সে ঘষতে দেখল অর্জুন। এবং কী আশ্চর্য! সে বারুদ জ্বলার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল। এত দূরে ওই শব্দ আসার কোনও কথাই নয়। গাইড বলল, ওখানে একটা কাগজ পড়ে আছে ভাইসাব, ওটাকে দয়া করে ছিঁড়বেন?

অর্জুন বারান্দায় পড়ে থাকা একটা খবরের কাগজের পাতা তুলে ছিঁড়তেই টুরিস্টরা হাততালি দিয়ে উঠল। তারা কাগজ ছেঁড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে। সেই কবে, কয়েক শতাব্দী আগেকার আর্কিটেক্টরা যে আবিষ্কার করেছিলেন, তা সম্ভবত এখনও ব্যবহার করা যায়নি। নবাবের নিরাপত্তার জন্যই এত সতর্কতা।

.

গেস্ট হাউসে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে অর্জুন ভুলভুলাইয়ার কথা ভাবছিল। এত নিরাপত্তা সত্ত্বেও নবাবরা দীর্ঘজীবী হননি। ভয় যাদের তীব্র, তারা যতই ঘেরাটোপের মধ্যে থাকুক না কেন, একটা ছিদ্র

থেকেই যায়, যার মধ্যে দিয়ে বিপদ তাদের কাছে পৌঁছে যায়। ডক্টর বকসিও নিজেকে অনেক আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করলে তার কাছে নিশ্চয়ই পৌঁছোনো যাবে।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অমিতাভ এলেন। বললেন, হঠাৎ পিনাকীরঞ্জনকে দরকার পড়ল? ভদ্রলোককে খবরটা দিতে কীরকম ঘাবড়ে গেলেন।

শহর দেখতে যাওয়ার আগে ফোনে অমিতাভকে এই কাজটা করার জন্য অনুরোধ করেছিল অর্জুন। জিজ্ঞেস করল, কীরকম?

বললেন, কাল তো কথা বলে এলাম। এর মধ্যে পুলিশ ওঁর কাছে এসেছে নাকি? ওঁকে আশ্বস্ত করলাম, পুলিশ আসেনি। অর্জুনের কী একটা দরকার, তাই।

যাচ্চলে। আসবেন কিনা কে জানে!

অর্জুনের কথা শেষ হতেই দরজায় শব্দ হল। সে উঠে দরজা খুলতেই দেখল, পিনাকীরঞ্জন সসংকোচে দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে আসতে বলেছেন?

হ্যাঁ, আসুন আসুন। বসুন। ইনি অমিতাভ, নিশ্চয়ই চেনেন।

আজই প্রথম দেখলাম।

সে কী! বেঙ্গলি ক্লাবের এত কাছে থেকেও আপনাদের পরিচয় হয়নি?

আমি, আমি একটু ঘরকুনো, তা ছাড়া অনেক দিন বাইরে আছি।

চা খাবেন?

না, না। আমি চা খাই না।

পিনাকীবাবু, আপনার কাছে আমি একটা সাহায্য চাই!

আমার কাছে? কী যে বলেন! আমার কী ক্ষমতা!

এভাবে বলবেন না। ব্যাপারটা সামান্যই। আপনার সঙ্গে ডক্টর বকসির আলাপ হয়েছে। ওঁর মতো বিখ্যাত আয়ুর্বেদ ভারতে খুব কমই আছেন। কিন্তু চেষ্টা করলেও ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না। আমার এক আত্মীয় আলসারে ভুগছেন। অ্যালোপ্যাথি ওষুধে কোনও কাজ হচ্ছে না। ওঁর অসুখের যাবতীয় তথ্য আমি সঙ্গে এনেছি। কিন্তু আমি তো চেষ্টা করেও ওঁর দেখা পাব না। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন। অর্জুন বলল।

আমি? আমি বললে উনি কি শুনবেন? মনে হয়েছিল খুব রাগী লোক। বেশ জড়তা নিয়ে বললেন পিনাকীরঞ্জন।

অমিতাভ এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, বললেন, ঠিক কথা। উনি শুনবেনই না।

তা হলে? পিনাকীরঞ্জন যেন স্বস্তি পেলেন।

অর্জুন বলল, একটাই উপায় আছে। আমার মনে হয়, কোনও কারণে আপনাকে ওঁর ভাল লেগে গিয়েছে। নইলে যেচে ওষুধ দিতেন না। আপনি যেতে চাইলে উনি বোধহয় না বলবেন না। অবশ্য যেতে চাওয়ার জন্য একটা ঠিকঠাক কারণ দেখাতে হবে।

আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না মশাই। ওঁর কাছে যাওয়ার কোনও দরকারই নেই যখন, তখন কারণ খুঁজব কেন? পিনাকীরঞ্জন মাথা নাড়লেন।

আপনার নেই মশাই, কিন্তু অর্জুনের তো আছে। আপনি গেলে আপনার সঙ্গে অর্জুন যেতে পারে। অমিতাভ জানালেন।

মাথা নাড়লেন পিনাকীরঞ্জন, না না। ঝুঁকি আছে। উনি অ্যালাউ না-ও করতে পারেন। খুব কড়া ধাতের মানুষ তো!

ঝুঁকি তো নিতেই হয় পিনাকীবাবু। এই যে অর্জুন এতটা পথ আপনার সুটকেস বয়ে নিয়ে এল, তাতে ঝুঁকি ছিল না? পুলিশ যদি সুটকেস খুলতে বলত, অর্জুন পারত না। সুটকেসের চাবি তো আপনার কাছে ছিল। তাই না?

অমিতাভ হাসতে হাসতে কথাগুলো বললেন।

অ! চোখ বন্ধ করলেন ভদ্রলোক।

অর্জুন বলল, আপনি কাল সকালে একটা ফোন করবেন। বলবেন ত্রিফলা খেয়ে আপনার কোনও উপকার হয়নি, উলটে শরীর আরও কষে গিয়েছে।

কী যে বলেন! কাল রাতে গিন্নিকে বলেছিলাম ত্রিফলা ভিজিয়ে রাখতে। সেই জল আজ ভোরে খেয়েছিলাম। দুপুরে চমৎকার পেট পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একগাল হাসলেন পিনাকীরঞ্জন। তৃপ্তির হাসি।

অর্জুন এক সেকেন্ড ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ট্রেনে পুলিশকে বলেছিলেন আপনার নাম পিনাকেশ। বলেননি?

হকচকিয়ে গেলেন পিনাকীরঞ্জন, হ্যাঁ, মানে...

আপনি বলেছিলেন যে, আপনার পেশা শিক্ষকতা। বলেননি?

বাধ্য হয়ে বলেছি। বিপদ দেখে।

তার মানে আপনি প্রয়োজন হলে চমৎকার অভিনয় করতে পারেন। আপনাকে অনুরোধ, আপনি আর-একবার অভিনয় করুন। অর্জুন বলল।

সেকেন্ডসাতেক মাথা নিচু করে ভাবলেন পিনাকীরঞ্জন। তারপর বললেন, বেশ। আপনি আমার উপকার করেছেন। এটা করলে যদি ঋণ শোধ হয়ে যায়, তা হলে করব। কিন্তু ভদ্রলোক খুব কঠিন ধাতের। ঠিক কী বলতে হবে। বলে দিন।

অর্জুন বুঝিয়ে দিল কী বলতে হবে টেলিফোনে। পিনাকীরঞ্জন সেটা কয়েকবার আউড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আমি কাল সকাল দশটায় ওঁকে ফোন করব। কী বলেন, সেটা তারপর আপনাকে জানিয়ে দেব।

পিনাকীরঞ্জন চলে গেলে অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, কী মনে হয়, ইনিঃ ফোন করবেন?

কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সেটা জানার জন্য। আপনি গাড়ি এনেছেন?

হ্যাঁ।

সন্ধেটা কি ফ্রি আছেন?

এণাক্ষী বলছিল সাতটা নাগাদ ক্লাবে যাবে। কেন?

ক্লাব ক'টা পর্যন্ত খোলা থাকে?

দশটা। সমস্যাটা কী বলো না?

ভাবছি একবার নবাবগঞ্জ থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়। অর্জুন বলল।

কী লাভ! গেলে তো দেখা পাবে না বলেই মনে হয়।

না না। দেখা করতে যাব না। দেখতে যাব।

অমিতাভ ব্যাপারটা বুঝলেন না কিন্তু ব্যাখ্যাও চাইলেন না। পকেট থেকে মোবাইল বের করে স্ত্রীকে বললেন, তুমি ছোটুকে ফোন করে বলো ক্লাবে নিয়ে যেতে। আমি ওখানে একটু দেরিতে পৌঁছোব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অর্জুনের সঙ্গে বেরোচ্ছি।

.

আজ নবাবগঞ্জ পৌঁছোতে যেন অনেক কম সময় লাগল। সন্ধে নেমে গিয়েছিল। বার্ড স্যাংচুয়ারির সামনে অমিতাভকে গাড়ি থামাতে বলল অর্জুন। স্যাংচুয়ারি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যে লোকটির সঙ্গে ওরা আগের দিন কথা বলেছিল, তার ডিউটি নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গিয়েছে।

অর্জুন বলল, ভিতরে যেতে হবে।

ভিতরে? কেন? অমিতাভ বুঝতে পারলেন না।

ঝিলের ধারে যাব। এখন স্যাংচুয়ারিতে কোনও টুরিস্ট নেই। কর্মচারীরাও বাড়ি চলে গিয়েছে। ঝিলের এধার থেকে ডক্টর বকসির বাড়িটাকে একটু দেখব।

কিন্তু যাবে কী করে? তা ছাড়া স্যাংচুয়ারিতে পাহারাদার থাকবেই। তারা আপত্তি করবে। আগে বললে অনুমতি নিয়ে আসা যেত লখনউ থেকে।

আমি তো জানিয়ে আসতে চাইনি। আপনি এক কাজ করুন। গাড়িটা নিয়ে পাশের পেট্রল পাম্পে চলে যান। আমি ঘণ্টা দেড়-দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসছি। পাহারাদাররা আমাকে দেখতে পাবে না, অর্জুন বলল।

মানে? তুমি একা যাবে? না না, আমিও যাব। অমিতাভ মাথা নাড়লেন।

আপনি তো এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত নন। তা ছাড়া গাড়িতে একজনের থাকা উচিত। খালি গাড়ি পড়ে থাকলে যে-কেউ সন্দেহ করবে, অর্জুন দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমিতাভ গাড়ি চালু করলেন। সেটা চোখের আড়ালে চলে যেতে অন্ধকার যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বস্তি পেল অর্জুন। সে এগিয়ে গেল।

গেটে তালা ঝুলছে। এই গেট সহজেই টপকানো যায়। কিন্তু পাহারাদাররা যদি এদিকে থাকে, তা হলে সহজেই ওদের নজরে পড়ে যাবে সে। অর্জুন পাঁচিল ধরে খানিকটা এগিয়ে গেল। মুশকিল হচ্ছিল হাইওয়ের গাড়ি নিয়ে। ওদের হেডলাইটের আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফলে গাড়ি দূরে দেখলেই পাঁচিল ছেড়ে রাস্তায় উঠে আসতে হচ্ছিল। যেন কোনও কাজে যাচ্ছে সে, এমন ভঙ্গিতে হাঁটতে হচ্ছে। জমিটা ঢালু হওয়ায় পাঁচিল নীচে নেমেছে। আশপাশে কোনও গাড়ি নেই দেখে অর্জুন লাফিয়ে পাঁচিলের উপর উঠেই বসে পড়ল। তারপর সন্তর্পণে ভিতরের দিকে নেমে পড়ল। এদিকে প্রচুর গাছগাছালি। ফলে জায়গাটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা। দূরে স্যাংচুয়ারির কোনও বাড়িতে আলো টিমটিম করছে। অর্জুন যেখানে নেমেছিল, সেখান থেকে সরে একটা বড় গাছের আড়ালে চলে এল।

ঝিলটা ঠিক কোন দিকে ঠাওর করার চেষ্টা করল সে। বড় রাস্তা থেকে গেট খুলে সোজা অনেকটা গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে ডক্টর বকসির প্রাসাদ দেখতে পেয়েছিল ওরা। আর তার পাশেই ঝিলের ওপার। তা হলে সোজা গিয়ে বাঁ দিকে যেতে হবে তাকে। হঠাৎ গলার স্বর কানে আসামাত্র গাছের আড়ালে স্থির হয়ে

দাঁড়াল অর্জুন। দুটো লোক কথা বলতে বলতে আসছে। লোক দুটো লম্বা, ইউনিফর্মটা যদি কালো বা ঘন নীল হয়, তা হলে অন্ধকারে বোঝা যাবে না। কথা হচ্ছে হিন্দিতে। একজন বলল, আরে ঝিলে তো কেউ মাছ ধরে না রাতে, পাখিও মারবে না। বলেছে পাখির ফোটো তুলবে। তাও বেশিক্ষণ না।

কিন্তু সেটাও তো নিষেধ।

আলবাত! কিন্তু দেখতে হবে ফোটো তুললে পাখিদের কোনও ক্ষতি হচ্ছে কিনা! দিনভর লোকে এত ফোটো তুলছে, তাতে তো পাখিদের ক্ষতি হয় না। রাতে তুললে হবে কেন? আমরা যদি ওদিকে না যাই, তা হলে পাঁচশো টাকা পেয়ে যাব। বলতে বলতে লোকটা সঙ্গীকে নিয়ে ওপাশে চলে গেল। অর্জুন দ্রুত ওদের অনুসরণ করল, নিঃশব্দে।

দ্বিতীয় লোকটি বলল, এর ছমাস আগে বোধহয় ওরা রাতে পাখিদের ফোটো তুলেছিল। মনে আছে?

প্রথমজন বলল, সেবার চারশো দিয়েছিল। এবার একশো বাড়িয়েছে।

ঠিক হ্যায়! চলো, আমরা রান্নাবান্না করি। ঝিলের ধারে না থাকলে কী হচ্ছে, সেটা তো দেখতে পাব না। দ্বিতীয়জন বলল।

এই তো! এতক্ষণে ঠিক কথা বললে, চলো।

অর্জুন চট করে আড়ালে চলে গেল। লোকদুটো তার দু'হাত দূর দিয়ে চলে গেল, যেদিকে আলো জ্বলছিল, সেইদিকে।

অর্জুন একটু দাঁড়াল। কেউ রাতে ঝিলের উপর ভেসে থাকা পাখিদের ফোটো তুলতে চায়। মাসছয়েক আগেও তুলেছিল। কিন্তু কেন? পাখিদের ফোটো তো ভোরের আলো ফুটলে চমৎকার তোলা যায়। রাতের অন্ধকারে তুলতে গেলে তো আলো জ্বালতে হবে। সেই আলোয় পাখিরা বিরক্ত হবেই। ওরা ওড়ার চেষ্টা করবে, চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাবে। সেই বিশৃঙ্খলাকে ক্যামেরায় ধরে কী লাভ? অর্জুন বুঝতে পারছিল না।

মিনিটদশেক বাগানের অন্ধকারে হাঁটার পর হঠাৎ হালকা হয়ে গেল অন্ধকার। সামনেই ঝিল। উপরে সন্ধে পার হওয়া আকাশের তারাদের ভিড়। সেই দূরবর্তী নক্ষত্রের আলো চুঁইয়ে নেমে আসছে ঝিলের জলে। ফলে চোখের সামনের দৃশ্যাবলি কিছুটা আবছা। অর্জুন একটা ছোট ঝোঁপের ভিতর ঢুকে পড়ল। ঝোঁপটা ঝিলের গা ঘেঁষা। ঝোঁপের তলায় ঘাস থাকায় আরাম করে বসতে পারল সে। এখান থেকে ঝিলের জল দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। পাখিদের হইহল্লা শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ওরা এত জোরে ডুব দিচ্ছে যে, জলে শব্দ হচ্ছে। ঝিলের ওপাশে ডক্টর বকসির বাড়ি। এখান থেকে কীরকম ছায়া ছায়া দেখাচ্ছে। বাড়িতে কোনও মানুষ আছে কি না, বোঝা যাচ্ছে না। কারণ, কোনও জানলায় আলোর প্রতিফলন নেই।

এমন হতে পারে ডক্টর বকসি আবার বেরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সেই দাড়িওয়ালা লোকটির তো ওখানে থাকার কথা!

এখন লোকটি যে ওই বাড়িতে আছে, তাও এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

অমিতাভকে যে সময় দিয়ে এসেছে তার মধ্যেই ফিরতে হবে অর্জুনকে। কিন্তু মিনিট পনেরো চলে যাওয়ার পরও বাড়িটা অস্পষ্ট ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন আশা ছেড়ে দিচ্ছিল অর্জুন, তখনই একতলার জানলায় আলো জ্বলে উঠল। কাঁচের জানলায় একটা মানুষের ছায়া কেঁপে সরে গেল। তারপর সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল লোকটা। বেশ স্বাস্থ্যবান, লম্বা। বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকাল। ঝিলের ধারে পৌঁছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। অর্জুন লক্ষ করতে চেষ্টা করল। ঝিলের এপার থেকে দূরত্বের কারণে লোকটার চোখ-মুখ বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ও যে ঝিলটাকে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, তা বুঝতে অসুবিধে হল না।

মিনিট আড়াই পরে লোকটা ফিরে গেল বাড়ির ভিতর। অর্জুন অনুমান করল, ওই লোকটি অবশ্যই ডক্টর বকসি নন। বাড়ি পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব যার উপর, সেই দাড়িওয়ালা লোকটিকেই সে দেখেছে। ডক্টর বকসি কোথায় গেলেন!

একটু পরেই লোকটা বেরিয়ে এল পিঠে একটা বোঝা নিয়ে। এখন ওর পরনে একটা কালচে হাফপ্যান্ট। বোঝাটা বেশ ভারী, তাই একটু ঝুঁকে হাঁটতে হচ্ছে ওকে। ঝিলের ধারে এসে লোকটা চারপাশে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে জলে নামতে লাগল বোঝাটা নিয়ে। ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিল লোকটা। তারপর আর দেখা গেল না।

পাখিগুলো সমানে চিৎকার করে চলেছে। অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না, রাতের অন্ধকারে পিঠে বোঝা নিয়ে লোকটা ঝিলের জলে নেমে কী করছে? ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক। ভারী বোঝা নিয়ে যখন কেউ জলে নামে, বিশেষ করে সন্ধের পর, তখন সেটা স্বাভাবিক কাজের মধ্যে পড়ে না।

একটু পরেই লোকটা উঠে এল। সঙ্গে বোঝাটা নেই। জল থেকে উঠে সোজা চলে গেল বাড়ির ভিতর। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। তার দশ মিনিট পরে বাড়ির দোতলার জানলা থেকে আলো ছিটকে এল ঝিলের উপর। অর্জুন দেখল লম্বা, রোগা একটা লোক আলোর পাশে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব মগ্ন হয়ে ফোটো তুলছে লোকটা। আলোটা ঝিলের জলে পিছলে পিছলে যাচ্ছে। বিরক্ত পাখিগুলো তুমুল প্রতিবাদ করছে আলো দেখে। বেশ কিছুক্ষণ আলোটা যেন জলের উপর কিছু খুঁজল। তারপর টুপ করে নিভে গেল।

লোকদুটোর কথা মনে পড়ল। এই ফোটো তোলার কথাই ওরা বলছিল। কিন্তু এটা কী ধরনের ফোটো তোলা? আলো পাখিদের যতটা না ধরেছে, তার চেয়ে লোকটা যেখানে ডুব দিয়েছিল, সেখানকার জলটাকেই বারবার আলোকিত করেছে। ফোটো ভোলা নিশ্চয়ই বাহানা। এমন হতে পারে যে,

বোঝাটাকে জলের নীচে নামিয়ে দিয়ে আসা হয়েছে সেটা আবার ভেসে উঠল কিনা, তা দেখার জন্য ওই আলোটাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

উপরের আলো নিভে গিয়েছে। বাড়ি এখন আবার নিঝুম। অর্জুন একটু ভাবল। তারপর জামাপ্যান্ট খুলে সন্তর্পণে জলে নামল। ডুবসাঁতার দিয়ে ঝিলের মাঝখানে চলে গিয়ে লোকটার ডোবার জায়গা ঠাওর করে শ্বাস নিয়ে আবার ডুব দিল।. ঝিল বেশ গভীর। ঝিলের তলায় একটা বড় গাছ আড়াআড়ি পড়ে আছে। সেই গাছের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে বোঝাটা। অর্জুনের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনও রকমে উপরে উঠে আসতেই হাঁপাতে লাগল সে। ধীরে ধীরে যেখান থেকে জলে নেমেছিল, সেখানে ফিরে এসে কিছুক্ষণ বসে থাকল চুপচাপ। ঝিলের জলের নীচে যে ভারী বস্তাটা সে দেখেছে, তার ভিতরে কী আছে, তা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু ওইখানে পড়ে থাকা গাছের ডালে শক্ত করে যে লোকটা বেঁধে এল, তার শরীরের শক্তি সম্পর্কে একটা আন্দাজ পাওয়া গেল। অত নীচে ডুব দিয়ে কাজ শেষ করে উপরে উঠে এসে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে গিয়েছিল লোকটা। একটুও ক্লান্তির ছাপ ওর আচরণে বোঝা যায়নি। এরকম একটা লোককে ডক্টর বকসির কেন প্রয়োজন হল? কী আছে ওই বস্তার ভিতর? যাই থাক, সেটা প্রকাশ্যে রাখতে ডক্টর বকসি অথবা ওই লোকটা চায় না। আর যেহেতু ওই বাড়িতে থেকে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করার স্বাধীনতা কাজের লোকের থাকার কথা নয়, তাই ধরে নিতে হবে ডক্টর বকসির আদেশেই লোকটা ঝিলের নীচে নেমেছিল।

অর্জুন ভাবল আর-একবার জলে নামবে কিনা। দীর্ঘকালের অনভ্যাসে সে দম হারিয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয়বারে হয়তো কিছুটা বেশি সময় জলের নীচে থাকতে পারবে। ঠিক তখনই ঝিলের উপর আলো এসে পড়ল। আলো আসছে ডক্টর বকসির জানলা থেকে। আলোর বৃত্ত ঘুরে ঘুরে জল দেখছে। পাখিগুলো আবার চিৎকার শুরু করল। অর্জুন দ্রুত ঝোঁপের ভিতরে চলে এল। এখন স্পষ্ট হল। ওরা ওই বস্তাটা বাঁধন খুলে উপরে ভেসে উঠেছে কিনা, তাই যাচাই করছে। ওঠেনি দেখে আলো নিভিয়ে দিল।

অর্জুন আর জলে নামার ঝুঁকি নিল না।

.

গাড়ি চালাতে চালাতে অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, জলে নেমেছিলে নাকি?

হ্যাঁ। ঝিলের জলে।

মাই গড! কেন?

অর্জুন ঘটনাটা অমিতাভকে বলল। অমিতাভ বললেন, না না। ওই জলে নেমে খুব ঝুঁকি নিয়েছ। একে অন্ধকার তার উপর পচা জল। বিষাক্ত সাপও থাকতে পারে।

অর্জুন হাসল, বিষাক্ত সাপ জলে বাস করে না বলে শুনেছি।

তোমার যদি সন্দেহ হয় কোনও নিষিদ্ধ জিনিস বস্তায় পুরে ওরা ঝিলের নীচে বেঁধে রেখেছে, তা হলে সেটা কী, জানতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে।

কীরকম?

পুলিশের এক বড়কর্তা আমার পরিচিত। এখনই তাকে ফোন করে বললে তিনি দলবল নিয়ে এসে ওটাকে জল থেকে তুলে আনতে পারেন, বলতে বলতে গাড়ি রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে মোবাইল বের করলেন অমিতাভ।

তারপর যদি পর্বতের মূষিক প্রসব হয়?

মানে?

পুলিশ বস্তাটা তুলে যদি দ্যাখে ওর মধ্যে কোনও নিষিদ্ধ বস্তু নেই?

তা হলে লুকিয়ে রাখবে কেন?

ঠিক। কী লুকিয়েছে, তা আগেই না জেনে কেন লুকিয়েছে, সেটা জানা দরকার। তা ছাড়া আজ পুলিশ গেলে ডক্টর বকসি বুঝতেই পারবেন, তার উপর নজর রাখা হয়েছিল। ফলে তিনি সতর্ক হবেন। আগামীকাল পিনাকীবাবু ওঁর পাত্তা পাবেন না। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। অর্জুন বলল।

অমিতাভ গাড়ি চালু করলেন, ঠিক বলেছ। তুমি দেখছি ঠান্ডা মাথায় বেশ ভাবতে পারো।

অর্জুন হাসল, এটা আমার জীবিকা।

.

অমিতাভ চেয়েছিলেন অর্জুনকে বেঙ্গলি ক্লাবে নিয়ে যেতে। কিন্তু সে রাজি হল না। প্রথমত, জামাপ্যান্ট নোংরা হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, সে কিছুক্ষণ একা থাকতে চায়। গেস্ট হাউসে তাকে নামিয়ে দিয়ে অমিতাভ চলে গেলেন।

বিছানায় শুয়ে অর্জুন ভাবছিল। বিজ্ঞাপনে ডক্টর বকসি দাবি করেছেন যে, মৃত্যুর পরও প্রিয়জনকে ঠিক আগের চেহারায় রেখে দেওয়ার প্রক্রিয়া তিনি আয়ুর্বেদের মাধ্যমে আবিষ্কার করেছেন। ঘটনা যদি তাই হয়, তা হলে ওঁকে নিয়ে হইহই পড়ে যাওয়ার কথা। এমনকী নোবেল পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু লখনউ শহরের লোক ব্যাপারটা জানেন বলে মনে হচ্ছে। না। কিন্তু ডক্টর বকসি কেন নিজেকে এত আড়ালে রাখছেন? ওঁর বাড়ির গেট থেকে দরজা, সর্বত্র সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রেখেছেন। একজন প্রচণ্ড

শক্তিশালী কাজের লোক ছাড়া বিশাল বাড়িতে কেউ নেই। নবাবগঞ্জ থেকে লখনউ বেশি দূর নয়। কিন্তু তিনি এখানকার বাঙালিদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাননি। আর এত জায়গা থাকতে নবাবগঞ্জে কেন? ওই বাড়ি কি উনি পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন? তা হলে লখনউয়ের পুরনো বাঙালিরা জানত।

অস্বস্তি হচ্ছিল অর্জুনের। যে-কোনও গবেষণায় একবারেই সাফল্য পাওয়া যায় না। ওঁর গবেষণার যা বিষয়, তাতে মৃত্যুর কাছাকাছি আসা মানুষ দরকার। যদি উনি আয়ুর্বেদিক ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন, তা হলে সাফল্য পেতে অনেক মানুষকে মৃত্যুর পর তাকে বাতিল করতে হয়েছে। সেই মানুষের আত্মীয়স্বজনরা কেন চুপ করে থাকবেন? ডক্টর বকসি তাদের প্রিয়জনের শরীর নিয়ে গবেষণা করে ব্যর্থ হয়েছেন বলে তারা পাঁচজনকে জানাবেন। পুলিশও চুপ করে বসে থাকবে না। মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু এসবের কিছুই এক্ষেত্রে হয়নি। কেন?

টেলিফোন বেজে উঠল। বিছানা থেকে ধীরেসুস্থে উঠে রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই কানে এল, দিনটা কেমন কাটল ভাই?

মিস্টার গাঙ্গুলির গলা বুঝতে পেরে খুশি হল অর্জুন, ভালই। আপনি ভালভাবে পৌঁছেছেন তো?

খারাপভাবে পৌঁছোইনি। কিন্তু তুমি ভালর পর একটা 'ই' যোগ করলে কেন?

যে জন্য এসেছি, সেটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে।

কীরকম?

আজ সন্ধের পর বার্ড স্যাংচুয়ারিতে গিয়েছিলাম। ঝিলের ওপাশেই ডক্টর বকসির বাড়ি। দেখতে চেয়েছিলাম বাড়িতে ক'জন থাকে, স্বাভাবিক কিনা। যেটুকু দেখলাম তাতে অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে। অর্জুন বলল।

তোমার মুখে যা শুনেছি, তার উপর নির্ভর করে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। আমার এক বন্ধু দীর্ঘদিন লখনউয়ে ছিলেন। আমার চেয়ে দু'বছরের বড় তিনি। তার কাছে জানলাম, স্যাংচুয়ারির পাশের বাড়িটা তৈরি হয়েছিল নাইনটিন টোয়েন্টি এইটে। নবাব বাহাদুর শাহর এক কর্মচারীর বংশধর ওই বাড়ি তৈরি করেন। ভদ্রলোক থাকতেন লখনউ শহরে। প্রতি সপ্তাহে ওই বাড়িতে নাচগানের আসর বসাতেন। ওঁর মৃত্যুর পর বাড়িটা বন্ধ পড়ে থাকে। বহুকাল। এরপর হাতবদল হতে হতে হয়তো এই ডক্টর বকসিই একদিন বাড়ির মালিক হয়েছেন। তবে তিনি বছরপাঁচেকের মধ্যে মালিকানা পেয়েছেন। পাওয়ার পর যা কিছু আধুনিকীকরণ, তা ওঁরই করা। এই তথ্য থেকে তুমি বুঝতে পারছ ডক্টর বকসি ওই অঞ্চলে মাত্র পাঁচ বছর ধরে আছেন।

অর্জুন বলল, খুব উপকার করলেন খবরটা দিয়ে। আপনি যে ইলাহাবাদে গিয়েও আমার সমস্যা নিয়ে ভাবছেন, এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

ওসব কথা বোলো না। তুমি আমার নাতির বয়সি। তা ছাড়া ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে। এই বুড়োবয়সে কোনও কিছু নিয়ে ভাবার সুযোগ পেলে সময়টা বেশ কেটে যায়। আচ্ছা রাখছি। মিস্টার গাঙ্গুলি লাইন কেটে দিলেন। এগারোটা নাগাদ পিনাকীরঞ্জন মিত্র অর্জুনের ঘরে এলেন। তার মুখে বেশ উত্তেজনা, মশাই, স্ত্রীকে লুকিয়ে কোনও কাজ করা আমার ধাতে নেই। আজ সেই কাজটা করে বেশ টেনশনে আছি। আমি কি পাপ করছি?

কীরকম?

আরে আপনি আমাকে বললেন ডক্টর বকসিকে ফোন করে বলতে, ত্রিফলায় কোনও কাজ হয়নি। কিন্তু কাল রাতে ত্রিফলা খেয়ে আজ সকালে দু'বার টয়লেটে যেতে হয়েছে। স্ত্রী সেটা দেখে বলেছেন অনেক দিন আগেই নাকি আমার ত্রিফলা খাওয়া উচিত ছিল। কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে নাকি আমার মুখ হাঁড়ি হয়ে থাকে। এর পর উনি যদি জানতে পারেন ডক্টর বকসিকে আমি মিথ্যে বলছি, তা হলে আর দেখতে হবে না। তাই ওর কাছে ব্যাপারটা লুকোলাম। পাপ করিনি তো? পিনাকীরঞ্জন রুমাল বের করে মুখ মুছলেন।

অর্জুন হাসল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে কৃষ্ণ কী উপদেশ দিয়েছিলেন মনে করে দেখুন।

বুঝলাম। আপনি তো কৃষ্ণ নন, অর্জুন!

ফোন করেছিলেন?

হুঁ।

কী কথা হল?

বিশ্বাস করুন, আমি সাজিয়েগুজিয়ে মিথ্যে বলতে পারি না। ট্রেনে পুলিশকে যা বলেছি, তা নেহাত সম্মানের ভয়ে। হঠাৎ বলে ফেলেছিলাম।

ধরা পড়ে গিয়েছেন?

না, না। বললাম, বাধ্য হয়ে ফোন করছি। ত্রিফলা খেয়েছি কিন্তু কোনও রেজাল্ট নেই। অন্যদিন তবু চেষ্টাচরিত্র করে কিছু হয়, আজ তাও হয়নি, এইটে বেশি বলে ফেলেছি। অনভ্যাসে। বলেছি, না হওয়ার জন্য খিদে হচ্ছে না। শুনে জিজ্ঞেস করলেন, কোন দোকান থেকে ত্রিফলা কিনেছি? গুল মারিনি। বললাম, পাড়ার দোকান থেকে। বললেন, নিশ্চয়ই ত্রিফলা বলে অন্য কিছু বিক্রি করেছে। বললাম, আপনি অন্য কোনও ওষুধ দিন, যাতে সুস্থ হতে পারি। উনি একটু ভেবে বললেন, আজ বিকেল তিনটের সময় যেন ওঁর বাড়িতে যাই। তিনটে পাঁচ হলে উনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন। স্যাংচুয়ারির পাশের গলি দিয়ে গেলে একটা গেট দেখতে পাব। সেখানে ওঁর লোক থাকবে আমাকে ভিতরে নিয়ে

যাওয়ার জন্য। আমার খুব ভয় করছে ভাই। যদি এমন ওষুধ দেন, যা খেলে হাতের জল না শুকোয়? পিনাকীরঞ্জনকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

নিয়ে আসবেন ওষুধ, কিন্তু খাবেন না। অর্জুন হাসল।

ওঃ! তাই তো। এটা ভাবিনি। বাঃ, এখন মন হালকা লাগছে।

তা হলে তিনটের সময় যেতে হবে। নবাবগঞ্জ যেতেও তো সময় লাগবে। অর্জুন বলল।

আপনি বলেছিলেন সঙ্গে যাবেন!

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনাকে যদি ঢুকতে না দেয়?

আমি আপনার ভাইপো। ধরুন, আমার নাম শিবরঞ্জন মিত্র। আপনার শরীর খুব খারাপ লাগছে বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

ও! পিনাকীরঞ্জন মাথা নাড়লেন, শিবরঞ্জন। মনে থাকলে হয়।

বেশি ভাববেন না, তা হলে মনে থাকবে।

এখন তো সওয়া এগারোটা বেজে গিয়েছে, কখন বাস ধরবেন?

বাস?

ট্যাক্সিতে অনেক খরচ হয়ে যাবে।

দেড়টা নাগাদ বেরোলেই হবে। খেয়ে এসেছেন?

হ্যাঁ। একটু বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

এখনও তো অনেক সময়। প্রায় দু'ঘণ্টা। এদিকে কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকলে ঘুরে আসতে পারেন, অর্জুন বলল।

কোথায় যাব? আমার তো চেনাজানা কম।

তা হলে বসুন। বসে টিভি দেখুন।

না না। আমি টিভি বেশিক্ষণ দেখতে পারি না। চোখ টনটন করে। আমি এখানেই বসে আছি, আপনি যা করার তা করুন।

অর্জুন উঠল। বাথরুমে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। একটা ঝুঁকি থাকছেই। ডক্টর বকসির লোকটি তাকে ঢুকতে না-ও দিতে পারে। না দিলে লোকটা তাকে চিনে রাখবে। পরে ঢোকা মুশকিল হবে। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতেই হবে। সে দাড়ি কামাবে বলে মুখে সাবান ঘষে ব্রাশ দিয়ে বোলাতে বোলাতে পিছন ফিরে দেখল পিনাকীরঞ্জন চেয়ারে বসে আছেন চোখ বন্ধ করে।

আচ্ছা, পিনাকীবাবু। অর্জুন আয়নার দিকে তাকিয়ে বলল।

বলুন।

প্রত্যেক মানুষকে একদিন-না-একদিন মরতেই হয়। তা আপনার প্ল্যান কী? মরার পরে আপনি কী করবেন?

হে হে! রসিকতা করছেন! মরার পর কিছু করার ক্ষমতা থাকে নাকি?

কেন থাকে না! তাজমহল দেখলেই মমতাজ-শাহজাহানের কথা মনে পড়বে? শাহজাহান প্ল্যান করেছিলেন বলেই আমাদের মনে পড়ে।

কোথায় শাহজাহান আর কোথায় আমি!

বেশ, কেউ যদি প্রস্তাব দেয়, আপনার মৃত্যুর পরও ওই শরীরটাকে অবিকল একরকম রেখে দেবে। পচা দূরের কথা, একটুও টসকাবে না, রাজি হবেন?

আমার শরীরটা? মরার পরও?

হ্যাঁ। শুধু কথা বলতে বা হাঁটাচলা করতে পারবেন না।

যাঃ। তা কি হয়? তা ছাড়া, তার দরকারও নেই।

দাড়ি কাটছিল অর্জুন। হাত নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, কেন?

আমার স্ত্রী বলেন আমাকে দেখলে ওঁর হাড়পিত্তি জ্বলে যায়! মরে যাওয়ার পরও যদি আমাকে এই চেহারায় উনি দ্যাখেন, তা হলে তো জ্বলা কমবে না। কী দরকার কষ্ট দিয়ে। করুণমুখে বললেন পিনাকীরঞ্জন।

অর্জুন হাসতে গিয়ে সামলে নিল।

৪. বারবার বিরক্ত

অমিতাভকে বারবার বিরক্ত করতে ইচ্ছে হল না। তা ছাড়া উনি নিশ্চয়ই এখন অফিসে। কাজ থেকে টেনে নিয়ে আসার যুক্তি নেই। বেরোবার আগে গেস্ট হাউসের ঘর থেকে কানাইলাল চৌধুরীকে টেলিফোন করল সে। লখনউ থেকে জলপাইগুড়ির লাটাগুড়ির লাইন পেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না। অন্য কেউ ফোন ধরেছিল। নাম বলতেই কানাইবাবু তড়িঘড়ি এসে রিসিভার তুললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। আমি খুব চিন্তায় ছিলাম।

চিন্তার কিছু নেই। আমি এখন লখনউয়ে। ডক্টর বকসি বাইরের কারও সঙ্গে দেখা করেন না। বোধহয় বিজ্ঞাপনের জবাবে যে চিঠি আসে, তা থেকে বেছে নিয়ে অ্যাপয়ন্টমেন্ট দেন। কিন্তু আমি চেষ্টা করছি ওঁর সঙ্গে দেখা করার। অর্জুন বলল।

আবার কী কথা? ডাক্তার রোগীর লোকের সঙ্গে কেন দেখা করবেন না। ওঁকে বলুন, বিজ্ঞাপনে যা আছে, তা ঠিক হলে যা টাকা লাগবে তাই দেব।

বেশ বলব।

আপনি ক'দিন ওখানে আছেন?

এখনই বলা সম্ভব নয়।

কোথায় আছেন?

গেস্ট হাউসে।

ও! ঠিকানাটা বলুন, আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এখনই দরকার নেই। লাগলে বলব। রাখছি।

পিনাকীরঞ্জন চুপচাপ শুনছিলেন। কথা শেষ হলে বললেন, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম আপনি কেন এত ইন্টারেস্টেড!

কী বুঝলেন?

আপনি কোনও পেশেন্ট নিয়ে এসে ডক্টর বকসিকে দেখাতে চান। তাই তো?

অনেকটাই ঠিক বুঝেছেন।

লোকটা কিন্তু ভাল আয়ুর্বেদ। মুখ দেখে বুঝে গেল আমি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছি আর ত্রিফলা খেতে বলল। দারুণ কাজ য়েছে, পিনাকীরঞ্জন বললেন, ভাল ডাক্তার পেশেন্টের মুখ দেখেই রোগ বলে দেন। শুনেছি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ও নাকি তাই বলতে পারতেন।

চলুন। এবার যাওয়া যাক।

এখনই? মানে, এখন একটা পনেরো বাজে?

বাস ধরতেও তো সময় লাগবে।

তা ঠিক। পাঁচ মিনিট দাঁড়াবেন?

কেন?

একটু টয়লেটে যাব। পেটটা কীরকম করছে? উত্তরের অপেক্ষা না করে টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন পিনাকীরঞ্জন।

.

সময়টা দুপুর বলে বাসে যাত্রীর সংখ্যা কম। শহর ছাড়ার আগেই ওরা বসার জায়গা পেয়ে গেল। পিনাকীরঞ্জন কন্ডাক্টরকে বলে দিলেন, নবাবগঞ্জের বার্ড স্যাংচুয়ারিতে যেন তাদের নামিয়ে দেওয়া হয়। মিনিটদশেক যাওয়ার পর ওঁর মনে সন্দেহ এল। তিনি আবার কন্ডাক্টরকে ডাকলেন, আমি তোমাকে যা বলেছি সেটা মনে আছে তো?

লোকটি জিজ্ঞেস করল, কী বলেছেন? পিনাকীরঞ্জন অর্জুনের দিকে তাকালেন, দেখলেন তো! এদের মাথায় যদি একফোঁটা ঘিলু থাকে! মন্তব্য বাংলায় করে কন্ডাক্টরকে হিন্দিতে বললেন, ভাই দয়া করে আমাদের নবাবগঞ্জের...

ধ্যাত! এককথা বারবার বলছে! লোকটি ফিরে গেল দরজায়।

খেপে গেলেন পিনাকীরঞ্জন, দেখলেন, কী বিশ্রী ব্যবহার!

আপনি এসব গায়ে মাখবেন না। জায়গাটা আমি চিনি। অর্জুন বলল।

বাসে বেশি সময় লাগল নবাবগঞ্জ পৌঁছোতে। পেট্রল পাম্প ছাড়াতেই অর্জুন উঠে পড়ল। এই সময় কন্ডাক্টরের গলা শোনা গেল, বার্ড স্যাংচুয়ারি!

বাস থামলে নামার সময় পিনাকীরঞ্জন গম্ভীর গলায় বললেন, শুক্রিয়া।

স্যাংচুয়ারির গেটে বেশ কয়েকটা গাড়িদাঁড়িয়ে আছে। পিনাকীরঞ্জন সেদিকে তাকিয়ে বললেন, যাবেন নাকি ভিতরে? আমি কখনও দেখিনি।

তিনটে বাজতে বেশি দেরি নেই।

ওহো! তাই তো?

শুনুন! আপনি অসুস্থ, এটা মনে রাখবেন।

ভেবে নিয়েছি, হাসলেন পিনাকীরঞ্জন।

কী ভেবেছেন?

চোখ আধবোজা করে উঃ-আঃ করব। আপনি আমাকে ধরে রাখলে টলতে টলতে হাঁটব। দেখলেই মনে হবে আমি খুব অসুস্থ!

দয়া করে ওটা করবেন না। আপনার পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে তাই বাঁ হাত দিয়ে মাঝে মাঝে পেট চেপে ধরবেন। আজ সকাল থেকে কিছু খাননি বলে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এইটুকু। পারবেন তো?

বিলক্ষণ!

আমাকে দেখান তো?

পিনাকীরঞ্জন বাঁ হাত পেটের উপর চেপে মুখ বিকৃত করলেন। অর্জুন হেসে ফেলল, অতটা না করলেও চলবে।

স্যাংচুয়ারির সীমানা শেষ হলে গলি দিয়ে ঢুকল ওরা। খানিকটা যাওয়ার পর লোহার গেট নজরে এলে পিনাকীরঞ্জন বললেন, আরে বাপ! ডাক্তারবাবু দেখছি খুব বড়লোক। অথচ জানেন, আমার স্ত্রী ওঁর নামই শোনেনি।

আপনার স্ত্রী কি বিল গেটসের নাম শুনেছেন?

তিনি কে?

পৃথিবীর অন্যতম ধনী ব্যক্তি। গেট খুলুন।

পিনাকীরঞ্জন এগিয়ে গিয়ে গেট খুললেন। অর্জুন চট করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। পিনাকীরঞ্জন ভিতরে ঢুকে গেট বন্ধ করতে না-করতে দূরে লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখল অর্জুন। গালে চাপ দাড়ি, ব্যায়াম করা শরীর।

অর্জুন চাপা গলায় বলল, আপনার পেটে ব্যথা হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে পিনাকীরঞ্জন বাঁ হাতে পেট খামচে ধরলেন। মুখ বিকৃত হল। দাড়িওয়ালা লোকটি সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, নাম?

পি-পিনাকী, উঃ! পিনাকীরঞ্জন শেষ করতে পারলেন না।

চলিয়ে, হাত নেড়ে ডাকল লোকটা।

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে পিনাকীরঞ্জনকে ধরে কয়েক পা হাঁটতেই লোকটা হিন্দিতে বলল, আপনার যাওয়ার অর্ডার আছে। ওকে গেটের বাইরে যেতে বলুন।

পিনাকীরঞ্জন বললেন, ও হল আমার ভাইপো। আমার শরীর খারাপ বলে স্ত্রী বলেছে ও যেন সব সময় সঙ্গে থাকে। কথা না শুনলে স্ত্রী খুব রেগে যান।

কোনও কথা শুনতে চাই না। অর্ডার হয়েছে একজনকে নিয়ে যাওয়ার। লোকটি বলল।

পিনাকীরঞ্জন বললেন, আচ্ছা মুশকিল! ডাক্তারের কাছে রোগী যাবে, তাতে অর্ডার আবার কীসের। ঠিক হ্যায়, হাম ডাক্তারবাবুকো বলেগা, চলো।

লোকটা একটু ভাবল। তারপর হাঁটতে শুরু করল। খুব দ্রুত হেঁটে যাওয়ায় দূরত্ব বাড়ছিল। অর্জুন বলল, দশে দশ পেয়ে গিয়েছেন। দারুণ অভিনয় করেছেন।

পিনাকীরঞ্জন হাসলেন, ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় স্কুলে একবার অভিনয় করেছিলাম।

বাড়িটার সামনে পৌঁছে লোকটাকে দেখতে পেল না অর্জুন। বাড়ি দেখে পিনাকীরঞ্জন মোহিত হয়ে গেলেন, উরে ব্বাবা! এ তো বাড়ি না, দুর্গ!

আপনার কিন্তু পেটে ব্যথা! অর্জুন মনে করিয়ে দিল।

ও, উঃ! পেট খামচে ধরলেন পিনাকীরঞ্জন।

এই সময় দরজা খুলে লোকটি বেরিয়ে এসে তাদের ভিতরে ঢুকতে বলল। ওরা ঢোকামাত্র দরজাটা বন্ধ করে পাশের একটা ঘর দেখিয়ে অন্যদিকে চলে গেল সে। পিনাকীরঞ্জনকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকল অর্জুন।

ঘরের একপ্রান্তে লম্বা টেবিলের উপর বড় বড় কাঁচের জার। তাতে তরল। পদার্থে লতাপাতা শিকড় ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন পিনাকীরঞ্জন, আয়ুর্বেদ! খুব পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতি।

এটি কে?

গম্ভীর গলা ভেসে আসতেই ওরা পিছন ফিরল। পিনাকীরঞ্জন বললেন, কী আশ্চর্য! আপনি বাঙালি? টেলিফোনেও তো উর্দু-হিন্দি বললেন, বলেই খেয়াল হতে পেট খামচে ধরলেন।

আপনি একে নিয়ে আসার কথা বলেননি, ডক্টর বকসি কেটে কেটে বললেন।

আমার স্ত্রী কিছুতেই একা ছাড়তে চাইল না যে! পিনাকীরঞ্জন মিত্র বললেন, এটি আমার ভাইপো। নর্থ বেঙ্গলে থাকে। বেড়াতে এসেছে। কিন্তু ইসবগুলে কোনও কাজ হচ্ছে না। উলটে পেটে তীব্র ব্যথা। একবার ভাবলাম, পাড়ায় অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের কাছে যাই। কিন্তু আপনি আমার মুখ দেখেই যখন বলে দিলেন যে, আমি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগি, তখন আপনার কাছেই ছুটে এলাম ভাইপোকে নিয়ে। পিনাকীরঞ্জন বললেন।

লখনউয়ে থাকেন? অর্জুনের দিকে তাকালেন ডক্টর বকসি।

না। আমি উত্তরবঙ্গে থাকি।

কী করা হয়?

তেমন কিছু নয়। চাকরি খুঁজছি। অর্জুন বলল।

পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল? চোখ সরাচ্ছিলেন না ডক্টর বকসি।

না। আমরা নদিয়া থেকে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলাম।

কথায় টান নেই। উত্তরবঙ্গের মানুষের কথায় একটা আলাদা টান থাকে, ডক্টর বকসি পিনাকীরঞ্জনকে বললেন, পিনাকেশবাবু, আপনি আমার সঙ্গে ওঘরে চলুন। মনে হচ্ছে আপনাকে পরীক্ষা করা দরকার। আসুন, বলে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

পিনাকীরঞ্জন ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, এবার কী করব?

অর্জুন ইশারা করল যাওয়ার জন্য। মিনিট কুড়ি পর ডক্টর বকসি ফিরে এলেন, খুব স্যাড ব্যাপার। ওঁর পেটের ভিতর একটা ভয়ংকর টিউমার আছে। কিন্তু উনি আমার কাছে টেলিফোনে মিথ্যে বললেন কেন?

মিথ্যে? মানে?

ওর পেট একেবারে খালি। অথচ বললেন ইসবগুল খেয়েও কাজ হয়নি। লোকটা বেসিক্যালি সরল। তা হলে?

হয়তো টিউমারের জন্য ব্যথা হচ্ছে, উনি ভাবছেন উলটো।

ওকে! আপনি তো ওঁর ভাইপো অপারেশন না করে আমি টিউমারটা গলিয়ে দিতে চাই। তার জন্য আমার কাছে দু'দিন থাকতে হবে। এখনই চিকিৎসা শুরু না করলে টিউমার ফেটে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বাঁচানো মুশকিল হবে। আপনি বাড়ি ফিরে ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আমাকে টেলিফোনে জানান। ডক্টর বকসি চিন্তিত গলায় বললেন।

উনি এখানে থাকতে রাজি হয়েছেন? অর্জুন অবাক!

আলোচনা করার মতো অবস্থায় উনি নেই। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল দেখে ওঁকে ঘুম পাড়াতে বাধ্য হয়েছি। আপনি যত তাড়াতাড়ি জানাতে পারবেন, তত ভদ্রলোকের উপকার হবে।

কীরকম খরচ হবে?

সেটা এখনই বলতে পারছি না।

কাকিমা তো জানতে চাইবেন। মানে ওঁর পক্ষে সম্ভব কিনা...

নার্সিংহোমে অপারেশন করলে যা খরচ হত তার চেয়ে বেশি হবে না। যান, আর কথা বাড়াবেন না, ডক্টর বকসি ঘুরে দাঁড়ালেন।

একটা অনুরোধ...

ডক্টর বকসি আবার ফিরে তাকালেন।

যাওয়ার আগে কাকাকে একবার দেখে যেতে চাই।

একজন ঘুমন্ত মানুষকে দেখার কী আছে?

কাকিমা জানতে চাইবেন। মেয়েদের মন তো! অর্জুন গলা নামিয়ে বলল।

ওঃ! বিরক্ত হলেন ডক্টর বকসি, আসুন। এক মিনিটের বেশি নয়। ডক্টর বকসিকে অনুসরণ করে পাশের ঘর দিয়ে আর-একটি ঘরে চলে এল অর্জুন। সেখানে বেশ উঁচু একটা লম্বা কাঠের টেবিলের উপর শুয়ে আছেন পিনাকীরঞ্জন। তার চোখ বন্ধ। শ্বাস পড়ছে স্বাভাবিকভাবে।

অর্জুন লক্ষ করল লম্বা টেবিলটা বেশ অস্বাভাবিক চেহারার। নীচের দিকে গাড়ির অ্যাকসিলেটরের মতো একটা জিনিস রয়েছে। হয়তো সেটায় চাপ দিলে টেবিলটা উপর-নীচ হয়।

দেখা হল?

উনি তো খুব শান্তভাবে ঘুমোচ্ছেন, অর্জুন কথা বলতে চাইল।

ওষুধের গুণে।

ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়েছেন?

না। একটা বিশেষ গাছের শিকড়ের রস যে-কোনও মানুষকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, ডক্টর বকসি বিরক্ত হচ্ছিলেন।

কিন্তু দেখুন, মনে হচ্ছে ওঁর পেটে কোনও ব্যথা নেই। পেট স্বাভাবিক।

ভিতরে বিশাল টিউমার, যে-কোনও মুহূর্তেই ফাটতে পারে।

কিছু মনে করবেন না, এক্সরে না করে আপনি টিউমারের অস্তিত্ব কী করে বুঝতে পারলেন? পেট টিপে কি ঠিকঠাক বোঝা সম্ভব?

আপনি কি আমার চিকিৎসাবিদ্যায় সন্দেহ করছেন?

না না। আমি জানতে চাইছি। অ্যালোপ্যাথি, এমনকী হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররাও এক্সরে করতে বলেন। তাতে পেটের ভিতরে ঠিক কোন জায়গায় এবং কী অবস্থায় টিউমার রয়েছে, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। অর্জুন বলল।

এবার শব্দ করে হাসলেন ডক্টর বকসি, আপনি আমাকে ডাক্তারি শেখাতে চাইছেন? বেশ, ওঁকে স্বচ্ছন্দে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন।

কী করে সম্ভব? ওঁর তো জ্ঞান নেই।

জ্ঞান এক মিনিটেই ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি, ডক্টর বকসি ঘরের অন্যপ্রান্তে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানেও টেবিলের উপর অনেক কাঁচের জারে তরল পদার্থ রয়েছে।

অর্জুন বলল, দাঁড়ান। আমাকে ভুল বুঝছেন আপনি। আপনাকে আমি সন্দেহ করিনি। কৌতূহল হচ্ছিল বলে প্রশ্নগুলো করছিলাম। আপনি স্বচ্ছন্দে কাকার চিকিৎসা করতে পারেন। উনি আপনার উপর খুব ভরসা করছিলেন।

ওঁর স্ত্রীর অনুমতির দরকার নেই? ডক্টর বকসি জিজ্ঞেস করলেন?

দেখুন, এখান থেকে লখনউ যেতে-আসতে প্রচুর সময় লেগে যাবে। অন্তত ঘণ্টাতিনেকের আগে ফিরতে পারব না। তার উপর কাকিমা যদি আসতে চান, তা হলে আরও দেরি হয়ে যাবে। এর মধ্যে যদি টিউমারটা... অর্জুন কথা শেষ না করে বেশ উদ্বেগের সঙ্গে তাকাল।

একটা টেলিফোন করে মতামত নিতে পারেন।

কাকার বাড়িতে টেলিফোন নেই, অর্জুন মাথা নাড়ল, তা ছাড়া, আপনাকে বলতে সংকোচ হচ্ছে, কাকা এবং কাকিমার মধ্যে সদ্ভাব নেই। সেই জন্যই কাকা বাড়ি ছেড়ে অত দূরে দশ বছর চাকরি করছেন। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, কাকা মারা গেলে কাকিমা স্বস্তি পাবেন!

অ্যাঁ! তাই নাকি? কীরকম?

দু'জনের মধ্যে কোনও মিল নেই তো! এই যে কাকা আমার সঙ্গে এসেছেন, তা কি খুশি হয়ে এসেছেন? বাধ্য হয়ে এসেছেন। কাকিমার সঙ্গে পেরে উঠবেন না বলে বাধ্য হয়ে এসেছেন। আসার আগে কাকিমা আমাকে আড়ালে বলেছেন যে, এখানে কোনও উপকার না হলে আমি যেন হাসপাতালে ওঁকে ভরতি করে বাড়ি ফিরি। বুঝতেই পারছেন, কাকা না থাকলে কাকিমা সব সম্পত্তির মালিক হয়ে স্বাধীনভাবে থাকতে পারবেন। আপনি ওঁর চিকিৎসা শুরু করুন। আমি চাই কাকা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। গড়গড় করে অর্জুন মিথ্যে কথাগুলো বলে বুঝল ডক্টর বকসি তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। তিনি ঘড়ি দেখলেন।

পিনাকেশবাবু যে আমার এখানে এসেছেন, তা ক'জন জানেন?

আমি আর কাকিমা।

হুঁ! দেখুন ভাই, এই টিউমারটার যা আকৃতি, তাতে একটা ঝুঁকি নিতেই হবে। আমার ওষুধে যখন ওটা গলতে শুরু করবে, তখন ওঁর রক্তচাপ বেড়ে যাবে। সেটা আমি কোনও অবস্থাতেই ঠেকাতে পারব না।

কী করা যাবে! অ্যালোপ্যাথি ওষুধেরও সাইড-রিঅ্যাকশন আছে।

আঃ! বারবার আমার সামনে অ্যালোপ্যাথির কথা বলবেন না।

সরি।

আজ অবধি কেউ মারা যায়নি, তবে সহ্য করতে না পারলে হার্ট জখম হতে পারে। সেক্ষেত্রে কথা বন্ধ হয়ে যাবে, মুভমেন্ট করতে পারবেন না। চেয়ারে বসিয়ে রাখলে চমৎকার বসে থাকবেন। তখন আবার নতুন করে চিকিৎসা করে ওঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু তার জন্য অন্তত তিন সপ্তাহ সময় দরকার।

পিনাকীরঞ্জনের শরীরের পাশে দাঁড়িয়ে ওঁর বুকে-পেটে হাত বোলাতে বোলাতে কথা বলছিলেন ডক্টর বকসি। অর্জুনের মনে হল ভদ্রলোক বেশ পুলকিত।

তা হলে!

আপনি এবার আসতে পারেন।

এ কী বলছেন! আপনার চিকিৎসা শেষ না হওয়ার আগে আমি যাই কী করে!

আপনার তো থাকার দরকার নেই। কোনও কাজেই আপনি লাগবেন না।

জানি। কিন্তু ওষুধের প্রতিক্রিয়া না জেনে কী করে যাব! কাকিমাকে তো বলতে হবে। আমার অবস্থাটা বুঝুন। এলাম কাকাকে নিয়ে, ফিরে যাব একা? অর্জুন বলল।

ডক্টর বকসি একটু ভাবলেন। তারবল বললেন, যে ঘরে আপনি অপেক্ষা করছিলেন, সেই ঘরে গিয়ে বসুন।

অগত্যা ফিরে গেল অর্জুন। ডক্টর বকসির মতলব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এক্সরে ছাড়া কী করে বোঝা যাবে যে, টিউমার ফাটবে ফাটবে করছে! আর পেটে টিউমার থাকলে পিনাকীরঞ্জন টের পেতেন না! এখানে আসা পর্যন্ত ওঁর পেটে বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা হয়নি। অর্জুনের কথামতো পেটে ব্যথা হচ্ছে বোঝাতে অভিনয় করছিলেন তিনি। অথচ পেট টিপেই ডক্টর বকসি আবিষ্কার করলেন ওঁর পেটে টিউমার আছে!

ভাবতে ভাবতে অর্জুন হেসে ফেলল। না জেনে একটা তথ্য দিয়ে ফেলেছেন ডক্টর বকসি। রক্তচাপ বেড়ে গেলে, হার্ট জখম হলে পিনাকীরঞ্জন কথা বলতে পারবেন না, হাত-পা বা শরীরের কোনও অংশ নাড়তে পারবেন না, চেয়ারে বসালে বসে থাকবেন। তারপর তিনি ওঁর চিকিৎসা তিন সপ্তাহ ধরে করে সুস্থ করে দেবেন। বিজ্ঞাপনে তো এরকম কথাই লেখা হয়েছিল। মৃতদেহ অবিকল এক চেহারায় রেখে দিতে পারবেন। শুধু তার হৃৎস্পন্দন থাকবে না।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর লাটাগুড়ির কানাইলাল চৌধুরীর মতো অনেক মানুষ নিশ্চয়ই ডক্টর বকসির খবরের কাগজের বক্স নম্বরে চিঠি লিখেছে। ইচ্ছে করলেই তাদের মধ্যে থেকে রোগী নির্বাচন করে ভদ্রলোক গবেষণা করতে পারতেন। অবশ্য যদি এটা গবেষণা হয়ে থাকে। সেটা না করে পিনাকীরঞ্জনের মতো সুস্থ ব্যক্তিকে গিনিপিগ করতে উদ্যোগী হচ্ছেন কেন?

পাশের দরজা খুলে গেল। অর্জুন দেখল, সেই দাড়িওয়ালা লোকটি একটা প্লেটের উপর কাঁচের গ্লাস বসিয়ে এগিয়ে আসছে। গম্ভীর মুখে সেটা অর্জুনের সামনে ধরে বলল, শরবত।

হালকা নীল পানীয় গ্লাসের ভিতরে। অর্জুন গ্লাস তুলে নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার প্লেটের উপর রেখে দিয়ে বলল, ধন্যবাদ, আমি শরবত খাই না।

চোয়াল নাড়ল লোকটা, চা, কফি?

এখন টেনশন হচ্ছে খুব, কিছু খাব না, তারপর জিজ্ঞেস করল, টয়লেট কোথায়?

প্রশ্ন শুনে লোকটা বেশ বিরক্ত হল। বলল, পারমিশন নেই।

অ্যাঁ! টয়লেটে যেতেও পারমিশন লাগে এখানে? তুমিও পারমিশন চাও?

লোকটি জবাব না দিয়ে বেরিয়ে যেতেই অর্জুন ওকে অনুসরণ করল। ওই দরজা দিয়ে খানিকটা যেতেই একটা বড় হলঘর। লোকটি হলঘরের প্রান্তে একটা বেসিনে শরবত ঢেলে দিয়ে গ্লাসটা কয়েকবার ধুয়েও তৃপ্ত হল না, লিকুইড সাবানে ধুয়ে ন্যাপকিন দিয়ে পরিষ্কার করে ওপাশের ঘরে চলে গেল।

হলঘর থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে উপরে। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে চোখ পড়তেই অর্জুন চমকে উঠল। শেষ ধাপের দুদিকে দুটো কঙ্কাল স্বাগত জানানোর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ও দুটো যে পূর্ণবয়স্ক মানুষের কঙ্কাল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

অর্জুন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এই সময় উপর থেকে নেমে এলেন ডক্টর বকসি। নামার সময় কঙ্কাল দুটোকে দু'হাতে ছুঁয়ে নিলেন। তিনি হলঘরে পা দেওয়ামাত্র দাড়িওয়ালা ওপাশের ঘর থেকে বেরিয়ে মাথা নিচু করে যে কথাগুলো বলল, তা অর্‌জুন শুনতে পেল না। ডক্টর বকসি মাথা নাড়লেন। তারপর কবজি তুলে সময় দেখে বললেন, আর এক ঘণ্টা পর কাজ শুরু করব আমরা। তখন ছেলেটাকে বলবি, কাল সকালে এসে পেশেন্টকে দেখতে। এখন দেখে কোনও লাভ হবে না।

লোকটি কিছু জিজ্ঞেস করল।

ডক্টর বকসি বললেন, ভাল কথায় না গেলে কী করতে হবে, তা তো তোর জানাই আছে। সেটা করলে তোরই লাভ হবে, হাসলেন তিনি। লোকটি মাথা নাড়ল খুশি হয়ে। ডক্টর বকসির পিছন পিছন ওপাশের দরজা দিয়ে চলে গেল।

অর্জুন দ্রুত চলে এল হলঘরে। সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল দোতলায়। লম্বা করিডোর। ডান দিকের ঘরটায় ঢুকে সে অবাক! একটা খাটের চারকোণে চারটে লম্বা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। তাদের আঙুলে মশারির দড়ি জড়ানো। ঘরের একপাশে বড় আয়নার সামনে যে চেয়ার, তার হাতল ধরে একটি অল্পবয়সি কঙ্কাল দাঁড়িয়ে। এ বাড়িতে এত কঙ্কাল কেন? অর্জুন পাশের ঘরে ঢুকল দরজা ঠেলে। ঢুকতেই একটা তীব্র পচা

গন্ধ নাকে এল। এই ঘরের জানলা দিয়ে ঝিল দেখা যাচ্ছে। বোধহয় এখান থেকেই ঝিলের জলে আলো ফেলা হয়েছিল। ঘরের কোণে একটা বড় রেফ্রিজারেটর। কোনও কারণে তার দরজা ভালভাবে বন্ধ করা হয়নি। গন্ধটা আসছে ওর ভিতর থেকে।

.

রেফ্রিজারেটরের দরজাটা আর-একটু ফাঁক করতেই গন্ধটা অর্জুনের শরীরকে এমন অস্থির করে তুলল যে, মনে হল, বমি হয়ে যাবে। নাকে রুমাল চেপে সে দেখল একটা সসপ্যানে বেশ কয়েকটা মাংসের বড় বড় টুকরো থেকেই ওই দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। মাংসগুলো হাড় ছাড়া এবং কয়েক দিনের পচা বলে কালচে রং ধরে গিয়েছে। এটা খাসি বা মুরগির তো নয়ই, গোরু বা মোষের হতে পারে। সে আর-একটু ঝুঁকে দেখতে চাইল। পাশেই বড় বড় দুটো বাটিতে রান্না করা মাংস রয়েছে। বাটি নাকের কাছে এনে তেমন গন্ধ পেল না অর্জুন। রান্না করা মাংসেও কোনও হাড় নেই। একজন ডাক্তারের রেফ্রিজারেটরে এত পচা মাংস কেন থাকবে? পাশেই একটা চিলতে ঘর। অর্জুন সে ঘরে ঢুকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের মোড়ক দেওয়া টেবিলের উপর মাংস কাটার ছুরি দেখতে পেল। লোকে দোকান থেকে মাংস পিস করে কাটিয়ে আনে, আর এ বাড়িতে এখানে মাংস টুকরো করা হয়। হঠাৎ অস্বস্তি হতে অর্জুন ঘুরে দেখতে পেল, দাড়িওয়ালা লোকটা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ওগুলো কীসের মাংস?

অর্জুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। ওর ওজন এবং শক্তি এত প্রবল যে, অর্জুন আছড়ে পড়ল মাটিতে। লোকটা দু হাত বাড়িয়ে অর্জুনের গলা চেপে ধরতে সে জোড়াপায়ে ওর পেটে লাথি মারল। সামলাতে না পেরে লোকটা উলটে পড়ল টেবিলের গায়ে। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল কাঠের টেবিল। অর্জুন এক লাফে বাইরে আসার সময় আড়চোখে দেখতে পেল, লোকটা মাংস কাটার ছুরি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছে। সে বাইরে এসে দরজার ছিটকিনি তুলে দিল। দড়াম দড়াম শব্দ হতে লাগল দরজায়। এবার মাঝখানের হুড়কো টেনে দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতে ডক্টর বকসির গলা শুনতে পেল সে। উপরে তখন সমানে শব্দ হয়ে যাচ্ছে। অর্জুন সিঁড়ির পাশে টেবিলে সাজানো জারের পিছনে লুকোতে-না-লুকোতে ডক্টর বকসি হলঘরে ঢুকে চিৎকার করলেন, কী হয়েছে? শব্দ করছ কেন?

উপর থেকে আর্তনাদ ভেসে আসতে ডক্টর বকসি তড়িঘড়ি সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলেন। অর্জুন দৌড়ে চলে এল পিনাকীরঞ্জন যে ঘরে শুয়ে ছিলেন, সেখানে। জোরে ঝাঁকুনি দিয়েও ভদ্রলোককে যখন জাগানো গেল না, তখন সে আর দেরি করল না। বাইরের দরজা খুলে দৌড়ে ঝিলের কাছে পৌঁছে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে যখন ঝিলের প্রায় মাঝখানে, তখন দাড়িওয়ালা লোকটা ছুরি হাতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখছে ক্ষিপ্ত হয়ে। ডক্টর বকসি বেরিয়ে এলেন, এখানে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? গেটের দিকে গিয়ে ওকে ধরো। আমি গেট লক করে দিয়েছি। ওদিকে দিয়ে পালাতে পারবে না। মনে রেখো, ছেলেটাকে ওখানেই মারা চলবে না।

দাড়িওয়ালা গেটের দিকে দৌড়োল।

এখন সন্ধের অন্ধকার ঘন ছায়া ফেলেছে ঝিলের জলে। অনেকটা সাঁতরে এপারে এসে হাঁপাতে লাগল অর্জুন। আপাতত সে বেঁচে গেলেও পিনাকীরঞ্জন মৃত্যুর মুখে রয়েছেন। বেশি দেরি করলে ওঁকে বাঁচানো যাবে না।

সে বাগানের মধ্যে দিয়ে স্যাংচুয়ারির পাঁচিলের কাছে চলে আসতেই দূরে চিৎকার উঠল। একজন পাহারাদার চেঁচিয়ে তাকে থামতে বলছে। আর দেরি না করে পাঁচিল ডিঙিয়ে রাস্তার ধারে চলে এল সে। মিনিটপাঁচেকের মধ্যে পেট্রল পাম্পে পৌঁছে অর্জুন অমিতাভকে ফোন করল, আপনি কোথায়?

থানায়।

থানায়?

গেস্ট হাউসে ফোন করে শুনলাম তুমি পিনাকীরঞ্জন মিত্রকে নিয়ে

করে শুনলাম তুমি পশন বেরিয়ে গিয়েছ। কোথায় গিয়েছ জানি। তখনই আমার বন্ধু, যিনি পুলিশের বড়কর্তা, তার সাহায্য নিই। তিনি থানাকে বলেছেন যা করার করতে। আমি থানায় বসে অপেক্ষা করছি। আর আধঘণ্টার মধ্যে কোনও খবর না পেলে তোমায় খুঁজতে যাব ভেবেছিলাম।

থানাটা কোথায়?

এই তো নবাবগঞ্জেই।

বাঁচালেন! আপনি এখনই পুলিশ নিয়ে ওই বাড়িতে চলে আসুন। পিনাকীবাবুর জীবন বিপন্ন, কুইক। কথা শেষ করতেই অর্জুন দেখল একটা সাইকেলে চেপে দাড়িওয়ালা পাম্পের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। সামনাসামনি হলে ওর সঙ্গে শক্তিতে সে পেরে উঠবে না।

ফোনের টাকা নিয়ে বুথের ছেলেটা বলল, আপনি এরকম ভিজে গিয়েছেন কী করে?

ঝিলের জলে পড়ে গিয়েছিলাম, বলতে বলতে অর্জুন দেখল দাড়িওয়ালা লোকটা আবার ফিরে যাচ্ছে। পাম্প থেকে তেল নেওয়া একটা গাড়ি রাস্তায় বেরোতে সে হাত তুলে তাকে থামাল। তারপর ঝুঁকে গাড়ির ভিতরটা দেখে যেতে বলে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল স্যাংচুয়ারির দিকে। ওকে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল।

এখন অন্ধকার। হাইওয়ে দিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে একের পর এক। অর্জুন সন্তর্পণে হাঁটছিল। হঠাৎ একটা জিপ রাস্তা ছেড়ে তার পাশে চলে এল এবং অমিতাভর গলা কানে এল, উঠে এসো।

পুলিশের জিপে অর্জুন উঠল। দারোগা ছাড়া চারজন সেপাই বসে আছে পিছনে। অমিতাভ অর্জুনের সঙ্গে দারোগার আলাপ করিয়ে দিলে তিনি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের অভিযোগটা কী? উনি যদি একজন প্রতারক ডাক্তার হন, তা হলে তা প্রমাণ করতে পারবেন? দেখুন, আমরা যেন মানহানির মামলায় না পড়ি!

অর্জুন বলল, আপনার সে ভয় নেই। উনি শুধু প্রতারকই নন, পাক্কা ক্রিমিনাল! বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকতে হবে।

গেট বন্ধ ছিল। হর্ন দিল ড্রাইভার। তারপর সেপাইদের বলল গেট খুলে দিতে। কিন্তু তার আগেই হেডলাইটের আলোয় দাড়িওয়ালা এসে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, এখন এখানে ঢোকা চলবে না। পারমিশন নেই।

দারোগা বললেন, আমি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করব।

এখন উনি দেখা করবেন না। পারমিশন নেই, লোকটা বলল।

একজন সেপাই নেমেছিল জিপ থেকে। দারোগা তাকে আদেশ করলেন গেট খুলতে। এগিয়ে গিয়ে গেট খোলার চেষ্টা করল সেপাই কিন্তু গেট খুলল না। সেপাই ফিরে এসে বলল, কোনও তালা নেই কিন্তু গেট খুলছে না।

দারোগা ড্রাইভারকে বললেন, জিপটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে চাপ দিয়ে গেট ভেঙে ভিতরে ঢোকো।

আদেশ পাওয়ামাত্র জিপ এগিয়ে গিয়ে গেটে চাপ দিতেই সেটা ভেঙে দু'পাশে সরে গেল। এতক্ষণে দাড়িওয়ালা বুঝতে পেরেছে এটা পুলিশের জিপ। সে দৌড়োতে লাগল বাড়ির দিকে। জিপ ছুটল। লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই দুটো সেপাই লাফিয়ে নেমে পড়ল ওকে ধরতে। সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে ছুরি বের করে উঁচিয়ে ধরল লোকটা, মেরে ফেলব। আর-এক পা এগোলেই মেরে ফেলব।

দারোগা জিপ থেকে নেমে টর্চের আলো ফেললেন লোকটার হিংস্র মুখে। তারপর শান্ত গলায় বললেন, ছুরিটা ফেলে দাও, নইলে গুলি চালাব।

লোকটা আচমকা লাফ দিয়ে রাস্তা থেকে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। দুটো সেপাই ওর পিছনে ধাওয়া করতে চেয়েছিল। কিন্তু দারোগা নিষেধ করলেন। মোবাইল বের করে বোতাম টিপে আরও ফোর্স চাইলেন। সেপাই দু'জনকে বললেন, তোমরা ওই গেটের কাছে লাঠি নিয়ে অপেক্ষা করো। ফোর্স এলে জঙ্গল সার্চ করবে। ওর হাতে ছুরি আছে কিন্তু তোমাদের লাঠি দিয়ে ওকে ঘায়েল করতে হবে, যদি ফোর্স আসার আগে ও বেরিয়ে যেতে চায়?

সেপাই দু'জন জিপ থেকে লাঠি বের করে নিয়ে গেটের দিকে চলে গেল।

.

সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। বাড়ির ভিতরে কোনও মানুষ আছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। সেদিকে তাকিয়ে দারোগা বললেন, বাড়িতে তো কেউ নেই দেখছি!

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে বেল বাজাল। তৃতীয়বার বাজানোর পর আলো জ্বলল। মিনিটখানেক পর ফতুয়া গায়ে লুঙ্গিপরা টাকমাথা একটা লোক দরজা খুলে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে দরজা খুলতে দেরি হয়ে গেল। কসুর মাফ করবেন। আদেশ করুন।

ডক্টর বকসিকে ডেকে দিন, দারোগা গম্ভীর গলায় বললেন।

ডক্টরসাহেব তো কানপুর গিয়েছেন। শুক্রবার ফিরবেন।

কখন গিয়েছেন?

এই একটু আগে, চোস্ত উর্দুতে কথাগুলো বলল লোকটা।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

আমি ডক্টরসাহাবের গোলাম। একসময় আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন নবাব বাহাদুর শাহ। এখন আমি পথের ভিখারি। ডক্টরসাহাব মহানুভব মানুষ, তিনি দয়া করেছেন বলে আমি এখানে দেখাশোনার কাজে আছি। লোকটি বলল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আমরা ভিতরে যেতে পারি? উনি এখানকার দারোগা।

অবশ্যই আসবেন। আঃ! ডক্টরসাহাব থাকলে খুব খুশি হতেন। আসুন।

যে ঘরে ওরা প্রথমে বসেছিল, সেই ঘর থেকে দ্রুত হেঁটে অর্জুন দলটাকে নিয়ে চলে এল যেখানে পিনাকীরঞ্জন শুয়ে আছেন। গিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল। পিনাকীরঞ্জন সেখানে নেই।

আপনি কি কিছু খুঁজছেন বাবু?

একটু আগে আমি আর-এক ভদ্রলোক এখানে এসেছিলাম। তখন আপনাকে দেখিনি। ভদ্রলোককে ডক্টর বকসি এখানে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছিলেন, আমি চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেই ভদ্রলোক কোথায়? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

আমি বাজারে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে কাউকে দেখিনি। যদি আপনার কথা সত্যি হয়, তা হলে ঘুম ভেঙে গেলে তিনি চলে গিয়েছেন।

আমি এখান থেকে গিয়েছি মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে।

ঘুম ভাঙানোর জন্য বাবুর এক সেকেন্ড লাগে। আমি তো কাউকে দেখিনি।

অমিতাভ বললেন, হয়তো পিনাকীবাবু লখনউ ফিরে গিয়েছেন।

অর্জুন হলঘরে এল। দারোগা কঙ্কাল দুটো দেখে চমকে উঠলেন, এ কী!

ডক্টরসাহাবের শখ। মেডিক্যাল কলেজ পুরনো কঙ্কাল বিক্রি করে দেয়। তাই কিনে নেন ডক্টরসাহাব।

অর্জুন উপরে উঠে এল। যে ঘরে রেফ্রিজারেটর আছে, সেখানে তখনও প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। সে রেফ্রিজারেটরের দরজা খুলল। মাংসের সসপ্যান বা রান্না করা মাংস সেখানে নেই!

মাংসগুলো কোথায় গেল?

কোন মাংস?

এখানে পচা মাংস আর রান্না করা মাংস ছিল।

এ বাড়িতে তো কেউ মাংস খায় না। ডক্টরসাহাব নিরামিষ খান। আপনি বোধহয় ভুল দেখেছেন!

আমি ভুল দেখেছি? তা হলে এখনও পচা গন্ধ এখানে কী করে আছে?

ওহো! দু-দুটো বড় ছুঁচো মরে পড়েছিল এখানে। ফেলে দিলেও গন্ধ যায় না সহজে। লোকটি হাসল।

দারোগা বললেন, একমাত্র ওই দাড়িওয়ালা লোকটির আচরণ ছাড়া আমরা সন্দেহজনক কিছু পাচ্ছি না অর্জুনবাবু।

দাড়িওয়ালা? সেই পাগলটা আবার এসেছে নাকি?

আপনি চেনেন? দারোগা জিজ্ঞেস করলেন।

খুউব! ওরকম রাগী পাগল আমি কমই দেখেছি।

অর্জুন জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। ঝিলের জলে পাখিরা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। তোলপাড় করছে জল। সে দারোগার কাছ থেকে টর্চ নিয়ে ঝিলের জলে আলো ফেলল। জানলার ঠিক সামনে রাজ্যের পাখি মারপিট করছে কিছু খাওয়ার জন্য। একটা বড় পাখি খাবার নিয়ে একটু উড়তেই তার মুখে মাংসের টুকরো দেখতে পেল বলে মনে হল অর্জুনের। ওরা এই জানলা দিয়ে মাংসগুলো ঝিলের জলে ফেলে দিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল সবাই। হঠাৎ অর্জুনের নজর পড়ল লোকটির গোড়ালিতে। লুঙ্গির নীচে গোড়ালির যেটুকু একঝলক দেখতে পেল, তাতে বুঝতে অসুবিধে হল না যে, লোকটা মোজা পরে আছে। কাজের লোক লুঙ্গির নীচে জুতো ছাড়া মোজা পরে ঘুরছে! অর্জুন আর দেরি না করে পিছন থেকে লোকটার দু'হাত টেনে ধরে বলল, ডক্টর বকসি, আপনার খেলা শেষ!

দারোগা বললেন, মানে?

ইনিই ডক্টর বকসি। আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন পরচুলা পরে। এখন নিজের টাক নিয়ে লুঙ্গি ফতুয়ায় কাজের লোক সেজেছেন, অর্জুন বলল।

একটু প্রতিবাদ করলেও শেষ পর্যন্ত ডক্টর বকসি ভেঙে পড়লেন। স্বীকার করলেন রেফ্রিজারেটরের মাংসগুলো মানুষের। মানুষের মাংস খেতে তার এবং দাড়িওয়ালার খুব ভাল লাগে। চট করে মৃতদেহ পাওয়া যায় না বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ইতিমধ্যে দু'জন রোগী পেয়ে গিয়েছিলেন। তারা এসেছিলেন কেরল এবং গুজরাত থেকে। রোগী এবং তার এসকর্টদের খাদ্যবস্তু করেছেন ওঁরা।

পিনাকীরঞ্জনকে পাওয়া গেল বাড়ির নীচের চোরাকুঠরি থেকে। তিনটে কঙ্কালের পাশে শুয়ে ছিলেন তিনি। মাথায় জল ঢেলে চেতনা ফেরানো হল তার। চেতনা ফিরতেই কঙ্কাল দেখে 'ওরে বাবা বলে লাফিয়ে উঠলেন।

একজন সেপাই ঝিলে ডুব দিয়ে মানুষের নাড়িভুড়ি ইত্যাদি বোঝাই বস্তা টেনে উপরে তুলল। সম্ভবত আগেই পচে গিয়েছিল, তার উপর চব্বিশ ঘণ্টা জলে থেকে সেগুলোর চেহারা বীভৎস, গন্ধও আরও কটু হয়ে গিয়েছে।

এই সময় আর-এক গাড়ি পুলিশ চলে এল বাড়ির সামনে। টর্চ নিয়ে তারা নেমে পড়ল দাড়িওয়ালাকে খুঁজতে।

দারোগা বললেন, অর্জুনবাবু, আপনাদের একটু কষ্ট করে থানায় যেতে হবে। পুরো ব্যাপারটা রেকর্ড করে রাখতে চাই।

অর্জুন মাথা নাড়ল। অমিতাভ বললেন, এতদিন বইয়ে ক্যানিব্যালের কথা পড়েছি। আফ্রিকার নরখাদক মানুষ। আজ চোখের সামনে দেখলাম। কী ভয়ংকর।

অর্জুন ডক্টর বকসির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, ডক্টর বকসি, সত্যি ছদ্মবেশ ধরার ব্যাপারে আপনার দক্ষতা অসাধারণ। এমনকী উর্দু বলে আমাকেও বিভ্রান্ত করে ফেলেছিলেন। কিন্তু মানুষের মাংস খাওয়ার নেশা কবে থেকে হল?

বছরদশেক আগে। এক নাবিকের জীবনী পড়তে গিয়ে জানতে পারি, ওরা সমুদ্রে জাহাজডুবি হওয়ার পর দ্বীপে আশ্রয় নেয়। সেখানে কোনও প্রাণী ছিল না, যাকে মেরে খেতে পারে। সেখানে অনাহারে

থাকার সময় ওদের মধ্যে একজন মারা যায়। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তার মাংস ঝলসে খেয়ে নেয়। ওরা। প্রথমে ঘেন্না লাগলেও নাবিকটি স্বীকার করে মানুষের মাংস যে অত সুস্বাদু, সে আগে জানত না। ওটা পড়ার পর থেকে একটু-একটু করে আমার মনে খাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হয়। তিরুবনন্তপুরমের হাসপাতালে কাজ করতাম আমি। সেখানকার মর্গ থেকে একটা হৃদরোগীর মৃতদেহ চুরি করে নিয়ে এসে খেয়ে বুঝলাম নাবিকের কথা সত্যি। তবে পচিয়ে খেলে আরও স্বাদ বাড়ে। যেমন শুঁটকি মাছ! রাঁধলে গন্ধ থাকে না। মৃতদেহ পাওয়া খুব মুশকিল। তা ছাড়া খারাপ রোগে মরলে অন্য বিপদ। তাই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। মরে যাওয়ার পরও প্রিয়জনের দেহ অবিকৃত অবস্থায় রেখে দেওয়া কোনও সভ্য সমাজই মেনে নেয় না। তাই সকলকে লুকিয়ে প্রিয়জনকে ওইভাবে রাখতে হবে। আমার কাছে নিয়ে এসে যদি ফিরে না যায়, তা হলে কেউ জানতে পারবে না ওরা কোথায় গিয়েছিল। কেরল বা গুজরাতের কেউ এখনও খোঁজ করেনি। আপনি অত্যন্ত ধূর্ত বলে পারলেন। অবশ্য আপনাকে দেখে প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। সেটাকে আমল দিইনি বলে ধরা পড়ে গেলাম।

এই সময় জঙ্গলে চিৎকার উঠল। হইহই! তারপর একজন সেপাই চিৎকার বলে উঠল, ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে।

ডক্টর বকসি বললেন, বেচারা। খুব বিশ্বস্ত লোক ও!

হঠাৎ পিনাকীরঞ্জন মিত্র বললেন, আমাকে একবার যেতে হবে। এখনই।

অমিতাভ বললেন, কোথায়?

আর কোথায়? ওই ইসবগুল খাওয়ার পর টেনশন হলেই... টয়লেট কোথায়?

অর্জুন হেসে ডক্টর বকসিকে বলল, টয়লেটে যাওয়ার পারমিশনটা দেবেন তো?

উত্তরের অপেক্ষা না করে পিনাকীরঞ্জন ছুটে গেলেন বাড়ির ভিতর।

অর্জুন এবার নিউইয়র্কে (২০০৯)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১-৩. থিয়েটার রোড

অর্জুন এবার নিউইয়র্কে (২০০৯)
অর্জুন সমগ্র ৫ – সমরেশ মজুমদার

থিয়েটার রোডের ট্র্যাভেল অ্যান্ড কার্গো অফিসে বসে অরূপ লাহিড়ি বলেছিলেন, দুবাই এয়ারপোর্টে প্রায় এগারো ঘণ্টা বসে থাকতে হবে আপনাকে। আমি এমিরেটসের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা আগে একটা সময় প্যাসেঞ্জারকে এয়ারপোর্টে না রেখে হোটেলে নিয়ে যেত। এখন নিচ্ছে না। আপনি ভাউচারটা রাখুন। ট্রানজিটেই এদের লাউঞ্জ পাবেন। বিশ্রাম করতে পারবেন।

অন্য এয়ারলাইন্সে গেলে হয় না?

আগামী দশ দিনের মধ্যে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া আপনার নামে আমেরিকা থেকে যে টাকা এসেছে তাতে একমাত্র এমিরেটসের টিকিটটা কভার করছে। চলে যান ভাই, খারাপ লাগবে না। দুবাই এয়ারপোর্ট বিশাল। ঘুরে দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।

অতএব নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এয়ারপোর্ট থেকে এমিরেটসের প্লেনে আকাশে উড়েছিল অর্জুন। যখন প্লেন মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন সুন্দরী এয়ারহোস্টেসরা আরব মহিলার পোশাক পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওড়নায় মুখ অর্ধেক ঢাকা সত্ত্বেও অর্জুনের মনে হয়েছিল, এঁরা ইউরোপ বা আমেরিকার মহিলা। প্লেন আকাশে উড়লে ওঁরা যখন পোশাক বদলে সহজ হলেন, তখন অর্জুন বুঝল তার ধারণা ভুল ছিল না। দুবাইতে নামার আগে আবার ওঁরা আরব মহিলার সাজে ফিরে গেলেন।

সুটকেস প্লেনের পেটে, নিউ ইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছোবার পরে পাওয়া যাবে। অতএব খালি হাতে অর্জুন ট্রানজিট লাউঞ্জে চলে এল। দুবাই ধনীদের জায়গা। কাদের টাকা কত তা নিয়ে তর্ক হয়। দোতলার প্যাসেজে পা দিয়ে অর্জুন যে দৃশ্য দেখল, তাতে ওই তথ্যের সমর্থন পাওয়া গেল। বিশাল আলোঝলমলে ছ'তলা ধরে ডিউটি শপের মেলা। চারধারে যেন হিরে জ্বলছে। দু-দুটো ফুটবল মাঠ এর মধ্যে ঢুকে যাবে। দোকানগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, গোটা পৃথিবীর মূল্যবান জিনিস এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

খুঁজতে খুঁজতে অরূপ লাহিড়ির দেওয়া ভাউচারটা যে লাউঞ্জের, তার সামনে এসে দাঁড়াল সে। ঢুকতেই বাঁ দিকের রিসেপশনে বসা কাঠখোট্টা চেহারার এক মহিলা, যিনি অবশ্যই আরবি নন, বাজখাই গলায়

জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই?

অর্জুন বলল, আমি নিউ ইয়র্কের ফ্লাইট ধরব। ততক্ষণ কি এখানে থাকতে পারি?

না, পারেন না। যদি না আপনার কাছে অনুমতিপত্র থাকে।

অর্জুন ভাউচার এগিয়ে দিল। সেটার উপর চোখ বুলিয়ে কম্পিউটারে এন্ট্রি করে ভদ্রমহিলা ইশারায় জানালেন যে, ভিতরে যেতে পারে। ভদ্রমহিলা একবার হাসলেন, মুখের পেশি একটুও নরম হল না। এই চাকরি করলে এমন মুখে বসে থাকা ঠিক নয় তা উনি জানেন না।

ভিতরের হলঘর সুন্দর করে সাজানো। টিভিতে আরবি ছবি দেখানো হচ্ছে নিঃশব্দে। সামনে বিশাল কাঁচের দেওয়াল। ওপাশের টারম্যাকে প্লেন নামছে-উড়ছে।

আচমকা এই সফর। নিউ ইয়র্ক থেকে মেজর ফোন করেছিলেন দিন পনেরো আগে। তাঁর শরীর এবং মন খুব খারাপ। এই অবস্থায় হাজার হাজার মাইল আকাশে উড়ে যাওয়ার ধকল সামলানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ কিছুদিন থেকেই উত্তরবাংলাকে দেখতে তার খুব ইচ্ছে করছে। বোধহয় সেই ইচ্ছে এই জীবনে পূর্ণ হবে না। এখন তার মনে হচ্ছে, অর্জুন যদি নিউ ইয়র্কে চলে আসে, উত্তরবাংলা না দেখার সাধ কিছুটা মিটবে। অর্জুন কি তার শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করবে? যদি করে তা হলে তিনি খুব খুশি হবেন। আজ সকালের ডাকেই অর্জুনের জন্যে ভিসা পেতে সুবিধে হবে বলে যাবতীয় কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। আসতে না পারলে অর্জুন যেন ওগুলো ছিঁড়ে ফেলে। আর আসতে পারলে যেন কাল সকালের মধ্যে তাকে মেল করে জানিয়ে দেয়। তার ই-মেল আইডি হল, মেজর এম রেডিফ. অন।

চারদিনের মাথায় কুরিয়ার কোম্পানি কাগজপত্র পৌঁছে দিল। মা বললেন, আহা, মানুষটি তার শেষ ইচ্ছের কথা জানিয়েছেন, তুই যা। দেখা করে আয়।

দোটানায় পড়েছিল অর্জুন। মাকে একা জলপাইগুড়িতে রেখে দু চারদিন বাইরে থাকা যায়, কিন্তু আমেরিকা মানে কমপক্ষে দু’সপ্তাহের ধাক্কা। গতবারের বিদেশযাত্রার স্মৃতিতে এখন ধুলো জমছে বলে কৌতূহলও হচ্ছিল।

মেজরের পাঠানো কাগজপত্রের সঙ্গে একটা চিঠি ছিল। সেটা পড়ার পর অর্জুন ঠিক করল, যেতে হবে। টেলিফোনে যা বলেছিলেন ঠিক সেসব কথা। লেখার পর মেজর লিখেছিলেন, এই নিউ ইয়র্ক শহরে কয়েকশো জাতি বাস করে। তাদের আচার-ব্যবহার, ভাষা আলাদা। তুমি গতবার যখন এসেছিলে তখন এদের দেখে গিয়েছিলে। কিন্তু নিউ ইয়র্কের মাটির তলায় আর-একটা যে জগৎ আছে, তা তুমি দ্যাখোনি। না, আমি আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনের কথা বলছি না। যার কথা বলছি তা জানতে হলে তোমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে।

মনে বঁড়শি বিঁধল। মেজর জানেন কোন টোপ কোন মাছ গিলে ফেলে। খোদ নিউ ইয়র্ক শহরের নীচে আর-একটা জগৎ আছে এ খবর অর্জুন কখনও পড়েনি। সেটা কি আন্ডারওয়ার্ল্ড? আন্ডারওয়ার্ল্ড মানে অপরাধীদের জগৎ। ই-মেলে অর্জুন জানিয়ে দিল, সে যাচ্ছে।

চিঠিতে 'ট্রাভেল অ্যান্ড কার্গো' কথাটি লেখা ছিল। ব্যাগ গুছিয়ে অর্জুন চলে এসেছিল কলকাতায়। শিয়ালদা স্টেশন থেকে সোজা ওদের থিয়েটার রোডের অফিসে। অরূপ লাহিড়ির টেবিলের সামনে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতেই তিনি সোজা হয়ে বসলেন, আরে! আপনি অর্জুন! বসুন ভাই। একটু আগে ব্যাঙ্ক থেকে জানিয়েছে আপনার নামে টাকা এসে গিয়েছে। পাসপোর্ট দেখিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু ভিসার জন্যে ইউ এস এ কনসুলেট কবে ইন্টারভিউ ডেট দেবে তা বলতে পারছি না। প্রচণ্ড ভিড় ওখানে।

অর্জুন ফাঁপরে পড়েছিল। ভিসার জন্যে বেশিদিন কলকাতার হোটেলে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অরূপ লাহিড়ি কম্পিউটারে কনসুলেট ধরে ভিসার জন্যে অর্জুনের নাম-ঠিকানা লিখে আবেদন করেই অবাক গলায় বললেন, আশ্চর্য!

কী হয়েছে?

আরে, আপনার নাম তো অলরেডি লিস্টে উঠে আছে। আগামীকাল সকালে যেতে হবে আপনাকে। ভিসা ফর্ম ফিলআপ করতে হবে। সঙ্গে ফোটো আছে?

প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সব কাজ শেষ করা হয়েছিল। পরের সকালে কনসুলেটের ভিসা অফিসার তার কাগজপত্র দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কেন যাচ্ছেন?

মেজর আমাকে দেখতে চান। তার শেষ ইচ্ছের প্রতি সম্মান জানাতে যাচ্ছি।

কোনও সত্য অনুসন্ধানের জন্যে নিশ্চয়ই যাচ্ছেন না?

না। তবে কোনও অসত্য যদি আমাকে বিব্রত করে, তা হলে আমি আপনাদের সাহায্য চাইব সত্যিটাকে সামনে আনতে। অর্জুন হেসেছিল।

গুড। আমাদের সাহায্য চাইবেন। কারণ, আপনি আমাদের দেশে যাচ্ছেন টুরিস্ট হিসেবে?

ভিসা পেয়ে গিয়েছিল। এই ভিসা পাওয়ার পিছনে যে মেজরের বড় ভূমিকা ছিল তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

দুবাই এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে বসে অর্জুন এইসব ভাবছিল। দীর্ঘসময় ওখানে থাকতে হবে তাকে। অরূপ লাহিড়ি বলেছিলেন, আগে সাত ঘণ্টার বেশি হলে এয়ারলাইন্স যাত্রীদের হোটেলে নিয়ে যেত। এখন খরচ কমাতে সেটা বন্ধ করেছে। তবে লাউঞ্জগুলো ভাল। ঘুমোতে পারেন। যে জায়গায় সে বসে আছে তা নিশ্চয়ই আরামদায়ক। কিন্তু তা বসার জন্যে, এতে ঘুমোনো যাবে না। অর্জুন দেখল, বাঁ

দিকের শেষপ্রান্তে রেস্টুরেন্টের মতো চেয়ার-টেবিল সাজানো আছে। একটি বিশাল চেহারার মহিলা এদিকে পিছন ফিরে চেয়ারে বসে খাচ্ছেন। চেয়ারের দু'পাশ থেকে তাঁর শরীর উপচে পড়েছে।

অর্জুন ভাবল একবার পাক দিয়ে এলে হয়। সিকি মাইল জায়গা জুড়ে ডিউটি শপগুলো ঝলমল করছে। ঘুরে ঘুরে দেখতেই অনেক সময় কেটে যাবে। না, কোনও কোনাকাটা করার ইচ্ছে তার নেই। আর হলেও, তার সাধ্য নেই। এখন ডলারের দাম কমেছে। বছরখানেক আগে সাতচল্লিশ টাকায় এক ডলার পাওয়া যেত। এখন সাঁইত্রিশ টাকা লাগছে। সে মাত্র একশো ডলার কিনে এনেছে। কাউকে বলা যাবে না অঙ্কটা, কিন্তু ভারতীয় মুদ্রায় টাকাটা তার কাছে কম নয়। বিলাসদ্রব্য কিনে সেটা কমিয়ে ফেলা বোকামি।

এই সময় একটি ছিপছিপে মধ্যবয়সি মহিলা ভিতরে ঢুকলেন। দরজার পাশে বসা মহিলাকে কাগজ দিয়ে সোজা চলে এলেন অর্জুনের সামনে, আমার খুব খিদে পেয়েছে। কোথায় খাব?

কথাগুলো ইংরেজিতে কিন্তু বলার ভঙ্গি এত জড়ানো যে, মর্ম উদ্ধার করতে সময় লাগল অর্জুনের। সে মাথা নাড়ল, আমি জানি না।

কেমন লোক আপনি? একজন মহিলার খিদে পেয়েছে শুনেও চুপচাপ বসে আছেন, খুঁজে দেখবেন না? এখানে তো খাবার থাকার কথা!

ওই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই জানতে পারবেন।

মাই গড। ওর মুখ দেখলে মনে হবে সমাধির পাশে বসে আছে।

অতএব উঠতে হল। বাঁ দিকের চেয়ার-টেবিলের কাছে যেতেই থামের আড়ালে থাকা সেলফগুলো চোখে পড়ল। থরেথরে নানান ধরনের খাবার সাজানো রয়েছে। স্যান্ডউইচ থেকে হটডগ, প্যাটিস, পেস্ট্রি। কেক, ডিমসেদ্ধ, পাউরুটি, কী নেই! ওপাশে চা-কফির সরঞ্জাম। ডান দিকে নানা পানীয়। কিন্তু কোনও সেলসম্যান নেই। সে পিছু হেঁটে মহিলাকে মাথা নেড়ে ইশারা করতেই তিনি চলে এলেন। খাবারের চেহারা দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, উঃ, এরা বাঁধাধরা খাবারের বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। বিনেপয়সায় খাওয়াচ্ছে বলে একটু চিন্তাভাবনা করবে না?

অর্জুন দেখল, মহিলা দুটো হটডগ, একটা বিয়ারের ক্যান নিয়ে টেবিলে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি খাবেন না? খেয়ে নিন। বাইরে এগুলোরই অনেক দাম।

মহিলা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন খেতে।

অরূপ লাহিড়ি বলেননি লাউঞ্জে বিনেপয়সায় খাবার পাওয়া যায়। প্লেটে কিছু খাবার আর জল নিয়ে অর্জুন টেবিল খুঁজতেই মহিলা বললেন, এখানে বসে পড়ুন।

অতএব ওঁর উলটো দিকে বসল অর্জুন। খাওয়া শুরু করতেই মহিলা বললেন, আপনি কি স্প্যানিশ?

চমকে উঠল অর্জুন। ঠিক শুনছে তো? সে বলল, পার্ডন!

ওঃ। আপনি কি স্প্যানিশ? শেষ তিনটে শব্দ কেটে কেটে উচ্চারণ : করলেন মহিলা।

নো। আমি ভারতীয়।

ভারতীয়? ও নো, ইম্পসিবল?

ভারত অনেক বড় দেশ। আমি যেখানে থাকি সেই অংশের নাম পশ্চিমবঙ্গ।

কিন্তু চেহারায় স্প্যানিশ ছাপ আছে।

আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন?

আমি মেক্সিকান। কিন্তু নিউ ইয়র্কে থাকি। ও কে! আমি এবার ঘুমোতে যাব। বলে মহিলা খাবারের শূন্য প্লেট, খালি ক্যান গারবেজ ব্যাগে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

স্প্যানিশ! নিজের গালে বাঁ হাত বোলাল অর্জুন। আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি যে, তাকে স্প্যানিশদের মতো দেখতে। কোথায় স্পেন আর কোথায় জলপাইগুড়ি। স্প্যানিশরা কি ইংরেজদের মতো সাদা চেহারার মানুষ নয়?

খাওয়া শেষ করে বাইরের করিডরে চলে এল সে। এখানে সূর্যের আলো ঢোকে না। কিন্তু বিদ্যুৎ এখানে সূর্যের আলোকে হার মানিয়েছে। অর্জুন দেখল, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে প্রচুর ছেলেমেয়ে বসে আছে। সম্ভবত ওদের কাছে লাউঞ্জে ঢোকার কাগজ নেই। অথচ পরের প্লেন ধরার জন্যে অনেকটা সময় কাটাতে হবে।

দুটো রেস্টুরেন্ট পেরোতেই ডান দিকের কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল সে। পরপর লম্বা ডিভান পাতা রয়েছে। ডিভানের একটা দিক ঈষৎ উঁচু। সেগুলোর বেশির ভাগই ভরতি। লোকজন ঘুমোচ্ছে এখানে। ওই মহিলা নিশ্চয়ই এখানে ঘুমোতে এসেছেন। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল অর্জুন। কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল না। কিছুটা হেঁটে একটা খালি ডিভান পেয়ে শরীর এলিয়ে দিল সে। আঃ, কী আরাম!

এই বিশাল হলঘরে কোনও শব্দ নেই। যেন ঘুমে কাদা হয়ে আছে মানুষজন। অর্জুনেরও ঘুম আসছিল। হঠাৎ একটা মেয়েলি গলা কানে এল। ফিসফিস করে কিছু বলছে। তারপর হাসির শব্দ। উঠে বসে চারপাশে তাকাল সে। কোথাও কেউ বসে বা দাঁড়িয়ে কথা বলছে না। অথচ গলার স্বর কানে আসছে।

অর্জুন দু'পাশের শায়িত শরীরগুলোর দিকে তাকাল। সবাই ঘুমোচ্ছে। একজন আপাদমস্তক মুড়ে। তার দিকে এগিয়ে গেল সে। কথাগুলো স্পষ্ট হল। মোবাইলে কথা বলছেন মহিলা। ইংরেজি উচ্চারণ জড়ানো হলেও কথাগুলো বুঝতে পারল অর্জুন। ওই বুড়ি বেঁচে থাকা পর্যন্ত তুমি একটা পয়সাও পাবে না। ও একটা ডাইনি। তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার কথা, তুমি একটি নির্বোধ! ও কখনওই অসুস্থ হবে না। আরও কত বছর বেঁচে থাকবে তা ঈশ্বরও জানেন না। আমি তোমাকে বলছি না ওকে মেরে ফেলতে, কিন্তু ও যাতে বেঁচে না থাকে তার ব্যবস্থা তো করতে পারো। আবার চুপচাপ। অর্জুন কান খাড়া করল। মহিলা হাসলেন, হ্যাঁ, একটা অ্যাক্সিডেন্টের আয়োজন করতে হবে। মারা যাওয়ার পর পুলিশ যেন সন্দেহ না করে!' আবার চুপচাপ। তারপর, ওয়েল, আমি তোমাকে কয়েকটি প্ল্যান দিতে পারি। বেস্ট যেটা সেটা কাজে লাগাও। আর হ্যাঁ, এটা ঘটাতে তোমাকে আমি দু'মাস সময় দিলাম। তার মধ্যে যদি বুড়ি না মরে তা হলে তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না। বাই! এবার একটু ঘুমোতে যাই।

অবাক হয়ে দেখল অর্জুন। পা থেকে মাথার চুল চাদরের আড়ালে ঢাকা, একটুও না নড়ে মহিলা যে কথাগুলো বললেন তা রীতিমত ভয়ংকর। যাকে ফোন করে বৃদ্ধাকে মেরে ফেলতে বলছেন, না মারলে একটা পয়সাও পাওয়া যাবে না, সে নিশ্চয়ই পুরুষ। বৃদ্ধা নিশ্চয়ই লোকটার আত্মীয় হন। এই মহিলার মুখ দেখতে ইচ্ছে করছিল খুব। এই মুহূর্তে পৃথিবীর কত মানুষ তো খুনের পরিকল্পনা করছে, সে কী করতে পারে! কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট মনে হবে অথচ মারা যাবে এমন প্ল্যান যে দিতে পারে, তার মুখ দেখতে খুব ইচ্ছে। করছিল। চাদর সরিয়ে মুখ দেখা যাবে না। মহিলা চিৎকার করলে পুলিশ তাকে জেলে পুরবে। কেন চাদর তুলেছিল তা বললেও পুলিশকে প্রমাণ দিতে না পারায় বিশ্বাস করাতে পারবে না। অবশ্য ধৈর্য ধরে জেগে থাকলে মহিলা যখন ঘুম থেকে উঠবেন তখন দেখা যেতে পারে। কিন্তু ততক্ষণ ধৈর্য ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। অর্জুন লক্ষ করল, ওই ডিভানের পাশে একটা ট্রলির উপর সুটকেস চাপানো আছে। হ্যান্ডব্যাগ হিসেবে ওটা নিয়ে প্লেনে ওঠা যায়। সে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ট্রলিটাকে একটু ঘুরিয়ে বেশ জোরে ঠেলে দিয়ে নিজের ডিভানে শুয়ে পড়ল।

শোওয়ামাত্র ট্রলিটা ধাক্কা খেল দেওয়ালে। শব্দ হল বেশ জোরে। অর্জুন চোখ অর্ধেক খুলে দেখল, চাদর সরিয়ে যে মেয়েটি উঠে বসেছেন তাঁর চুল সোনালি। ডিভান থেকে নেমে মেয়েটি ছুটে গিয়ে ট্রলিটা ধরে চারপাশে তাকালেন। চারপাশের মানুষ যেভাবে ঘুমোচ্ছে তাতে কাউকে সন্দেহ করার সুযোগ তিনি পাচ্ছেন না। চাপা গলায় মেয়েটি বললেন, হু ডিড ইট?

ততক্ষণে ওর মুখ দেখা হয়ে গিয়েছে। লাবণ্য নেই এক ফোঁটাও, মুখের গড়ন বেশ কাটকাট, অসুন্দরী বলা যাবে না। যে পাশে ট্রলি ছিল তার ওপাশের ঘুমন্ত লোকটির কাছে গিয়ে মেয়েটি কিছু বলতে গিয়ে ইতস্তত করলেন। তারপর ট্রলিটাকে নিজের ডিভানের গায়ে এনে একটা পা তার উপর তুলে দিয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলেন।

যে মুখে লাবণ্য নেই, ঠিকঠাক মুখের গড়নের উপর টানটান চামড়া থাকে, সেই মহিলারা নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। সেই বৃদ্ধার জন্যে কষ্ট হল অর্জুনের। তিনি কোন দেশে আছেন তা জানা নেই।

কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্টের পরিকল্পনা হচ্ছে তার জন্যে, সেটা ঠিকঠাক হলে তিনি আর পৃথিবীতে থাকবেন না।

লম্বা একটা ঘুম দিয়ে অর্জুন দেখল, পাশের ডিভানে একটা মোটাসোটা আফ্রিকান ভদ্রলোক শুয়ে আছেন। সেই মেয়েটি নেই। সে যখন ঢুকেছিল তখন যারা ঘুমিয়েছিল তাদের অনেকেই এখন প্লেনের পেটে বসে আছে।

সে টয়লেট থেকে বেরিয়ে পা বাড়াতেই শুনতে পেল, এই যে, একটা বুদ্ধি দিন তো!

মুখ ফিরিয়ে রেস্টুরেন্টে খাবার নেওয়া মহিলাকে দেখতে পেল অর্জুন। মহিলা বললেন, এরকম বদখত মহিলা আমি জীবনে দেখিনি। এখানে একটু ঘুমোতে এসেছিলাম। ঘুমিয়ে আবার ওই লাউঞ্জে ফিরে যেতে মহিলা বললেন নতুন ভাউচার লাগবে। তখন যেটা দিয়েছিলাম তাতে আট ঘণ্টা থাকা যেত। কিন্তু একবার বেরিয়ে বাইরে এক ঘণ্টা কাটালে পুরনো ভাউচার অকেজো হয়ে যাবে। অথচ আট ঘণ্টা শেষ হতে এখনও অনেক দেরি আছে।

যদি এটাই নিয়ম হয়ে থাকে তা হলে মানতেই হবে।

মানতেই হবে? নিয়মটা অমানবিক হলেও মানতে হবে? তা ছাড়া নিয়মটা করেছে কে? আপনার কি প্রতিবাদ করার ইচ্ছে হচ্ছে না? মহিলা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

প্রতিবাদ করলেও কোনও কাজ হবে বলে মনে হয় না?

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, ঠিক। আমি একটা ভুল ভেবেছি।

মানে?

আপনাকে আমি স্প্যানিশ ভেবেছিলাম। আপনি মোটেই তা নন। আপনি একশো ভাগ ভারতীয়? ভদ্রমহিলা আর দাঁড়ালেন না।

হকচকিয়ে গিয়েছিল অর্জুন। ভদ্রমহিলা তাকে ঘুরিয়ে গালিগালাজ দিয়ে গেলেন। এঁরা নিশ্চয়ই মনে করেন ভারতীয় মানে খুব দুর্বল, প্রতিবাদ করতে চায় না। অন্যায় মেনে নেয়। এরকম ধারণা কী করে হল কে জানে!

ডিউটি ফ্রি শপগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটা একটা বিরল অভিজ্ঞতা। পারফিউমের দোকানে গিয়ে তার চোখ ছানাবড়া। পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো ডলারের পারফিউম লোকে কিনছে। কর ছাড়া বিক্রি হচ্ছে বলে বাইরের চেয়ে এখানে বেশ সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে।

মাত্র একশো ডলার যার পকেটে তার উচিত শুধু দেখে যাওয়া। দোকানের সামনে একটি সুদৃশ্য গাড়ি দাঁড়িয়ে। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। এরকম চারটে দোকান থেকে জিনিস কিনলে যে রসিদ পাওয়া যাবে তার নাম্বার নিয়ে মাসে একবার লটারি হবে। লটারিতে রসিদের নাম্বার উঠলে এই গাড়ি পুরস্কার হিসেবে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ একটা পঞ্চাশ ডলারের পারফিউম কিনলে এক লক্ষ ডলারের গাড়িটার চাবি পকেটে আসতে পারে। কিন্তু অসম্ভব, পঞ্চাশ ডলার সে ইচ্ছে করলেও খরচ করতে পারবে না। অর্জুন দেখল, জিনিস। কিনে লোকেরা লাইন দিয়ে পাসপোর্ট বোর্ডিং কার্ড দেখিয়ে পেমেন্ট দিচ্ছে। তারপর যে যার গন্তব্যে উড়ে যাবে। ধরা যাক, লটারি হবে দিন দশেক পরে। যার নাম্বার সেই লটারিতে উঠবে সে হয়তো থাকে কুচবিহারে। পাসপোর্টের নাম্বার দেখে এরা কি তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে? না করলে তো সেই ভদ্রলোক কোনও দিন জানতেও পারবেন না। সে লক্ষ করল, পাসপোর্টের নাম্বারটাই ওরা রসিদে লিখছে, কোথা থেকে ইস্যু হয়েছিল, কোন তারিখে, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। শুধু ওই নাম্বার দেখে তোক কী করে খুঁজে পাবে কে জানে!

ঘুরতে ঘুরতে আবার অর্জুন ফিরে এল সেই জায়গায় যেখানে সে শুয়ে ছিল। এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক বাকি আছে প্লেন ছাড়তে। ভিতরে তাকিয়ে সে দেখল, ডিভানগুলো আবার ভরতি হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ দুবাইতে নেমে ডিভানগুলোতে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আবার বিভিন্ন প্রান্তে উড়ে যাচ্ছে।

এই সময় হন্তদন্ত হয়ে সেই সোনালি চুলের মেয়েটি কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গিয়ে যে ডিভানে শুয়ে ছিলেন তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে সেই আফ্রিকান ভদ্রলোক নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। মেয়েটি ডিভানের আশপাশ দেখলেন, ঝুঁকে নীচের দিকে তাকালেন। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে লোকটির কাঁধে টোকা দিয়ে কিছু বললেন। খুব বিরক্ত মুখে লোকটি মাথা নেড়ে আবার চোখ বন্ধ করল। সোনালি চুলের মেয়েটি যে খুব হতাশ হয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছিল। কাঁচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে তিনি অর্জুনের দিকে তাকালেন। কপালে ভাঁজ পড়ল। তারপর বললেন, এক্সকিউজ মি! আপনি আমার পাশের ডিভানে শুয়ে ছিলেন? নীরবে মাথা নাড়ল অর্জুন, হ্যাঁ।

আমি আমার সেলফোনটা হারিয়ে ফেলেছি। অথবা আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম তখন কেউ ওটা তুলে নিয়েছে। বাই এনি চান্স, আপনি কি ওটা দেখেছেন?

না। খুব দামি সেট বোধহয়?

নট দ্যাট। আজ এখানে এসে আমি একজনের সঙ্গে যে কথা বলেছিলাম তা রেকর্ড করে রেখেছিলাম। সেটা এক বৃদ্ধা মহিলাকে শোনানো খুব দরকার। সেই অর্থে ওই সেলফোনটার অনেক দাম। কী যে করি! সোনালিচুল ঠোঁট কামড়ালেন।

কমপ্লেন করুন।

করেছি। ওরা পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে অ্যানাউন্স করেছে। লাভ হয়নি। স্লান মুখে বললেন মেয়েটি।

কিছু মনে করবেন না। আপনি বলছেন, একজনের সঙ্গে যা কথা বলেছেন তা রেকর্ড করেছেন একজন বৃদ্ধাকে শোনাবেন বলে। এটা পরে আবার করতে পারেন না?

না। ও নেশার ঘোরে যা বলেছে তা স্বাভাবিক অবস্থায় বলবে না। উলটে সন্দেহ করবে।

ও। উনি নিশ্চয়ই এই বৃদ্ধার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছেন?

হঠাৎ সোনালিচুল ঘুরে দাঁড়ালেন, আপনার এত কৌতূহল কেন?

আমার মনে হচ্ছে আপনি বৃদ্ধাকে সতর্ক করে দিতে চান।

হ্যাঁ। কিন্তু আপনার এটা মনে হচ্ছে কেন?

সেলফোনটা আপনি খুঁজছেন, না পেয়ে আপসেট হচ্ছেন সেই কারণে। আপনি ওই বৃদ্ধাকে সতর্ক করবেন কেন? নিশ্চয়ই তাঁর বিপদ হতে পারে। কেউ তাঁকে খুন করতে পারে অথবা একটা অ্যাক্সিডেন্টের বাহানা তৈরি করে মেরে ফেলতে পারে। অতএব ওই বৃদ্ধা যেন লোকটিকে বিশ্বাস না করেন। সেটা করবেন না ওঁর নিজের গলায় বলা কথাগুলো শুনলে। ভুল বলছি?

আপনি কে?

আমি একজন টুরিস্ট।

হঠাৎ চোখ বড় হল সোনালিচুলের, বুঝতে পেরেছি। আমি কাল সেলফোনে যা বলেছি তা পাশের ডিভানে শুয়ে আপনি শুনতে পেয়েছেন?

অত জোরে কথা বললে কান বন্ধ রাখব কী করে?

তা হলে বুঝতেই পারছেন ওই সেলফোনটা পাওয়া কত জরুরি।

নিশ্চয়ই। সেটা যখন পাচ্ছেন না তখন এখনই ওই বৃদ্ধাকে ফোনে সব কথা খুলে বলুন। বেশি দেরি করবেন না।

কেন?

ভদ্রলোকের মুখ থেকে কথা বের করতে গিয়ে আপনিও তো কম কিছু বলেননি। শুধু ওই কথাগুলো বলার জন্যে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। আপনি যেমন রেকর্ড করে রেখেছেন, তেমনই উনিও আপনার কথা রেকর্ড করে রাখতে পারেন। বৃদ্ধাকে শুনিয়ে তার কাছের লোক হয়ে যেতে পারেন, যা আপনি হতে চাইছেন। উনি বৃদ্ধার কাছে পৌঁছোবার আগেই ফোনটা করে ফেলুন।

অর্জুনের কথা শেষ হতেই থ্যাঙ্ক ইউ, বলে সোনালিচুল ছুটে গেলেন দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো ফোনগুলোর দিকে। তখনই আকাশবাণী হল, নিউ ইয়র্কগামী এমিরেটসের প্লেন আঠাশ নাম্বার গেট থেকে উড়বে। প্যাসেঞ্জারদের সিকিউরিটি চেকিং-এর জন্যে যেতে বলা হচ্ছে।

অনেকটা পথ হেঁটে আঠাশ নাম্বার গেটে পৌঁছোতেই পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা শোনা গেল, মিস লিজা ক্লিন্টন, দয়া করে এনকোয়ারিতে চলে আসুন। আপনার সেলফোন লেডিস টয়লেটে পাওয়া গিয়েছে।

অর্জুন সোনালিচুলের মুখ অনুমান করল। যদি এর মধ্যে বৃদ্ধার সঙ্গে তাঁর কথা হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে এখন ছুটছেন সেলফোন ফিরিয়ে নিতে। বৃদ্ধার মৃত্যুর জন্যে যিনি দু'মাসের বেশি অপেক্ষা করবেন না বলেছিলেন, তিনিই আজ বৃদ্ধাকে সতর্ক করছেন। এরকম অভিজ্ঞতা অর্জুনের আগে হয়নি।

দুবাই থেকে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার পথে কোথাও নামছে না প্লেন। যত উড়ছে তত সময় পিছিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণে কলকাতায় রাত নেমে যাওয়ার কথা, কিন্তু এখানে এখনও দুপুর। সারা আকাশ জুড়ে সূর্য। সাদা মেঘ নীচে থাকায় পৃথিবীটা দেখা যাচ্ছে না। নিউ ইয়র্কে এখন বোধহয় রাত শেষ হয়নি। চোখ বন্ধ করলেও ঘুম আসছিল না। অথচ আশপাশের মানুষগুলো নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। পৃথিবীর আকাশের অন্তত পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে এই প্লেনটা যেন একটা ছোটখাটো পৃথিবী হয়ে আছে। চিনে ভদ্রলোকের পাশে আফ্রিকান, জাপানির পাশে আরবের, আমেরিকানের পাশে বাংলাদেশের মানুষ।

টয়লেটে যাওয়ার জন্যে প্যাসেজে পা রাখল অর্জুন! দুটো দরজাতেই 'অকুপায়েড' শব্দটা জ্বলছে। একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে দু'পাশে তাকাল। একমাত্র প্লেনের নম্র গর্জন ছাড়া কোনও শব্দ নেই। সামনের দরজাটা খুলে যেতে সে একটু সরে দাঁড়াল, যাতে বেরিয়ে আসা মানুষটি স্বচ্ছন্দে যেতে পারে।

আরে! আপনি এখানে?

অর্জুন তাকাল। অবাক হয়ে প্রশ্ন করছেন দুবাই এয়ারপোর্টের সোনালিচুল।

এমিরেটসে নিউ ইয়র্ক যেতে হলে এই ফ্লাইটে যেতে হবে।

আপনি নিউ ইয়র্কেই যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

নিশ্চয়ই আপনি আমাকে অনুসরণ করবেন না?

কোন দুঃখে! মেয়েটি বেরিয়ে আসায় চটপট ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল অর্জুন। টয়লেটের ভিতরটা বেশ ছোট কিন্তু তার মধ্যেই সব বন্দোবস্ত রয়েছে। মিনিট আড়াই পর সে বেরিয়ে আসতেই দেখল, সোনালিচুল নিজের সিটে না ফিরে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

আপনি কোথায় বসেছেন?

ওই ওপাশে।

আপনার সঙ্গে তো হ্যান্ডব্যাগ ছিল না?

না।

আমার পাশের সিট খালি আছে। আপনি যদি এসে বসেন তা হলে আমরা কথা বলতে পারি। আমার আর টিভি দেখতে ভাল লাগছে না।

এক মুহূর্ত ভেবে অর্জুন মাথা নাড়ল, তারপর মেয়েটিকে অনুসরণ করল। এই ফ্লাইটের প্রত্যেক আসনের সামনে একটা ছোট টিভি মনিটর রয়েছে, যেটা সামনের সিটের পিছনে লাগানো। হেডফোন ব্যবহার করে তার সংলাপ শুনতে হয়।

পাশাপাশি তিনটে সিটের দুটোই খালি। সোনালিচুল জানলার পাশে বসলে অর্জুন মাঝখানের সিট ছেড়ে তৃতীয়টিতে বসল।

আপনি কেন আমেরিকা যাচ্ছেন?

বেড়াতে।

ও। আমি লিজা ক্লিন্টন।

একটু আগে আপনার নাম দুবাই এয়ারপোর্টের সবাই শুনেছে। আপনি আপনার সেলফোন ফিরে পেয়েছেন। আমি অর্জুন।

অ-র-জু-ন?

অর্জুন হাসল, ও কে!

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে লিজা বলল, ফোনটা ফিরে পেয়ে কোনও লাভ হল না।

কেন? আপনি তো সেই বৃদ্ধাকে শোনাতে পারবেন!

জানি না পারব কিনা! উনি এখন হাসপাতালে!

হাসপাতালে? চমকে তাকাল অর্জুন।

আপনার পরামর্শ যদি কয়েক ঘণ্টা আগে পেতাম তা হলে ভদ্রমহিলাকে দুর্ঘটনায় পড়তে হত না। সাবধান করে দিতাম। বিষণ্ণ মুখে বললেন লিজা।

দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল?

জানি না। কেউ একজন ফোন ধরেছিল। বলল, আধ ঘন্টা আগে ওঁর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এইটুকু বলে লাইন কেটে দিল। এখন কী হবে?

অর্জুন মাথা নাড়ল, আপনি এখন বিপদে পড়েছেন।

কেন?

দুর্ঘটনা ঘটার আগেই যদি আপনি বৃদ্ধাকে সব জানিয়ে সতর্ক করে দিতেন, তা হলে আপনার দিকটা পরিষ্কার হয়ে যেত। কিন্তু তা যখন পারেননি, মানে, সুযোগ পাননি, তাই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বৃদ্ধাকে খুন করার জন্যে পরামর্শ দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। অর্জুন বলল।

ও মাই গড। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন লিজা, আমি ওই সব বলে ওকে তাতাচ্ছিলাম যাতে ও মনের কথা বলে ফেলে এবং বৃদ্ধা ওর আসল চেহারাটা বুঝতে পারেন।

এই লোকটির সঙ্গে আপনার কীরকম সম্পর্ক?

ও ওই বৃদ্ধার ভাইয়ের ছেলে। আমাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু ওর রোজগার খুব কম। অথচ বৃদ্ধা খুব ধনী। তার মৃত্যুর পরে ওই সব পেয়ে যাবে। কিন্তু আমার একটুও পছন্দ নয় ওকে। অনেক বলেছি কিন্তু শুনতে চায়নি। শেষে আমি বললাম, বৃদ্ধার মৃত্যু কবে হবে আর তারপর সে । সম্পত্তি পাবে। আমি এর মধ্যে নেই। তখন সে চাইল বৃদ্ধাকে সরিয়ে দিতে। আমি অবাক হয়ে গেলাম। ওর চেহারাটা চিনলাম। মুখে বললে বৃদ্ধা বিশ্বাস করবেন না, ওর কথাগুলো তাই সেলফোনে রেকর্ড করে রাখলাম। কিন্তু ও যে এত তাড়াতাড়ি কাজে নেমে পড়বে ভাবিনি। চোখ মুছলেন লিজা।

প্রার্থনা করুন যাতে বৃদ্ধা সুস্থ হয়ে ওঠেন। অর্জুন বলল, আর এমনও তো হতে পারে, ওই লোকটি এই দুর্ঘটনা তৈরি করেনি? বৃদ্ধার দুর্ঘটনার পিছনে কারও কোনও পরিকল্পনা ছিল না। এটা নিছকই দুর্ঘটনা?

লিজা দুটো হাত বুকের উপর জড়ো করে চোখ বন্ধ করলেন। ওঁর ওই প্রার্থনার ভঙ্গি দেখে ধীরে ধীরে উঠে নিজের জায়গায় ফিরে এল অর্জুন। এয়ারহোস্টেস এগিয়ে এল, আপনি কি হিন্দু মিল নেবেন?

অর্জুন মাথা নেড়ে বলল, যা ইচ্ছে দিন।

.

০২.

জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে নেমে অন্য যাত্রীদের পিছন পিছন হেঁটে এসে ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়াল অর্জুন। বেশ বড় লাইন। এই সময় অন্য দেশ থেকে যেসব প্লেন এসেছে তাদের যাত্রীরাও লাইনে রয়েছে। প্রায় একঘণ্টা দাঁড়াবার পর সে অফিসারের সামনে পৌঁছে পাসপোর্ট বাড়িয়ে দিল। ভদ্রলোক তার পাতা উলটে ভিসা দেখে একটা যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করে জিজ্ঞেস করলেন, দ্বিতীয়বার কেন আসা হচ্ছে?

অর্জুন এবার মেজরের চিঠি এগিয়ে দিল, এই ভদ্রলোক খুব অসুস্থ, আমাকে দেখতে চেয়েছেন। আমার টিকিট, ভিসার খরচ উনিই দিয়েছেন।

আপনার পেশা কী?

আমি সত্য-সন্ধান করি।

কোন সত্যের সন্ধান এখানে করবেন?

আমার কাজের জায়গা ভারতবর্ষ। এখানে আমি একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে এসেছি। আপনাদের কলকাতার কনসুলেট এসব কথা জানে।

সত্যি কথা বলার জন্যে ধন্যবাদ। দয়া করে তেমন কোনও পরিস্থিতি হলে নিজে কিছু করবেন না। পুলিশকে খবরটা দিলেই আপনার কর্তব্য শেষ। ছাপ মেরে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে অফিসার বললেন, আপনার দিনগুলো ভাল কাটুক।

ঘুরন্ত বেল্ট থেকে সুটকেসটা খুঁজতে গলদঘর্ম হল অর্জুন। কয়েকশো সুটকেস পরপর সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রত্যেকটাকেই তার নিজের বলে মনে হচ্ছিল। দু'বার হাত বাড়িয়েও গুটিয়ে নিয়েছে সে। তৃতীয়বার ঘোরার পর সে লক্ষ স্থির রাখতে পারল। চাকা লাগানো বলে ট্রলির দরকার হল না। কাস্টমের গ্রিন চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখল, প্রচুর মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন পরিচিত যাত্রীর জন্যে। কারও কারও হাতে নাম লেখা প্ল্যাকার্ড। মেজরের পক্ষে নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টে তাকে নিতে আসা সম্ভব নয়। ম্যানহাটনে যে ফ্ল্যাটে মেজর থাকতেন সেই জায়গাটা অর্জুনের চেনা। কিন্তু এই সুটকেস নিয়ে যেতে হলে ট্যাক্সি করতে হবে। হয়তো তার পকেটের অর্ধেক ডলার বেরিয়ে যাবে ভাড়া দিতে। কিন্তু মেজর নাকি সেই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে এসেছেন কুইন্সে। জায়গাটা নাকি এয়ারপোর্ট থেকে বেশি দূরে নয়। ট্যাক্সির ভাড়া নিশ্চয়ই ম্যানহাটনের চেয়ে কম হবে।

আর ইউ অর্জুন?

প্রশ্নটা শুনে তাকাল সে। একটি অল্পবয়সি কালো ছেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটির মুখে বেশ মিষ্টি সারল্য রয়েছে। অর্জুন মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াল ছেলেটি, মাই নেম ইজ মার্টিন। মিস্টার মেজর আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

হাতে হাত মিলিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?

পকেট থেকে একটা ফোটো বের করল মার্টিন, মিস্টার মেজর এটা আমাকে দিয়েছিলেন। বলেছেন, আপনার মুখ বোধহয় পালটায়নি। এটা তো বেশ কয়েক বছর আগের ফোটো। আপনি যখন এখানে এসেছিলেন। মিস্টার মেজর ভুল বলেননি।

কোনও কোনও মানুষকে প্রথমবার দেখলেই ভাল লেগে যায়। মার্টিনকেও ভারী পছন্দ হল অর্জুনের। মার্টিন বলল, আপনার সুটকেসটা তেমন ভারী নয়, তলায় চাকাও আছে। আপনি যদি খুব টায়ার্ড না হন তা হলে আমরা বাসেই যেতে পারি। ট্যাক্সির ভাড়া বেঁচে যাবে।

বাস কোথায় পাওয়া যাবে?

সুটকেসের স্ট্র্যাপটা অর্জুনের হাত থেকে নিয়ে মার্টিন ওটাকে টেনে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। তখনই একটা বাস সেখানে পৌঁছোতে মার্টিন তাকে ইশারা করে সুটকেস সমেত উপরে উঠে গেল। অর্জুন দেখল, মার্টিন ড্রাইভারকে ভাড়া দিচ্ছে। টিকিট নিয়ে বাসের ভিতরে ঢুকে মার্টিন হাসল। একদম ফাঁকা বাস। মনে হচ্ছে এই বাসটার মালিক আমরা।

পাশে বসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, কত ভাড়া দিলেন?

যা-ই দিয়ে থাকি, আমার পকেট থেকে দিইনি। মিস্টার মেজর আমাকে আপনার ট্যাক্সি ভাড়াও দিয়েছিলেন। ওঁকে অনেক ডলার ফেরত দিতে পারব।

বাস চলতে শুরু করেছে। অর্জুন জানলার বাইরে তাকাল। প্রথমবারের আসার স্মৃতি এখন মেলাতে পারছে না। এয়ারপোর্ট সাধারণত শহরের বাইরে হয়। অতএব শূন্য মাঠ, চমৎকার রাস্তা ছাড়া দেখার কিছু নেই। আকাশের দিকে তাকাল অর্জুন। জলপাইগুড়ির আকাশের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। হঠাৎ মাথায় ভাবনাটা এল। কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় আমেরিকা। মাঝখানে কয়েকটি সমুদ্র। সূর্য থেকে ছিটকে আসা এই গ্রহ শীতল হয়ে যাওয়ার পর সহস্র বছর লেগেছিল অ্যামিবা থেকে মানুষে পৌঁছোতে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষের বনমানুষদের বংশধর যেমন মানুষ হয়েছে তেমনই এই আমেরিকায়ও একই প্রক্রিয়া কাজ করেছে। অথচ আমেরিকা আবিষ্কার করার আগে বাকি পৃথিবীর মানুষ এখানকার কথা জানতই না। আর এখন অতলান্তিক পেরিয়ে চলে আসতে আট ঘণ্টা খরচ হয়। প্রশ্ন হল, বনমানুষ থেকে মানুষ হয়ে ভৌগোলিক পরিমণ্ডল অনুযায়ী চেহারা, আচরণ এবং পরবর্তীকালে নিজস্ব ভাষা তৈরি হলেও এই আলাদা আলাদা দ্বিপদ জীবনের মধ্যে অনেক ব্যাপারে মিল থেকে গেল কী করে?

বাস থেকে নেমে অর্জুনের চোখ জুড়িয়ে গেল। ছবির মতো বাড়ি, রাস্তা। ম্যানহাটনের মতো আকাশছোঁয়া বাড়ি এখানে নেই। চওড়া পরিষ্কার রাস্তায় গাড়ি চলছে খুব কম। মিনিট পাঁচেক হেঁটে একটা তিনতলা বাড়ির সামনে পৌঁছে মার্টিন বলল, এই বাড়িটা মিস্টার মেজরের।

অর্জুন দেখল সুন্দর বাড়ির সামনে ফুটপাতে একটা লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছ দাঁড়িয়ে আছে। মার্টিন ডোরবেল বাজাল। কয়েক সেকেন্ড পর স্পিকারে। গলা ভেসে এল, ইয়েস!

মার্টিন বলল, মিস্টার মেজর, উই আর হিয়ার।

বলমাত্র দরজায় শব্দ হল। মার্টিন হাতল ঘোরাতেই সেটা খুলে গেল। অর্জুনের মনে হল এই ব্যাপারটা দেশে চালু করলে খুব ভাল হয়। তা হলে দরজা খোলার জন্যে বারবার উপর-নীচ করতে হয় না।

সুটকেসটা মার্টিনই টেনে তুলল। দোতলার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেজর। দু'হাত বাড়িয়ে তিনি অর্জুনকে তার বুকে টেনে নিলেন। অর্জুন বুঝতে পারল মেজর আরও মোটা হয়েছেন।

আলিঙ্গনের পর অর্জুনের দু'কাধ ধরে মেজর বললেন, আমি খুব খুশি আমার অনুরোধ রেখেছ বলে। এখন বলো, কেমন আছ?

আমি ভাল আছি। আপনার শরীর কেমন?

সব ছেড়ে বসে আছি, কোনও পিছুটান নেই, যেই ডাক আসবে চলে যাব।

কোথায়?

মেজর হাত তুলে উপরের দিকটা দেখালেন।

অর্জুন হাসল, আপনি কী করে জানলেন উপরেই যাবেন। ওটা নীচে বা পাশেও হতে পারে। অথবা কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, মৃত্যুর পর মানুষের সব অস্তিত্ব মিলিয়ে যায় বাতাসে।

ভাল বলেছ। কিন্তু আর নয়। চলো, তোমাকে তোমার ঘর দেখিয়ে দিই। স্নান করে পেট ভরে খেয়ে নিয়ে একটা লম্বা ঘুম দাও। অনেকটা পথ এসেছ, জেট ল্যাগ হয়ে গেলে কষ্ট পাবে। মেজর ওর হাত ধরে ওপাশের যে ঘরে নিয়ে গেলেন সেটি চমৎকার সাজানো। মেজর বললেন, দ্যাখো, পছন্দ হয়েছে?

চমৎকার। এই বাড়িটা কবে কিনেছেন?

বছরখানেক হল। ম্যানহাটনের আকাশছোঁয়া বাড়ির ফ্ল্যাটে থেকে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। মাটিতে হাটাহাটি করা ওখানে সম্ভব নয়। ম্যানহাটনে জীবন চব্বিশ ঘণ্টা এত জোরে ছোটে যে, তার সঙ্গে তাল রাখার বয়স আমার চলে গিয়েছে। তাই চলে এলাম এখানে। ওই দ্যাখো, ওটা একটা চাপাগাছ। আমাদের

দেশের চাপা নয়, চাপার মতো দেখতে বলে আমি নাম দিয়েছি চাপাগাছ। তার পাশে দেবদারু। এই দুটো গাছে থাকতে খুব ভালবাসে কাঠবিড়ালিরা। এর মধ্যেই ওরা আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছে। রোজ ভোরে আর বিকেলবেলায় ওদের চিনেবাদাম খাওয়াতে হয়। আর এই পাড়াটা দ্যাখো। একদম ছবির মতো, কোনও বাড়িই চারতলা নয়। মেজরকে খুব তৃপ্ত দেখাচ্ছিল।

এই সময় মার্টিন কাছে এল। হেসে বলল, আপনি বলছিলেন অর্জুন খুব টায়ার্ড?

ও হো! নিশ্চয়ই। যাও অর্জুন, চেঞ্জ করে একটা শাওয়ার নিয়ে নাও। তারপর কিছু খেয়ে লম্বা ঘুম দাও। পরে গল্প করব। অর্জুনের পিঠ চাপড়ালেন মেজর।

স্নান সেরে পোশাক বদলাতে বদলাতে অর্জুনের মনে হল, মেজরের স্বভাবের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আগের মতো কথায় কথায় রেগে যাওয়া, সেই ডোন্ট কেয়ার ভাবটা একদম নেই। পাকা দাড়ি, টাক পড়ে যাওয়া মাথায় এখন ওঁকে বেশ স্নেহশীল দাদু ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না।

.

০৩.

অর্জুনের ঘুম ভাঙল বিকেল চারটে নাগাদ। মুখ ধুয়ে পোশাক পালটে সে ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। মূল দরজার বাইরে মোড়া পেতে বসে আছেন মেজর। দুটো হাত সামনে বাড়ানো। তাতে প্রচুর চিনেবাদাম। আর, অর্জুন গুনল, ন'টা কাঠবিড়ালি তার কাধ থেকে হাতে নেমে এগিয়ে গিয়ে এক-একটা বাদাম তুলে নিয়ে লাফিয়ে নেমে খাচ্ছে। ওদের খাওয়ার ধরনটা চমৎকার। দুটো পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে উপরের দুটো পা। হাতের মতো ব্যবহার করে বাদাম খাচ্ছে। অজুর্ন নীচে নেমে আসতেই সব ক'টা কাঠবিড়ালি দুদ্দাড় করে সামনের গাছ দুটোয় উঠে গেল। অর্জুন বলল, সরি!

তোমাকে কখনও দ্যাখেনি তো! দেখলেই হবে না, তোমার গায়ের গন্ধ যতক্ষণ ওদের পছন্দ না হবে ততক্ষণ তোমাকে ওরা বন্ধু বলে ভাববে না। মার্টিনকে তো রোজ দেখছে, কিন্তু ওই কারণে ওকে পছন্দ করে না। হাসলেন মেজর।

মার্টিন কোথায়?

ও কাজে গিয়েছে। তোমাকে আনতে হবে বলে ও ডিউটি বিকেলের শিটে করে নিয়েছিল। কেন? চা খাবে? চলো, করে দিচ্ছি।

না না, আপনি বসুন। আমি চা করছি।

তুমি করবে? লাস্ট কবে চা বানিয়েছ?

এটা তো সুক্তো রান্না নয়! আমি করছি, খেয়ে বলবেন।

অর্জুন উপরে উঠে গেল। কিচেনে ঢুকে সে বেশ ঘাবড়ে গেল। গ্যাস আছে, পাশে জলের ব্যবস্থা। ওপাশে সিঙ্ক। কিন্তু উপরে দুটো তাকে অন্তত গোটা তিরিশেক কৌটো পরপর সাজানো আছে। প্রথমটা খুলতেই পাঁচফোড়ন দেখা গেল। কোনওটায় চা আছে, কোনওটায় চিনি। তা বের করতে হলে তো সব ক'টাই খুলে দেখতে হবে। দ্বিতীয় তাকে হাত না দিয়ে গ্যাসের সামনের কৌটো খুলতেই টি-ব্যাগ পেয়ে গেল অর্জুন। পাশেরটায় চিনি। তার পরেরটায় লবণ। জিভে স্বাদ নিয়ে ও দুটোকে আলাদা করতে হল।

অর্জুন ব্যালকনিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি চায়ে চিনি খান?

কথা না বলে মাথা নেড়ে 'না' বললেন মেজর। কারণ, এখন তাঁর শরীর জুড়ে কাঠবিড়ালিরা খেলা করছে। অর্জুনের মনে হল, কাঠবিড়ালিরা মেজরকে একটা ছোট্ট গাছ বলে ভেবে নিয়েছে। ম্যানহাটনের আকাশচুম্বী বাড়ির ফ্ল্যাট ছেড়ে এখানে চলে এসে মেজর বেশ ভাল আছেন।

চায়ের ডাক পেয়ে মেজর উপরে চলে এলেন। চুমুক দিয়ে বললেন, বাঃ!

গুছিয়ে বসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, এবার বলুন, জরুরি তলব কেন?

কৈফিয়ত চাইছ নাকি? মেজরের চোখ ছোট হল।

না না। স্রেফ কৌতূহল।

তোমাকে অনেক দিন দেখিনি। মন টানছিল। আরে বয়স হয়েছে তো! তাই তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হল। ও হ্যাঁ, আগামীকাল আমি শ্রাদ্ধ করব।

শ্রাদ্ধ? কার?

মেজর হাসলেন, আত্মীয়স্বজন যখন নেই, তখন নিজের শ্রাদ্ধ নিজেকেই করতে হবে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরে এই দাড়ির মায়া কাটাতে হবে।

তার মানে আপনি কাল দাড়ি কামাবেন, ন্যাড়া হবেন? হকচকিয়ে গেল অর্জুন। দাড়ি ছাড়া মেজরকে ভাবাই যায় না। না জানলে দেখে চিনতে পারবে না।

মেজর হাসলেন, আমি চলে গেলে আমার শ্রাদ্ধ করার জন্যে কেউ থাকবে না। হিন্দু বাবা-মায়ের সন্তান যখন, তখন কাজটা নিজেই করে যাই। কেন করছি জানো? একটু-একটু করে মায়া কাটাতে চাই। আয়নায় দাড়ি গোঁফহীন মুখ দেখে ভাবব, এটা আমি নই। ব্যস, মায়া কমে যাবে।

অর্জুন বলল, কিছু মনে করবেন না, এটা একদম ছেলেমানুষি।

ঠিক তখনই ডোরবেল বাজল। মেজর উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে খুশি-গলায় বললেন, হাই জিম! চাবিটা নাও।

দড়িতে বাঁধা চাবি উপর থেকে নীচে ফেলে দিলেন মেজর। নীচের দরজাটা খুলে গেল। দড়ি উপরে তুলে রেখে অর্জুনের সামনে চলে এলেন, তোমার সঙ্গে খুব ইন্টারেস্টিং একজন মানুষের আলাপ করিয়ে দিচ্ছি! ওর নাম জিম ব্রাউন।

ততক্ষণে জিম উপরে উঠে এসেছেন। অর্জুন দেখল ভদ্রলোককে। মেজরের সমবয়সি।

অর্জুনের দিকে তাকিয়ে জিম জিজ্ঞেস করলেন, এর কথা তুমি বলেছিলে?

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে মেজর তাকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। জিমকে খুব হতাশ দেখাল। ধপ করে সোফায় বসে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন তিনি। তারপর বললেন, লুক মেজর, তুমি ব্যাপারটাকে যে এত হালকাভাবে দেখবে তা আমি ভাবিনি।

কী থেকে এখন ওটা ভাবছ জিম?

তুমি এতদিন আমাকে ভরসা দিচ্ছিলে ইন্ডিয়া থেকে তোমার কাছে এমন একজন আসছেন যিনি আমার সমস্যার সমাধান করে দেবেনই। একজন ইন্ডিয়ান ট্রুথ-ইনভেস্টিগেটর কী করে আমেরিকায় এসে প্রবলেম সলভ করবেন তা নিয়ে আমার সন্দেহ ছিল। তবু ভেবেছিলাম, মানুষটি নিশ্চয়ই অনেক অভিজ্ঞ। লাইক জেমস বন্ড। বন্ড নিজে ব্রিটিশ হলেও হংকং-এ গিয়ে প্রবলেম সল্ভ করেছিলেন। জিম হাত নাড়লেন, কিন্তু এ তো কমবয়সি ছেলে! মাস্ট ইন মিডটোয়েন্টিস। এ কী করবে?

জিম, তুমি আলেকজান্ডারের নাম শুনেছ?

তুমি ওকে চিনলে কী করে? আমার সহকর্মী ছিল কিন্তু!

আমি গ্রিক সেনাপতি আলেকজান্ডারের কথা বলছি। ও হো, তোমাদের এখানে তো ইতিহাস ভাল করে পড়ায় না। গ্রিস থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষে গিয়ে অনেকটা জায়গা জয় করেছিলেন সেই ভদ্রলোক। আর তাঁর বয়স তিরিশও হয়নি। এত তাড়াতাড়ি মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ো না জিম। অবশ্য তুমি যদি না চাও তা হলে অর্জুনকে আমি অনুরোধ করব না। শান্ত গলায় বললেন মেজর।

চশমা খুললেন জিম, ওয়েল, আমি জিম, জিম ব্রাউন। অর্জুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

করমর্দন করে অর্জুন বলল, আমি অর্জুন।

অ-র-জুন!

হেসে ফেলল অর্জুন, বেশ কাছাকাছি।

এই ভদ্রলোক কী তোমাকে আমার সমস্যার কথা বলেছেন? হাত তুলে মেজরকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন জিম।

অর্জুন কিছু বলার আগেই মেজর মুখ খুললেন, না বলিনি। তোমার সমস্যার কথা তুমি যেভাবে বলবে আমি তা পারব না।

থ্যাঙ্ক ইউ। অনেক দিন পরে তুমি বিচক্ষণতা দেখালে। কিন্তু অ-র-জুন, তুমি এই নিউ ইয়র্ক শহরটাকে ভাল করে জানো কি?।

একবার এসেছিলাম। কয়েকটা দ্রষ্টব্য জায়গার কথা মনে আছে। অর্জুন বলল।

তা হলে? তোমার পক্ষে এখানে কী করে কাজ করা সম্ভব? জিম মাথা নাড়লেন।

আপনি একটু আগে জেমস বন্ডের কথা বললেন। সমস্যার সমাধান করতে হংকং-এ পা দেওয়ার আগে ওঁর কাছে একটা ছাপানো ম্যাপ ছাড়া কোনও ধারণা ছিল না। আমি তো ম্যানহাটন শহরটা মোটামুটি চিনি। অর্জুন হাসল।

হুম। জিম মেজরের দিকে তাকালেন, এটা ঠিক, বয়স কম বলে বুদ্ধি কম হবে এমন কোনও নিয়ম নেই।

বেটার লেট দ্যান নেভার। বুঝতে পারার জন্যে ধন্যবাদ। মেজর উঠে দাঁড়ালেন, এখন নিশ্চয়ই চা খেতে তোমার আপত্তি হবে না?

বিন্দুমাত্র না। কিন্তু আমার একটা প্রস্তাব আছে। জিম বললেন।

মেজর ঘুরে দাঁড়ালেন। জিম বললেন, চলো, আমরা তিনজন একটা চমৎকার রেস্তরাঁয় বসে ডিনার করে ফেলি।

প্রস্তাবটা যখন তুমি দিচ্ছ তখন বলব, নট এ ব্যাড আইডিয়া। মেজর হাসলেন, চলো হে অর্জুন।

৪-৫. জিম ব্রাউনের গাড়ি

০৪.

জিম ব্রাউনের গাড়িটি বেশ আরামদায়ক। জিম গাড়ি চালাচ্ছেন, পাশে মেজর। পিছনে বসে অর্জুন ভাবল, এত দামি গাড়ির মালিক হওয়া সত্ত্বেও জিম ড্রাইভার রাখেননি। গতবারই শুনেছিল অতিরিক্ত বিত্তবান না হলে এদেশে কেউ ড্রাইভারের খরচ মেটাতে পারে না। ভারতবর্ষ হলে জিম কখনও ড্রাইভারের সিটে বসতেন না।

এখন সন্ধে নামব নামব করছে। এই সময় ডিনারের কথা জলপাইগুড়িতে অতি নিয়মনিষ্ঠ মানুষও ভাবেন না। সাহেবদের ব্যাপারই আলাদা। মাঝরাতে খিদে নিশ্চয়ই ঘুম ভাঙাবে। আমেরিকায় গাড়ি চালানো কোনও কঠিন কর্ম নয়। ক্ল্যাচ নেই। ব্রেক আর অ্যাক্সিলেটারের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলেই হল। সেইসঙ্গে রাস্তার নিয়মটা জানতে হবে। জিম বোধহয় ম্যানহাটনের উলটো দিকে ওঁদের নিয়ে যাচ্ছেন। প্রচুর গাড়ি সামান্য ব্যবধান রেখে ছুটছে, লাল আলো দেখলেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এর আগেরবার সে পাতালরেলে বেশি ঘুরেছিল। তাতে তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছোনো যায় বটে, কিন্তু মাটির উপরের শহরটাকে চেনা যায় না।

বড় রাস্তা থেকে গাড়ি চলে এল সরু পথ ধরে যেখানে একটা বিশাল লেক, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে নামতেই নিয়ন সাইন চোখে পড়ল, ওয়াটার ফ্রন্ট রেস্টুরেন্ট।

জিম বললেন, চলো, এটা আমার প্রিয় জায়গা।

ওয়েটাররা জিমকে চেনে। পরম সমাদরে কাঁচের দেওয়ালের পাশে সাজানো টেবিলে একজন নিয়ে গেল ওঁদের। কাঁচের ওপাশেই জল। বেশ চওড়া এই জলাশয়ের উপরে আলো জ্বলছে পরপর। তার আলো পড়েছে। জলে। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। অর্জুন বলল, বিউটিফুল!

খুব খুশি হলেন জিম। জানলার ধারের দুটো চেয়ার মেজর এবং অর্জুনকে ছেড়ে দিয়ে বসে বললেন, আমি এখানে প্রায়ই ডিনার খেতে আসি। ওই জলের বুকে ভাসতে থাকা আলোগুলো দেখতে-দেখতে দিব্যি সময় কেটে যায়।

ওয়েটার এগিয়ে এলে জিম বললেন, তুমি কী নেবে? স্কচ অর বিয়ার? মেজর তো এখন এসব খায় না, আমরাই একটু খাই। কী বলো?

অর্জুন চমকে গেল। সে মেজরের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। যে মেজর পান না করে থাকতেন না, পকেটে চ্যাপটা ছোট বোতল সব সময় রাখতেন, তিনি অভ্যেসটা ছেড়ে দিয়েছেন? কী করে সম্ভব হল?

অর্জুনকে ওইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেজর বললেন, বুদ্ধিমান মানুষরা অবাক হয় না, প্রয়োজনে অবাক হওয়ার ভান করেন। কী খাবে বলে দাও।

কৌতূহল দমন করে অর্জুন জিমকে বলল, আমাকে একটা লেমন স্কোয়াশ দিতে বলুন। খুব বেশি ঠান্ডা যেন না হয়।

মাথা নেড়ে জিম ওয়েটারকে পানীয় এবং ডিনারের মেনু জানিয়ে বিদায় করে মেজরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি এখনই কাজের কথা শুরু করব?

মেজর বললেন, দেরি করার কি কোনও কারণ আছে?

জিম একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, না। আগে ডিনারটাই আরাম করে খাওয়া যাক। আমি কাল সকালে ওর সঙ্গে কথা বলব। তুমি কি আমার অফিসে আসতে পারবে? পকেট থেকে পার্স বের করে কার্ড এগিয়ে দিলেন জিম।

নিশ্চয়ই। অর্জুন বলল।

বাঃ। তা হলে সকাল এগারোটায় চলে এসো।

কার্ডে চোখ বুলিয়ে পকেটে রেখে দিল অর্জুন। ব্রুকলিনের ঠিকানা। জায়গাটা মেজরের বাড়ি থেকে কীভাবে যেতে হয় জেনে নিতে হবে।

ডিনার যখন মাঝামাঝি অবস্থায় তখন সেলফোন শব্দ করতে লাগল। বেশ বিরক্ত হয়ে সেটটাকে অন করে ওদিকের কথা না শুনে জিম বললেন, আমি এখন ডিনার টেবিলে। খুব দরকার হলে ঘণ্টাখানেক পর কল করবেন। লাইনটা কেটে দিলেন জিম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ওটা বেজে উঠল। জিম ফোনটা অন করলেন না। বেজেই চলেছে দেখে মেজর হাত বাড়িতে ওটা তুলে নিতে জিম বললেন, প্লিজ, আমাকে কথা বলতে বলবে না। লোকটি অভদ্র, এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারল না?

মেজর লাইনটা অন করে বললেন, হ্যালো! কে বলছেন?

জবাবটা তিনি শোনামাত্র লাউডস্পিকার অন করে দিলেন, সরি, কে বলছেন বললেন?

এবার গলা শোনা গেল, আমি সার্জেন্ট গোল্ডস্মিথ বলছি। আপনি এখনই আপনার বাড়িতে চলে আসুন। আপনার বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

শোনামাত্র মেজরের হাত থেকে সেলফোন ছিনিয়ে নিয়ে জিম ব্রাউন উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? কী দুর্ঘটনা ঘটেছে?

আপনি মিস্টার ব্রাউন?

অফকোর্স, আমি জিম ব্রাউন।

আপনার স্ত্রীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

আমি আসছি, এখনই আসছি। অফিসার, ও বেঁচে আছে তো?

এখন পর্যন্ত আমরা কোনও খারাপ খবর পাইনি।

সেলফোন অফ করে অর্জুনের দিকে তাকালেন জিম। খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল তাকে। ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছতে গিয়ে হাত কাপল। বললেন, আমাকে এখনই যেতে হবে। তোমাদের ডিনারটা নষ্ট করার জন্যে দুঃখিত। তোমরা খাওয়া শেষ করো। ওয়েটার! গলা তুলে ওয়েটারকে ডাকতে সে কাছে। এলে ক্রেডিট কার্ড এগিয়ে দিয়ে বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফর্মালিটিস শেষ করো। আমাকে যেতে হবে।

ওয়েটার কার্ড নিয়ে চলে গেলে মেজর বললেন, তোমার এই বিপদের সময় আমরা তোমার দেওয়া ডিনার খেতে পারি না জিম। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে কে আহত করল? কেনই বা করল?

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আজ এখানে ডিনার খাওয়ার প্ল্যান তো আগে ছিল না, থাকলে ওকে সঙ্গে নিয়ে আসতাম। ওর যদি... উঃ, আমি পাগল হয়ে যাব। আমি কল্পনা করতে পারছি না মেজর! উঠে দাঁড়ালেন জিম ব্রাউন।

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। এবার সে মেজরকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ওঁর বাড়িতে যাবেন? আমার মনে হচ্ছে যাওয়া দরকার।

মেজর আপত্তি করলেন না। জিমের একটু কুণ্ঠা ছিল। তার মনে হচ্ছিল, একে তো রাতের খাওয়া নষ্ট হল, তার উপর অত দূরে নিয়ে যাওয়া মানে কষ্ট দেওয়া। কিন্তু অর্জুনের কথা শুনে না বলতে পারলেন না।

মেজরের অনুরোধে স্পিড বাড়াতে গিয়েও বাড়ালেন না জিম। তার মনে হচ্ছিল, যত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছোতে পারবেন তত মঙ্গল। কিন্তু মেজর মনে করিয়ে দিলেন, এখন জিমের আস্তে গাড়ি চালানো উচিত। মনের উপর যে চাপ পড়েছে তা সামলে জোরে চালালে বিপদ ঘটতে পারে।

অর্জুন দেখল, নিউ ইয়র্কে এখন রাত নেমেছে। নানান ধরনের গাড়ি ছুটছে। কিন্তু রাস্তা শব্দহীন। কোনও গাড়ি থেকেই হর্নের আওয়াজ বের হচ্ছে না। দেশের ড্রাইভাররা যে কেন এটা শেখে না? হঠাৎ তার চোখ বড় হল। অন্ধকারেও সে বুঝতে পারল, তারা একটা সমুদ্রের ধার দিয়ে যাচ্ছে। এই শহরের বুকের কাছে সমুদ্র আছে তা জানা ছিল না তার। সে মেজরকে জিজ্ঞেস করল, এটা কী সমুদ্র?

অতলান্তিক। মেজর সামনের সিটে বসে জবাব দিলেন।

অর্জুনের মনে পড়ল। কোথায় যেন পড়েছিল, পৃথিবীর সব সমুদ্রের মধ্যে অতলান্তিক হল সবচেয়ে ভয়ংকর। একটু পরে সমুদ্র থেকে সরে এল গাড়ি। অর্জুন ভেবে রাখল, একদিন দিনের বেলায় ওই সমুদ্র দেখতে হবে।

কিছুটা যাওয়ার পর মেজর মুখ ঘুরিয়ে বললেন, নিউ ইয়র্কের এই অঞ্চলটার নাম লং আইল্যান্ড। বড়লোকদের পাড়া বলতে পার।

কথাগুলো বাংলায় বললেন বলে জিম মানে বুঝতে পারলেন না। অবশ্য তিনি এখন অভ্যেসে গাড়িটা চালাচ্ছেন, মন পড়ে আছে পুলিশের দেওয়া খবরে।

এগজিট দিয়ে বড় রাস্তা থেকে নেমে ভিলেজ রোডে চলে এল গাড়ি। কিছুদূর যেতেই গাড়ির গতি কমে এলে অর্জুন দেখল, একটা বিরাট একতলা বাড়ির লনের পাশে দুটো পুলিশের গাড়ির ছাদে আলো জ্বলছে নিভছে। হাট করে খোলা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে পুলিশের গাড়িগুলোর পাশে গাড়ি পার্ক করলেন জিম! তারপর গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত বাড়ির দরজার দিকে হাঁটতে লাগলেন। মেজর এবং অর্জুন গাড়ি থেকে নেমে ওঁকে অনুসরণ করতে গিয়েও পিছিয়ে পড়লেন। অর্জুন দেখল, বিশাল লনে জোরালো আলো ছড়িয়ে আছে। লনের চারপাশে ফুলের গাছ, জিম সত্যি ধনী ব্যক্তি।

ওঁরা দরজায় গিয়ে দেখলেন, দু'জন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বেশ উত্তেজিত হয়ে জিম কথা বলছেন। মোটামুটি লম্বা চেহারার অফিসার বলছেন, আপনি শান্ত হন। এখন হাসপাতালে গেলে কোনও লাভ হবে না। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ওরা দেখা করতে দেবে না। আমি লাইনটা ধরে দিচ্ছি, আপনি কথা বলে দেখুন।

সেলফোনে লাইন ধরে জিমকে দিলেন অফিসার। জিম বললেন, আমি জিম ব্রাউন। একটু আগে আমার স্ত্রীকে আহত অবস্থায় পুলিশ আপনাদের হাসপাতালে ভরতি করেছে। আমি তাকে দেখতে এখনই আসতে পারি কি?

ওপাশের কথা শুনে মাথা নাড়লেন জিম, ও হো! ও কেমন আছে?

সেটা শোনার পর জিম ভেঙে পড়লেন, আই সি ইউ-তে আছে। ও বাঁচবে তো? প্লিজ, আমাকে মিথ্যে বলবেন না।

উত্তরটা শুনে মাথা নাড়লেন। ঠোঁট টিপে কান্না সামলে টেলিফোন রেখে দিয়ে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন।

মোটাসোটা অফিসার এবার মেজরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওয়েল, জেন্টলম্যান, আপনাদের পরিচয় জানতে পারি?

মেজর আমেরিকান উচ্চারণে বললেন, আমি জিমের বন্ধু। এই ছেলেটি আমার গেস্ট। আমরা যখন ওয়াটার ফ্রন্টে ডিনার করছিলাম তখন ওর কাছে খবরটা পৌঁছেছিল। ওর এই বিপদে ওকে একলা ছেড়ে দিতে চাইনি।

ও কে। আমি সার্জেন্ট গোল্ড স্মিথ। চল্লিশ মিনিট আগে আমি এই রাস্তায় ডিউটিতে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, এই বাড়ি থেকে একটা বাইক তীব্র গতিতে বেরিয়ে উলটো দিকে চলে গেল। আমি বাইকটাকে চেজ করতে পারতাম অত জোরে চালানোর জন্যে। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এই বাড়ির ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। ভাগ্যিস সেটা মনে হয়েছিল, না হলে আমরা মিসেস ব্রাউনকে অত তাড়াতাড়ি হসপিটালাইজ করতে পারতাম না। ওঁর পিঠে, কোমরে, কাঁধে ছুরি মারা হয়েছে। প্রচণ্ড ব্লিডিং হচ্ছিল এবং ওঁর জ্ঞান ছিল না। যে ছুরি দিয়ে ওঁকে মারা হয়েছে, ছুরিটাকে আততায়ী এখানে ফেলে যায়নি। এই বাড়িতে আর-একজন বৃদ্ধা থাকেন। তার কত বয়স হয়েছে জানি না, কিন্তু ভাল করে কথা বলতে পারেন না। তাকে জিজ্ঞেস করে একমাত্র ওঁর সেলফোন নাম্বার ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি। নাম্বারটা বৃদ্ধার সেলফোনেই ছিল। তিনি কোনও চিৎকার, চেঁচামেচি শুনতে পাননি।

মাথা নাড়লেন জিম, আমার মা, এখন একদম শুনতে পান না।

মিস্টার ব্রাউন, আপনি আজ কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন?

লাঞ্চের পরে। কয়েকটা কাজ শেষ করতে বিকেল হয়ে গেল। তখন মেজরের কাছে গিয়েছিলাম। স্ত্রীকে বলে গিয়েছিলাম, ফিরতে রাত হতে পারে। জিম বললেন।

আপনার বা আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল?

ওর মতো নিরীহ মানুষের কোনও শত্রু থাকতে পারে না।

আপনি এই কাজটা কার হতে পারে বলে সন্দেহ করছেন?

অফিসার, বিশ্বাস করুন, আমি ভাবতে পারছি না।

আপনার ছেলেমেয়ে?

মেয়ে ওয়াহিও ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছে। ওর স্বামীও ওখানকার প্রোফেসর। ছেলে কোথায় আছে তা আমি জানি না। জিম মাথা নাড়লেন।

ছেলের সঙ্গে আপনার এখন সম্পর্ক নেই?

হ্যাঁ। ও বাজে সংস্পর্শে পড়েছিল। স্কুলের পর পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছিল। আমি ওসব পছন্দ না করায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ও আমাদের বেশি বয়সের সন্তান। দিদি এবং ভাই-এর বয়সের পার্থক্য অনেক।

ইদানীং কি ও আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে?

আমি জানি না। ওর মা আমাকে কিছু বলেনি।

ওর একটা ফোটো আমাদের চাই। না, না, এখনই দিতে হবে না। কাল সকালে দিলেই হবে। বুঝতেই পারছেন, ওকেও কিছু প্রশ্ন করা দরকার।

সার্জেন্টের কথা শুনে জিম মাথা নাড়লেন, কিন্তু ওর এখনকার ফোটো তো এই বাড়িতে নেই। স্কুল থেকে বেরোবার সময় ওর মায়ের সঙ্গে ফোটো তুলেছিল। সেই চেহারা নিশ্চয়ই বদলে গিয়েছে এতদিনে। সেটা যদি কাজে লাগে তা হলে দিতে পারি।

সেটাই নেবেন জানিয়ে সার্জেন্ট তার সঙ্গী অফিসারকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পুলিশের দুটো গাড়ি গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, মনে হল, তুমি ওদের সত্যি কথা বললে না জিম!

জিম চুপ করে থাকলেন।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, হাসপাতাল কী বলল?

একটু পরে ওর জ্ঞান ফিরবে বলে আশা করছে। জ্ঞান ফিরলে, কন্ডিশন স্টেবল হলে কাল সকালে অপারেশন করবে। আমাকে সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে যেতে হবে। উঃ, আমি ভাবতেই পারছি না। জিম উঠে দাঁড়ালেন।

অর্জুন এতক্ষণে কথা বলল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ছেলে কী কথা বলত তা সত্যি আপনি জানতেন না?

জিম অর্জুনের দিকে তাকালেন, হা, জানতাম। আমি ওকে নিষেধ করেছিলাম ছেলের ফোন এলে কথা বলতে।

কেন? মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

টম চাইত আমার অনুপস্থিতিতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। দীর্ঘকাল দেখা না হওয়ায় আমার স্ত্রী ওর প্রস্তাবে দুর্বল হয়ে পড়ত। আমার জন্যে কিছু বলতে পারত না।

কেন দেখা করতে চাইত? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

কেন আবার? মায়ের কাছ থেকে যদি পাঁচ-দশ হাজার ডলার পাওয়া যায় তা হলে কিছুদিন মজায় কাটাতে পারবে।

ও কি মায়ের কাছে টাকা চাইত?

আমি সন্দেহ করি, যদিও আমার স্ত্রী কখনও সেরকম কথা বলেনি?

তা হলে আপনি কী মনে করেন, ছেলেই তার মাকে ছুরি মেরেছে?

আমি কী করে বলব? তখন তো আমি সামনে ছিলাম না।

মেজর চেয়ারে বসলেন, কিন্তু জিম, এসব কথা তুমি পুলিশকে বললে না কেন? কাকে সন্দেহ হয় জিজ্ঞেস করেছিলেন অফিসার। তুমি ছেলের নাম বলোনি। যাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কথা তুমি আমাকে বললে, তা পুলিশকে জানানো তোমার কি কর্তব্য ছিল না?

মেজর আমার সন্দেহের কথা পুলিশকে জানালে ওরা আজ না হয় কাল ঠিক ওকে ধরে ফেলত। যদি এই কাজটা ও না করে থাকে তা হলে আমার স্ত্রী সুস্থ হয়ে ফিরে এসে যখন শুনত, আমার সন্দেহের কারণে ছেলে জেলে ঝুলছে, তা হলে খুব ধাক্কা খেত। আমাকে দায়ী করত। জিম বললেন।

ও যদি খুনের চেষ্টা করে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই ধাক্কা খেতেন না। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, সেক্ষেত্রে ছেলের শাস্তি চাইতেন তিনি।

আমি জানি না, আমাকে আগে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। কাল সকালে যদি ওর সেন্স ফিরে আসে, ডাক্তার যদি কথা বলার অনুমতি দেয়! জিম ক্লান্ত গলায় বললেন।

মেজর চলে গেলেন ল্যান্ডলাইনের টেলিফোনের কাছে। রিসিভার তুলে নাম্বার ডায়াল করে জিমের বাড়ির ঠিকানা বলে ট্যাক্সি পাঠাতে বললেন।

জিম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

ও! আমি তোমাদের পৌঁছে দিতে পারছি না। আমি সত্যি দুঃখিত। আবার এই রাতে বাড়িতে একা থাকতেও স্বস্তি বোধ করছি না। আই ডোন্ট নো, যে খুন করতে চেয়েছিল সে যদি আবার ফিরে আসে?

জিম নিচু গলায় বললেন।

মেজর এগিয়ে গিয়ে ওঁর কাঁধে হাত রাখলেন, তুমি পুলিশকে বলো...!

নাঃ। হয়তো আমি ভুল ভাবছি! ও কে!

মিস্টার ব্রাউন, অর্জুন এগিয়ে এল, আমি যদি আজকের রাতটা এই বাড়িতে থাকি তাতে কি আপনার আপত্তি আছে?

প্রস্তাবটা শোনামাত্র মুখে হঠাৎ আলো ফুটল জিমের, তুমি থাকবে? ওঃ, আই উইল বি হাইলি অবলাইজড।

এই সময় গাড়ির হেডলাইট এসে পড়ল বাড়ির উপর। মেজর বললেন, ঠিক আছে। অর্জুন, তুমি এখানেই থেকে যাও। কাল সকালে একটা ট্যাক্সি নিয়ে না-হয় কুইন্সে চলে এসো। মেজর এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। তার ট্যাক্সি এসে গিয়েছে।

আমেরিকার বাড়িগুলোর দেওয়াল ইটের নয়। পাতলা কাঠের। বাড়ির দরজাও পলকা। ঠেললে খুলবে না, কিন্তু একটু বেশি শক্তি প্রয়োগ করলে প্রতিরোধ করতে পারবে না। ধরেই নেওয়া হয় দরজা বন্ধ দেখেও যারা বেশি শক্তি প্রয়োগ করে তারা অপরাধী। এই কারণে দরজায়, জানলায় অ্যালার্ম লাগানো হয়। শক্তি প্রয়োগ করলেই যন্ত্র এমন জানান দেয় যে, প্রতিবেশীরা

তো বটেই, পুলিশও ছুটে আসে। এদেশে বাড়ি তৈরি হয় বড়জোর ষাট বছরের জন্যে। একজন তিরিশ বছর বয়সি মানুষ সেই বাড়ি কিনলে গোটা জীবন চমৎকার কাটিয়ে দিতে পারে। কখনও ছেলেমেয়ে, নাতির কথা ভেবে শক্তপোক্ত বাড়ি তৈরির কথা ভাবা হয় না।

দরজা বন্ধের পর অ্যালার্ম চালু করে দিয়ে জিম জিজ্ঞেস করলেন, ফ্রিজে কিছু খাবার আছে, তাই গরম করে দিই। তোমার তো ডিনার অর্ধেকও করা। হয়নি।

অর্জুন মাথা নাড়ল, এখনই দরকার নেই।

বেশ। এই বাড়িতে বেডরুম চারটে। নীচে গেস্টরুম, লিভিংরুম; হল, কিচেন। এসো আমার সঙ্গে। জিম একটা ছোট সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন, পিছনে অর্জুন।

মাঝখানে সুন্দর কার্পেট মোড়া ফাঁকা ঘর। দু'পাশে চারটে বেডরুম।

বাঁ দিকের শেষ দরজাটা খুললেন জিম। ভিতর থেকে অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে অর্জুন দেখল, জিম গিয়ে বসেছেন বিছানার একপাশে। আর তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে এক বৃদ্ধা কেঁদে কেঁদে কিছু বলছেন! জিম বললেন, ঠিক আছে মা, আমি তো এসে গিয়েছি, তোমার কোনও ভয় নেই।

বৃদ্ধা ততক্ষণে অর্জুনকে দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে আঙুল তুলে দেখিয়ে জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে বললেন, হু-হুঁ-ইজ-দেয়ার?

জিম হাসলেন, হি ইজ গোয়িং টু হেলপ আস মম। হিজ নেম ইজ অ-র জুন।

অর্জুন ঘরের ভিতরে ঢুকে বৃদ্ধার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঝোঁকাল। বৃদ্ধা তার দিকে ভাল করে দেখে ছেলের দিকে তাকালেন, হি-হি-গুড!

গুড। এখন তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। তুমি কি একটু দুধ খাবে?

বৃদ্ধা মাথা নেড়ে না বললেন।

চাদরটা বৃদ্ধার বুক পর্যন্ত টেনে দিয়ে একটা মৃদু আলো জ্বেলে দিয়ে, গুড নাইট মম! বলে বেরিয়ে এলেন জিম। অর্জুন তাকে অনুসরণ করল।

বাইরে বেরিয়ে জিম বললেন, এপাশের দুটো বেডরুম আমরা স্বামী-স্ত্রী ব্যবহার করি। নীচে গেস্টরুম আছে, আর উপরের চার নাম্বার বেডরুমটায় কেউ থাকে না। তুমি কোন ঘরে থাকতে পছন্দ করছ?

আমার বোধহয় নীচের ঘরে থাকা উচিত।

বেশ, তুমি নীচে যাও, আমি আসছি। জিম বললেন।

নীচে নেমে এল অর্জুন। গেস্টরুমে ঢুকে দেখল, দামি হোটেলের সঙ্গে কোনও তফাত নেই। দেওয়াল-আলমারির পাল্লা খুলে দেখল, এক কাপড়ের সুন্দর স্লিপিংসুট ভাঁজ করা রয়েছে। যাক, রাত্রে শার্ট-প্যান্ট পরে শুতে হবে না। এগুলো নিশ্চয়ই এই ঘরে যে অতিথি থাকবেন তার জন্যে রেখে দেওয়া। হয়েছে।

পোশাক পরিবর্তন করে অর্জুন খুশি হল। যেন তার শরীরের মাপ নিয়ে এগুলো বানানো হয়েছে। সে দরজা খুলে বাইরে আসতেই জিমকে দেখতে পেল। নিজের পরনে এখন শোওয়ার পোশাক। কিন্তু তার সামনের টেবিলে গ্লাসের ভিতর সোনালি রঙের পানীয়ে কয়েক টুকরো বরফ ভাসছে। জিম বললেন, বোসো। জিমকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

অর্জুন বসল। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনার ছেলে কোথায় থাকে? ওর প্রফেশন কী?

আমি কিছুই জানি না। তবে ব্রঙ্কসে ওকে অনেকে দেখেছে।

ব্রঙ্কস?

ম্যানহাটন, কুইন্স, ব্রঙ্কস, স্যাটার্ন আইল্যান্ড আর লং আইল্যান্ড নিয়ে নিউ ইয়র্ক। ম্যানহাটনের পাশে হার্লেম আর ব্রঙ্কস হল কালোদের জায়গা। বেশিরভাগ ক্রিমিনাল ওখানেই আস্তানা গাড়ে। কারণ, ওখানকার কয়েকটা এলাকায় বড় দলে না গেলে পুলিশও ঢুকতে সাহস পায় না। আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই ও কোথায় থাকে তা জানার। আর ওর প্রফেশন সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। ক্রাইমওয়ার্ল্ডে ঢুকে গিয়ে কোনও শক্তিশালী দলের সঙ্গে হাত মেলালে রোজগারের ভাবনা ভাবতে হয় না।

তা হলে আপনার ছেলে তার মায়ের কাছে টাকা চাইতে কেন এসেছিল? ওর তো অন্য পথে রোজগার থাকার কথা।

হয়তো সেখানে কোনও সমস্যা হয়েছে।

মিস্টার ব্রাউন, আপনার ছেলে এরকম হল কেন?

একটা বড় চুমুকে গ্লাস অর্ধেক করে জিম বললেন, আমাদের দুর্ভাগ্য। ওর দিদি অত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী ছিল বলে আমরা ভেবেছিলাম ও সেরকম হবে। ওর মা চাইত, দিদির কথা বলে ওকে ইন্সপায়ার করতে। আমরা বুঝিনি, খুব। সাধারণ মানের ছাত্র বলে ও দিদিকে ঈর্ষা করত। স্কুলের বাজে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে দিয়েছিল অল্প বয়সেই। তাদের কাছ থেকে ড্রাগ খাওয়া শিখেছিল সে। পনেরো বছর বয়সে প্রথম স্কুল থেকে ওর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এল। ওকে স্কুল থেকে বের করে দিত কিন্তু ওর মা হাতে পায়ে ধরায় প্রিন্সিপাল সেবার ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু পরীক্ষায় ফেল করল ও। তারপর থেকেই আমাদের অবাধ্য হতে ওর খুব ভাল লাগত। রাত দুটো বা তিনটের সময় বাড়ি ফিরত। এইভাবে চলছিল। আঠারো বছরের পর ও বাড়িতে আসা বন্ধ করল। এখন মাঝে মাঝে মোটরবাইকে ওকে দেখা যায় ওই ব্রঙ্কস এলাকায়।

এখন ওর বয়স কত?

পঁচিশ পেরিয়েছে।

আপনার কি মনে হয় ও নিজের মাকে খুন করতে পারে?

কোনও কিছুই অসম্ভব বলে এখন মনে হচ্ছে না।

অর্জুন জিমের মনের অবস্থা বুঝতে পারছিল। তার মনে হচ্ছিল, জিমের এখন শুয়ে পড়া উচিত। তবু জিম গ্লাস শেষ করতে যাচ্ছেন দেখে সে জিজ্ঞেস করল, আপনি বোধহয় জেমস বন্ডের মতো একজনকে খুঁজছিলেন। মেজর আপনাকে আমার কথা বলেছিলেন? আমাকে দেখে আপনি খুব হতাশ হন। আপনি আমাদের ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মনস্থির করতে পারেননি। আপনি কেন একজন সত্যসন্ধানীকে খুঁজছিলেন?

জিম হাসলেন, আমি ভয় পাচ্ছিলাম আমার কোনও ক্ষতি হবে। আমি একবারও ভাবিনি আঘাতটা আমার স্ত্রীর উপর আসবে। ভাবলে আরও বেশি তৎপর হতাম।

আপনি কেন ভয় পাচ্ছিলেন?

আমার ছেলে এই শহরে আছে কিন্তু কোথায় আছে তা জানি না। আমাকে এড়িয়ে সে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। তার সঙ্গীরা হল ভয়ংকর ক্রিমিনাল। ভয় হচ্ছিল সেই কারণে। আমি ওর ঠিকানাটা জানতে চাইছিলাম। ঠিকানা জানলে ওর গতিবিধির উপর নজর রাখতে পারতাম। প্রাইভেট ডিটেক্টিভ এজেন্সিগুলোর উপর আমার একটুও ভরসা নেই। আবার পুলিশের কাছে যেতে চাইনি। আমি কোনও কারণ ছাড়াই ছেলেকে ভয় পাচ্ছি এটা শুনলে ওরা কোনও গুরুত্ব দিত না। জিম বললেন।

অর্জুন বলল, আপনি এবার শুয়ে পড়ুন।

জিম উঠলেন। ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কথাটা মনে আসতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনার মেয়েকে খবরটা দিয়েছেন।

মাথা নাড়লেন জিম, না। কাল সকালে হাসপাতালে গিয়ে দেখব ও কেমন আছে, দেখে ফোন করব। গুড নাইট।

অর্জুন বলল, গুড নাইট।

এখন এই বাড়ি শান্ত। কোথাও কোনও শব্দ নেই। আলো নেভাতে গিয়ে টেবিলে পড়ে থাকা গ্লাসটার উপর চোখ পড়ল। সেটাকে তুলে নিয়ে কিচেনের বেসিনের পাশে রেখে এল অর্জুন। এত বৈভব, এত বিলাসিতা, কিন্তু বাড়িতে কোনও কাজের লোক নেই। অতিরিক্ত বিত্তশালী না হলে ড্রাইভার তো বটেই, কাজের লোকও রাখা সম্ভব নয়। ভারতীয় টাকায় মাসে যে আট লাখ টাকা রোজগার করে, তাকেও নিজের হাতে বাসন মাজতে হয়, রান্না থেকে ঘর পরিষ্কার না করে উপায় থাকে না। বাড়ির লনে ঘাস বড় হলে সেগুলো ছাঁটাও তার কর্তব্য।

আলো নিভিয়ে গেস্টরুমে চলে এল অর্জুন। জিম ব্রাউন না হয় এ দেশের মানুষ, অনেক ভারতীয়র হাজার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও দেশে ফিরে যেতে চায় না। মানুষের টাকা রোজগার করতে গিয়ে দুঃখ কেন?

ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল অর্জুন। এখন চারধার চুপচাপ। দূরের রাস্তায় মাঝে মাঝে কোনও গাড়ি ছুটে গেলে তার আওয়াজ ভেসে এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সারা দুপুর ঘুমোনোর জন্যে এখন অর্জুনের ঘুম আসছিল না।

ঘণ্টাখানেক পর সে উঠে বসল। ঘুম না আসার একটা কারণ, তার খিদে পেয়েছে। ওয়াটার ফ্রন্ট রেস্টুরেন্টে খাওয়া শুরু করামাত্র ফোনটা এসেছিল। সময়টা ছিল সন্ধেবেলা। এখন গভীর রাত। জিম

নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকার পর অর্জুন উঠল। কিচেনের রেফ্রিজারেটরে কি কোনও খাবার নেই? মিসেস ব্রাউন কি আজ সকালে কিছু তৈরি করে রেখে দেননি ওখানে? যদিও ওখান থেকে জিমকে না জানিয়ে খাবার নেওয়া অনুচিত, কিন্তু নিশ্চয়ই চুরি বলে মনে করবেন না জিম?

দরজা খুলে নিঃশব্দে বড় ঘরে পা রাখল অর্জুন। ঘরে বাতি না জ্বললেও কাঁচের দেওয়ালের আড়াল ভেদ করে আকাশের আলো চুঁইয়ে ঢুকছে ভিতরে। তাতে অবশ্য কোনও কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের চেয়ে একটু স্বস্তি এনে দিয়েছে। অর্জুন কিচেনের দিকে পা বাড়াল। মেঝের উপর কার্পেট থাকায় শব্দ হওয়ার কারণ নেই।

রেফ্রিজেটরের দরজা খুলতেই আলো জ্বলে উঠল ভিতরে। অনেক পাত্র রাখা আছে। প্রথমটি তুলতেই অর্জুন খুশি হল। পুডিং। এখনও ছুরির স্পর্শ পায়নি যখন, তখন আজ-কালের মধ্যেই বানিয়েছিলেন মিসেস ব্রাউন।

একটা প্লেটে খানিকটা পুডিং চামচ দিয়ে তুলে নিয়ে পাত্র যথাস্থানে রেখে দরজা বন্ধ করতেই আলো নিভে গেল। কিচেনে দাঁড়িয়েই এক চামচ পুডিং মুখে দিল অর্জুন। আঃ, দারুণ স্বাদ। খিদের কারণে দ্রুত পুডিং শেষ করে সে গ্লাস খুঁজে না পেয়ে জিমের ব্যবহার করা গ্লাস কলের জলে ধুয়ে আবার ভরে নিয়ে চুমুক দিল। ঠিক তখনই কোথাও কট করে একটা শব্দ হল। তারপর আবার সব চুপচাপ।

খালি বাড়িতে রাতের বেলায় শব্দ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। অর্জুন নিশ্চিত যে, সে ভুল শোনেনি। গ্লাস হাতে নিয়েই সে কিচেনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। ঘর যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে গোটানো পরদা, তাই বাইরের লন ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। এই সময় দ্বিতীয়বার কট শব্দটা হল।

অর্জুন দরজার দিকে তাকাল। শব্দটা হচ্ছে দরজার ওপাশে। এটা হাওয়ার ধাক্কা নয়। সে পা টিপে টিপে দরজার এপাশে চলে আসামাত্র তৃতীয়বার শব্দটা হল। দরজার গায়ে তালায় চাবি বা ওই জাতীয় কিছু ঢুকিয়ে, কেউ খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু জিম এদিকের লকটা নামিয়ে দেওয়ায় চাবি কাজ করছে না।

কী করা যায়? লক তুলে দরজা চটপট খুললেই আগন্তুককে দেখা যাবে। লোকটি নিশ্চয়ই সেটা পছন্দ করবে না। সঙ্গে অস্ত্র থাকলে অর্জুনকে আঘাত করবেই। বোকামি করার কোনও মানে হয় না। অর্জুন ধীরে ধীরে কাঁচের দেওয়ালের পাশে ঝুলে থাকা পরদার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। একটু ঝুঁকতেই বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটির ঝাপসা মূর্তি দেখতে পেল সে। লোকটি তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু লোকটি যে বেশ লম্বা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এবার দরজায় আলতো টোকা দিল লোকটি। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবার টোকা দিল। এবার একটু জোরে। তারপর অর্জুনকে অবাক করে চাপা গলায় ডাকল, মম, মম।

এতক্ষণ অর্জুন লোকটিকে জিম ব্রাউনের ছেলে বলে ধারণা করেছিল। মাকে খুন করার চেষ্টা করেও নিশ্চয়ই অন্য কোনও মতলবে ফিরে এসেছে। কিন্তু মম ডাক শুনে অর্জুনের মনে হল, এতক্ষণ তারা পুরোটাই ভুল ভেবে নিয়েছিল। লোকটি যখন এ বাড়ির দরজায় এসে মা বলে ডাকছে, তখন মিসেস ব্রাউনের হাসপাতালে যাওয়ার ঘটনাটা ওর জানা নেই। ও যদি ছুরি মেরে থাকে, তা হলে কখনওই এই সময়ে এসে 'মা' বলে ডাকবে না। ছেলের বদলে অন্য কেউ যদি হয় তা হলে সে 'মা' বলবে কেন? অর্জুনের মনে হল, লোকটির সঙ্গে কথা বলা দরকার। সে দেওয়ালের কাঁচে শব্দ করে লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। কিন্তু শব্দ হওয়ামাত্র লোকটি হকচকিয়ে এদিকে তাকাল এবং এক লাফে নীচে নেমে দ্রুত গেটের দিকে চলে গেল। তারপরেই বাইকের শব্দ হল রাস্তায়। মুহূর্তেই শব্দ মিলিয়ে গেল।

.

০৫.

ঘুম ভাঙল সাড়ে সাতটার সময়। তাড়াতাড়ি বাথরুমের কাজ সেরে বাইরে আসতেই অর্জুন দেখতে পেল, টেবিলের উপর একটা কাগজ পেপারওয়েট চাপা রয়েছে। সেটা তুলেই পড়ল, মিস্টার ব্রাউন হাসপাতালে চলে গিয়েছেন। অর্জুন ঘুমোচ্ছিল বলে তিনি আর ডাকেননি। ওঁর সেলফোনের নম্বর লিখে গিয়েছেন।

একটু খারাপ লাগল অর্জুনের। আরও ভোরে ওঠা উচিত ছিল তার। তা হলে ভদ্রলোকের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে পারত। হাসপাতালটা কোথায় তা অবশ্য ওঁকে ফোন করে জেনে নেওয়া যায়। মাঝরাতে লোকটি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ সে এই ঘরে বসে ছিল অপেক্ষায়, যদি আবার ফিরে আসে।

একটা ব্যাপারে ধন্দ লাগছে তার। পুলিশ অফিসার বলেছেন যে, এই বাড়ি থেকে দ্রুতবেগে একটা মোটরবাইককে বেরিয়ে যেতে দেখে তার সন্দেহ হওয়ায় তিনি খোঁজ করতে ভিতরে ঢুকেছিলেন। অর্থাৎ আততায়ীর মোটরবাইক ছিল। আবার গত রাতে যে এসেছিল সেও মোটরবাইকে ফিরে গিয়েছে। লক্ষণীয় যে, লোকটি মোটরবাইক ভিতরে নিয়ে আসেনি। যে আসছে সে বাড়ির লোকদের জানাতে চায়নি বলে মোটরবাইক বাইরে রেখে এসেছিল। এই দুটো লোককে একই মানুষ বলে ভাবতে অসুবিধে নেই। কিন্তু তা হলে দরজায় নক করে 'মা' বলে ডাকবে কেন?

দ্বিতীয়ত, প্রথমে চাবি দিয়ে দরজা খুলতে চেষ্টা করেছিল লোকটি। তার মানে এ বাড়ির সদর দরজার চাবি তার কাছে আছে। পেল কী করে? জিম নিশ্চয়ই সেটা দেবেন না। অবশ্য এক ফাঁকে এসে বন্ধ দরজায় চাবির গর্তের ছাঁচ নিয়ে নতুন চাবি তৈরি করে নেওয়া যায়। কিন্তু লোকটি দরজায় নক করেছিল। সাড়া না পেয়ে 'মা' বলে ডেকেছিল। অত রাতে দরজায় নক করলে নিশ্চয়ই মিসেস ব্রাউন সাড়া দিয়েছেন এর আগে। 'মা' ডাক শুনে নিশ্চয়ই দরজা খুলে দিয়েছেন। সেই কারণেই লোকটি নক করেছিল, 'মা' বলে ডেকেছিল।

হিসেব মিলছে না। কিচেনে ঢুকল সে। ইলেকট্রিক কেটলিতে চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে দুধ-চিনি-চায়ের সন্ধান করতে লাগল। সেগুলো পাওয়ার পর খেয়াল হল জিম ব্রাউনের মায়ের কথা। ভদ্রমহিলা কি এখনও ঘুমোচ্ছেন? নাকি বেরোবার আগে জিম ওঁকে চা খাইয়ে গিয়েছেন! তবু দু'কাপ চা তৈরি করে দুধ-চিনি একটা ট্রে-তে তুলে সে দোতলায় চলে এল। জিমের মায়ের ঘরের দরজা ঈষৎ খোলা। সেখানে দাঁড়িয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ভিতরে আসতে পারি?

ভিতর থেকে জড়ানো শব্দ বাইরে এল। একটু অপেক্ষা করে অর্জুন ভিতরে ঢুকল। জিমের মা বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় রয়েছেন। তার পিঠের নীচে তিনটে বালিশ রাখা। একটা চাদর কোমর পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে।

গুড মর্নিং। আমি অর্জুন। পাশের টেবিলে ট্রে রাখল সে।

সেদিকে তাকালেন বৃদ্ধা। ধীরে ধীরে তার মুখে হাসি ফুটল।

আসুন, আমরা চা পান করি। আপনি চিনি খান?

বৃদ্ধা মাথা নেড়ে না বললেন।

শুধু লিকার?

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বোঝালেন বৃদ্ধা। তারপর ইশারায় যে বস্তুটিকে দেখালেন তা দেখে অর্জুন চমৎকৃত। বিছানার পাশ থেকে টেনে সামনে নিয়ে আসতেই বৃদ্ধার সামনে একটা বেশ চওড়া প্লাইউডের হাতল এগিয়ে এল। অর্জুন সেই হাতলের উপর বৃদ্ধার চায়ের কাপ রাখল।

বৃদ্ধা জড়ানো যে শব্দটা উচ্চারণ করলেন সেটা যে থ্যাঙ্ক ইউ' তা এবার বুঝতে পারল অর্জুন। একটা চেয়ারে চায়ের কাপ নিয়ে বসে অর্জুন বৃদ্ধাকে ভাল করে দেখল। সমস্ত মুখ জুড়ে বার্ধক্যের ছাপ, হাতদুটো সরু এবং তা থেকে চামড়া ঝুলছে। মাথায় সাদা চুল ছেলেদের মতো ছটা।

হঠাৎ অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জানেন আপনার ছেলের বউ এখন কোথায়?,

বৃদ্ধা অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর ডান হাত নীচের দিকে নাড়ালেন। কাপটাকে দুহাতে ধরে উপরে তুলে মুখ নামিয়ে আলতো চুমুক দিলেন তিনি।

অর্থাৎ এই বাড়ির কোনও খবর ওঁর কাছে পৌঁছোয়নি।

আপনার নাতির সঙ্গে দেখা হয়? বেশ জোরে প্রশ্নটা করল অর্জুন।

কাপটা নামিয়ে রেখে অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন বৃদ্ধা। শব্দগুলোর মানে বুঝতে পারছিল না অর্জুন। কিন্তু তাতে যে যথেষ্ট অভিমান জড়ানো আছে, তা স্পষ্ট। অর্জুনের মনে হল, এই বৃদ্ধার সঙ্গে ওঁর নাতির যোগাযোগ ছিল। অর্থাৎ জিমকে এড়িয়ে জিমের স্ত্রী এবং মা ছেলেটির জন্যে অপেক্ষা করতেন। জিম যাতে না জানতে পারেন তাই সে আসত মধ্যরাতে। হয়তো দরজায় টোকা দিলে মিসেস ব্রাউন সেটা খুলে দিতেন নিঃশব্দে।

আপনার নাতির কাল আসার কথা ছিল? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

কিছু বলতে গিয়েও যেন নিজেকে সামলে নিলেন বৃদ্ধা। তারপর চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিতে লাগলেন। অর্জুন যে এই ঘরে বসে আছে তা একেবারে উপেক্ষা করলেন।

অর্জুন বুঝল ভদ্রমহিলা এখন মুখ খুলবেন না। হয়তো ওঁর মনে পড়েছে নাতির ব্যাপারে মুখ খোলা নিষেধ।

বৃদ্ধার চা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে কাপ তুলে হাতল সরিয়ে নীচে নেমে এল অর্জুন। তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। অর্জুন ট্রে-টা কিচেনে নামিয়ে রেখে রিসিভার তুলল, হ্যালো।

অ-র-জুন। দিস ইজ জিম। তুমি কি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হতে .পারবে?

নিশ্চয়ই।

মেজর আসছেন। তোমাকে তৈরি থাকতে বলেছেন। উনি তোমাকে তুলে নেবেন। লাইন কেটে দিলেন জিম।

পোশাক বদলে দরজার বাইরে এসে সেটা চেপে দিতেই লক আটকে গেল। এখন এই বিরাট বাড়িটায় একজন লোলচর্ম প্রায় বাশক্তিরহিত বৃদ্ধা ছাড়া আর কেউ নেই। আমেরিকানরা এই সব বৃদ্ধবৃদ্ধাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে দেয় বলে শুনেছিল অর্জুন। জিম কেন ব্যতিক্রম হল? কিন্তু বৃদ্ধা সারাদিন ওইভাবে পড়ে থাকেন, ওটাও তো ভাল নয়।

লনের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল অর্জুন। ঘাসের উপর চাকার দাগ এখনও রয়ে গিয়েছে। এই চাকা অবশ্যই মোটরবাইকের। গাড়ির চাকার চেয়ে অনেক সরু। লন এবং বাঁধানো চাতালের মাঝখানে এক বিঘত পরিমাণ মাটির উপর দাগটা বেশ স্পষ্ট। খাঁজগুলো বোঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রথম রাতে যে লোকটি এসে খুনের চেষ্টা করেছিল এটা তার বাইকের চাকার দাগ। একটু উত্তেজিত হয়ে গেটের বাইরে চলে এল অর্জুন। সেখানকার মাটির উপর বেশ কয়েকটা চাকার দাগ। দুটো দাগ আগের চাকার দাগের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টির চাকার দাগ একটু আলাদা। খাঁজগুলো একটু বড় বড়। অর্থাৎ দ্বিতীয় মোটরবাইক ভিতরে ঢোকেনি। জিমের ছেলে এটাকে গেটের বাইরে রেখে ভিতরে ঢুকেছিল।

এই সময় মেজরের গাড়ি পাশে এসে দাঁড়াল। অর্জুন দেখল, মার্টিন গাড়িটা চালাচ্ছে। পাশে বসে আছেন মেজর। পিছনের দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসতেই মেজর এবং মার্টিন একসঙ্গে বলে উঠলেন, গুড মর্নিং!

গুড মর্নিং! অর্জুন হাসল। মেজর বললেন, একটা ভাল খবর আছে। মিসেস ব্রাউনের জ্ঞান ফিরে এসেছে।

বাঃ। খুব ভাল কথা। অর্জুন বলল।

এখন ওঁর কাছ থেকে স্টেটমেন্ট পেলেই পুলিশ ছেলেটিকে খুঁজবে।

কোন ছেলেটিকে?

আঃ। যে খুন করতে চেষ্টা করেছিল। ছেলের উপর জিমের সন্দেহ ছিল।

কিন্তু মিস্টার ব্রাউনের ছেলে তো তার মাকে খুন করতে আসেনি। অর্জুন খুব শান্ত গলায় বলতে মেজর চমকে তাকালেন, কী বলছ?

আমি ভুল বলছি না।

তোমার কী থেকে মনে হচ্ছে ঠিক বলছ? একটু আগে জিম ফোনে আফশোস করছিল, ছেলের ব্যাপারে কেন আরও সতর্ক হয়নি!

উনি ভুল করছেন। দেখবেন ওঁর স্ত্রীও আমাকে সমর্থন করবেন।

দ্যাখো অর্জুন, তুমি অতীতে অনেক সত্যি উদ্ধার করেছ বটে, কিন্তু একটা রাত ওই বাড়িতে কাটিয়েই ঠিকঠাক সত্যি জেনে যাবে এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? মেজর মাথা নাড়লেন, শুনেছি, জিমের মা কথা বলতে পারেন না। জিম নিশ্চয়ই তোমাকে এই তথ্য দেয়নি। তা হলে তোমার জানা সোর্স কোথায়?

অর্জুন গত রাতের ঘটনা এবং আজ বৃদ্ধার সঙ্গে কথাবার্তা মেজরকে জানিয়ে হাসল, আমার সন্দেহ হয়েছিল কেউ মাকে ছুরি মেরে আবার রাত দুপুরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না। তাই যে খুন করতে চেয়েছিল সে আলাদা লোক। কিন্তু সন্দেহ তো তথ্য নয়। আজ লনের উপর এবং গেটের বাইরের মাটিতে দু'-দুটো মোটরবাইকের চাকার দাগ আমার সন্দেহকে সত্যি করে দিল।

আশ্চর্য! পুলিশ তো মোটরবাইকের চাকার কথা নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

কারণ, ওঁরা জানেন একটাই মোটরবাইক ভিতরে ঢুকেছিল। মাঝরাতের আগন্তুকের খবর ওঁদের কাছে নেই। অর্জুন বলল।

তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয় তা হলে জিমের ছেলেটি বদলেছে বলতে পারছি না। কিন্তু সে চোরের মতো মাঝরাতে বাড়িতে যায় কেন? জিমের ভয়ে?

হ্যাঁ। বাবা এবং ছেলের সম্পর্ক ভাল নয়। হয়তো মিস্টার ব্রাউন নির্দেশ দিয়েছেন ছেলেকে বাড়িতে ঢুকতে না দিতে। অর্জুন বলল।

তা হলে জিমের বউকে কে খুন করতে এসেছিল?

পুলিশ নিশ্চয়ই খুঁজে বের করবে।

কেন ছুরি মেরেছিল?

এর উত্তর মিসেস ব্রাউন দিতে পারবেন।

হাসপাতালের পার্কিংলটে গাড়ি পার্ক করল মার্টিন। করে বলল, আমি এখানেই অপেক্ষা করছি, আপনারা কাজ শেষ করে আসুন।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে মেজর বললেন, তুমি একা গাড়িতে বসে কী করবে? চলো, আমাদের সঙ্গে ভিতরে চলো।

থ্যাঙ্ক ইউ মেজর। কিন্তু কোনও কোনও সময় দূরে থাকলে অনেকটা দেখা যায়।

কথা না বাড়িয়ে মেজর হাঁটতে লাগলেন, সঙ্গী হল অর্জুন।

.

হাসপাতালের রিসেপশনিস্ট জানালেন মিসেস ব্রাউনের জ্ঞান ফিরে এসেছে কিন্তু তাকে কথা বলতে দেওয়া হবে না। বিকেলের দিকে কন্ডিশন নর্মাল হলে উনি কথা বলতে পারবেন। মিস্টার ব্রাউন যেহেতু বয়স্ক মানুষ, তাই তাকে অ্যালাউ করা হয়েছে স্ত্রীর পাশে যেতে। কিন্তু তিনি কোনও কথা জিজ্ঞেস করতে পারবেন না। একটু পরেই মিসেস ব্রাউনকে ও টি-তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অপারেশনের জন্যে। এ ব্যাপারে ভয়ের কিছু নেই।

মিস্টার ব্রাউনের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই। মেজর বললেন, চলো, কফি খেয়ে আসি।

যদি সেই সময় মিস্টার ব্রাউন বেরিয়ে যান?

ও জানে আমি আসছি, তাই অপেক্ষা করবে।

তা হলে চলুন। কিন্তু শুধু কফি নয়, খুব খিদে পেয়েছে। হসপিটাল ক্যান্টিনে ঢুকে অর্জুনের মনে হল, জলপাইগুড়িতে এর কাছাকাছি মানের কোনও খাবার দোকান নেই। ছোট ছোট রঙিন টেবিল চেয়ার, কাউন্টারের ওপাশে সুন্দরী সেলসগার্ল, তাদের পিছনে ইলেকট্রনিক বোর্ডে কী কী খাবার পাওয়া যাবে এবং তাদের দাম লেখা রয়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে মেজর বললেন, এখনও কুড়ি মিনিট বাকি আছে। এরা একটা স্পেশ্যাল ব্রেকফাস্ট দেয় যার দাম কুড়ি মিনিট পরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তুমি ওই টেবিলে গিয়ে বসো, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

আপনি নেবেন কেন?

আঃ। অর্জুন। এটা তোমার ভারতবর্ষ নয়। এখানে পরিশ্রম করলে বৃদ্ধরাও নিজেকে যুবক ভেবে খুশি হয়। যাও! মেজর অর্ডার দিলেন, ওয়ান জাম্বো ব্রেকফাস্ট, টু কাপ্‌স অফ কফি।

একটু পরে ট্রে-র উপর কফির মুখ বন্ধ কাগজের গ্লাস আর প্লেট ভরতি যে জাম্বো ব্রেকফাস্ট নিয়ে মেজর এলেন, তা দেখে অর্জুনের চোখ বড় হয়ে গেল, এ কী!

সস্তায় পাচ্ছ, খেয়ে নাও।

কী এটা?

তিনতলা বিগম্যাক।

নষ্ট হবে। আপনি একটু নিন, প্লিজ!

আমি এখন দিনেরাতে দু'বার খাই। দিনেরবেলায় সেদ্ধ, রাতে যা পাই।

অতএব শুরু করল অর্জুন। মনমাতানো স্বাদ। ভিতরে যে সস দেওয়া হয়েছে তার গন্ধও চমৎকার। ক্যান্টিনটায় এখন বেশ লোক হয়েছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ হয়ে গেল। কফির কাপের ঢাকনা খুলে চুমুক দিল অর্জুন।

মেজর বললেন, জিমের সঙ্গে দেখা করেই বাড়ি ফিরে যাব।

দরকারি কাজ আছে?

তোমাকে খাওয়াব বলে একটা আড়াই কেজির ইলিশ কিনেছিলাম। সেটা জমিয়ে রাঁধতে হবে। মেজর হাসলেন।

মানে? আপনি তো সেদ্ধ খাবেন!

ইয়েস। তা ছাড়া নিজের শ্রাদ্ধ করব আজ।

ওরে বাব্বা। তা হলে ইলিশটা মুলতুবি থাক। এখন যা খেলাম তাতে বিকেলের আগে খিদে পাওয়ার কোনও চান্স নেই।

বলছ?

হ্যাঁ। এই সময় মিস্টার ব্রাউনকে দেখা গেল। মুখ ঘুরিয়ে ওঁদের খুঁজছেন। দেখতে পেয়ে এসে বসলেন তৃতীয় চেয়ারে। উনি মুখ খোলার আগেই মেজর বললেন, দাঁড়াও। ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসি তোমার জন্যে।

না। জাস্ট এ কাপ অফ কফি!

ছাড়ো তো। কাল থেকে তো না খেয়ে আছ। মেজর, উঠে গেলেন। অর্জুনের ভাল লাগল। মানুষকে খাইয়ে ভদ্রলোক বেশ তৃপ্ত হন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখলেন?

আমাকে চিনতে পেরেছে। মাথা নাড়লেন জিম।

ডাক্তার কী বলছেন?

একটা মাইনর অপারেশন হবে এখন। তারপরে আর কোনও ভয় নেই। মিস্টার ব্রাউন দু'হাতে কপাল চেপে ধরলেন, একটু পরেই পুলিশ আসবে। আবার জিজ্ঞেস করবে। আমি কী জবাব দেব? উঃ।

আপনি যা জানেন তাই বলবেন।

আমি যে অনেক কিছু জানি, কিন্তু সেসব কথা পুলিশকে বলতে চাইনি। চাইনি বলেই মেজরের কাছে তোমার কথা শুনে উৎসাহী হয়েছিলাম।

অর্জুন হাসল, তা হলে বলছেন আপনার স্ত্রীর আততায়ীকে আপনি জানেন?

এই সময় মেজর ট্রে-তে খাবার নিয়ে এলেন। মিস্টার ব্রাউন বললেন, আমি ওর নাম উচ্চারণ করতে চাই না।

তুমি যা ভাবছ তা সত্যি নয় জিম। খাও। মেজর বললেন।

তার মানে? অবাক হয়ে তাকালেন মিস্টার ব্রাউন।

অর্জুন বলল, দাঁড়ান, মিস্টার ব্রাউন! সমস্ত ব্যাপারটা আপনি আপনার স্ত্রীর মুখে শুনতে পারবেন। ততক্ষণ মনটাকে একটু নরম রাখুন। আপনার ছেলে তার মাকে ছুরি মারেনি।

তুমি আমাকে স্তোক দিচ্ছ? পুলিশ তাকে দেখেছে আমার বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যেতে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার ব্রাউন।

পুলিশ তোমাকে বলেছে যে, তারা তোমার ছেলেকে দেখেছে?

ওই হতভাগাই বাইক চড়ে। আমারই টাকায় কিনেছে। ইদানীং ও আমাকে ফোনে ভয় দেখাত। বিশ হাজার ডলার না দিলে আমার ব্যাবসার গোপন। তথ্য ফাঁস করে দেবে। সেই টাকা চাইতে এসে না পেয়ে ছুরি মেরেছে। এখন আর আমার কোনও সংকোচ নেই। পুলিশকে আমি সব বলব। মিস্টার ব্রাউনের হাত কঁপতে লাগল।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, ফোনে যে কথা বলেছে সে যে তোমার ছেলে তা বুঝলে কী করে? অন্য কেউ তো হতে পারে?

মেজর! আমি বাপ হয়ে ছেলের গলা চিনব না? তা ছাড়া ওরকম অশ্লীল শব্দ, বস্তি এলাকার মস্তানরা যা বলে তাতে তো ও অভ্যস্ত।

মেজর বললেন, তোমাদের তো অনেকদিন দেখা হয়নি। আর কেউ ওর পরিচিত, তোমাকে ফোন করেছিল। তুমি তাকে ছেলে ভেবে নিয়েছ?

তোমরা কী বলতে চাইছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না?

আগে খেয়ে নাও, তারপর বোঝার চেষ্টা করবে।

মিস্টার ব্রাউন খাবারের ট্রে-র দিকে তাকালেন। তারপর কফির কাপ তুলে নিলেন।

একটা চুমুক দিয়ে অর্জুনের দিকে তাকালেন তিনি, পুলিশ যাকে আমার বাড়ি থেকে মোটরবাইকে বেরোতে দেখেছিল সে টম নয়?

টম?

আমার ছেলে।

না। অর্জুন সহজ গলায় বলল।

.

ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে রিসেপশনে আসতেই সুন্দরী রিসেপশনিস্ট জিজ্ঞেস করলেন, মিস্টার ব্রাউন?

ইয়েস। মিস্টার ব্রাউন এগিয়ে গেলেন।

আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনাদের কোনও পরিচিত ছেলে এখানে এসে অসভ্যতা করে গিয়েছে। আমি পুলিশকে ইনফর্ম করতে যাচ্ছিলাম। সুন্দরী বললেন।

আমাদের পরিচিত? কী নাম?

নাম বলেনি। কানে দুল, লেদার জ্যাকেট, চুলে রং। স্বাস্থ্য ভাল, হোয়াইট। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন মিস্টার ব্রাউন, না। এরকম কাউকে আমি চিনি না।

আশ্চর্য ব্যাপার! ছেলেটি এসে বলল, কাল রাতে মিসেস ব্রাউন ভরতি হয়েছিলেন, তাকে কি মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? আমি অবাক হয়ে জানালাম, তিনি মর্গে যাবেন কেন? তার অপারেশন চলছে। ও একটা বিশ্রী গালি দিয়ে চলে গেল।

বিশ্বাস করুন, এরকম কেউ আমার পরিচিত নেই।

আপনার স্ত্রী বেঁচে আছে শুনে ও যেন দুঃখিত হয়েছিল।

আপনি পুলিশকে বললেন না কেন? হয়তো এই ছেলেটিই আততায়ী?

আমি সিকিউরিটিকে বলেছিলাম ওকে আটকাতে। কিন্তু ও ততক্ষণে বাইকে চেপে বেরিয়ে গিয়েছে। আপনি অপেক্ষা করুন, পুলিশের সাহায্য আপনার দরকার হবে।

মিসেস ব্রাউনের অপারেশন শেষ হওয়ার পর জানা গেল আর উদ্বেগের কারণ নেই। মেজর বিকেলবেলায় আবার আসবেন বলে অর্জুনকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের দেখে মার্টিন প্রায় দৌড়ে এল, কী হয়েছিল?

কী হয়েছিল মানে? জিমের স্ত্রীর অপারেশন হয়েছে। মেজর বললেন।

ও নো! ব্রঙ্কসে যে ছেলেদের দেখা যায় তাদের মতো দেখতে একজন হসপিটাল থেকে বেরিয়ে আসতেই সিকিউরিটির দুটো লোক দৌড়ে এল ওকে ধরতে। ছেলেটি বাইকে উঠে যেভাবে বেরিয়ে গেল তা শুধু সিনেমায় দেখা যায়। আমি সিকিউরিটির লোক দুটোকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? ওরা উত্তর দিল না। এই ছেলেগুলো খুব ভয়ংকর। মার্টিন বলল।

ওকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

নিশ্চয়ই। বেশ জোরের সঙ্গে বলল মার্টিন।

ব্রঙ্কসের ছেলেদের আপনি চেনেন?

না। আমি চিনতে চাই না। ওদের মানুষ বলে মনে করি না আমি।

ওরা আপনার মতে কী?

নরকের কীট। মার্টিন বলল।

মেজর হাসলেন, চলো, বাড়ি যাওয়া যাক। আমার অনেক কাজ বাকি আছে।

.

বাড়ি ফিরে স্নান সেরে মার্টিনকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মেজর জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি তোমার লাঞ্চ খাওয়ার ইচ্ছে নেই?

একদম সত্যি। যা খাইয়েছেন তার ভার এখনও বইছি।

বেশ। তবু যদি খিদে পায় ফ্রিজে টুকটাক পেয়ে যাবে। আমি চারটের মধ্যে ফিরে আসব। আর এই নাও নীচের দরজার ডুপ্লিকেট চাবি। বিশ্রাম নিতে না চাইলে আশপাশে ঘুরে এসো। মেজররা চলে গেলেন।

মেজর কোথায় যাচ্ছেন তা জিজ্ঞেস করেনি অর্জুন। নিশ্চয়ই কোনও ব্যক্তিগত কাজে যাচ্ছেন। তার মনে পড়ল, মেজর বলেছিলেন, আজ শ্রাদ্ধ করব নিজের, দাড়ি কামাব। নিশ্চয়ই কথাগুলো রসিকতা করে বলেছেন।

ব্যালকনিতে গেল অর্জুন। কাঠবিড়ালিরা ফুটপাতে, গাছে নিজেদের খেলা খেলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রাইভেট কার ছুটে যাচ্ছে সামনের রাস্তা দিয়ে। তারপরেই শব্দহীন হয়ে যাচ্ছে এই পাড়া। আশপাশের বাড়িগুলোর জানলা-দরজা বন্ধ। একজন প্রৌঢ়া মহিলা চেনে বাঁধা কুকুরকে নিয়ে ফুটপাতে হাঁটছেন অলসভাবে।

আকাশের দিকে তাকাল অর্জুন। জলপাইগুড়ির আকাশের সঙ্গে নিউ ইয়র্কের আকাশের কোনও পার্থক্য নেই। যত পার্থক্য মাটিতেই। হঠাৎ খেয়াল হল, এখানে আসার পর মাকে পৌঁছোনোর খবরটা দেওয়া হয়নি। মেজরের অনুমতি না নিয়ে ফোন করাটা উচিত কাজ হবে না।

আধঘণ্টা শুয়ে-বসে কাটিয়ে অর্জুন ঠিক করল আশপাশের এলাকাটা ঘুরে দেখতে। দরজা টেনে দিতেই বন্ধ হয়ে গেল। চাবি পকেটে নিয়ে সে হাঁটতে লাগল। ছবির মতো বাড়ি। কিন্তু এই দুপুরে সেগুলোকে জনশূন্য বলে মনে হচ্ছে। রাস্তাটা ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। বাঁক নিতেই বেশ কিছু দোকান এবং অফিস দেখতে পেল। মানুষজন দরকারে এসেছে এখানে। কেনাকাটা করছে, কাজ সারছে।

একটা কফির দোকান চোখে পড়ল। পকেটে ডলারগুলো আছে। এখানে কফির দাম নিশ্চয়ই খুব বেশি হবে না। কফি নিয়ে গোলটেবিলে বসল অর্জুন। এক ডলার নিল। দেশে চল্লিশ টাকা দিয়ে সে নিশ্চয়ই এক কাপ কফি খেত না। না, চল্লিশ টাকাকে এখন থেকে এক টাকা বলে ভাবতে হবে।

কফির দোকানে জনাপাঁচেক লোক বসে কফি খাচ্ছে। ঠিক পাশের টেবিলে একটা গোঁফওয়ালা শক্তপোক্ত মানুষ একটি তরুণকে খুব বোঝাচ্ছে, কিন্তু তরুণটি সমানে মাথা নেড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত গুফো লোকটি বিরক্ত হয়ে ছেলেটিকে হাত নেড়ে কিছু বলতে ছেলেটি যেন পালিয়ে বেঁচে গেল। যেহেতু ওরা ইংরেজিতে কথা বলছিল না, তাই অর্জুন কিছুই বুঝতে পারেনি।

গুঁফো লোকটি এবার অর্জুনের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ইংরেজিতে বলল, বেকার হয়ে থাকবে তবু কাজ করবে না। মাথা গরম হয়ে যায়।

অর্জুন মাথা নাড়ল, এরকম ছেলে সব দেশেই আছে।

হুম। আমাকে এখন আর-একটা ছেলেকে খুঁজে বের করতে হবে।

মনে হচ্ছে আপনার হাতে কাজ আছে? আছে।

কিন্তু কাজ করবে এমন লোক কম।

কী ধরনের কাজ জানতে পারি?

আমার একটা কুরিয়ার সার্ভিস আছে। চিঠি বা প্যাকেট ডেলিভারি দেওয়ার জন্যে তোক চাই। পার অ্যাসাইনমেন্ট পেমেন্ট করি, নো মাইনে।

ও।

আপনি কি আমেরিকান?

না। আমি ইন্ডিয়ান।

অনেক ইন্ডিয়ান এখানকার সিটিজেনশিপ নিয়ে আমেরিকান হয়ে গিয়েছে। তা আপনি এদেশে কবে এসেছেন?

গত কাল।

মাই গড! কতদিন থাকবেন?

বড়জোর দিনদশেক।

তা হলে আপনি টুরিস্ট?

লোকটি মুখ ফিরিয়ে নিল। কফি খেতে খুব ভাল লেগেছিল অর্জুনের। আর-এক কাপ খাওয়ার কথা চিন্তা করল সে। লোকটি টেবিলে আঙুল দিয়ে কিছু আঁকছে। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি আর-একটু কফি খাবেন?

লোকটা হাসল, হাফ কাপ খেতে পারি।

ওরা হাফ কাপ দেবে?

লোকটি বলল, আপনি বসুন, আমি নিয়ে আসছি।

লোকটি উঠে কাউন্টারে চলে গেল। তারপর দুটো কাপ নিয়ে ফিরে এল, একটা কাপ দু'ভাগ করে নিলাম।

আপনি দাম দিলেন কেন? আমিই তো খাওয়াতে চেয়েছিলাম?

এই যে চেয়েছিলেন তার দাম কফির দামের চেয়ে অনেক বেশি। নিন। লোকটি অর্জুনের টেবিলে বসল, আমার নাম জোসেফ। সবাই 'জো' বলে ডাকে।

আমার নাম অর্জুন।

একটু খটোমটো। অর ইজ ওকে। এই কফি খেয়ে আমাকে ব্রঙ্কসে যেতে হবে। ছোকরা কিছুতেই যেতে রাজি হল না। নোকটা কফিতে চুমুক দিল।

অর্জুন সোজা হল, ব্রঙ্কস! কেন?

একটা পার্সেল ডেলিভারি দেওয়ার আছে। আজই দিতে হবে। কুরিয়ার বিজনেসে দেরি করা মানে ক্লায়েন্ট হারানো। যে ছেলেটি রেগুলার কাজ করে সে আজ অসুস্থ হয়ে পড়ায় নতুন ছেলে খুঁজছিলাম। অগত্যা আমাকেই যেতে হবে। গুফো লোকটা, যার নাম জো, কফি শেষ করল।

অর্জুন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, কখন যাবেন?

এখনই। পাশেই আমার অফিস। সেখান থেকে পার্সেল নিয়ে টিউব ধরব।

কতক্ষণ লাগবে যেতে-আসতে?

ঘণ্টাতিনেক।

আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই তা হলে আপত্তি আছে?

আপনি যাবেন? কেন?

আমি কখনও ব্রঙ্কস দেখিনি।

ওটা মোটেই দেখার জায়গা নয়।

তবু, অনেক কথা শুনেছি।

গুঁফো জো একটু ভাবল। তারপর বলল, আপনাকে আমি কোনও পারিশ্রমিক দিতে পারব না, টিউবের টিকিটও আপনাকে কাটতে হবে।

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, ঠিক আছে।

জো-এর অফিসটা খুবই ছোট। কোনও কর্মচারী নেই। তালা খুলে পার্সেলটা নিয়ে আবার তালা বন্ধ করে মাথা নাড়ল জো।

মিনিট সাতেক হেঁটে টিউবস্টেশনে পৌঁছে গেল ওরা। জো-র কাছে কার্ড ছিল, বোধহয় টিউবে যাতায়াতের মাসিক কার্ড। অর্জুনকে টিকিট কাটতে হল আসা-যাওয়ার। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই হুড়মুড়িয়ে ট্রেন এসে গেল। নিউ ইয়র্কের সবক'টা দ্বীপকে মাটির নীচ দিয়ে বেঁধে ফেলেছে পাতাল রেল। মাটির নীচের সেই রেললাইনের ম্যাপ দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

ট্রেনে উঠে বেশ মজা লাগল। দুটো কালো ছেলে যন্ত্র চালিয়ে গান গাইছে আর নাচছে। গান গাইতে গাইতে যাত্রীদের সামনে টুপি পেতে ধরছে। তাতে খুচরো বা এক দুই ডলার দিচ্ছেন কেউ কেউ। ছেলে দুটোর পোশাক এবং ভঙ্গি দেখলে হিন্দি সিনেমার অভিনেতা বলে মনে হবে। অর্জুনের মজা লাগছিল। পশ্চিমবাংলার গ্রামগঞ্জের বাসে 'ভোলা মন' বলে চিৎকার করে যারা একতারা বাজিয়ে গান গায় তাদের সঙ্গে এদের মূলত কোনও পার্থক্য নেই। শুধু এই কালোসাহেব গাইয়ে ভিখিরিদের স্মার্টনেস দেশের ভিক্ষুকরা কোনওদিন রপ্ত করতে পারবে বলে মনে হয় না।

পাশাপাশি বসে ছিল জো আর অর্জুন। স্টেশনে ট্রেন থামছে আবার ছুটছে। একসময় গাইয়েরা নেমে গেল। হঠাৎ জো জিজ্ঞেস করল, আপনি দেশে কী করেন?

অর্জুন একটু ভাবল। তারপর এমন ভান করল যেন ট্রেনের চাকার শব্দে শুনতে পায়নি। জো এবার একটু গলা তুলে প্রশ্নটা করল। অতএব উত্তরটা দিতেই হল। শুনে চোখ বড় হয়ে গেল জো-এর, মাই গড! আপনি ডিটেকটিভ?

অর্জুন হাসল, না। আমি সত্যসন্ধানী। মিথ্যের আড়ালে চাপা পড়ে থাকা সত্যিটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।

এটা আপনার প্রফেশন?

মাথা নাড়ল অর্জুন, হ্যাঁ।

ডিটেকটিভ হন বা না হন, এইসব মানুষ অকারণে সময় নষ্ট করেন । আপনি ওই কফির দোকানে নিশ্চয়ই কিছুর খোঁজে এসেছিলেন? জো জিজ্ঞেস করল।

বিশ্বাস করুন, সময় কাটাতে ওখানে ঢুকেছিলাম। আমার পরিচিত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে নিউ ইয়র্কে এসেছি। এখানে আমি শুধু টুরিস্ট। অর্জুন হাসল।

কিন্তু আপনার তো বেশি বয়স নয়?

বোধহয় সেটাই আমার সুবিধে।

ও। কিন্তু আমি ব্রঙ্কস যাচ্ছি শুনে আপনি সঙ্গে যেতে চাইলেন কেন? যদি আমাকে কুইন্সে যেতে হত তা হলেও কি উৎসাহ দেখাতেন?

না।

তার মানে ব্রঙ্কসের ব্যাপারে আপনার বিশেষ আগ্রহ আছে। কেন?

শুনেছি ওখানে কুখ্যাত অপরাধীরা ঘোরাফেরা করে। পুলিশের সঙ্গে প্রায়ই তাদের মারপিট হয়। জায়গাটা দেখার ইচ্ছে হল। অর্জুন বলল।

আপনাকে একটা উপদেশ দিচ্ছি। ভুলেও ওখানে গিয়ে নিজের পরিচয় দেবেন না। তা হলে আপনি আর ফিরে আসতে পারবেন না। জো বলল।

মনে থাকবে। অর্জুন মাথা নাড়ল।

৬-৮. মাটির নীচ থেকে

০৬.

মাটির নীচ থেকে উপরে উঠে এসে প্রথমে মনে হল, নিউ ইয়র্ক শহরের প্রান্ত এলাকার সঙ্গে কোনও ফারাক নেই। লোকজন দ্রুতগতিতে হাঁটছে। কিছুটা চলার পর অর্জুন লক্ষ করল, ক্রমশ কালো মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দূরে বিকট শব্দ হতেই জো অর্জুনকে নিয়ে একটা দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দোকানদার কিছু বলতে চাইলে জো বলল, ভাই, তিন মিনিটের বেশি থাকব না। ও কে!

তখনই দৃশ্যটা দেখতে পেল অর্জুন। পাশাপাশি ছ'টা মোটরবাইক, পিছনে অন্তত আঠারোটা মাঝারি গতিতে এগিয়ে আসছে। সাদা-কালো মিশিয়ে স্বাস্থ্যবান চালকদের পরনে চামড়ার প্যান্ট, হাতকাটা জ্যাকেট। হাতে নানানরকম উল্কি আঁকা। প্রত্যেকের চুলে বেণি, কাঁধের উপর লুটোনো। চোখগুলো রোদচশমায় ঢাকা, মুখে দাড়ির জঙ্গল। ওদের আসতে দেখে রাস্তা ফাঁকা করে সবাই ফুটপাতের ওধারে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দৃশ্যটি দেখলেই ভয় জাগবেই। ওরা ওপাশের রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে যেতেই জো বলল, চলুন।

এরা কারা? হাঁটতে হাঁটতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

ঈশ্বর পৃথিবীতে পাঠাবার সময় ওদের বুকে দয়ামায়া, ভালবাসা বোধগুলো দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। জো বলল।

এরাই তা হলে সেই কুখ্যাত অপরাধী? পুলিশ ধরছে না কেন?

অপরাধ করলেই ওরা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। এখন যাদের দেখলেন, তাদের বিরুদ্ধে কেউ পুলিশের কাছে কোনও নালিশ করেনি।

দুটো সাদা ছেলে একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখেই বোঝা যায় অনেকদিন স্নান করেনি। চুলে নানারকমের রং। হাতকাটা গেঞ্জি আর জিনস পরনে। কিছু একটা চিবুচ্ছিল ওরা। ওদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একজন পা সামনে তুলে দিয়ে পথ আটকাল। দ্বিতীয়জন জিজ্ঞেস করল, ইউ স্টে হিয়ার?

জো মাথা নাড়ল, নো।

ছেলেটা খ্যাকখ্যাক করে হাসল, তোমার পকেটে যা আছে তা বের করো? কুইক।

বের তো করতেই পারি ব্রাদার, কিন্তু তুমি মুশকিলে পড়বে। জো বলল।

মুশকিলে পড়ব? হা হা হা। আমি কথা বলি কিন্তু ও ছুরি চালাতে ভালবাসে।

বেশ নাও। পকেটে হাত ঢোকাল জো, কিন্তু একটু পরেই মিস্টার ডি সিলভার কাছে তোমাদের যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ছেলেটা পা নামিয়ে দিল, ইউ নো হিম?

হি ইজ মাই ক্লায়েন্ট।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দুটো যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গি করে উলটো দিকে তাকিয়ে থাকল।

আবার হাঁটা শুরু করতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ডি সিলভা কে?

এই পাড়ার গড ফাদার। জো জবাব দিল।

একটা ছোট্ট আধা অন্ধকার বারে ঢুকল জো। সেখানে চার-পাঁচজন ছড়িয়েছিটিয়ে বসে। বারম্যানকে জো ডি সিলভার কথা জিজ্ঞেস করতে সে মুখের ইশারায় পাশের দরজা দিয়ে ভিতরে যেতে বলল। দরজাটা ভেজানো।

জোর সঙ্গে ভিতরে ঢুকে অর্জুন দেখল, বিশাল চেহারার একটা লোক টেবিলে বসে দাবা খেলছে। তার সামনে কেউ নেই। লোকটার ঊর্ধ্বাঙ্গের অনেকটা জ্যাকেটে ঢাকা পড়েছে। সেখানে প্রচুর উল্কি আঁকা।

জো বলল, হাই! কেমন আছ?

মরে যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত আমি খারাপ থাকব না। অনেক দিন পর এলে? লোকটি দাবার বোর্ড থেকে চোখ না সরিয়ে কথাগুলো বলল।

আমার কর্মচারী অসুস্থ বলে আসতে হল। মিস্টার কার্ভালার নামে একটা পার্সেল এসেছে টেক্সাস থেকে। জো বলল।

কাভার্লো এখন মাটির নীচে। মাসখানেকের মধ্যে উপরে উঠবে না।

ও।

ফালতু খুন করে ঝামেলায় পড়েছে। উপরে উঠলেই পুলিশ ওকে ধরবে।

ডি সিলভা বলল, তুমি যদি চাও তা হলে কাউকে সঙ্গে দিয়ে তোমাকে নীচে পাঠাতে পারি। না হলে আমাকে দিয়ে যেতে পারো।

তুমিই নাও। দয়া করে ওকে দিয়ে দেবে।

এটি কে? ডি সিলভা বোর্ডের চাল দিল।

আজ থেকে আমার কাজ করছে। ওকে চেনানোর জন্যে সঙ্গে এসেছি।

একটা নাম নিশ্চয়ই আছে।

অর। জো বলল।

অর? অবাক হয়ে তাকাল ডি সিলভা। তারপর অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ল। শেষে হাসি থামতে বলল, আমি বাবার জন্মে এমন নাম শুনিনি। সুতরাং তুমি হলে অলটারনেটিভ। কোন দেশ থেকে এসেছ?

ইন্ডিয়া। অর্জুন বলল।

ইন্ডি! মাথা নাড়ল ডি সিলভা, এখানে এসে যদি কোনও প্রবলেমে পড়ো তা হলে আমার নাম বলবে। কিন্তু মনে রেখো, এই তিনটে ব্লকে। তার বাইরে নয়।

বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়ল অর্জুন।

পার্সেলটা ডি সিলভাকে দিয়ে দিল জো। সেটা তুলে কানের কাছে নিয়ে গিয়ে ঝাঁকাল ডি সিলভা। তারপর গন্ধ শুকল। এবার হাসি ফুটল তার মুখে। তারপর সেলফোনের বোতাম টিপল। সেটা কানে লাগিয়ে ধরতেই ওপারের সাড়া পেয়ে হাসতে হাসতে যে ভাষায় কথা বলে গেল, সেটা সম্ভবত স্প্যানিশ। বিন্দুবিসর্গ বুঝল না অর্জুন। লোকটি ফোনে কথা বলছে চেঁচিয়ে। মোটা শরীর কাঁপিয়ে হাসছে। শেষে সেলফোন বন্ধ করে ডি সিলভা বলল, কার্ভালো খুব এক্সাইটেড। ও তোমাকে কিছু দেবে কুরিয়ার করার জন্যে।

কীভাবে দেবে?

ও তো উপরে উঠবে না। তুমি নীচে গিয়ে দেখা করে এসো।

আমাকে নীচে যেতে হবে? জো-এর মুখ শুকিয়ে গেল।

তুমি তো এর আগে নীচে নেমেছ?

হ্যাঁ। কিন্তু মিস্টার ডি সিলভা, ওখানে না গেলেই খুশি হব।

এই সময় একটা বাইকের আওয়াজ বাইরের রাস্তায় থামল। তারপর দরজায় শব্দ হল। একটা লোক মাথা গলিয়ে বলল, বেন দেখা করতে চাইছে।

পাঠিয়ে দাও। কিন্তু তুমি ওর পিছনে থেকো। ডি সিলভা বলল।

তারপরই যে ছেলেটি ঢুকল তাকে পাঙ্ক ছাড়া কিছু মনে হয় না। চুল রঙিন এবং মাথার উপরে খাড়া হয়ে আছে। হাতে-গলায় উল্কি। পরনে বারমুডা আর হাতকাটা জ্যাকেট। মুখের চেহারা নির্বিকার। উল্কিগুলো সাপের।

বেন বলল, কার্ভালো ফোনে বলল আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

আমি শুনছি তুমি নাকি প্রায়ই ব্রঙ্কসের বাইরে যাচ্ছ?

প্রায়ই না, গত কাল গিয়েছিলাম।

আই ডোন্ট লাইক দ্যাট।

আমার মনে থাকবে। কিন্তু শুধু আমার বেলায় এই নির্দেশ কেন?

তুমি কি তোমার বন্ধুর কথা বলছ? ওকে আমি যেতে দিই। কারণ, ওর যাওয়ার পিছনে সেন্টিমেন্টাল কারণ আছে। যাকগে, তুমি এই ভদ্রলোককে কার্ভালোর কাছে নিয়ে যাও। জো, ফলো হিম। ডি সিলভা বলল।

আমি কি আপনার প্রাইভেট প্যাসেজ ব্যবহার করতে পারি?

যদিও আমি পছন্দ করি না, তবু, জো-এর জন্যে। হাত নাড়ল ডি সিলভা।

জো অর্জুনকে অপেক্ষা করতে বলে বেনকে অনুসরণ করে ভিতরে চলে গেল।

ডি সিলভা তার কর্মচারীকে বলল, অ্যাসকে বলবে বেনের উপর নজর রাখতে। ওর চালচলন আমার ভাল লাগছে না।

লোকটি বেরিয়ে গেলে অর্জুন বলল, আমি কি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারি?

নিশ্চয়ই। কিন্তু বেশি দূরে যাবেন না। ডি সিলভা আবার দাবার বোর্ডের সামনে গেল।

অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল। আকাশে হঠাৎই মেঘ জমছে। ছায়াছায়া হয়ে আছে সামনের পথ। হঠাৎ চিৎকার কানে এল। একটা লোক প্রাণভয়ে দৌড়ে যাচ্ছে আর তার পিছনে ছুটছে তিনটে ছেলে। বীভৎস চিৎকার করছে ছেলেগুলো। একটা পুলিশের গাড়ি দ্রুত সেদিকে যেতে আচমকা চিৎকার থেমে গেল। ছেলে তিনটে পাশের বাড়িগুলোর খাঁজে উধাও। পুলিশ লোকটিকে জিজ্ঞেস করে গাড়িতে তুলে চলে গেল।

অর্থাৎ জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। দু'পাশের ফুটপাতে যে সমস্ত মানুষ চলাফেরা করছে তাদের দেখে কিন্তু অপরাধী বলে মনে হল না। নিতান্তই সাংসারিক মানুষ। এই সব কাণ্ডের মধ্যেও এরা এখানে আছে। অদ্ভুত ব্যাপার!

হঠাৎ ফুটপাতের গায়ে দাঁড় করানো মোটরবাইকের উপর নজর পড়ল অর্জুনের। ঝকঝকে বাইক। দেখতে বেশ সুন্দর। সে সামনে গিয়ে চাকার দিকে তাকাতেই কীরকম অস্বস্তি এল মনে। টায়ারের উপরে যে ডিজাইনটা রয়েছে তা যেন সে আগেও দেখেছে। বাইকের পিছনের রাস্তায় কাদার উপরে যে ছাপটা পড়েছে তা দেখামাত্র অর্জুন বুঝতে পারল, মিস্টার ব্রাউনের বাড়ির গায়ে এই রকম চাকার ছাপ সে দেখেছিল। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, ওখানেও একই বাইক গিয়েছিল। একই কোম্পানির চাকা অনেক বাইকে থাকাই স্বাভাবিক। অর্জুন দেখল, আর-একটা মোটরবাইক তার সামনে এসে দাঁড়াল। এই ছেলেটির পরনে ফ্যাকাশে জিন্স আর টি শার্ট। বেশ শক্তপোক্ত চেহারায় বাইক থেকে নেমে ছেলেটি আগের বাইককে দেখল। ঠিক তখনই ডি সিলভা এসে দাঁড়াল দরজায়।

এখানে কী দরকার? ডি সিলভার কোমরে হাত।

পুলিশ আমাকে খুঁজছে। ওরা আমার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ এনেছে। ছেলেটি নার্ভাস।

কেন?

আমি জানি না। আমার মা নাকি হাসপাতালে। ওরা মনে করছে, আমি নাকি তাঁকে ছুরি মেরেছি। ঈশ্বরের দিব্যি, আমি আমার মাকে কখনওই তা করতে পারি না।

কে বলল তোমাকে?

থানা থেকে খবরটা এসেছে। আমি আমাদের এলাকার হাসপাতালে ফোন করে জেনেছি, মাকে কাল রাতে ভরতি করা হয়েছে। মিস্টার ডি সিলভা, আপনি আমাকে বাঁচান। প্লিজ। আমি আমার মাকে স্পর্শ পর্যন্ত

করিনি। ছেলেটি বলল।

তুমি তো কাল বাড়িতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ। কেউ সাড়া দেয়নি। দরজা খোলেনি। আমি চলে এসেছিলাম।

তা হলে কে ছুরি মেরেছে?

আমি জানি না।

ঠিক আছে। তুমি ড্যানিয়েলের কাছে চলে যাও। আমি বলে দিচ্ছি।

থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ। বলে ছেলেটি বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেল। ডি সিলভা অর্জুনের দিকে তাকিয়ে হাসল, খুব সুন্দর জায়গা, না? বেশ পিসফুল!

এই সময় বেন আর জো বেরিয়ে এল। বেন বলল, আমি কি যেতে পারি?

শিয়োর। ডি সিলভা বলল।

সে বাইক নিয়ে চলে যেতে জো বলল, আমার কাজ হয়ে গিয়েছে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মিস্টার ডি সিলভা।

ডি সিলভা বলল, নেক্সট টাইম তোমার আসার দরকার নেই। অরকে পাঠিয়ে দিয়ো। হ্যাভ এ নাইস ডে। বলে ভিতরে চলে গেল লোকটি।

দ্রুত হেঁটে ওরা টিউব স্টেশনে পৌঁছে গেল। ট্রেনে উঠে জো জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখলেন? দেখার ইচ্ছে নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়েছে?

কিছুটা। কিন্তু আপনি অত দূর থেকে এখানে ডেলিভারি দিতে কেন আসেন? ওরা তো এখানকার কোনও কুরিয়ার কোম্পানিকে পাঠাতে পারে। আপনাকেও এখানে আসার ঝুঁকি নিতে হয় না। অর্জুন বলল।

ওদের পক্ষে এখানকার কুরিয়ার ব্যবহার করা সম্ভব নয়। যে-কোনও মুহূর্তে পুলিশের হাতে চলে যেতে পারে বলে এত দূরে আমার কাছে পাঠায়। আর আমি আসি, কারণ, ওরা অনেক গুণ বেশি অর্থ দেয়। হাসল জো।

.

০৭.

খুব উত্তেজিত হয়ে মেজরের বাড়িতে ফিরে এল অর্জুন। টিউব থেকে নেমে রাস্তা নিয়ে একটু ধন্দে পড়েছিল সে। জো তাকে সাহায্য করল। বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। বেল না বাজিয়ে

মেজরের দেওয়া চাবি দিয়ে দরজা খুলে উপরে উঠতে উঠতে ঘড়ি দেখল সে। সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছে।

দোতলার ঘরে কেউ নেই। টেবিলে একটা চিরকুট পেপারওয়েটের নীচে রয়েছে। তাতে মেজর লিখেছেন যে, তিনি মিসেস ব্রাউনকে দেখতে যাচ্ছেন। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ফিরে আসবেন। কিছু খাওয়ার ইচ্ছে হলে মাইক্রোওভেন চালু করে নিতে পারে।

অতএব এই ফাঁকা বাড়িতে স্নান সেরে মাইক্রোওভেন অন করে গরম খাবার নিয়ে টেবিলে বসল অর্জুন। বোনলেস মাংসের সঙ্গে নানান সবজি দিয়ে রান্না উপাদেয় ঝোল খেতে বেশ ভালই লাগল।

খেয়েদেয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে বসল সে। এখনও বাইরেটা বেশ ঝকঝকে, রোদ্র সরতে অনেক দেরি। এখানে সন্ধে হয় রাত আটটার পরে। কাঠবিড়ালিগুলো একইভাবে লাফালাফি করে চলেছে।

জিম ব্রাউনের ছেলের সঙ্গে ওইভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবেনি অর্জুন। আচ্ছা, এটাকে কি কাকতালীয় বলে? তা কেন? ছেলেটি যে ব্রঙ্কসে থাকে তা তো সে আগেই শুনেছিল। হ্যাঁ, জো-এর সঙ্গে ডি সিলভার কাছে না গেলে নিশ্চয়ই ওর দেখা পাওয়া যেত না। ছেলেটির পোশাক, চালচলনে রুক্ষ ভাব থাকলেও কথা বলার সময় বোঝা যাচ্ছিল, ওর মধ্যে নরম ভাবও রয়েছে। মুখের গড়ন অবশ্য মিস্টার ব্রাউনের মতো নয়। পুলিশ ওকে আততায়ী বলে ভাবছে। মিস্টার ব্রাউন যদি স্টেটমেন্ট দেন, তা হলে সেটা ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু মিসেস ব্রাউন কথা বলতে পারলে পুলিশের ধারণা অবশ্যই বদলাবে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল, ডি সিলভাকে ধরলে ওই ছেলেটির কাছে পৌঁছোনো যাবে।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল রাস্তা ছেড়ে বাড়ির সামনে। ন্যাড়ামাথা গোলগাল এক ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে উপরের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারা করলেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, কার খোঁজ করছেন? এখন বাড়িতে আমি একা।

চাবি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছি, দয়া করে দরজাটা খোলো। মেজরের গলা শুনে চমকে উঠল অর্জুন। ইনিই এতকালের চেনা মেজর? নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। দৌড়ে নীচে নেমে সে চিৎকার করল, এ কী করেছেন?

কেন? শ্রাদ্ধ করলে মাথার চুল আর দাড়ি কামাতে হয়। হয় না?

আপনি সত্যি সত্যি নিজের শ্রাদ্ধ করে এলেন?

সেটা দুপুরে। এখন আমি ফ্রিম্যান, মুক্তপুরুষ। মেজর হাসলেন, এখন আমি নো-ম্যানস ল্যান্ডে রয়েছি বলে ভাবতে পারো।

নো-ম্যানস ল্যান্ড মানে?

দুটো দেশের সীমানা যেখানে শেষ হয় সেখানে কিছুটা খালি জায়গা রাখা হয়। সেই জায়গাটাকে নো-ম্যানস ল্যান্ড বলা হয়। আমি সংসার জীবন থেকে ছুটি নিয়েছি আবার পরলোকে যেতে দেরি হচ্ছে বলে এই নো-ম্যানস ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি।

আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?

অতিরিক্ত সুস্থ আছে। এখন এই বাড়ি, আসবাব, এমনকী এই শরীর দেখে মনে হচ্ছে এসব আমার নয়। কোনও পিছুটান নেই। আহা, কী যে আনন্দ হচ্ছে!

তা হলে শহরে আছেন কেন? পাহাড়ের নির্জনে চলে যাওয়াই তো ভাল ছিল।

পাহাড়ে নির্জনতা আছে একথা তোমাকে কে বলল? শহরে থেকেই আমি আমার চারপাশে নির্জনতা তৈরি করতে পারি। মেজর মাথা নাড়লেন।

তা হলে মিস্টার ব্রাউনের স্ত্রীকে দেখতে গেলেন কেন?

ও! তুমি এটা বুঝলে না? জিম আমাকে দেখে চমকে উঠল। প্রথমে চিনতেই পারেনি। এতে আমি আনন্দিত হলাম।

মিসেস ব্রাউনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ইয়েস। হয়েছে। ওঁর জ্ঞান ফিরেছে। আমাকে চিনতে পারেননি, তাই কথাও হয়নি। জিমের কাছে শুনলাম উনি পুলিশকে বলেছেন, ছেলের ব্যাপারে কথা বলবে বলে একটি ছেলে তাঁর কাছে এসেছিল। সে এসে সরাসরি এক লক্ষ ডলার চায়। না দিলে ছেলেটিকে খুন করা হবে। তিনি চিৎকার করে উঠতে ছেলেটি তাঁকে ছুরি মারতে থাকে। এর পর তার কিছু মনে নেই।

তার মানে এই দাঁড়াল, আমার ধারণা সত্যি। অর্জুন হাসল।

জিমের ধারণা ভুল হওয়ায় তোমার উপর তার আস্থা বেড়ে গিয়েছে।

মেজর বললেন, ফ্রিজে কিছু খাবার ছিল। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করেছ?

হ্যাঁ।

তোমার দিনটা নিশ্চয়ই ভাল কাটেনি?

উঁহু। দারুণ কেটেছে।

কীরকম?

আমি আজ ব্রঙ্কসে গিয়েছিলাম। অর্জুন বলল।

অ্যাঁ? চোখ বড় হয়ে গেল মেজরের, তুমি একা গিয়েছ?

না। অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর জো-এর সঙ্গে আলাপ হওয়া, তার সঙ্গে ব্রঙ্কসে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে জো-কে রাজি করানো ইত্যাদি ঘটনা মেজরকে জানাল।

মেজর খুবই উত্তেজিত। বললেন, এক্ষুনি জিমকে জানানো দরকার যে, তোমার সঙ্গে ওর ছেলের দেখা হয়েছে।

দেখা হয়েছে কিন্তু পরিচয় হয়নি। তা ছাড়া উনি চাইলেই ছেলের কাছে পৌঁছোতে পারবেন না। অর্জুন বলল।

না পারুক। খবরটা দেওয়া উচিত।

মিস্টার ব্রাউন এখনও হাসপাতালে?

না। ও বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। ওর মা অসুস্থ। তাকে দেখাশোনা করতে হয়। বাড়িতে ফোন করলে পাওয়া যাবে ওকে।

মেজর চলে গেলেন ল্যান্ডলাইনে ফোন করতে। অর্জুন তাকিয়ে ছিল। মেজরের চেহারা একদম বদলে গিয়েছে। কিন্তু চেহারাই বদল হয়েছে, কথাবার্তা, উৎসাহ সব আগের মতো রয়েছে। নো-ম্যানস ল্যান্ডে থাকার কথা বলছেন। কিন্তু সেটা স্বভূমি থেকে কীসে আলাদা তা বোঝা যাচ্ছে না।

মেজর রিসিভার হাতে নিয়ে গলা তুললেন, অর্‌জুন, জিম তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। ও খুব এক্সাইটেড।

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে রিসিভার নিয়ে বলল, গুড ইভনিং মিস্টার ব্রাউন!

গুড ইভনিং অ-র-জুন। আমি, আমি খুব দুঃখিত। আমি তোমাকে আন্ডারএস্টিমেট করেছিলাম। এখনও চব্বিশ ঘণ্টা কাটেনি, অথচ তুমি এর মধ্যে মিরাকেল করেছ।

আমি কিছুই করিনি। আচমকাই হয়ে গিয়েছে।

আমার ছেলেকে কেমন দেখলে?

ভাল।

তুমি কথা বলার সুযোগ পাওনি?

প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলাম, তখন সুযোগ ছিল না।

অ-র-জুন। ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা দরকার। আমার স্ত্রী ওকে ছেড়ে থাকতে পারছে না। আমার মা-ও ওকে দেখতে চাইছেন। এখন আমার মন বলছে তুমি পারবে ওকে ফিরিয়ে আনতে। তোমার পারিশ্রমিক বাবদ আমি পাঁচ হাজার ডলার কালই পাঠিয়ে দেব। এটা অগ্রিম। কাজে সফল হলে বাকি পাঁচ হাজার দেব। রাখছি। ফোন রেখে দিলেন জিম ব্রাউন।

পাঁচ হাজার ডলারে কত টাকা হয়? হিসেবটা মনে-মনে করতেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, পাগল! একদম পাগল!

মেজর তাঁর কামানো গালে হাত বোলাচ্ছিলেন, একদম পাগল বলছ? অর্ধেক নয়?

আপনি ভাবতে পারেন, ভদ্রলোক কাল দু'লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দেবেন অ্যাডভান্স হিসেবে। যদি কাজ শেষ করতে পারি তা হলে আরও দু'লক্ষ দেবেন। এত টাকা পাওয়ার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এবং এই কাজের জন্যে এত পাওয়ার কোনও কারণই নেই। অর্জুন বলল।

মাথা নাড়লেন মেজর, আফ্রিকার দুর্গম জঙ্গলে মুটুম্বু জাতের আদিবাসী শিশুরা যে পাথর ঘষে ঘষে মার্বেল বানিয়ে খেলত, তা একদল আমেরিকান অভিযাত্রী কৌতূহলবশে কুড়িয়ে নিয়ে এসে জানল, ওগুলো মহামূল্য হিরে। অতএব তোমার কাজের মূল্য তুমি যা নির্ধারণ করবে সেটা সঠিক না-ও হতে পারে। যাই, স্নান করে আসি। মেজর চলে গেলেন। হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অর্জুন।

.

সকালে মেজরের ঘরে গিয়ে অর্জুন দেখল, তিনি গম্ভীর মুখে বসে আছেন। সে গুড মর্নিং বলতে মেজর মাথা নাড়লেন একবার।

কী হয়েছে?

বাংলায় যাকে অম্বল বলে, তাই।

অ্যান্টাসিড খেয়েছেন?

না। এই শরীর যেমন অম্বল তৈরি করেছে তেমনই তার দায়িত্ব সেটা দূর করা। বাইরে থেকে ওষুধ পাঠিয়ে তাকে সাহায্য করব না।

কেন?

শ্রাদ্ধের পর এই শরীর সম্পর্কে কোনও মোহ না থাকাই উচিত।

জল খান। তিন-চার গ্লাস। জল ওষুধ নয়।

মাথা নাড়লেন মেজর, সেটা খাওয়া যেতে পারে।

আমি ভাবছি, মিসেস ব্রাউনকে দেখতে যাব। কীভাবে যাব?

মার্টিনকে বলো। ও গাড়ি ড্রাইভ করবে।

টিউবের রুটটা কী?

আহা, গাড়িটা তো পড়েই আছে। ওটা নিয়ে যাও।

মার্টিন এককথায় রাজি। অতএব চা খেয়ে রওনা হল ওরা।

.

০৮.

হাসপাতালের পার্কিং-এ গাড়ি পার্ক করে মার্টিন বলল, আমি এখানেই থাকি। ভিতরে গিয়ে তো কিছুই করার নেই। এখানে দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।

অতএব একাই রিসেপশনে গিয়ে মিসেস ব্রাউনের খোঁজ নিল অর্জুন। সুন্দরী বললেন, আপনার নাম আর আই ডি দেখান। মাত্র তিনজন গেস্টকে ওঁর কাছে যেতে অ্যালাউ করা হচ্ছে।

অর্জুন তার পাসপোর্ট বের করে এগিয়ে দিল। সুন্দরী সেটা দেখেকম্পিউটারের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বললেন, লিটে তিনতলায় চলে যান।

তিনতলায় লিট থেকে বের হতেই এক সিকিউরিটি গার্ড এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, অ-র-জু-ন?

অর্জুন মাথা নাড়তে লোকটি দু'হাত দিয়ে ওর পোশাক, শরীর সার্চ করল। কিছু না পেয়ে বলল, আমার সঙ্গে আসুন।

একটা কেবিনে প্রৌঢ়া শুয়ে আছেন। তার কাঁধে-হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। সিকিউরিটির লোকটি বলল, আপনার গেস্ট। অ-র-জুন।

ও। আপনার কথা জিম বলছিল! ভদ্রমহিলা ধীরে ধীরে কথা বলছেন। বোঝা গেল তিনি এখনও অসুস্থ।

মিস্টার ব্রাউন আসেননি?

মাথা নাড়লেন মহিলা, আমার শাশুড়ি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

উনি কি আপনাকে বলেছেন যে, আমি আপনার ছেলেকে দেখেছি?

হ্যাঁ। কী বলে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে? আপনি ওকে যেমন করে হোক আমার কাছে নিয়ে আসুন। কাতর চোখে তাকালেন ভদ্রমহিলা।

চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি সব কথা পুলিশকে বলেছেন? পুলিশ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে?

হ্যাঁ। বলেছি। জিম বোধহয় আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

যে ছেলেটি আপনাকে ছুরি মেরেছিল তাকে মনে আছে?

মাথায় খাড়া হয়ে থাকা রঙিন চুল। হাত কাটা জ্যাকেট। হাতে সাপের উল্কি আঁকা। বেশি বয়স নয়। চোখ বন্ধ করলেন মহিলা।

সঙ্গে সঙ্গে ডি সিলভার সঙ্গে দেখা করতে আসা বেনের মুখ মনে পড়ে গেল অর্জুনের। মিসেস ব্রাউনের বর্ণনার সঙ্গে বেনের যথেষ্ট মিল।

দূরে দাঁড়ানো সিকিউরিটির লোক এগিয়ে এসে বলল, এবার ওঁকে বিশ্রাম নিতে দিন, প্লিজ।

লিফটে উঠল অর্জুন। সেটা দোতলায় এসে থেমে গেল। দরজা খুলল। দু'জন মানুষ লিফটে ঢুকলেন। অর্জুন অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ চিৎকার শুনতে পেল, আপনি?

লিফ্ট ততক্ষণে একতলায় নেমে এসেছে। সে অবাক হয়ে তাকিয়েই হেসে ফেলল, আরে! আপনি!

আপনি এখানে কী করছেন? লিজা ক্লিন্টন অর্জুনের হাত ধরে বেরিয়ে এল, এভাবে আবার দেখা হবে ভাবতে পারিনি।

আমি আমার এক পরিচিত ভদ্রমহিলাকে দেখতে এসেছিলাম। আপনি?

আপনাকে যে বৃদ্ধার কথা বলেছিলাম তাঁকে দেখতে এসেছিলাম। আপনি শুনলে খুশি হবেন, উনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। লিজা বলল।

বাঃ। বেশ ভাল খবর। অর্জুন বলল, আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে?

হ্যাঁ। আমি ওঁকে সব কথা বলেছি।

শুনে ওঁর কী প্রতিক্রিয়া হল?

আমাকে খুব বকলেন। বললেন, কাজটা খুব অন্যায় হয়েছে। ওঁর ভাইপো যদি বুদ্ধিমান হত তা হলে উনি খুন হয়ে যেতেন। তা নয় বলে এখন শুধু তার পা ভেঙেছে। আমি বললাম, উনি পুলিশকে ডেকে সব কথা জানিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু বৃদ্ধা রাজি হলেন না। বললেন, যেহেতু আমি তাকে নিজে থেকে সব জানিয়েছি তাই তিনি ক্ষমা করে দিচ্ছেন। লিজা হাসলেন, এখন

অনেক হালকা লাগছে।

ওঁর ভাইপো, যিনি আপনাকে বিয়ে করতে চান, তাঁর খবর কী?

তার সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। লিজা কাঁধ নাচালেন।

কথা বলতে বলতে ওঁরা হাসপাতালের বাইরে চলে এসেছিলেন। লিজা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় উঠেছেন?

কুইন্সের ইউনিয়ন টার্নপাইকে।

আত্মীয়ের বাড়িতে?

না। তার চেয়েও বেশি, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়িতে।

লিজা অবাক হয়ে তাকালেন, কোনও ফোন নাম্বার?

এই রে। ওটা তো জানতে চাইনি। হাতব্যাগ খুলে একটা চিরকুটে নিজের নাম্বার লিখে এগিয়ে ধরলেন লিজা, এটা রাখুন। আশা করি আমাকে ফোন করবেন। আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?

লং আইল্যান্ডে। কোনও কাজ করার না থাকলে যেতে পারেন।

একটু ভাবলেন লিজা। তারপর বললেন, বেশ। কিন্তু আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে?

হ্যাঁ।

তা হলে আমাকে ফেরার সময় একটা টিউব স্টেশনে নামিয়ে দেবেন যেখান থেকে আমি ব্রুকলিনে যেতে পারি। আমি ওখানেই থাকি।

লং আইল্যান্ড থেকে ব্রুকলিন কতটা দূর?

টিউবে বেশি সময় লাগে না।

মার্টিনের সঙ্গে লিজার আলাপ করিয়ে দিয়ে অর্জুন বলল, সে মিস্টার ব্রাউনের বাড়িতে যেতে চায়। সে কি বাড়িটা চেনে?

মার্টিন বলল, সে এর আগে মিস্টার মেজরকে নিয়ে দু'বার ওই বাড়িতে গিয়েছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে মার্টিন বলল, অ-র-জুন, ওই ছেলেটি আজও এসেছিল। তবে একা নয়, সঙ্গে একটা কালো ছেলে ছিল।

কোন ছেলেটি?

যে কাল সিকিউরিটির তাড়া খেয়ে বাইকে চড়ে পালিয়েছিল।

ওরা কি ভিতরে ঢুকেছিল?

ছেলেটি ঢোকেনি। ও যাকে এনেছিল সে ঢুকেছিল। কিন্তু মিনিট চারেকের মধ্যে বেরিয়ে এসে ছেলেটির সঙ্গে চলে গেল।

তুমি সিকিউরিটিকে জানালে না কেন?

কালকের সিকিউরিটির লোকরা আজ ডিউটিতে ছিল না। আমি তাদের বলতে গেলে ওরা কিছুই বুঝত না। গাড়ি চালাতে চালাতে মার্টিন বলল।

লিজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

আমরা যে ভদ্রলোকের বাড়িতে যাচ্ছি তার স্ত্রীকে একটি ছেলে ছুরিতে আহত করেছিল। সেই ছেলেটিকে গত দু'দিন হাসপাতালে আসতে দেখা যাচ্ছে। অর্জুন বলল।

সর্বনাশ! আপনারা পুলিশকে জানাচ্ছেন না কেন?

হ্যাঁ। এটা জানানো দরকার।

ছেলেটি কি ভদ্রমহিলার চেনা?

না। ও এসেছিল ব্রঙ্কস থেকে।

মাই গড। চোখ বন্ধ করলেন লিজা।

কী হল? অর্জুন তাকাল।

ওখানকার ছেলেরা ডেঞ্জারাস হয়। পুলিশ ওদের নিয়ে নাজেহাল!

.

জিম ব্রাউন লিজাকে দেখে অবাক হলেন। অর্জুন লিজার পরিচয় দিল, আমার সঙ্গে প্লেনে আলাপ। আজ আবার দেখা হয়ে গেল হাসপাতালে। মিসেস ব্রাউন বললেন, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন?

হ্যাঁ। আমি একটু আগে তোমাকে ফোন করেছিলাম। মেজর বললেন, তুমি হাসপাতালে গিয়েছ। অ-র-জুন, আমার মা খুব অসুস্থ। উনি নাতিকে দেখতে চান। নাতির কথা ভেবে ভেবেই ওঁর শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বলে মিস্টার ব্রাউন একটা টেবিলের ড্রয়ার খুলে খাম বের করলেন। সেটা অর্জুনের দিকে এগিয়ে ধরলেন, নাও।

কী?

তোমাকে বলেছিলাম, আজ অগ্রিমবাবদ এটা দেব।

মাথা নাড়ল অর্জুন, মিস্টার ব্রাউন। ওটা আপাতত রেখে দিন। আমি এই শহরে নতুন। আমার কোনও ক্ষমতাও এখানে নেই। এদেশে এসেছি টুরিস্ট হিসেবে। তাই আমার প্রফেশনাল কাজ এদেশে করে আমি পারিশ্রমিক নিতে পারি না।

কিন্তু!

এদেশের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যেন কোনও সমস্যা হলে পুলিশকে জানাই, নিজে কিছু না করি। অর্জুন হাসল, আজ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সিকিউরিটি অফিসারের জন্যে বেশি কথা বলতে পারিনি। আততায়ী ছুরি মারার আগে ওঁকে নিশ্চয়ই কিছু বলেছিল?

খামটা আবার ড্রয়ারে রেখে দিয়ে মিস্টার ব্রাউন বললেন, হ্যাঁ। ও আমার ছেলের নাম করে পাঁচ হাজার ডলার চেয়েছিল। না দিলে নাকি আমার ছেলে খুব বিপদে পড়বে। আমার স্ত্রী তার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চেয়েছিল। তখন তর্ক শুরু হয়। সেই সময় ছেলেটি ছুরি মারে। মাথা ঠান্ডা রেখে আমার স্ত্রী আহত অবস্থাতেই মেঝেয় পড়ে গিয়ে এমন ভান করে, যাতে ছেলেটি ভেবে নেয় যে, ও মারা গিয়েছে। ভয় পেয়ে সে পালায়।

লিজা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, ওই ছেলেটির ব্যাপারে কিছু করা উচিত।

অর্জুন তখন ব্রঙ্কসের ছেলেটির পরপর দু’দিন হাসপাতালে আসার কথা মিস্টার ব্রাউনকে জানিয়ে বলল, আপনি পুলিশকে জানান, যাতে মিসেস ব্রাউনের আর কোনও বিপদ না হয়।

মিস্টার ব্রাউন তড়িঘড়ি টেলিফোনে পুলিশকে ব্যাপারটা জানালেন। পুলিশ তাকে আশ্বস্ত করল, তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে।

ফোন রেখে মিস্টার ব্রাউন বললেন, এই ছেলেটি আমাদের ক পরিস্থিতিতে নিয়ে গেল! অথচ আমি জানিই না এই বাড়িতে সে নিয়মিত আসত। রাতে আমি যখন ঘুমিয়ে থাকতাম তখন আমার স্ত্রী তাকে দরজা খুলে দিত। আমার মাও তাঁর নাতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তার জন্যেই আমার স্ত্রী ছেলেটিকে বাড়িতে ঢুকতে দিত। অথচ এসবের বিন্দুবিসর্গ আমি জানতাম না।

ওঁরা, মানে আপনার স্ত্রী এবং মা ওকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনেননি কেন?

নিশ্চয়ই চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফল হননি। সব প্রাণী কি পোষ মানে? মিস্টার ব্রাউন বললেন, কিন্তু পুলিশ যেই জেনেছে যে, আমার ছেলে আততায়ী নয়, অমনই তার সম্পর্কে ওদের আর কৌতূহল নেই। ওরা খুঁজে বের করবে কে আততায়ী?

আততায়ী যে ব্রঙ্কসের ছেলে তা কি ওরা জানে?

না। আমি বলতে পারিনি তুমি ওকে ব্রঙ্কসে দেখেছ। তা হলে পুলিশ জানতে চাইবে তুমি কে এবং কেন ব্রঙ্কসে গিয়েছিলে? তোমাকে নিয়ে পুলিশ টানাহ্যাঁচড়া করত। সেটা শুরু হলে তোমার কাছ থেকে আমি কোনও সাহায্য পেতাম না। আততায়ীর চেহারার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, মোটরবাইক ব্যবহার করে সে। এবার পুলিশ তাকে খুঁজে বের করুক। মিস্টার ব্রাউন বললেন।

মাথা নাড়ল অর্জুন, আপনার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারি?

ওঁর শরীর খুব খারাপ। কথা বলতে পারবেন বলে মনে হয় না।

তবু!

এসো।

মার্টিন বাড়ির ভিতর ঢোকেনি। বাইরে গাড়িতে রয়েছে। অর্জুন এবং লিজা মিস্টার ব্রাউনকে অনুসরণ করলেন। দোতলায় উঠে অর্জুনের জানা ঘরটিতে ঢুকলেন মিস্টার ব্রাউন। ভিতরে ঢুকে ওঁরা দেখলেন, বৃদ্ধা চিত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর গলা পর্যন্ত একটা চাদরে ঢাকা।

মম। ফিসফিস করে ডাকলেন মিস্টার ব্রাউন।

একটু ফুঁপিয়ে উঠলেন বৃদ্ধা। মিস্টার ব্রাউন বললেন, আমরা খুব চেষ্টা করছি। ও ভাল আছে। অর্জুন ওকে দেখেছে। অর্জুনকে ইশারা করলেন মিস্টার ব্রাউন।

অর্জুন বলল, আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার নাতিকে কাল দেখেছি। বৃদ্ধা নড়লেন না। তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে রইলেন। জিম ব্রাউন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মম, হি ইজ হেলপিং আস। তুমি কিছু বলো।

বৃদ্ধা ফুঁপিয়ে উঠলেন, ব্রিং হিম ব্যাক। প্লিজ!

.

নীচে নেমে এসে অর্জুন মিস্টার ব্রাউনকে বলল, ব্রঙ্কসের পুলিশকে বলুন ছেলেটি ওখানেই আছে। ওকে 'বেন' বলে সবাই ডাকে।

কী করে বলব? বললেই তো জানতে চাইবে খবরটার সোর্স কী?

অর্জুন হাসল, বলবেন, একটা উড়ো ফোন এসেছিল। সেই ফোনে আপনি জেনেছেন।

জিম ব্রাউন মাথা নাড়লেন, কিন্তু তুমি কি কোনও প্ল্যান করেছ?

ভাবছি। দেখুন, গতকাল ওখানে গিয়ে বুঝতে পেরেছি, আমার মতো বাইরের লোককে কেউ ঢুকতেই দেবে না। আমার কথা ওরা ভাল বোঝে না, ওদের কথা আমি আন্দাজে বুঝি। উচ্চারণই দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। দেখি, আর একটু ভাবি। অর্জুন বলল।

.

ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ডের সামনে মার্টিন লিজার কথামতো গাড়ি থামাল। লিজা বললেন, আমি কি আপনাকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে বলতে পারি?

নিশ্চয়ই। কিন্তু হাতে বেশি সময় নেই। এখান থেকে কুইন্স নিশ্চয়ই বেশ দূর।

অর্জুন বলতেই মার্টিন মাথা নাড়ল, এক ঘণ্টার বেশি লাগবে।

লিজা বললেন, আপনার ফোন নাম্বারটা জানা থাকলে ভাল হত।

অর্জুন মার্টিনের দিকে তাকালে সে মেজরের নাম্বারটা বলে দিল। সেলফোনে নোট করে নিলেন লিজা।

৯-১৩. দুপুরে খাননি মেজর

০৯.

দুপুরে খাননি মেজর। কারণ জিজ্ঞেস করতে বললেন, চব্বিশ ঘণ্টায় একবার খেলেই যখন শরীরটা হেঁটে-চলে বেড়াবে, তখন বারংবার তার পেটে সাপ্লাই করার কোনও প্রয়োজন নেই। লোকে রসনার তৃপ্তি, শরীরের আরামের জন্যে দিনে চারবার খায়। আমার তো ওসব দরকার নেই। তবে তোমাদের জন্যে লাঞ্চ রেডি করে রেখেছি। বাসমতী চাল, মুগের ডাল, বেগুনভাজা, মৌরলামাছের ঝাল আর কচি খাসির মাংসের ঝোল। চটপট খেয়ে নাও।

হেসে ফেলল অর্জুন, আপনি এত রান্না করেছেন?

দুর! এ আর কী। ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন…, থেমে গেলেন মেজর, না, আমি এখন অন্যলোক। নো স্মৃতিচারণ।

খেতে খেতে অর্জুনের মনে হল, সত্যি মেজর বদলে গিয়েছেন। আগের মতো রাগারাগী, চিৎকার করছেন না। সবচেয়ে যেটা লক্ষণীয়, অর্জুন কোনও অভিযানে যাচ্ছে আর মেজর সেখানে থেকেও সঙ্গী হচ্ছেন না, এটা ভাবাই যায় না। সে দূরে বসে থাকা মেজরের দিকে তাকাল। ওঁকে এখন গৌতম বুদ্ধের কাছাকাছি চেহারার মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

.

খাওয়া শেষ করে ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই কাণ্ডটা ঘটল। কোথা থেকে একটা কালো বিড়াল লাফিয়ে পড়ল গাছের নীচে। কাঠবিড়ালিগুলো দুদ্দাড় পালালেও একটা ধরা পড়ে গেল। তার কাঁধের কাছটা দাঁতে নিয়ে বিড়ালটা একটা ড্রামের উপর লাফিয়ে উঠল। অন্য কাঠবিড়ালিরা ততক্ষণে নিরাপদে দাঁড়িয়ে হল্লা শুরু করেছে। তাতে বেশ বিরক্ত হয়ে বিড়ালটা লাফিয়ে ব্যালকনিতে চলে আসতেই অর্জুন পা চালাল। আঘাত এড়াতে বিড়ালটা মুখের খাবার ফেলে দিয়ে উলটো দিকে লাফ দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

আহত কাঠবিড়ালিটা নড়ছে, পা ছুড়ছে। ঝুঁকে দেখে অর্জুন বুঝল, এটা নেহাতই ছোট। সে ওটাকে হাতের তালুতে তুলে নিয়ে দেখল, ঘাড়ের উপর রক্তের ঈষৎ ছোপ, দাঁত বসেছিল ওখানে। এ ছাড়া অন্য কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।

কাঠবিড়ালিটাকে নিয়ে সে মেজরের সামনে চলে এসে টেবিলের উপর রাখল। মেজরের কপালে ভাঁজ পড়তেই অর্জুন বলল, একটা কালো বিড়াল ওর কাঁধে দাঁত বসিয়েছে। কী করে এটাকে বাঁচানো যায়?

কালো বিড়াল? ভয়ংকর ধূর্ত ওটা। মেজর উঠে একটা আলমারি খুলে তুলল আর আয়োডিন গোছের তরল পদার্থ নিয়ে এসে যত্ন করে ক্ষতের উপর লাগিয়ে দিলেন, খুব ঘাবড়ে গিয়েছে বলে একে আধমরা দেখাচ্ছে। তবে দাঁত যদি বেশি বসে গিয়ে থাকে, তা হলে বাঁচবে না।

কোনও ডাক্তারকে দেখানো যায় না?

তারা গৃহপালিত জীবজন্তুর চিকিৎসা করে। কাঠবিড়ালিকে কি গৃহপালিত বলা যায়? ছোট্ট প্রাণীটিকে টেবিলের উপর শুইয়ে দিলেন মেজর। সেটা চোখ বন্ধ করে মড়ার মতো পড়ে রইল।

আজকের ঘটনাগুলো মেজরকে জানাল অর্জুন। সব শুনে মেজর বললেন, আমার মনে হয়, তোমার আর না এগোনোই ঠিক হবে। জিমের টাকা না নিয়ে ভাল করেছ। ভাবছি তোমাকে নিয়ে কাল নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে যাব। গাড়িতেই যাব। মার্টিন গাড়ি চালাবে। লোকে বাঘকে ভয়ংকর সুন্দর বলে, নায়াগ্রা দেখলে বুঝবে, প্রকৃতিও কত ভয়ংকর এবং সুন্দর হতে পারে।

অর্জুন বলল, আপনি আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, নিউ ইয়র্কের মাটির নীচে একটা জগৎ আছে। তা টিউবট্রেন নয়। লিখেছিলেন, এখানে এলে সেটা দেখতে পাবে। ব্রঙ্কসে গিয়ে বুঝলাম, ওখানকার মাটির নীচে কিছু মানুষ থাকে। অনুমান করছি, তারা কেউ সাধারণ, স্বাভাবিক মানুষ নয়। সেখানে পুলিশও আঁটঘাট না বেঁধে ঢোকে না।

তুমি ঠিক বলছ। আসলে লেখার সময় আমি অত ভেবে লিখিনি। ভেবেছিলাম, এসব লিখলে তোমার মনের কৌতূহল বাড়বে। মেজর বললেন।

ঠিকই। এখন যখন সুযোগ এসেছে তখন আপত্তি করছেন কেন?

পুলিশ যেখানে যেতে চায় না, সেখানে তুমি গিয়ে কী করবে?

দেখাই যাক না।

তা হলে আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে হয়। মেজর সোজা হয়ে বসলেন।

অর্জুন হাসল! বাঃ। দারুণ হবে। আবার আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারব!

.

১০.

বিকেলবেলা ডাইনিংরুমে ঢুকে অবাক হয়ে গেল অর্জুন। কাঠবিড়ালিটা উঠে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, একটু একটু হাঁটার চেষ্টা করছে। অর্জুন কাছে যেতে সে ঘুরে দৌড়োবার চেষ্টা করতেই পড়ে গেল চিত হয়ে। অর্জুন ওকে তুলে নিল হাতে। তারপর চারপাশে তাকিয়ে একটা পিচবোর্ডের বাক্সে কাঠবিড়ালিকে ছেড়ে দিল। এর মধ্যে ঘুরুক ও।

মেজর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মার্টিন তার কাজে বেরিয়ে গিয়েছে। দরজার চাবি নিয়ে ওটাকে বন্ধ করে রাস্তায় নামল অর্জুন। কালকের রাস্তায় হেঁটে কফির দোকানে পৌঁছে সে দেখল, কয়েকটি অচেনা মুখ রয়েছে। অতএব জো-এর অফিসে এল অর্জুন। কম্পিউটারের সামনে বসে একমনে কাজ করছে জো। অর্জুন গিয়ে দাঁড়াতে জো মুখ ফেরাল, হাই!

হাই বলতে গিয়েও হ্যালো, বলল অর্জুন।

জাস্ট এ মিনিট, কাজ করতে করতে জো বলল।

মিনিট চারেক পর জো উঠে এল, লে গো ফর কফি।

দোকান খোলা রেখেই জো বেরিয়ে এল।

কফি খেতে খেতে জো জিজ্ঞেস করল, কাল কীরকম অভিজ্ঞতা হল?

দারুণ। সুযোগ পেলে আবার যেতে চাই। অর্জুন বলল।

আপনার মতলবটা কী বলুন তো?

মতলব?

ওসব জায়গায় যেতে বললে লোকের বুক হিম হয়ে যায়, আর আপনি আবার যেতে চাইছেন! ব্যাপারটা কী খুলে বলুন!

অর্জুন হাত তুলল, কাল এখানে কফি খেতে আসার আগে আমি কি আপনাকে চিনতাম? না। আপনি কী ব্যাবসা করেন তা কি জানতাম? না। আপনাকে যে ব্রঙ্কসে পার্সেল ডেলিভারি দিতে যেতে হবে সেটাও জানা ছিল? না। আমার যদি ওখানে যাওয়ার পিছনে কোনও মতলব থাকত তা হলে আমি কেন এখানে আসব? অন্য কোনওভাবে চেষ্টা করতাম। তাই না?

মাথা নাড়ল জো, তা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু যেখানে গেলে প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হয় সেখানে আপনি যেতে চাইছেন কেন?

একজন অসুস্থ বৃদ্ধা এবং তার প্রৌঢ়া পুত্রবধূ যিনি সম্প্রতি ছুরিতে আহত হয়েছেন, তাদের অনুরোধ রাখতে আমার যাওয়া উচিত।

জো মাথা নাড়ল, আমি কিছুই বুঝলাম না।

ওই দু'জনের নাতি এবং ছেলে ব্রঙ্কসে আছে। তাকে অনুরোধ করতে হবে যাতে সে বাড়িতে ফিরে যায়। অর্জুন বলল।

আপনি একটি উন্মাদ। জো চেঁচিয়ে উঠল।

কী জন্যে মনে হচ্ছে?

ওখানে যারা স্বেচ্ছায় যায়, ওই জীবনে যারা অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তারা কখনওই স্বাভাবিক ভদ্রজীবনে ফিরে আসবে না। জীবন নিয়ে জুয়ো খেলে ওরা। ছিনতাই, মস্তানি, খেলার ছলে কাউকে মেরে ফেলতে যে যত পারদর্শী হবে, তার ব্যাঙ্ক তত উপরে উঠবে। ছোট নেতা থেকে বড় নেতা হওয়ার রাস্তায় ওরা চেষ্টা করে আরও নির্মম হতে। এই নেশা থেকে আপনি সরাতে চাইলে আপনাকে ছাই করে দেবে ওরা। জো মাথা নাড়তে লাগল।

অর্জুন চুপ করে থাকল। সেটা দেখে জো জিজ্ঞেস করল, হাউ মাচ দে আর পেয়িং ইউ? কত ডলার দেবে?

যা দিতে চেয়েছিল তা আমি রিফিউজ করেছি। অর্জুন বলল।

তার মানে? আপনি যদিও কাজটা পারবেন না, তবু প্রফেশনাল ফি নেবেন না?

না। আমি এই দেশে এসেছি টুরিস্ট হিসেবে। প্রফেশনাল ফি নিতে পারি না।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জো বলল, আপনি তো ইন্ডিয়ার মানুষ?

হ্যাঁ। ইন্ডিয়ার সব মানুষ কি আপনার মতো?

হেসে ফেলল অর্জুন, সেখানে চোর, বদমাশ থেকে মাফিয়া ডন, কোনও কিছুর অভাব নেই। যাক গে, আপনি আমাকে আর-একবার ওখানে যেতে সাহায্য করবেন?

ছেলেটিকে আপনি খুঁজে বের করবেন কী করে?

ডি সিলভা ওকে চেনেন।

মাই গড! আপনি জানলেন কী করে?

আপনারা যখন কার্ভালোর কাছে গিয়েছিলেন তখন সে ডি সিলভার কাছে এসেছিল। যদিও আমার সঙ্গে কথা হয়নি।

আপনি কী করে বুঝলেন সেই ছেলেটি!

জো-কে থামিয়ে দিল অর্জুন, কথাবার্তা শুনে বুঝেছি।

জো কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, আমি একটু ভেবে দেখি। একটা রাস্তা পেলে কাল আপনাকে জানাব। বাড়িটা তো আমি দেখে এসেছি।

.

১১.

বাড়িতে এসে অর্জুন দেখল, মেজর খুব যত্ন করে কাঠবিড়ালিটাকে খাওয়াচ্ছেন। সে হেসে বলল, আপনি জীবন থেকে ছুটি নিয়ে বসে আছেন। আর দেখুন, বিড়ালের পাঁত ঘাড়ে বসে যাওয়া সত্ত্বেও ও জীবনে ফেরার জন্যে ব্যস্ত।

প্রসঙ্গে না গিয়ে মেজর জিজ্ঞেস করলেন, রাতে কী খাবে?

আপনি তো সারাদিন খাননি। আপনার মেনু?

আমি সাত্ত্বিক আহার করব। ফ্যানভাত, মাখন, আলুসেদ্ধ।

ফাটাফাটি।

মানে? মেজর অবাক।

ওটাই আমার সবচেয়ে প্রিয় খাবার। অর্জুন নিজের ঘরে চলে গেল।

.

আজ একটু দেরিতে ঘুম ভাঙল অর্জুনের। তৈরি হয়ে ডাইনিং রুমে এসে দেখল, মেজর কারও সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন। সে কিচেনে ঢুকে চা বানাতে গিয়ে দেখল, গ্যাসে জল ফুটছে। মার্টিন এসে দাঁড়াল দরজায়, লেট মি ডু দ্যাট।

এদেশে চা তৈরি করতে কোনও ঝামেলাই নেই। গরম জলে টি-ব্যাগ ফেলে দিয়ে নাড়াচাড়া করলেই লিকার তৈরি হয়ে যাবে। তারপর ইচ্ছেমতো দুধ-চিনি মিশিয়ে দিলেই চা হয়ে গেল। তবু মার্টিনকে দায়িত্ব দিয়ে অর্জুন ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। প্রথমেই তার মনে হল, সামনের পৃথিবীটা আজ

অন্যরকম। একটাও কাঠবিড়ালি চোখে পড়ছে না। তাদের দৌড়োদৌড়ি, চেঁচামেচি আজ নেই। গাছটাও যেন থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। কী হল ওদের?

ফোন রেখে মেজর পাশে এসে দাঁড়ালেন, জিমের মাকে আজ হাসপাতালে ভরতি করা হবে। বেচারা জিম!

মার্টিন এসে দু'জনকে চা দিয়ে গেল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, কাঠবিড়ালিদের কী হয়েছে?

সকাল থেকেই দেখছি না। এই জায়গাটা বোধহয় ওদের আর পছন্দসই নয়। মেজর চায়ে চুমুক দিলেন, তোমার প্ল্যান কী?

ব্রঙ্কসের রাস্তায় ঝুঁকি নিয়ে হাঁটাচলা করা যায়, কিন্তু কোনও সোর্স ছাড়া মাটির নীচে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। মিস্টার ব্রাউনের ছেলের নাম কী?

টম। ভাল নাম আমি জানি না।

আমি একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাচ্ছ?

কাছেই। একটা লোকের কথা আপনাকে বলেছিলাম, জো। ওর দোকানে যাচ্ছি।

.

জো অর্জুনকে দেখে হাসল, আপনার কপাল ভাল না খারাপ তা জানি না।

কেন?

সেদিন কার্ভালোর দেওয়া এনভেলাপ টেক্সাসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আজ ভোরে সেখান থেকে আর-একটা প্যাকেট এসেছে, যেটা ওকে দিতে হবে।

অর্জুন হাসল, বাঃ। ভাল খবর। তা হলে কপাল খারাপ বলছেন কেন?

জায়গাটার নাম ব্রঙ্কস। তাই!

আপনি কখন যাচ্ছেন?

এখন প্রচুর কাজ। দুপুরে যাব। এবং এই শেষবার। কার্ভালোকে বলে দেব, আর আমার পক্ষে ব্রঙ্কসে যাওয়া সম্ভব নয়। জো বলল।

একটু ইতস্তত করে অর্জুন বলল, একটা অনুরোধ করতে পারি?

জো তাকাল।

অর্জুন বলল, ব্রঙ্কসে গিয়ে ডি সিলভার কাছে পৌঁছেলে তো কার্ভালোর হদিশ পাওয়া যাবে। যদি আমি প্যাকেটটা এখন পৌঁছে দিই!

আপনি? জো হতভম্ব।

আমি পারব।

আপনি খুন হয়ে যেতে পারেন! জো মাথা নাড়ল।

সেটা আপনি গেলেও হতে পারে।

একটু ভাবল জো, প্যাকেটে কী আছে তা আমি জানি না। যদি নিষিদ্ধ কিছু থাকে তা হলে পথে পুলিশ আপনাকে ধরলে বিপদে পড়বেন।

নিষিদ্ধ কিছু মানে?

ড্রাগ থেকে শুরু করে মাদক। অথবা ডলারও থাকতে পারে।

কত বড় প্যাকেট?

আড়াইশো গ্রাম ওজন। বেশি বড় নয়।

আমি ঝুঁকি নিচ্ছি।

জো-কে রাজি করাতে কিছুটা সময় খরচ হল। চৌকো ব্রাউন পেপারের একটা বড় খাম দিল জো। খামের উপর একটা নাম্বার আর জো-এর দোকানের ঠিকানা লেখা। অর্থাৎ যার জন্যে ওটা এসেছে তার কোনও নামধামের বিবরণ খামের উপর নেই। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, এটা যে কার্ভালোর তা বুঝলেন কী করে?

জো হাসল, ওই নাম্বার কাভালোর।

অর্জুন একটু ভাবল। নাম-ঠিকানা নেই এমন একটা প্যাকেট মানে রহস্যজনক ব্যাপার, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনও প্রমাণ যখন নেই তখন শুধু সন্দেহের কারণে টম ব্রাউনের কাছে পৌঁছোবার সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

জো ছাড়ল না। অর্জুনকে যাতায়াতের ভাড়া নিতে বাধ্য করল। সেইসঙ্গে কার্ভালোকে দিয়ে সই করিয়ে আনার রসিদও দিয়ে দিল।

বেরোবার সময় অর্জুন হেসে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আপনি আমাকে বিশ্বাস করে এই দায়িত্ব দিচ্ছেন, আমি তো ব্রঙ্কসে না গিয়ে এটার ভিতরে কোনও দামি জিনিস থাকলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারি?

জো হাসল। দু'বার মাথা নাড়ল। মুখে কিছু বলল না।

.

১২.

নিউ ইয়র্কের পাতালরেলের প্রতিটি কামরায় বেশ বড় আকারের ম্যাপ টাঙানো থাকে। প্রতিটি কামরার ভিতরে লাউডস্পিকার থাকায় কোন স্টেশন আসছে তা স্পষ্ট শোনা যায়। স্টেশনের নাম শুনে ম্যাপ দেখলেই বোঝা যায়, যেখানে নামতে হবে সেই স্টেশন কত দূরে। ট্রেনে উঠে অর্জুন ম্যাপ খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিল। অনেকটা সময়। নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায়। আজ সেই গানের দল কামরায় নেই। অর্জুনের পাশে বসে একটি কালো ছেলে বই পড়ছে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে গল্পে ডুবে গিয়েছে সে। ট্রেন ছুটছে। উপরের পৃথিবীতে কত কী হয়তো ঘটে যাচ্ছে এই মুহূর্তে, পাতালে বসে তার বিন্দুবিসর্গ টের পাওয়া যাচ্ছে না।

কীভাবে টম ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করবে, কী কথা বলে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে সে? অর্জুন মাথা নাড়ল। এসব নিয়ে আগে থেকে ভেবে কোনও লাভ নেই। কোনও পরিকল্পনাই কাজে লাগবে না। কারণ, সে ওখানে দ্বিতীয়বার যাচ্ছে।

.

স্টেশন থেকে বেরিয়ে গত দিনের চেনা পথ ধরে সে হাঁটতে লাগল। চারটে ছেলে মোটরবাইকে চেপে চিৎকার করতে করতে চলে গেল। তাদের ওইভাবে চলে যেতে দেখেও অন্য পথচারীদের ভাবভঙ্গির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হল না।

ডি সিলভার কাছে আজ স্বচ্ছন্দে পৌঁছে গেল অর্জুন। লোকটি চোখ ছোট করতেই অর্জুন বলল, আমি জো-এর কুরিয়ারে কাজ করছি।

এবার হাসি ফুটল মুখে। ডি সিলভা জিজ্ঞেস করল, আজও কি কার্ভালোর জন্যে এসেছেন? ওর উচিত হচ্ছে না জো-এর কুরিয়ার ব্যবহার করা।

অর্জুন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ডি সিলভা তাকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করল, আপনার দেশ যেন কোথায়? কী যেন বলেছিলেন, ইন্ডিয়া?

হ্যাঁ ইন্ডিয়া।

দেশটা কোথায়? আফ্রিকায়?

না। এশিয়ায়।

ছেলেবেলায় ভাবতাম সারা পৃথিবীটা ঘুরে দেখব। তা আর হল না। তা আপনাকে এমন নাম কে দিল? অ-র! হা হা হা।

অর্জুন হাসল, কথা বলল না।

আসুন, বাইরে যাই। দেখি কাউকে পাই কিনা! ডি সিলভা বাইরে পা বাড়ালে অর্জুন তাকে অনুসরণ করল।

বাইরে বেরিয়ে অর্জুন অবাক। একটু আগে জমজমাট দেখেছিল রাস্তাটা। এখন একদম ফঁকা। কোনও লোক নেই ফুটপাতে। তখনই তিনটে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল সামনে। ড্রাইভিং সিটে বসে একজন অফিসার চেঁচিয়ে বললেন, এটা হচ্ছে কী? তোমার ছেলেরা আমাদের কি একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না।

আমার তো কোনও ছেলে নেই অফিসার? ডি সিলভা হাসল।

আঃ। রসিকতা ছাড়ো। হু ইজ বেন?

বেন? তোমার এলাকায় থাকে। কয়েকদিন আগে সে লং আইল্যান্ডে গিয়ে একজন মহিলাকে ছুরি মেরেছিল ডলারের জন্যে। তুমি জানো না?

ঈশ্বরের দিব্যি, আমি জানি না।

আমরা প্রথমে শুনেছিলাম, মহিলার ছেলের কাণ্ড ওটা। দু'-দু'বার খুব অল্পের জন্যে ওকে ধরতে পারিনি। এখন খবর এসেছে ছেলে নয়। ওই বেনের কাণ্ড এটা। তোমরা এখানে যা করছ তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। কিন্তু এখান থেকে লং আইল্যান্ড অনেক দূর, তাই না?

নিশ্চয়ই।

ছেলেটিকে আমাদের হাতে তুলে দাও।

আমি দেখছি। তবে ও বোধহয় এখানে নেই।

ডি সিলভা, ইউ নো মি, আমার সঙ্গে চালাকির চেষ্টা কোরো না।

কোনও প্রশ্নই ওঠে না অফিসার। ডি সিলভা বলামাত্র পুলিশের গাড়িগুলো একটু এগিয়ে রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আই ডোন্ট লাইক ট্রাবল। কিন্তু এই ছেলেগুলো সেটাই ইনভাইট করছে। অ-র, ইউ কাম উইথ মি, কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যান। ডি সিলভা আবার ভিতরে ঢুকে পড়ল। যে ঘরে বেন জো-কে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঘরে এসে একটা দরজা খুলল ডি সিলভা। দরজার বাইরে একটা চাতাল। সেখানে নানান রকমের বাতিল বাক্স তূপ করে রাখা আছে। বাক্স সরিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলল ডি সিলভা, আমার পিছন পিছন চলে আসুন।

কুয়োর মতো একটা সুড়ঙ্গ। তার একটা দিকে আংটা লাগানো। ডি সিলভার মতো সেখানে পা রেখে রেখে নীচে নামতেই চোখের সামনে জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পেল না অর্জুন। ডি সিলভার গলা কানে এল, আমার হাত ধরুন।

হাতড়ে হাতড়ে হাতের নাগাল পেল অর্জুন। অন্ধকারে একটা স্যাঁতসেঁতে প্যাসেজ দিয়ে ডি সিলভার হাত ধরে হাঁটতে হল কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে অন্ধকার পাতলা হয়ে এল। ওরা বেরিয়ে এল ছাইছাই রঙা আলোমাখা একটা রাস্তায়। মাথার অনেক উপরে ছাদ। পায়ের তলায় সিমেন্টের বদলে শুধুই মাটি। এই সুড়ঙ্গ ঠিক পাতালরেল যাওয়ার মতো চওড়া।

খানিকটা হাঁটার পর চিৎকার শোনা গেল। বাঁক ঘুরতেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল অর্জুন। সুড়ঙ্গের দু'পাশে যেন সংসার পেতে বসে আছে লোকজন। খাঁটিয়া থেকে আরম্ভ করে রান্নার গ্যাস, কী নেই! বীভৎস চেহারার পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাও আছে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, সভ্যতার ধার ধারে না। চিৎকার করছে যে ছেলেটি তার হাতে একটা রিভলভার। তাকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে তারা যেন বেশ মজা পেয়েছে। অর্জুন লক্ষ করল, পুরুষদের বেশিরভাগই দাড়িওয়ালা। ডি সিলভাকে দেখে ছেলেটি চিৎকার করতে করতে অদ্ভুত উচ্চারণে কিছু বলতে যেতেই সপাটে চড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ওর হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়ে ডি সিলভা বলল, এখানে যে অশান্তি করবে তার জিভ উপড়ে ফেলা হবে।

ছেলেটি কেঁদে ফেলল, আমার আড়াইশো ডলার চুরি হয়ে গিয়েছে।

ঠিক করে রাখিসনি কেন?

আমি ঘুমোচ্ছিলাম। এরা সবাই দেখেছে, কিন্তু কেউ বলছে না।

ছেলেটি কথাগুলো বলামাত্র লোকগুলো যেন কিছুই শোনেনি এমন ভঙ্গি করে যে-যার জায়গায় চলে গেল। রিভলভার থেকে গুলি বের করে পকেটে রেখে যন্ত্রটা ফেরত দিয়ে ডি সিলভা জিজ্ঞেস করল, কাকে সন্দেহ করছিস?

ছেলেটি কঁধ নাচাল।

অর্জুন বুঝতে পারছিল মাটির নীচে এই সুড়ঙ্গে ডি সিলভার কথার উপর কেউ কথা বলে না। অর্থাৎ উপরের তিনটি ব্লকের মধ্যে ওর কর্তৃত্ব। অন্য ব্লকগুলোয় নিশ্চয়ই ওর মতো অনেক ডন আছে। দেখলে মনে হবে, রাস্তার দু'পাশের ফুটপাতে ভিখিরিরা বাসা বেঁধেছে। কিন্তু সেখানে এত দামি টিভি চলছে যা অর্জুন কখনও দ্যাখেনি। খানিকটা যাওয়ার পর একটা লোক এগিয়ে এল, কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ?

বাধ্য হয়ে আসতে হল। বেন কোথায়? ডি সিলভা জিজ্ঞেস করল।

কোথাও লুকিয়ে আছে। টম ওকে খুন করবে বলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বেচারা বেন পুলিশের ভয়ে উপরেও যেতে পারছে না।

ডি সিলভা ওদের পরিচয় করিয়ে দিল, তোমার প্যাকেট এসেছে। ও জো-এর কর্মচারী। নিয়ে যাও।

সই করে প্যাকেট নিল কার্ভালো। এক টানে মুখ ছিঁড়ে ভিতর থেকে পলিথিনে মোড়া আর-একটা প্যাকেট বের করে পকেটে ঢোকাল।

আমার মনে হয় জো-এর কুরিয়ার এবার ছেড়ে দাও। পুলিশ নিশ্চয়ই নজর রাখছে। নেক্সট টাইম জো ধরা পড়ে যেতে পারে। ডি সিলভা বলল।

হ্যাঁ। আমিও ভাবছিলাম ওকে কিছুদিন ব্যবহার করব না।

টম কোথায়?

বাড়াবাড়ি করছে। আটকে রেখেছি।

চলো, দেখি।

নিঃশব্দে অর্জুন ওদের অনুসরণ করল। সুড়ঙ্গ থেকে আর-একটা সুড়ঙ্গ। তার দরজা বন্ধ। কার্ভালো সেটা খুলতেই টম ব্রাউন দৌড়ে এসে চিৎকার করল, আমাকে আটকে রেখেছ কেন? বেনকে আমি খুন করবই।

শান্ত গলায় ডি সিলভা জিজ্ঞেস করল, কেন?

ও আমার সঙ্গে বন্ধু হিসেবে মিশে সব কথা জেনেছিল। আমি বিশ্বাস করে সব বলেছিলাম। ও বলেছিল, আমার বাবাকে একটু শাসিয়ে দেবে। বাবাকে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু ও আমার মায়ের কাছে টাকা চেয়ে না পেয়ে ছুরি মেরেছে। আই লাভ মাই মাদার। শুধু তাই নয়, হাসপাতালে ও জনকে নিয়ে গিয়েছিল জবানবন্দি দেওয়ার আগে কী করে মাকে খুন করা যায় তার প্ল্যান করতে। টম চিৎকার করে বলল।

ডি সিলভা কাভালোকে বলল, তোমার সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলব।

নিশ্চয়ই, চলো।

অ-র, আপনি একটু এখানে অপেক্ষা করুন।

ডি সিলভাকে নিয়ে কার্ভালো চোখের আড়ালে চলে যাওয়ামাত্র অর্জুন বলল, হাই টম!

হু আর ইউ!

আমি তোমার ভাল চাই। তোমার ঠাকুরমা খুব অসুস্থ।

আমার ঠাকুরমাকে তুমি চিনলে কী করে?

প্রশ্ন কোরো না। তোমাকে দেখতে না পেলে তিনি মারা যাবেন। প্লিজ, তুমি গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করে এসো। অর্জুন বলল।

অসম্ভব। উপরে উঠলেই পুলিশ আমাকে ধরবে।

না। তোমার মা পুলিশকে বলেছেন বেন তাঁকে খুন করতে গিয়েছিল।

তুমি ঠিক বলছ? চোখ ছোট করল টম।

মিথ্যে বলছি না। তুমি বেনকে খুন করলে পুলিশ তোমাকে ছেড়ে দেবে না। কাজটা পুলিশকেই করতে দাও।

কিন্তু আমার বাবা?

মিস্টার ব্রাউন এখন খুব দুঃখিত। তিনিও চান তুমি ফিরে যাও।

কিন্তু এসব তুমি জানলে কী করে?

আমি মিস্টার মেজরের বাড়িতে আছি। তিনি তোমার বাবার বন্ধু।

মিস্টার মেজর? দ্যাট ফ্যাটি ইন্ডিয়ান উইথ অ্যালকোহল?

হ্যাঁ। তবে তিনি এখন ওসব ছেড়ে দিয়েছেন। আর হ্যাঁ, এসব কথা যেন কাউকে বোলো না। তা হলে আমি বিপদে পড়ব।

কার্ভালো এবং ডি সিলভা ফিরে আসছে দেখে অর্জুন মুখ বন্ধ করল। ডি সিলভা বলল, লুক টম, বেন অন্যায় করেছে। তার শাস্তি পুলিশ বা তুমি দিতে পারো না। ওটা আমরাই দেব। কথাটা ভুলে গেলে বিপদে পড়বে। তোমাকে ওখানে আটক থাকতে হবে না। ওয়েল অ-র, লেটস গো ব্যাক।

যে পথ দিয়ে ওরা সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল সেই পথ দিয়ে উপরে উঠে এল। ডি সিলভা বলল, জো-কে বলবেন যদি এখানকার কারও নামে কোনও পার্সেল আসে তা হলে আমাকে ফোন করতে। আপনাদের আর এখানে আসা ঠিক হবে না।

.

১৩.

জো-কে রশিদ দিয়ে ডি সিলভার বক্তব্য জানিয়ে বাড়ি ফিরে এল অর্জুন। তাকে দেখামাত্র মেজর হাসলেন, আগে হলে আমি খুব রাগারাগী করতাম। এখন তো ওই জীবনে নেই, তাই কিছু বলছি না।

অর্জুন বলল, আমি জো-এর কাছে গিয়েছিলাম। জো আমাকে ব্রঙ্কসে পাঠাল প্যাকেট ডেলিভারি করতে।

আবার ব্রঙ্কসে গিয়েছিলে? আর আমি তৈরি হয়ে বসে আছি তোমার সঙ্গে অভিযানে যাব বলে। না হয় আমি বুড়ো হয়েছি, তাই বলে...!

এই সময় ফোন বেজে উঠতে মেজর কথা থামিয়ে উঠে গেলেন রিসিভার তুলতে, হ্যালো! মেজর বলছি! আঁ? সে কী! কী করে হল? তাই নাকি? তবে দ্যাখো, তুমি আমার উপর ভরসা করতে পারোনি ওকে দেখার পর। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, যখন ইচ্ছে চলে এসো জিম। বাই।

রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়ালেন মেজর। ঠিক আগের মতো চিৎকার করে উঠলেন, তুমি, তুমি একটা যাচ্ছেতাই, একদম যাচ্ছেতাই!

মানে? অর্জুন অবাক।

এগিয়ে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন মেজর, থ্যাঙ্ক ইউ। টম এইমাত্র তার বাড়িতে পৌঁছেছে। দে আর সো হ্যাপি। হ্যাঁ, আজ আমি চিকেন রান্না করব আবার। জিম বলেছে কাল গালা লাঞ্চ খাওয়াবে।

চিকেন যখন খাবেন তখন দাড়িটাও রাখুন। হেসে অর্জুন বলল।

অ্যাঁ? অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন মেজর, তুমি যাচ্ছেতাই রকমের ভাল!

বিশল্যকরণী (২০১০)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১. অমল সোমের বাড়িতে

বিশল্যকরণী (২০১০) – সমরেশ মজুমদার
অর্জুন সমগ্র ৫ – সমরেশ মজুমদার

সকাল নটায় হাকিমপাড়ায় অমল সোমের বাড়িতে গিয়ে অর্জুন অবাক হল। সুটকেস বন্ধ করে তাতে চাবি ঘুরিয়ে হাবু তাকে দেখে একগাল হাসল।

কী ব্যাপার? সুটকেস নামিয়েছ কেন?

অর্জুন জিজ্ঞেস করতে হাবু আঙুল তুলে ভিতরটা দেখাল। মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। মাঝে মাঝে অর্জুনের মনে হয় হাবু খুব বুদ্ধিমান। ও কথা। বলতে পারে না বলে কোনও আক্ষেপ নেই, উলটে বেশ উপভোগ করে। লোকে যখন ওর ইশারা বুঝতে পারে না, তখন মজা পায়।

অমলদা কোথাও যাচ্ছেন?

ডান হাত ওলটাল হাবু, যার অর্থ সে কিছুই জানে না।

বাড়ির ভিতরের বারান্দায় পৌঁছে অমল সোমকে দেখতে পেল অর্জুন। রোদ্দুরে চেয়ার পেতে চাদরমুড়ি দিয়ে বসে বই পড়ছেন। বারান্দা থেকে সে একটা মোড়া তুলে উঠোনে ওঁর কাছাকাছি বসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?

ইন্টারেস্টিং! অমল সোম বই বন্ধ করলেন, বুঝলে অর্জুন, একটা লোক দু-দু'বার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেও তৃতীয়বার উত্তরমেরুতে যাচ্ছে। তৃতীয়বার ভাগ্য তার উপর সদয় না-ও হতে পারে জেনেও যাচ্ছে। কোনও ধনরত্ন পাওয়ার আগ্রহে নয়, শুধু ফোটো তোলার নেশা তাকে ঘরে থাকতে দিচ্ছে না।

অর্জুন কথা বলল না। তার প্রশ্নটা অমল সোমের কানে ঢোকেনি। বইয়ের মধ্যে এখনও ঝুঁদ হয়ে আছেন। অমল সোম বলে চলেছেন, এরকম মানুষ আজও পৃথিবীতে আছেন বলে একটার পর একটা আবিষ্কার হয়ে চলেছে। বইটা পড়ে দেখো।

একটা ইংরেজি পেপারব্যাক এগিয়ে দিলেন অমল সোম। অর্জুন বইটা নিয়ে দেখল মলাটে হিমবাহের ফোটো, উপরে লেখকের নাম রবার্ট মুরহেড, নীচে, পয়জনাস স্নো', বিষাক্ত বরফ। অর্জুন কল্পনা করল, উত্তরমেরুতে যখন ব্লিজার্ড বইছে, সাপের ছোবলের মতো বরফ ছুটে আসছে,তখন তাকে বিষাক্ত ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

অমলদা অর্জুনকে দেখলেন, তুমি কি একেবারে তৈরি হয়ে এসেছ? তৈরি হয়ে আসব কেন? অর্জুন চোখ ছোট করল, আপনি তো আমাকে কিছু বলেননি?

বলিনি? ঠিক বলছ তুমি? আমি তোমাকে বাইরে যাওয়ার কথা বলিনি?

না অমলদা। গত পরশু বিকেলে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি তখন বিশল্যকরণী পাতা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারেননি।

চোখ বন্ধ করলেন অমল সোম। তারপর বললেন, রোগটা ভালই পাকিয়েছে হে!

কী রোগ?

ভুলে যাওয়ার। আমি তোমাকে বলব বলে ঠিক করেছিলাম। তুমি এসেছিলে, চলেও গেলে। আজ সকালে আমার মনে হল, তোমাকে বলেছি এগারোটার মধ্যে চলে আসতে। আর মনে হওয়ামাত্র নিশ্চিত হয়ে গেলাম। যত দিন যাবে তত এই রোগ শক্তিশালী হবে। ধরো, দুপুরের খাবার খাওয়ার এক ঘণ্টা পরে মনে হবে আমি খাইনি। এখনই বেশ কিছু মানুষের নাম আমি মনে রাখতে পারি না। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ একটা শঙ্খ বাজাতেন। গতকাল কিছুতেই সেই শঙ্খটার নাম মনে করতে পারছিলাম না। মনে না করতে পারলে মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। তখন যে কী ভয়ানক কষ্ট! অমল সোম বললেন।

নামটা মনে করতে পেরেছেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, অদ্ভুতভাবে। যত ভাবছি তত 'গজদন্ত' শব্দটা মনে আসছিল। শাঁখটার নাম কখনওই গজদন্ত নয়। ওই গজদন্ত শব্দটা থেকে গজেন নামটা মনে এল। বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন গজেন্দ্রকুমার

এক ঘণ্টা পারি না। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ এখলাম না। মনে না মিত্র। ব্যস, পেয়ে গেলাম নামটা।

অবাক হল অর্জুন, কী করে?

গজেন্দ্রকুমারের একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম 'পাঞ্চজন্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উপর লেখা। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খটির নামে বইটির নামকরণ করেছিলেন। হাসলেন অমল সোম।

এটা হয়েই থাকে। ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাববেন না। এখন বলুন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হাবুকে দেখলাম সুটকেস গুছিয়ে ফেলেছে। অর্জুন বলল।

অনেকদিন উত্তরবাংলার গাছগাছালি দেখিনি। দিনদশেক আগে মেজর ফোন করেছিলেন ফ্লোরিডা থেকে। জিজ্ঞেস করেছিলেন, রামায়ণে হনুমান। গন্ধমাদন পর্বত থেকে যে ভেষজ পাতা আনতে গিয়ে খুঁজে না পেয়ে গোটা পর্বতটাকে তুলে নিয়ে এসেছিল, তার নাম কী? বললাম। শুনে জিজ্ঞেস করলেন, ওই গুল্ম কি এখনও পাওয়া যায়? বললাম, পাওয়া যায় মানে? এই ডুয়ার্সের জঙ্গলে আগাছার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে! শুনে তিনি খুব উত্তেজিত। দুদিন পরে জানালেন, একজন ভেষজবিজ্ঞানীকে নিয়ে কলকাতা হয়ে এখানে আসছেন। ইতিমধ্যে ওঁরা দমদম বিমানবন্দরে নেমে গিয়েছেন। সাড়ে দশটায় বাগডোগরায় নামবেন। আমি ওঁদের নিয়ে আসতে গাড়ি পাঠিয়েছি। নেপালি ড্রাইভারকে মেজরের নাম লিখে প্ল্যাকার্ড করে দিয়েছি। ধরো, এগারোটার একটু পরে ওঁরা চলে আসবেন। এলেই ওঁদের গাড়িতে আমরা উঠে পড়ব। অমল সোম শান্ত গলায় বললেন।

কোথায় যাবেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

আপাতত রাজাভাতখাওয়া। ওখানকার ফরেস্ট বাংলোয় তিনটে ঘরের জন্যে ডি এফ ও সাহেবকে অনুরোধ করেছি। কিন্তু তুমি কী করবে এখন?

অর্জুন চট করে ভেবে নিল। এখন প্রায় দশটা। সে উঠল, আপনি যখন চাইছেন তখন চেষ্টা করছি ওই সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে আসতে।

এসো!

.

বাড়িতে ঢোকামাত্র মা জিজ্ঞেস করলেন, সাতসকালে কোথায় গিয়েছিলি?

অমলদার বাড়িতে। কেন?

এসব করে বেড়ালে চলবে? কবে থেকে বলছি একটা স্থায়ী চাকরির চেষ্টা কর, তুই কানেই তুলছিস না! কবে কখন একটা কেস পাবি, সেটা করে ঠিকঠাক রোজগারও সবসময় হয় না, এভাবে কতদিন চলবে? মায়ের গলায় তীব্র বিরক্তি।

অর্জুন হাসল, চলে তো যাচ্ছে। যা টাকা পেয়েছি তাতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

আমি ওসব জানি না। রায়সাহেব ফোন করেছিলেন, খুব জরুরি, বললেন। দয়া করে আজই ওঁকে ফোন কর। মা বললেন।

রায়সাহেব মানে?

ওঃ। মি. এ পি রায়। কলকাতা থেকে একটু আগে ফোন করেছিলেন। বললেন, তোর সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। মা চলে গেলেন তাঁর কাজে।

জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ এ পি রায়কে প্রথমে চিনত এসপি রায়ের ছেলে হিসেবে। এস পি রায়কে বলা হত ফাদার অফ জলপাইগুড়ি'। বেশ কয়েকটা চা-বাগানের মালিক এস পি রায় শহরের জন্যে, শহরের মানুষের জন্যে সারাজীবন কাজ করে গিয়েছেন। খেলাধুলো ভালবাসতেন ভদ্রলোক। নিজে ফুটবল খেলতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে মাঠে দেখা যেত। ভাল খেলতে পারলেই যে-কোনও খেলোয়াড়কে চাকরি দিতেন তিনি। কত গরিব মানুষ তাঁর কাছে উপকৃত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই এস পি রায়ের ছেলেও জলপাইগুড়ির খেলার জগতের সঙ্গে জড়িতছিলেন। অর্জুনকেবিশেষ স্নেহকরেন তিনি। তাঁদের চা-বাগানগুলো নানান সমস্যার কারণে হস্তান্তর করতে বাধ্য হওয়ায় তিনি এখন সপরিবার কলকাতায় বাস করছেন। এই মানুষটি হঠাৎ তাকে ফোন করতে গেলেন কেন? ঘড়ি দেখল সে। কথা বলতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। ঠিক সময়ে পৌঁছোনো তার অভ্যেস। কিন্তু মায়ের কথা ভেবে টেলিফোনের বই দেখে নাম্বার বের করে ডায়াল করল অর্জুন। একটু পরেই এ পি রায়ের গলা শুনতে পেল সে, হ্যালো!

এ পি-দা, আমি অর্জুন।

ও! শোনো, তুমি আজই ট্রেনে ওঠো। কাল কলকাতায় তোমাকে দরকার।

কেন?

কেন মানে? তোমার যা ট্যালেন্ট তা জলপাইগুড়িতে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া অর্থনৈতিক ব্যাপারটা নিয়ে তুমি মোটেই ভাবছ না। কলকাতার সবচেয়ে বড় বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা 'থার্ড আই'-এর এম ডি'র সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি তোমার নাম শুনেছেন। ওঁর সংস্থায় তুমি যদি জয়েন করতে চাও তা হলে সানন্দে গ্রহণ করবেন। এ পি রায় বেশ খুশি গলায় কথাগুলো বললেন।

এ পি-দা, আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে। আমি এখনই একটা বিশেষ কাজে ডুয়ার্সে যাচ্ছি। ফিরে এসেই আপনাকে ফোন করব।

যাওয়াটা কি খুব জরুরি?

আমি কথা দিয়েছি যে!

ওকে।

ফোন রেখে দিলেন এ পি রায়, কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারল ভদ্রলোক বেশ বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু কী করতে পারে সে? আচমকা কোনও সংস্থায় চাকরি নিয়ে সত্যসন্ধান করা কি তার পক্ষে সম্ভব? কোথাও চাকরি করলে নিজের স্বাধীনতা সংকুচিত হবেই। হয়তো প্রতি পদক্ষেপে কৈফিয়ত দিতে হবে। কিন্তু এ পি রায়ের প্রস্তাবে মুখের উপর না বলা যায় না। সে ঠিক করল, ফিরে এসে কলকাতা যাবে।

সে অমল সোম এবং মেজরের সঙ্গে ডুয়ার্সে যাচ্ছে এই খবরটা শুনে মা চট করে রাগারাগি করতে পারলেন না। অর্জুন মাকে আশ্বস্ত করল, ফিরে এসেই সে কলকাতা যাবে। মা শুধু বললেন, এই সুযোগটা হারাস না অর্জুন!

কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে অর্জুন যখন অমল সোমের বাড়িতে ঢুকল তখন ঘড়িতে সওয়া এগারোটা। অমল সোম বারান্দায় চেয়ারে বসে ছিলেন, পাশে হাবু। কাছে যাওয়ামাত্র হাতে ধরা ডালভরা পাতাগুলো এগিয়ে ধরলেন তিনি, আমার বাড়ির বাগানে এগুলো জঙ্গল হয়ে রয়েছে। একেই যে বিশল্যকরণীপাতা বলে, তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। কিন্তু লক্ষ করে দ্যাখো, পাতাগুলো খুব ফ্যাকাশে। অর্থাৎ এর রস খুব পাতলা হবে। সেক্ষেত্রে সেটা আদৌ কার্যকর হবে কি না আমি জানি না।

অর্জুন পাতাগুলো হাতে নিল। হ্যাঁ, এগুলো বিশল্যকরণী পাতা। কিন্তু জঙ্গলে যেরকম গাঢ় রঙের পাতা দেখা যায়, এগুলো তেমন নয়।

সে জিজ্ঞেস করল, এগুলো কি ওঁদের দেখাবেন?

ব্যাগে রেখে দাও। পার্থক্য বোঝাতে হলে দেখাব। অমল সোম ঘড়ি দেখলেন, কিন্তু এখনও ওঁরা আসছেন না কেন?

ফ্লাইট ঠিক সময়ে এসেছে কি না কে জানে! বাগডোগরায় নেমেও তো অনেকটা রাস্তা ওঁদের আসতে হবে।

অর্জুন আসার পরে হাবু ভিতরে চলে গিয়েছিল। এবার একটা বড় টিফিন ক্যারিয়ার আর বাস্কেটের মধ্যে দাঁড় করানো ছ'টা জলের বোতল নিয়ে এল।

আমি বাইরের জল খেতে পারি না। এগুলো ফুরিয়ে গেলে কী হবে কে জানে? সিলকরা বোতলের জল কিনে খেলেও ঠিক ভরসা পাই না। অমল সোম বললেন।

অর্জুন কিছু বলল না। বয়স হয়ে গেলে মানুষের ধ্যানধারণা বদলে যায়। যে অমল সোমের সঙ্গে সে বিভিন্ন অভিযানে গিয়ে দেখেছে, কোনও ব্যাপারেই তাঁর কোনও অস্বাচ্ছন্দ্য নেই, তিনি এখন ফোঁটানো জল পাবেন না বলে দুশ্চিন্তায় আছেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনে কি এমন একটা বয়স আসে, যখন তার খুঁতখুঁতুনি বেড়ে যায়।

শেষপর্যন্ত গাড়িটা বাড়ির সামনে এল বারোটা তিন মিনিটে। অর্জুন ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, গাড়ি থেকে নেমে দুটো হাত পাখির ডানার মতো দু'পাশে মেলে চিৎকার করে উঠলেন মেজর, হাই মধ্যম পাণ্ডব। আমি আশা করছিলাম নেমেই তোমাকে দেখতে পাব।

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন?

উত্তরটা মুখে না দিয়ে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মেজর। তাঁর গালভরতি দাড়ি অর্জুনের মুখে চেপে ধরে বললেন, লা-টু উপ্পা।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভিতর থেকে স্ত্রীকণ্ঠের হাসি ভেসে এল।

মেজর সেদিকে তাকাতেই অমল সোমের গলা শোনা গেল, দেরি হল কেন?

মেজর বললেন, দমদম থেকে ছাড়তেই দেরি করল। ইন্ডিয়ায় যা খুব স্বাভাবিক।

অমল সোম গম্ভীর গলায় বললেন, মেজর! প্লেনটা দেরি করলেও ছেড়েছে। আমেরিকার এয়ারপোর্টগুলোয় রোজ কত ফ্লাইট ক্যানসেল হয় তা নিশ্চয়ই আপনার জানা নেই। যাকগে, ছেড়েছিল বলে আমাদের দেখা হল।

মেজর অমল সোমের দিকে হাত বাড়ালেন, আপনি আগের মতো আছেন দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি।

এসময় উলটো দিকের দরজা খুলে যিনি নেমে এলেন, তিনি ইচ্ছে করলে সিনেমার নায়িকা হতে পারতেন। শুধু লম্বাই নন, বেশ সুন্দরী। পরনে জিন্স আর জ্যাকেট। এগিয়ে এসে অমল সোমের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, স্টেফি মুরহেড।

মেজর আলাপ করিয়ে দিলেন। স্টেফি ভেষজবিজ্ঞানী। মাস্টার্স করার পর রিসার্চ করছেন। থাকেন ফ্লোরিডায়। বয়স জেনে অর্জুন বুঝল, স্টেফি তার চেয়ে এক বছরের ছোট।

মেজরের ইচ্ছে ছিল কিছুক্ষণ অমল সোমের বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে রওনা হওয়ার। কিন্তু অমল সোম বললেন, তাড়াতাড়ি রাজাভাতখাওয়ায়। পৌঁছোনো উচিত।

স্টেফিকে ড্রাইভারের পাশের আসনে বসতে বলা হল। পিছনে ওঁরা তিনজন। অমল সোম ড্রাইভারকে বললেন, ভানুপ্রসাদ, ট্যাঙ্ক ভরে তেল নিয়ে নাও।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে বেরিয়ে তিস্তা নদী পেরিয়ে বলেরো গাড়ি ছুটল ডুয়ার্সের দিকে। জানলার কাচ নামিয়ে একবুক শ্বাস নিয়ে মেজর বললেন, আঃ!

অমল সোম মুখ না ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল?

বুকের ভিতরটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল! কী বাতাস, একফোঁটা পলিউশন নেই। এখানে এলেই আমার বুকের ভিতরটা নির্মল হয়ে যায়। মেজর বললেন।

তা হলে এখানে না থেকে আমেরিকায় পড়ে আছেন কেন?

অভ্যেস! স্রেফ অভ্যেস। অসুস্থ হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাবে সরকার, শ্রেষ্ঠ চিকিৎসার সুযোগ পাব। মেজর বললেন, কিন্তু খিদে পেয়ে গেল!

খিদে? যেন এর চেয়ে শিশুসুলভ শব্দ অমল সোম আগে কখনও শোনেননি।

অফকোর্স খিদে। সেই ভোরে হোটেল থেকে বেরোবার সময় এক কাপ চা ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি। এয়ারপোর্টে বসে থাকতে হল। একটা ভাল রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ল না। প্লেনে তো খাবার দেওয়ার বালাই ছিল না। আফটার অল এই চেহারাটা তো উইদআউট ফুয়েল রান করতে পারে না। বেশ চেঁচিয়ে কথাগুলো বললেন মেজর।

অর্জুন বলল, ডান দিকের বাইপাশ ধরলেই একটা ভাল ধাবা পাওয়া যেতে পারে।

অমল সোম ঠোঁট ওলটালেন, ধাবা! ওখানে খেলে আমাশা অনিবার্য।

মেজর শরীর নাচালেন, উঁহু। আমি বহুবছর আগে ধাবায় খেয়েছিলাম। মাটন চাপ, কী ডিলিসিয়াস! এখনও ভুলতে পারিনি।

মাটন চাপ! মেজর, আপনি এই বয়সে মাটন খাবেন? রেড মিট? আমি ভাবতে পারছি না আপনি আমেরিকায় থেকেও এত অবৈজ্ঞানিক কথা বলছেন কী করে?

অর্জুন অমল সোমকে থামাতে বলল, ওখানে চিকেনও পাওয়া যাবে। চিকেন? মেজর তাঁর কাঁচাপাকা দাঁড়িতে আঙুল চালালেন, ওটা একটা খাদ্যদ্রব্য বলে আমি মনে করি না।

স্টেফি অবাক চোখে চারপাশ দেখছিলেন। ওঁর হাতে এখন ক্যামেরা। জানলা দিয়ে টপাটপ ফোটো তুলে যাচ্ছেন একের পর-এক। ভানুপ্রসাদ সম্ভবত পিছনের আলোচনা শুনছিল। গাড়ির গতি কমিয়ে বলল, ধাবা এসে গিয়েছে, গাড়ি থামাব?

ইয়েস মাই বয়। মিস্টার সোম, এই ধাবায় যে খাবারকে আপনি স্বাস্থ্যসম্মত বলে মনে করেন, তাই আমি হাসিমুখে খেয়ে নেব।

গাড়ি থামতেই একটা ছোকরা ছুটে এল। নামতা পড়ার মতো নানান খাবারের নাম বলে যেতে লাগল। গাড়ি থেকে নেমে অর্জুন তাকে ধমকে চুপ করতে বলে মালিককে ডেকে আনতে বলল। ছেলেটার কথা

শুনে একজন বেঁটে সর্দারজি ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। এখন ধাবার সামনে গাড়ির ভিড় হালকা। কয়েকজন খাঁটিয়ায় বসে খাচ্ছে। সর্দারজি সামনে এসে হাসল, আরে বাপু! আপ? বলিয়ে বাবুজি?

নাম মগন সিংহ। এর আগে দু-তিনবার এই ধাবায় নেমেছিল অর্জুন। একবার একটু ঝামেলাও হয়েছিল। দেখা গেল, তাকে মনে রেখেছে। মগন সিংহ।

অর্জুন বলল, ওই দাড়িওয়ালা সাহেব আর মেমসাহেব আজই বিদেশ থেকে এসেছেন। মশলা যতটা কম আর ঝাল একদম নয়, এমন খাবার দিতে পারবেন ওঁদের জন্যে?

জি। কেন পারব না? বসুন, বসুন! এ বাচ্চা, চার কুরশি লাগা জলদি। চিৎকার করল মগন সিংহ। তারপর জিজ্ঞেস করল, চিকেন না মাটন?

অমল সোম খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, চিকেন! কিন্তু খাবারটা কী?

বাবুজি, সুপ দিতে পারি! যদি বলেন স্টু, তাও হবে। সঙ্গে রুটি, গরমাগরম।

আমাকে ভেজিটেবল সুপ দাও। ওদের চিকেন।

মগন সিংহ অর্জুনের দিকে তাকাল, বাবুজি, আপনিও তাই নেবেন?

না। মাটন চাপ আর রুটি। কিন্তু প্লেট চামচ যেন পরিষ্কার থাকে।

মগন সিংহ চলে গেল। ছেলেটা ইতিমধ্যে চেয়ার পেতে দিয়েছিল। হালকা শীত মাখানো রোদ্দুরে এখানে বসতে মন্দ লাগবে না। ওপাশে মেজর স্টেফিকে বোধহয় ডুয়ার্সের ভূগোল সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছিলেন। অর্জুনের ডাকে ওঁরা চলে এলেন। চেয়ারে বসে মেজর বললেন, গ্র্যান্ড! স্টেফি, এটাকে ওপেন এয়ার রেস্টুরেন্ট ভেবে নাও।

কথাগুলো ইংরেজিতে বললেন তিনি। স্টেফি চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, এখানে কোনও লেডিসরুম নেই?

মেজর চটপট ছেলেটিকে ডেকে বললেন, অ্যাই, তোদের এখানে মেয়েদের টয়লেট আছে? টয়লেট? ওঃ! কী বলে বোঝাই!

অর্জুন হাসল, মেমসাহেবকে বাথরুমে নিয়ে যা।

ছেলেটা মাথা নেড়ে ইশারা করল স্টেফিকে। মেজর বললেন, উঃ, আমাদের কত ভুল কথা শেখানো হয়েছিল। বাথরুম যে স্নানের ঘর, জলবিয়োগের জন্যে নয়, তা কে বলবে?

অমল সোম আরাম করে বসে ছিলেন। বললেন, এত বছর আমেরিকায় থেকেও আপনি বিকল্প বাংলা চমৎকার বলছেন দেখে প্রীত হলাম।

মানে? মেজর তাকালেন।

বুঝে নিন।

এই সময় লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবি পরা একটা স্বাস্থ্যবান লোক ধাবা থেকে বেরিয়ে এল পানীয়ের বোতল হাতে। এসে বোতল উঁচিয়ে ধরে গলায় খানিকটা ঢেলে চিৎকার করল, মুন্না, এ মুন্না! জলদি বাহার আ।

আর-একজন স্বাস্থ্যবান লোক বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। তারও হাতে পানীয়ের বোতল।

প্রথম লোকটি হতাশ গলায় বলল, ফালতু বাত মত করনা।

একদম সাচ বাত। একটু আগে আমি দেখেছি। একজন মেমসাব। ফিল্মস্টার।

তো? হাত ঘুরিয়ে মূকাভিনয় করে জিজ্ঞেস করল লোকটা, কোথায় গেল?

এই সময় দেখা গেল মগন সিংহ বেরিয়ে আসছে। দ্রুত লোকটার কাছে গিয়ে নিচু স্বরে কিছু বলল। লোকটা সেটা শুনে অর্জুনদের দিকে তাকাল। তারপর সঙ্গীকে নিয়ে আবার ভিতরে ঢুকে গেল। মগন সিংহ ভিতরে চলে যেতে অমল সোম বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখলে! এরকম সাবস্ট্যান্ডার্ড জায়গায় যারা খেতে আসে, তারা আর যাই হোক, ভদ্রলোক নয়। লুম্পেন, গুন্ডাদের জায়গা এটা। খাবার দিতে দেরি হলে আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।

অর্জুন বলল, লোকটা বোধহয় ট্রাক ড্রাইভার। মগন সিংহ যখন কথা বলেছে। তখন আর ওর কিছু করার ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া এরকম লোক শুধু ধাবা কেন, অনেক বড় বড় রেস্টুরেন্টেও চলে যায়। আপনি চিন্তা করবেন না।

খাবার এল। একটা ছোট টেবিল পেতে তার ওপর খাবারের পাত্রগুলো রাখা হল। তিনজনের জন্যে পরিষ্কার চকচকে কানাউঁচু বাটিতে স্টু অথবা সুপ, একটা প্লেটে গরম রুটির স্তূপ, অর্জুনের জন্যে খালি প্লেট আর গরগরে মাটন চাপ।

অমল সোম বললেন, দেখে তো শত্রু বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু মহিলাটি কোথায় গেলেন? এত দেরি হওয়ার তো কথা নয়।

অর্জুন উঠে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ওদের দেখতে পেল। স্টেফির হাতে একটা গাছের ডাল। ছেলেটাও যেন ওকে কিছু পাইয়ে দিয়েছে এমন আনন্দে হাঁটছে। মুখোমুখি হতেই স্টেফি ডালটা দেখিয়ে বললেন, তুমি এই গাছটাকে চেনো?

হ্যাঁ। গাঁদাফুলের গাছ।

দ্যাটস অল? তার বেশি জানো না? অথচ ও জানে। ও বলল যদি অল্প কেটে বা ছড়ে যায়, তা হলে এই গাছের পাতা থেঁতলে রসসুদ্ধ ক্ষতস্থানে চেপে দিলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে যায়। স্টেফি বলল, দ্যাখো, নেচার মানুষের জন্যে কতরকমের ফাস্ট এডের ব্যবস্থা করে রেখেছে।

তা ঠিক। এরকম তুমি অনেক কিছু পাবে। কিন্তু খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ।

অর্জুনের কথায় তেমন কাজ হল না। চেয়ারে ফিরে এসে স্টেফি আবার সবিস্তার মেজরকে বোঝাতে লাগলেন গাঁদাগাছের পাতার কী মহিমা!

অমল সোম তখন খাওয়া শুরু করেছেন। বললেন, গুড! ভেরি গুড।

স্টেফি ছোট্ট পাতাভরতি ডাল টেবিলের একপাশে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আমি কি খুব সামান্য ব্যাপার নিয়ে বেশি এক্সসাইটেড হয়েছি?

মেজর খেতে খেতে বললেন, নট দ্যাট। তোমার পক্ষে উত্তেজিত হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এরা এ-সবে এত অভ্যস্ত যে, নতুন করে উত্তেজিত হতে পারে না। একটু চুপ করে তিনি গলার স্বর পালটালেন, অর্জুন!

সবে মাংসের টুকরো রুটিতে জড়িয়ে মুখে পুরেছিল, সেই অবস্থায় তাকাল অর্জুন।

আমি যদি তোমার খাবারটা একটু টেস্ট করতে চাই, জাস্ট একটা ওয়ান ফোর্থ টুকরো, তুমি কি খুব আপত্তি করবে? মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

না, নিন! আপনি তুলে নিন। প্লেট এগিয়ে ধরল অর্জুন। মেজর, আপনি নিজের ক্ষতি করছেন। অর্জুনের যে বয়স তাতে সে রেড মিট, মশলা দেওয়া ঝাল রান্না খেয়ে হজম করতে পারে। আপনার বয়সে তা করা সম্ভব নয়। লোভ সংবরণ করুন যদি আরও কিছুদিন বাঁচতে চান। বেশ

অভিভাবকের গলায় কথাগুলো বললেন অমল সোম।

হতাশ চোখে অমল সোমকে দেখলেন মেজর। তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে মাথা নাড়লেন, আপনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে মি. সোম।

স্বাভাবিক। প্রাণ থাকলেই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অমল সোম মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছিলেন।

ভানুপ্রসাদের কথা খেয়াল ছিল না কারও, অমল সোমই মনে করালেন। তাকে ভিতরে খেতে পাঠানো হল। খাওয়া শেষ করে অমল সোম স্টেফিকে জিজ্ঞেস করলেন, মেজর টেলিফোনে তোমার কথা

বলছিলেন। এবার বলো, কী উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এসেছ?

স্টেফি খাওয়াটা উপভোগ করছিলেন। কাগজের রুমালে ঠোঁট মুছে বললেন, আমি একজন ভেষজবিজ্ঞানী। মাস্টার্স করার পর কী নিয়ে রিসার্চ করব তা-ই ঠিক করতে পারছিলাম না। বস্টন ইউনিভার্সিটির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এডওয়ার্ড স্মিথ-এর সঙ্গে আচমকা পরিচয় হয়ে গেল। উনি আমাকে বললেন, ভারতীয় মহাকাব্যে এমন অনেক উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে, যা মানুষের শরীরে মিরাকলের মতো কাজ করেছে। ছোটখাটো অসুখে তাদের অবদানের কথা এখন অনেকেই জানেন। উনি আমাকে বললেন যে, বুকের গভীর ক্ষত নাকি একটা লতানো গাছের পাতার রসে দ্রুত জুড়ে যায়। আমাকে একটি বই পড়তে দেন এডওয়ার্ড। ডিউরিং দ্য ওয়ার লছমন ওয়াজ অলমোস্ট কিলড বাই মেঘনাদ। সেটা ছিল সাম শর্ট অফ শেলের আঘাত। লছমন ওয়াজ সেন্সলেশ। তার বুক থেকে রক্ত বের হচ্ছিল এবং মৃত্যু যে-কোনও মুহূর্তেই হতে পারত। হিজ এল্ডার ব্রাদার ওয়াজ টোল্ড দ্যাট, লছমনকে বাঁচাতে পারে একটা গাছের পাতার রস, যা গন্ধমাদন। পাহাড়ে পাওয়া যায়। গাছটার নাম বিশল্যকরণী। যাই হোক, সেই পাতার রসে লছমনের উন্ড দ্রুত সেরে গিয়েছিল এবং সে বেঁচে গিয়েছিল। আমি এটাকে রূপকথা ভেবেছিলাম। অনেক অ্যাবসার্ড ব্যাপার রূপকথায় থাকে। কিন্তু এডওয়ার্ড আমাকে বললেন, ওই গাছ নাকি এখনও ইন্ডিয়ায় পাওয়া যায়। শ্বাস নিলেন স্টেফি, আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে এটা নিয়ে কথা বললাম। সবাই হেসে উড়িয়ে দিল। একজন বিদ্রূপ করল এই বলে যে, যদি তুমি ওই গাছের পাতার রস ঠিকঠাক প্রিজার্ভ করতে পারো, তা ওপেন হার্ট সার্জারির ক্ষেত্রে দারুণ কাজ দেবে। লোকটি বিদ্রূপ করলেও আমি একটা প্রস্তাব তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিলাম। আর তখনই মি. মেজরের সঙ্গে আমার আলাপ হল। উনি ফোনে জেনে নিলেন যে, এখনও ইন্ডিয়ার এই পার্টে ওই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। আপনারা কেউ দেখেছেন কি?

অমল সোম এবং অর্জুন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

গাছটা কি খুব দামি?

অমল সোম বললেন, নট অ্যাট অল। যে-কোনও বুনো গাছের মতো এখানে-ওখানে গজিয়ে থাকে। তবে তা দিয়ে ওপেন হার্ট সার্জারির কী কাজে লাগবে তা আমি জানি না।

অর্জুন বলল, ছেলেবেলায় খেলতে গিয়ে কোথাও কেটে গেলে বিশল্যকরণী পাতার রস লাগিয়ে দিলে দেখতাম, পরদিন জায়গাটা জুড়ে গিয়েছে।

তুমি সত্যি বলছ? স্টেফি উত্তেজিত।

অমল সোম বললেন, সেটা তো ওই গাঁদাফুলের পাতার রসেও জুড়ে যায়?

অর্জুন বলল, যায়। তবে বিশল্যকরণী আরও বেশি জোরালো। অর্জুন পকেট থেকে অমল সোমের দেওয়া বিশল্যকরণী গাছের পাতা বের করল। এই ছোট্ট ডালের পাতাগুলো হল বিশল্যকরণী। অমলদার

বাড়িতেই এটি পাওয়া যায়।

স্টেফি দ্রুত হাত বাড়িয়ে ওটা নিয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। মেজর বললেন, আমার যতদূর মনে আছে, বিশল্যকরণী পাতা এমন ফ্যাকাশে হয় না। বেশ গাঢ় রং।

অমল সোম বললেন, ঠিক। গন্ধমাদন পাহাড়ে কী ধরনের বিশল্যকরণী গাছ ছিল তা আমি জানি না, কিন্তু এই ডুয়ার্সের জঙ্গলে ওই গাছের যে পাতা দেখেছি, তার রং খুব ডিপ, কালচে-নীল, আর তার পাতার রস খুব গাঢ়।

স্টেফি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি গাছ বললেন, কিন্তু আমি শুনেছি ওটা উদ্ভিদ।

অমল সোম হাসলেন, ঠিকই শুনেছ। আমরা অন্যমনস্কভাবে গাছ শব্দটি ব্যবহার করি। যেমন ধান। ধান একটি উদ্ভিদ। কিন্তু আমরা বলি ধানগাছ। বিশল্যকরণী লম্বায় দেড়-দু' ফুটের বেশি হয় না।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, স্টেফি, এই পাতার রস কীভাবে ওপেন হার্ট সার্জারিতে কাজে লাগবে?।

ওপেন হার্ট সার্জারির পরে যদি ওই পাতার রস, যেমন শুনেছি তেমন কার্যকর হয়, তা হলে পেশেন্টের ওপেন করা শরীরের অংশ খুব দ্রুত জুড়ে যাবে। এখন চিকিৎসকরা যেভাবে জুড়ছেন তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগবে, খরচও কমে যাবে অনেক।

ওই রস কি পরীক্ষার মাধ্যমে অন্য চেহারায় নিয়ে যাওয়া হবে?

অফকোর্স। আমার এই উদ্যোগে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন একটি আন্তর্জাতিক ওষুধ সংস্থা। এই বাবদ যা খরচ হবে তা তারা দিচ্ছেন। যদি সাফল্য পাওয়া যায় তা হলে আমি পেটেন্ট বাবদ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হব। স্টেফি হাসলেন।

.

হাসিমারা হয়ে রাজাভাতখাওয়া পৌঁছোতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। রাজাভাতখাওয়া একটা জায়গার নাম জেনে স্টেফি অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, কথাটার মানে কী?

অর্জুন বলল, ভারত তখন অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। এরকম এক রাজ্য কুচবিহার। আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি তা কুচবিহার রাজার রাজত্ব ছিল। এই রাজার সঙ্গে একসময় পাশের পাহাড়ি রাজ্য ভুটানের রাজার ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল। শেষপর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হলে শান্তিচুক্তি তৈরি করতে কুচবিহারের রাজা এবং ভুটানের রাজা অথবা তাঁর কোনও প্রতিনিধি এই জায়গায় মিলিত হয়েছিলেন। সেই দুপুরে রাজা এখানে ভাত খেয়েছিলেন বলে জায়গাটার নাম হয়ে গেল রাজাভাতখাওয়া।

মাথা নাড়লেন স্টেফি, এভাবে যে জায়গার নাম হতে পারে জানতাম ।

সামনেই ট্রেন লাইন। স্টেফির কৌতূহল মেটাতে হল অর্জুনকে, এই লাইন কুচবিহার হয়ে অসমে গিয়েছে। ওপাশে শুরু হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে।

লাইন পেরিয়ে ডান দিকে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে তা শেষ হয়েছে জয়ন্তীর জঙ্গলে। বাঁ দিকের সরু পিচের পথটা ঢুকে গিয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এলাকায়। অমল সোম ভানুপ্রসাদকে সেদিকে যেতে বললেন।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে?

অমল সোম মাথা নাড়লেন, হুঁ।

বাঃ। বেশ কোয়াইট, যাকে বলে শান্ত নিরিবিলি জায়গা। মেজর বললেন।

আপনি দেখছি নিয়মিত বাংলা বই পড়ছেন। অমল সোম বললেন।

মেজর রেগে গেলেন, দেখুন মি. সোম, আমার বাবা-মা চোদ্দো পুরুষ বাঙালি, আমিও তাই। অনেক অনেক বছর আমেরিকায় আছি বলে চট করে ঠিকঠাক শব্দ মুখে আসে না, কিন্তু একটু ধাক্কা খেলেই গড়গড়িয়ে চলে আসে।

একটি লোক রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ি থামিয়ে অমল সোম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রেস্ট হাউস কোথায়? আমরা ঘর বুক করে এসেছি।

আপনারা ওই অফিসে যান। ওখান থেকেই চাবি পাবেন। লোকটা যে বাড়িটা দেখাল, সেটা ছাড়িয়ে চলে এসেছিল গাড়ি। অতএব ভানুপ্রসাদকে ব্যাক করতে হল।

আমার নামেই বুকিং আছে। অর্জুন, যাও, চাবি নিয়ে এসো। অমল সোম বললেন।

গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে অফিসঘরে ঢুকল। একজন টেলিফোনে কথা বলছেন, দ্বিতীয়জন মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন।

অর্জুন দ্বিতীয়জনকে বলল, রেস্ট হাউসে বুকিং কে দেখেন?

বলুন। কাগজ সরিয়ে রাখলেন ভদ্রলোক।

মি. অমল সোমের নামে ঘর বুক করা আছে। উনি বাইরে গাড়িতে আছেন। তিনটি ঘরের বুকিং আছে। অর্জুন বলল।

আমি যদ্দুর জানি একটা ঘর খালি আছে, তিনটে তো নেই।

সে কী! উনি ডি এফ ও-কে বলেছিলেন তিনটে ঘরের জন্যে?

স্লিপ দিন। হাত বাড়ালেন ভদ্রলোক।

অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার কাছে বুকিং স্লিপ আছে?

অমল সোম জানলায় মুখ এনে বললেন, টেলিফোনে কথা হয়েছে। ওটার দরকার নেই।

ব্যাপারটা ঘরে ঢুকে বলতেই প্রথম লোকটি রিসিভার নামিয়ে খাতা খুলে দেখালেন, সেখানে অমল সোমের নাম নেই।

কিন্তু ডি এফ ও ওঁকে কথা দিয়েছিলেন! অর্জুন কী করবে বুঝতে পারছিল না।

হয়তো, কিন্তু ওঁর অফিস আমাদের কোনও ইমফর্মেশন পাঠায়নি। উনি আমাদের বস। উনি কিছু বললে আমরা শুনতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের উনি কিছু বলেননি। প্রথমজন বললেন।

দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে বললেন, একবার বড়বাবুকে ফোন করে দ্যাখো, ওঁকে কিছু বলেছেন কিনা। বললে অবশ্য বড়বাবু আমাদের জানাতেন।

প্রথমজন ফোনের নাম্বার ঘোরালেন। রিসিভার নামিয়ে বললেন, এখানে নাম্বার পাওয়া খুব মুশকিল। আপনারা ক'জন?

চারজন। একজন মহিলা।

দেখুন, দুটো রুম দিতে পারি। একটা এখনই খালি আছে। দ্বিতীয়টা পাওয়া যাবে সন্ধের পরে। পার্টি ঘরে তালা দিয়ে ফরেস্টে বেড়াতে গিয়েছে। সন্ধের আগে ফিরবে না। গতকাল পর্যন্ত ওর বুকিং ছিল। আজ খালি পড়ে থাকায় ওকে দিয়েছিলাম এই শর্তে যে, কারও বুকিং থাকলে ওকে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়জন বললেন।

তার মানে দুটো ঘর পাওয়া যেতে পারে, দ্বিতীয়টা সন্ধের পর।

হ্যাঁ। প্রথমজন বললেন, লাইন পেয়েছি, বড়বাবু, চারজনের এক পার্টি এসেছেন, বলছেন, ডি এফ ও সাহেব ওঁদের তিনটে রুম দিয়েছেন। আপনি কিছু জানেন? আরে! এ কথা বলবেন তো! রাখছি। রিসিভার রেখে প্রথমজন বললেন, আজ ওই দুটোতে ম্যানেজ করে নিন, কাল দেখা যাবে।

অর্জুন বলল, আমরা চারজন। মহিলাকে একটা ঘর ছেড়ে দেওয়ার পর এক ঘরে তিনজন কি থাকা সম্ভব? তা ছাড়া আপনি বলছেন, দুটোর একটা ঘর সন্ধের পর পাওয়া যাবে?

একটু কষ্ট করুন। এক্সট্রা বেড দিয়ে দেব সন্ধের পর। আমাদের কাছে। খবর এলে এই সমস্যা হত না। দ্বিতীয়জন বললেন।

কিন্তু টেলিফোনে যাঁর সঙ্গে কথা বললেন তাঁর কাছে তো ইনফর্মেশন ছিল!

তাঁর কাছে থাকলে হবে? ওটা তো এই অফিসে আসতে হবে। আসেনি। তা ছাড়া ডি এফ ও টেলিফোনে বলে দিলেন আর আপনারা কোনওরকম রসিদ হাতে না নিয়ে চলে এলেন? লিখিত অর্ডার ছাড়া আপনি আইনসম্মতভাবে ঘর ক্লেম করতে পারেন না।

মাথা নাড়ল অর্জুন। কথাটা ভুল নয়। তবে এ দেশে সরকারি বড়কর্তাদের মুখের কথায় যত কাজ হয়, লিখিত অর্ডারে তা হয় না বলে সে এতকাল জানত।

বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়ির কাছে দাঁড়াতে মেজর বললেন, উঃ! এত সময় লাগল!

অর্জুন অমল সোমের দিকে তাকিয়ে সমস্যার কথা জানাল। অমল সোম বললেন, অসম্ভব। মেজরের সঙ্গে একঘরে শুলে সারা রাত জেগে থাকতে হবে। পকেট থেকে সেলফোন বের করে নাম্বার টিপলেন তিনি। কানে চেপে বিরক্ত হলেন, যাঃ, বলছে, আউট অফ রিচ।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, কোনও হোটেল নেই এখানে?

ইতিমধ্যে অফিস থেকে প্রথমজন বেরিয়ে এসেছিলেন। প্রশ্নটা তাঁকেই করল অর্জুন। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, না।

মেজর বললেন, রাজা এখানে ভাত খেয়েছিলেন অথচ হোটেল নেই?

প্রথমজন কথাটাকে গুরুত্ব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ঠিক করলেন?

অমল সেন বলেন, এভাবে থাকতে আমি অভ্যস্ত নই।

ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করলেন, আপনারা এক কাজ করুন। সোজা জয়ন্তীতে চলে যান। ওখানে সরকারি বাংলো আছে, গেস্ট হাউসও হয়েছে। কয়েকটা, সমস্যা হবে না।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, কতদূর?

বেশি সময় লাগবে না। ভদ্রলোক পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেলেন, মাঝপথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মাটির রাস্তা ধরে গেলে জৈন্তী নদীর ধারে একটা বাংলো আছে। বেসরকারি। বছরের বেশিরভাগ সময় খালি থাকে। ব্যবস্থা সুন্দর। তবে সেখানে না যাওয়াই ভাল।

মেজর সোজা হলেন, কেন?

একদম নির্জন জায়গা তো। জঙ্গলের মধ্যে! ভদ্রলোক চলে গেলেন।

মেজর বললেন, লেটস গো টু দ্যাট প্লেস।

অমল সোম বললেন, কী দরকার? জয়ন্তীর বাংলোটার খ্যাতি আছে। ওখানেই চলুন।

এতক্ষণ স্টেফি তাঁর ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মেজর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন জায়গায় থাকতে চাও! লোকালয়ে, না জঙ্গলের মধ্যে?

স্টেফি বললেন, অফকোর্স জঙ্গলের মধ্যে।

অর্জুন বলল, একবার বাংলোটাকে দেখা যেতে পারে। পছন্দ না হলে জয়ন্তীতে চলে যাব। এর জন্যে খুব বেশি হলে মিনিট চল্লিশেক নষ্ট হতে পারে।

গাড়ি ঘোরাল ভানুপ্রসাদ। অমল সোম বললেন, চাল, ডাল, তেল, ডিম, আলু যা যা দরকার তা এখান থেকে কিনে নাও, মোমবাতিও। ওখানে গিয়ে আমি নেই' শুনতে রাজি নই।

আধঘণ্টা পরে ডিকিতে যাবতীয় জিনিস বোঝাই করে ওঁরা রওনা হলেন। এখানে খুব তাজা সবজি পাওয়া যায়, যা দেখে স্টেফি উচ্ছ্বসিত। মেজর গোটাচারেক মুরগি কিনে তাদের পায়ে দড়ি বেঁধে ডিকিতে রাখলেন।

এখন দুপুর শেষ। কিন্তু সন্ধে হতে ঢের দেরি। বিকেল আসব আসব করছে। সুন্দর পিচের রাস্তাটা সোজা জঙ্গলের বুক চিরে চলে গিয়েছে। একটু একটু করে ছায়া ঘন হচ্ছে। একবুক শ্বাস নিয়ে বাতাস ছাড়লেন মেজর, আঃ। কী নির্মল জায়গা। নো পলিউশন। বুক্টা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

খানিকটা যাওয়ার পর দুটো বনমুরগিকে দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে যেতে দেখলেন ওঁরা। স্টেফি যখন জানলেন ওদের জীবনযাপনের সঙ্গে মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই, তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, ওদের ধরা যায় না?

অর্জুন মাথা নাড়ল, এই জঙ্গল সংরক্ষিত। কোনও প্রাণীকে ধরলে জেলে যেতে হবে।

স্টেফি গম্ভীর হলেন। তারপর বললেন, রাস্তা আর জঙ্গলের মধ্যে অনেক বুনো গুল্ম রয়েছে। ওদের মধ্যে বিশল্যকরণী দেখতে পেলে গাড়ি থামাতে বলো।

প্রায় কুড়ি মিনিটে ওরা ওপাশ থেকে একটা বাস আর তিনটে প্রাইভেট গাড়িকে এদিকে আসতে দেখল। জঙ্গল যত ঘন হচ্ছিল তত ঝিঁঝির ডাক বাড়ছিল। স্টেফি জিজ্ঞেস করলেন, এই জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী আছে?

সব প্রাণী হিংস্র নয়! পরিস্থিতি তাকে হিংস্র করে দেয়। যেমন হাতি। হাতির মতো নিরীহ প্রাণী খুব কম আছে। কিন্তু খিদে পেলে অথবা আক্রান্ত হচ্ছে ভাবলে, সে এমন হিংস্র হয়ে ওঠে যে, তার মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। জঙ্গলে ঢোকার আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বোর্ডে যা দেখলাম, তাতে জানলাম, এই জঙ্গলে হাতি, লেপার্ড, শূকর, বাইসন ছাড়াও গন্ডার মাঝেমধ্যে দেখা যায়। অমল সোম বললেন।

আঃ! ইন্টারেস্টিং।

ভানুপ্রসাদ, দাঁড়াও। বেশ জোরে বললেন অমল সোম।

অর্জুন তাঁর মুখের দিকে তাকাল। অমল সোম বললেন, তোমরা সামনের দিকে তাকিয়ে আছ বলে সম্ভবত সাইনবোর্ডটা মিস করেছ। গাড়িটা ব্যাক করো ভানুপ্রসাদ।

গাড়িটা প্রায় তিরিশগজ পিছিয়ে নিয়ে গেল ভানুপ্রসাদ। তখনই চোখে পড়ল একটা সরু রাস্তা ঢুকে গিয়েছে জঙ্গলের ভিতরে। রাস্তার মুখে গাছের গায়ে একটা কাঠের প্ল্যাকার্ড সাঁটা রয়েছে, যাতে লেখা, রেসটি।

মেজর বললেন, রেসটি! মানে কী?

অমল সোম বললেন, আমার অনুমান যিনি বাংলোটা বানিয়েছিলেন তিনি 'রেস্ট হাউস' না বলে আদর করে 'রেসটি' বলেছেন।

অর্জুন বলল, কিন্তু যেভাবে এবং যেখানে লিখে রাখা হয়েছে সেখানে কারও নজর তো চট করে যাবে না। তা হলে এভাবে লেখার মানে কী?

অমল সোম বললেন, হয়তো বাংলোটা যাঁর তিনি চান না বাইরের লোক ভিড় জমাক।

অর্জুন মেজরের দিকে তাকাল, তা হলে আমাদের যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

চলো, বাংলোটা চোখে দেখে আসি। লোকটাকে বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস বলে মনে হচ্ছে। নইলে এরকম নির্জন জঙ্গলে বাংলো তৈরি করতেন না। চলো। মেজর বললেন।

অতএব পিচের রাস্তা ছেড়ে গাড়ি ঢুকল মাটির পথে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি মাঝে মাঝে থার্ড গিয়ারে ছাড়া গতি বাড়াতে পারছে না। অজস্র পাখির ডাক ছাড়া বাঁদরের বাঁদরামিও চোখে পড়ল। সেই স্বল্প আলোতেও ফোটো তুলে যাচ্ছিলেন স্টেফি। আচমকা ব্রেক চাপল ভানুপ্রসাদ। থরথরিয়ে থেমে গেল বড় গাড়িটা। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, কী হল?

ভানুপ্রসাদ ইশারায় সামনের দিকটা দেখাল। গাড়ি থেকে কুড়ি ফুট দূরে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে লেজের উপর ভর করে সোজা যে দাঁড়িয়ে আছে, তার উচ্চতা অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট। শরীরটা দুলছে। মুখ

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাড়িটাকে দেখছে।

বিউটিফুল! চাপা গলায় বলে স্টেফি ক্যামেরা তাক করলেন। তারপর উইন্ডস্ক্রিনের আড়াল থেকে ফোটো তুলে সন্তুষ্ট না হয়ে জানলার বাইরে ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে ফোটো তুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ভালুপ্রসাদ দ্রুত তাঁকে টেনে নিয়ে এল ভিতরে। ঠিক তখনই সাপটি মুখ খুলে তীব্র গতিতে সামনে ছুঁড়ে ফেলল কিছু তরল পদার্থ। বলেরো গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের উপরও এসে পড়ল কয়েক ফোঁটা। একবার শান্ত না হয়ে পরপর দু'বার তরল পদার্থ ছুঁড়ে যেন একটু হতাশ হল সাপটা।

টেরিবল। ও কি বিষ ছুড়ছে? মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

সাপটা ধীরে ধীরে শরীর নীচে নামিয়ে নিল। তারপর সরসর করে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। অমল সোম স্টেফিকে বললেন, স্টেফি, তোমার উচিত ভানুপ্রসাদকে ধন্যবাদ দেওয়া। সাপের থুতু তোমার গায়ে পড়লে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারত!

স্টেফি ভানুপ্রসাদের হাতে আঙুল ছুঁইয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ!

ভানুপ্রসাদ একগাল হেসে গাড়ি চালু করল।

মেজর বললেন, তা হলে বোঝা যাচ্ছে এই জঙ্গলে মারাত্মক সাপ আছে। ঠিক এরকম সাপ আমি দেখেছিলাম আমাজনের ধারে।

আমাজন? অর্জুন তাকাল।

ইয়েস। অ্যানাকোন্ডার খোঁজে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই ব্ল্যাক কোবরাদের জ্বালায় পালিয়ে আসতে হয়েছিল। আমাদের উচিত ছিল কয়েক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড নিয়ে আসা। থেমে গেলেন মেজর।

কাছাকাছি কোথাও শব্দ হচ্ছিল। গাছের ডাল ভাঙার শব্দ। ভানুপ্রসাদ নিচু গলায় বলল, হাতি!

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, এলিফ্যান্ট? কোথায়? আমি অবশ্য আফ্রিকার হাতির সঙ্গে মোকাবিলা করেছি। বিগ বিগ এলিফ্যান্ট। তাদের তুলনায় তো ইন্ডিয়ান হাতি গোরুর মতো। কী বলল অর্জুন?

অর্জুন বলল, ইন্ডিয়ান বলে অবহেলা করবেন না।

একটু পরেই একটা তারের দেওয়াল-ঘেরা জমির উপর দোতলা বাড়ি দেখা গেল জঙ্গলের মধ্যে। বাড়িটা কাঠের। বহুদিন রং না করায় একটু জীর্ণ ভাব এসে গিয়েছে। গেটের সামনে পৌঁছে হর্ন বাজাল ভানুপ্রসাদ।

তার আওয়াজে কিছু পাখি আশপাশের গাছ ছেড়ে প্রতিবাদ করতে করতে ডানা মেলল। অর্জুন গাড়ি থেকে নেমে চারপাশে তাকাল। হাওয়া বইছে বলে জঙ্গলে অদ্ভুত শব্দ বাজছে। কাঠের বাড়িটা নিঝুম হয়ে রয়েছে। সে দেখল, স্টেফিও গাড়ি থেকে নেমেছেন। পাশে এসে স্টেফি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি সরকারি গেস্ট হাউস?

মাথা নাড়ল অর্জুন, না।

আমার মনে হচ্ছে ওখানে কেউ থাকে না।

গাড়ির ভিতর থেকে অমল সোম বললেন, একবার ভিতরে গিয়ে দেখে এসো।

গেট খুলে ভিতরে ঢুকল অর্জুন। বাংলোর লনে এককালে বাগান ছিল, এখন অযত্নে সেগুলো প্রায় বুনো ঝোঁপ হয়ে গিয়েছে। ওপাশে বেশ কিছু কলাগাছে কলা ঝুলছে। পুরুষ্ট, পেকে হলদে হয়ে আসা কলাগুলো কী করে বাঁদরদের খাদ্য হয়নি এখনও কে জানে? হঠাৎ অদ্ভুত শব্দ হতেই অর্জুন দাঁড়িয়ে গেল। শব্দটা সমস্ত লন জুড়ে বাজছে। শব্দের উৎস লক্ষ করতে করতে সে আবিষ্কার করল, প্রায় গোটা আটেক বড় গাছে টিন ঝুলছে। সেই টিনে ঘণ্টা বাঁধা আছে। প্রতিটি ঘণ্টা দড়ির সঙ্গে যুক্ত। সেই দড়ি ধরে টানলেই টিনে আওয়াজ হচ্ছে। যেমন বেজে উঠেছিল তেমন থেমে গেল শব্দ। লোকে কাকপক্ষী তাড়াবার জন্যে এরকম ঘণ্টা গাছে বেঁধে রাখে। ঘণ্টা যখন বাজল তখন নিশ্চয়ই কেউ দড়ি ধরে টেনেছে। যে টেনেছে সেই লোকটা কোথায়?

অর্জুন দুটো হাত মুখের দু'পাশে এনে চিৎকার করল, কেউ আছেন?

কোনও উত্তর এল না। চারদিকে নজর রেখে সে বাড়ির পিছন দিকে আসতেই দুটো ছোট ঘর দেখতে পেল। ঘরের দরজা ভিতর থেকে ভেজানো। মাথার উপর তাকিয়ে অর্জুন দেখতে পেল, ঘণ্টাবাঁধা দড়ি ওই কাঠের ঘরের সিলিং-এর ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। অর্থাৎ যে দড়িটা টেনেছে সে ওই ঘরেই রয়েছে।

অর্জুন দরজা ঠেলতেই কাঁক শব্দ উঠল। ঘরের ভিতরটা প্রায় অন্ধকার। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর লোকটাকে দেখতে পেল অর্জুন। একটা খাঁটিয়ার উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। দড়ির প্রান্ত খাঁটিয়ার পায়ার সঙ্গে বাঁধা।

শুনছেন? অর্জুন ডাকল।

লোকটি মুখ থেকে কম্বলের আড়াল সরাল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল। অর্জুন দেখল লোকটির মুখে কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দড়ি পাকানো শরীর, গায়ের রং বেশ কালো। মাথার চুলে বোধহয় অনেকদিন কাঁচির ছোঁয়া লাগেনি।

ধীরে ধীরে লোকটি খাঁটিয়া থেকে নামতে চেষ্টা করল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি কি অসুস্থ?

হ্যাঁ বাবু, বুখার। রোজ দুপুরে আসে, রাতের আগে ছেড়ে যায়। লোকটি একটা লাঠি হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, আপনি কে বাবু?

আমরা শুনেছিলাম এখানে থাকার জন্যে বাংলো আছে। তাই এসেছি।

মালিকের সঙ্গে কথা বলেছেন?

না। উনি কোথায় থাকেন?

শিলিগুড়িতে। মালিক না বললে দরজা খোলা নিষেধ আছে।

দেখুন, আমরা চারজন আছি। তার মধ্যে দু'জন এসেছেন বিদেশ থেকে। সন্ধেও হয়ে আসছে। এখন কোথায় গিয়ে থাকার জায়গা খুঁজব বলুন?

অর্জুন নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

মালিক জানলে আমার চাকরি চলে যাবে। তা ছাড়া, তা ছাড়া এখানে না থাকাটা আপনাদের পক্ষে ভাল হবে বাবু! আপনারা জয়ন্তীতে চলে যান।

মালিকের সঙ্গে কথা বলা যায় না। ফোন নাম্বার আছে?

লোকটি ঘরের একটা তাক থেকে খাতা বের করে খুলে এগিয়ে ধরল। অর্জুন পড়ল। ইংরেজিতে লেখা, সুধাংশুশেখর দত্ত, হসপিটাল পাড়া, শিলিগুড়ি। পাশে মোবাইল নাম্বার লেখা। পকেট থেকে সেলফোন বের করে নাম্বারগুলো টিপল সে। প্রথমবারে কোনও শব্দ হল না। দ্বিতীয়বারে পি পি আওয়াজ হতে হতে শেষপর্যন্ত রিং শোনা গেল। একটু পরেই বেশ গম্ভীর গলায় একজন কথা বললেন, কে?

নমস্কার। সুধাংশুশেখর দত্ত বলছেন?

বলছি।

আমার নাম অর্জুন। জলপাইগুড়িতে থাকি। আজ আমরা চারজন বিশেষ কাজে রাজাভাতখাওয়ায় এসেছিলাম। আমাদের দু'জন আমেরিকা থেকে এসেছেন। কিন্তু ওখানে জায়গা না পেয়ে আপনার বাংলোয় পৌঁছেছি। মুশকিল হল, বাংলোর কেয়ারটেকার আপনার অনুমতি ছাড়া জায়গা দিতে পারবে না। আপনি যদি অনুমতি দেন তাই এই ফোন করছি।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। অর্জুন ভাবল লাইন কেটে গিয়েছে। সে বলল, হ্যালো!

আপনি কী করেন? ভদ্রলোক সরাসরি প্রশ্ন করলেন।

আমার পেশা সত্যসন্ধান করা।

সেটা কী জিনিস? ডিটেকটিভ?

আমি নিজেকে ডিটেকটিভ বলতে রাজি নই।

আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাকে ফোন করছি। লাইন কেটে দিলেন ভদ্রলোক।

অর্জুন দেখল, লোকটি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, মালিক কী বললেন বাবু?

এখনও কিছু বলেননি। তবে বলবেন বোধহয়। অর্জুন অমল সোমদের ব্যাপারটা জানাতে এগোল।

লোকটি আসছিল পিছন পিছন, আমার কথা শুনুন। আপনারা এখনই চলে যান জয়ন্তীতে। ওখানে ঘর ঠিক পেয়ে যাবেন।

তোমার মালিক আপত্তি করলে তাই যেতে হবে।

অর্জুন দেখল, ওঁরা তিনজন গাড়ি থেকে নেমে লনের ভিতরে চলে এসেছেন। মেজর মাথার উপর হাত তুলে চিৎকার করলেন, মাই গড! কত পাখি! এখানে পাখিদের পাড়া নিশ্চয়ই আছে। এত পাখি যখন, তখন জল থাকতে বাধ্য।

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, চলে যেতে হবে?

মালিককে ফোন করেছিলাম। তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে জানাবেন বলেছেন।

স্টেফি চারপাশে তাকাচ্ছিলেন। অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এখানে কোনও বিশল্যকরণী দেখতে পেয়েছ?

অর্জুন হাসল, আগে থাকার জায়গাটার সমাধান হোক, তারপর তোমার জন্যে সমস্ত জঙ্গলে ওই পাতার খোঁজ করব। চিন্তা কোরো না।

অমল সোম লোকটির দিকে তাকালেন, তুমি কি কেয়ারটেকার?

হ্যাঁ বাবু। আমি এখানে থাকি। মালিকের নাম সুধাংশুশেখর দত্ত। শিলিগুড়িতে থাকেন।

মালিক কি প্রায়ই আসেন?

না। চার মাস আসেননি। এসে আমাকে কয়েক মাসের মাইনে দিয়ে যান। তখনই আলু, পিঁয়াজ, চাল, তেল কিনে রাখি। বাবু, আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে এখানে পড়ে আছি। কিন্তু, ওই বাবুকেও বলেছি,

আপনাদেরও বলি, এখানে না থেকে জয়ন্তীতে চলে যান।

কেন বলছ এ কথা?

লোকটি মুখ নিচু করল, কোনও জবাব দিল না। অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী নাম?

লছমন।

এমন সময় অর্জুনের ফোন বেজে উঠল। সে সেলফোন অন করতেই ওপাশ থেকে গলা ভেসে এল, দেখুন ভাই, আমি অজানা লোককে ওই বাংলোয় থাকতে দিই না। আপনার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানলাম, জলপাইগুড়িতে বেশ পরিচিত আপনি। কিন্তু আপনিই যে সেই অর্জুন তার প্রমাণ কী?

কী প্রমাণ চান?

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ালেন অমল সোম, আমাকে দাও।

সেলফোন হাতে নিয়ে অমল সোম বললেন, সুধাংশু, আমি অমল সোম বলছি। পঁচিশ বছর আগে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

ওপাশের কথা শুনে অমল সোম হাসলেন, আরে ভাই, ডি এফ ও-র কথা যে নীচের তলার মানুষের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছোয় না, তা জানতাম না। তা অর্জুন সম্পর্কে কী প্রমাণ চাইছ?

ওপাশ থেকে কিছু বলার পর অমল সোম লছমনকে ডাকলেন, তোমার মালিক কথা বলবেন। ফোনটা নাও।

লছমন সেলফোন কানে চেপে, জি সাব, জি সাব, বলে আবার ফেরত দিল অমল সোমকে। সুধাংশুবাবুর কথা শুনে বললেন, ও ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমরা সব কিনে এনেছি। শুধু তোমার লোক যদি বেঁধে দেয়। না পারলে উনুন আর বাসনকোসন দিলেই চলবে। ঠিক আছে, রাখছি।

কোমর থেকে চাবি বের করে লছমন ধীরে ধীরে দোতলায় উঠে ঘরের দরজা খুলতে লাগল। তিনটে শোওয়ার ঘর, একটা বসার। প্রতিটি ঘরের সঙ্গে বাথরুম রয়েছে। অর্জুন দেখে নিয়ে বলল, বাথরুমের জল কি নীচ থেকে আনতে হয়?

না বাবু। লছমন মাথা নাড়ল, পাম্প আছে। চালু করে দিচ্ছি। তারপর বেরিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, বাবু, আমার শরীর এখনও ঠিক হয়নি। যা পারি তা রান্না করে দেব। আপনারা আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়বেন।

রান্নাঘর কোথায়?

ওই ওপাশে। গ্যাস আছে। থালা, কড়াই ধোওয়া আছে।

অর্জুন বারান্দায় চলে এসে চেঁচিয়ে ডাকল, ভানুপ্রসাদ!

গাড়ি থেকে নেমে এল ভানুপ্রসাদ, বলুন!

গাড়ি ভিতরে ঢোকাও। সব জিনিসপত্র উপরে নিয়ে এসো। আচ্ছা, তুমি রাঁধতে জানো?

ওই, একরকম পারি।

ব্যস। তা হলেই হবে। লেগে পড়ো।

এই সময় মেজরের উত্তেজিত চিৎকার কানে এল। অর্জুন দ্বিতীয় ঘরটিতে ঢুকে অবাক হয়ে দেখল, দু'হাত মাথার উপর তুলে ভারী শরীর নিয়েও লাফাচ্ছেন মেজর, হেভেন, হেভেন যদি কোথাও থাকে তা হলে তা এখানেই।

কোথায়? অর্জুন জিজ্ঞেস করার আগেই পিছন থেকে এসে অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন। মেজর খোলা জানলার বাইরে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, লুক।

ওঁরা জানলার বাইরে তাকাতেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। নীচে জঙ্গলের আড়াল থাকায় অর্জুন টের পায়নি। এখন দোতলার জানলা থেকে নদীটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চওড়ায় প্রায় একশো গজে জল বয়ে যাচ্ছে তরতরিয়ে। তারপর নুড়ি আর নুড়ি। শেষ হয়েছে একটা ছোট পাহাড়ের নীচে। বর্ষায় পুরোটাই যে ঢেকে যায় তাতে সন্দেহ নেই। এখন জল নিশ্চয়ই কম, হাঁটুর সামান্য উপরে গভীরতা। সেই জলে শেষ সূর্যের রোদ পড়ায় মায়াবী বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

অর্জুন বলল, নিশ্চয়ই এই নদীর নাম জৈন্তী।

জয়ন্তী? মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

স্থানীয় মানুষ বলে জৈন্তী। জয়ন্তীতে এই নদী অনেক চওড়া।

লেট্‌স গো। চলো, নদীর কাছে যাই। মেজর উৎসাহী।

অর্জুন বলল, রাত নামছে। এখন না বের হওয়াই ভাল। কাল সকালে বরং যাওয়া যেতে পারে। আর কিছুনা হোক, যে সাপটাকে আসার সময় দেখলেন, তার আত্মীয়দের মুখোমুখি এখন হওয়া কি ঠিক হবে?

জানলাটা তা হলে বন্ধ করে দিই?

নীচে পাম্প চালু হল। তার আওয়াজ খুবই কর্কশ। ভানুপ্রসাদ প্রত্যেকের লাগেজ উপরে রেখে গেল। একটু পরেই সে কিচেনের দায়িত্ব নিয়ে নিল। অর্জুন চারটে ঘরে মোমবাতি জ্বেলে দিল।

ঠিক হল, একেবারে বাঁ দিকের শেষ ঘরে অমল সোম এবং অর্জুন রাত্রে থাকবেন। তাঁদের পাশের ঘরটি, স্টেফির জন্যে। স্টেফির পাশের ঘরটি ড্রয়িংরুম। সেখানে রাত্রে থাকবে ভানুপ্রসাদ। ডান দিকের ঘরটিতে মেজর থাকবেন। তাঁর নাসিকাগর্জনের কারণেই একা থাকার ব্যবস্থা।

পোশাক পালটে বসার ঘরে এসে চারজন বসলেন। স্টেফি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে হিংস্র জন্তুরা উঠে আসতে পারে?

অমল সোম বললেন, সাধারণত ওরা উপরে ওঠে না। গেট বন্ধ থাকলে ভিতরে ঢোকাও তো সম্ভব নয়। অবশ্য সাপ কী করবে তা বলতে পারছি না।

ওই লছমনকে জিজ্ঞেস করতে হবে কার্বলিক অ্যাসিড আছে কি না! আচ্ছা, লোকটি যে সেই চলে গেল, আর উপরে এল না তো! মনে হচ্ছে, আমরা আসায় ও খুশি নয়।

স্টেফি দ্রুত মাথা নাড়লেন, ঈশ্বর যেন এরকম ঘটনা না ঘটতে দেন।

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, স্টেফি, তুমি কীভাবে রিসার্চটা শুরু করতে চাইছ?

স্টেফি সোজা হলেন, প্রথমত, আমাকে জানতে হবে ওই গাছের পাতার রসে সত্যি কোনও কাজ হয় কি না। যদি হয়, স্থানীয় মানুষরা নিশ্চয়ই প্রয়োজনে ব্যবহার করে। আপনাদের দেখানো পাতা থেকে আন্দাজ করতে পারছি, ওই একই গাছের পাতা নানান রকমের হয়। হয়তো সবচেয়ে ঘন রস যা থেকে বের হয় তার কার্যকর শক্তি অনেক বেশি হবে। তা হলে সেই বিশেষ গাছ কোন মাটিতে জন্মায়, কী আবহাওয়া পছন্দ করে, তা জানতে হবে। ওই রসের স্যাম্পেল ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখব, কী কী উপাদান ওর মধ্যে আছে। সেসব উপাদানগুলো জানতে পারলে আমার পক্ষে আরও এগোনো সম্ভব হবে।

অমল সোম বললেন, ধরো, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে তুমি জানতে পারলে, ওর মধ্যে এমন উপাদান আছে যা ডেভেলপ করলে চিকিৎসাশাস্ত্রে বিপ্লব ঘটতে পারে। তুমি যদি তার পেটেন্ট নিয়ে নাও, তা হলে ওষুধ কোম্পানিগুলো তোমাকে কোটি কোটি ডলার অফার করবে। তাই না?

স্টেফি হেসে উঠলেন, ওসব নিয়ে আমি ভাবছি না। আমার প্রথম কাজ ওই গাছের ঠিকঠাক পাতাগুলো খুঁজে বের করা।

তোমার ইউনিভার্সিটি এই রিসার্চের ব্যাপারটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে? মাথা নাড়লেন স্টেফি, নো। এই ধরনের প্রপোজাল তখনই অ্যাপ্রুভাল পায়, যখন উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে গবেষণা করার জন্যে অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করা হয়।

মেজর আচমকা বলে উঠলেন, ওটা কী পাখির ডাক?

বাইরে তখন অন্ধকার নেমে গিয়েছে। মাঝে মাঝেই ঘরে-ফেরা পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছিল। এইমাত্র যে ডাকটা কানে এল সেটা বেশ কর্কশ। মাথা নাড়লেন অমল সোম, পরিচিত পাখি নয়। এইরকম জঙ্গলে কতরকমের পাখি আছে তার সার্ভে ঠিকঠাক হয়েছে কি না জানি না।

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, দেখি, ভানুপ্ৰসাদ কী করছে?

মেজর তার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে নিজেও উঠলেন, একটু দেখে আসি!

কী? অমল সোম তাকালেন।

ওই লইমন লোকটিকে আমার খুব সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে। যে অত অসুস্থ, লাঠি হাতে হাঁটছে, সে দিব্যি সিঁড়ি ভেঙে উপরে এসে দরজা খুলে দিল! আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমরা যাতে এখানে না থাকি তার চেষ্টা করছিল। সেই যে পাম্প চালাতে নীচে গিয়েছে আর পাত্তা নেই। মেজরের কথা শেষ হওয়ামাত্র পাম্পের শব্দ থেমে গেল। মেজর দরজার দিকে এগোলেন।

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, টর্চ আছে? ওটা সঙ্গে নিয়ে নীচে যান।

মেজর হাসলেন, ডুয়ার্সে আসছি বলে ওসব ব্যাপারে তৈরি হয়ে এসেছি। আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরে ওটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

মেজর বেরিয়ে যেতে অমল সোম স্টেফির সঙ্গে গল্প করছিলেন। এই সময় ভানুপ্রসাদ তিনকাপ কফি নিয়ে এল।

অমল সোম হাসলেন, বাঃ, গুড। বিস্কুট দিয়ে তো। কিন্তু মেজর নীচে যাবেন বললেন। ওঁর কফিটা নিয়ে যাও।

২. সিঁড়ির কয়েক ধাপ

সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে মেজর চারপাশে তাকালেন। এরকম কালো অন্ধকার তিনি এর আগেও অনেক দেখেছেন। এখন ঝিঁঝির ডাক ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। হাওয়া জঙ্গলের শরীরে অদ্ভুত বাজনা বাজাচ্ছে। কিছুক্ষণ কান পেতে থাকলে মনে অস্বস্তি জমে। নীচে টর্চের আলো ফেললেন মেজর। সাবধানে নীচে নেমে বাংলোর পিছন দিকে এগোলেন।

দূর থেকে একটা ঘরে আলো জ্বলতে দেখে মেজর বুঝলেন, ওখানে লছমন থাকে। অপদার্থ কেয়ারটেকার! বাংলোয় গেস্ট এলে ওর কর্তব্য তাদের যাতে অসুবিধে না হয় তা দেখা। অথচ লোকটা দরজা খুলেই গা-ঢাকা দিল। নিশ্চয়ই অন্য কোনও ধান্দা আছে ওর। অসুস্থতার ব্যাপারটা হয়তো ভান। বাংলোয় থাকার অনুমতি পাওয়ায় ওর নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধে হবে।

মেজর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিলেন। একটা হারিকেন জ্বলছে। ঘরে আসবাব বলতে একটা খাঁটিয়া আর কেরাসিন কাঠের ছোট আলমারি ছাড়া কিছু নেই। অসুস্থ লোকটির তো এখানে শুয়ে থাকার কথা।

মেজর দরজা থেকে ফিরতেই চমকে উঠলেন। কোনওরকমে তাঁর মুখ থেকে শব্দ বের হল, হু হু?

আমি লছমন?

সঙ্গে সঙ্গে সংবিৎ ফিরে এল মেজরের। গলা চড়ল, তুমি এই অন্ধকারে কী করছ?

কুছ নেহি।

কুছ নেহি? তো ভূতের মতন কোত্থেকে এলে?

সঙ্গে সঙ্গে জিভে একটা শব্দ তুলল লছমন, ওই নামটা একদম মুখে আনবেন না সাহেব। ওঁরা হয়তো পছন্দ করবেন না।

ওরা মানে? কাদের কথা বলছ?

হঠাৎ চুপ করে গেল। মেজর দেখলেন, লছমন সোজা ঘরে ঢুকে খাঁটিয়ার উপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

লোকটি রহস্যময়। মাথা নাড়লেন মেজর। এই সময় বেশ জোরে হাওয়া বইতেই জঙ্গলের ভিতরে প্রবল শব্দ শুরু হল। মেজর দ্রুত ফিরে এলেন উপরে। বসার ঘরে ঢুকতেই শুনলেন, অমল সোম বললেন, না ভাই, আমি ভূত দেখিনি। যা দেখিনি তা আছে কি না কী করে বলব? তবে মানুষ মরে গিয়ে যদি ভূত হয়, তা হলে বাঘ, সিংহ, হাতি থেকে গোরু, ছাগল, পিঁপড়েরা মরে যাওয়ার পরে ভূত হবে না কেন?

স্টেফি হেসে ফেললেন, আমি বাঘের ভূতের গল্প পড়েছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, খ্রিস্টানরা নভেম্বর মাসের দু'তারিখ সন্ধেবেলায় বাড়ির সামনে লাউ ঝুলিয়ে 'অল সোল্স ডে' পালন করে।

মেজর ঘরের ভিতরে এসে চেয়ারে বসে বললেন, যা দ্যাখেননি তাই যদি অবিশ্বাসে থাকে, তা হলে তো আপনি ভগবানেও বিশ্বাস করেন না?

মাথা নাড়লেন অমল সোম, এ নিয়ে আমি তর্ক করব না।

মেজর বললেন, এই বাংলোটায় আমাদের সতর্ক হয়ে থাকতে হবে।

স্টেফি তাকালেন মেজরের দিকে। উনি যাতে বোঝেন, তাই মেজর কথাগুলো ইংরেজিতে বলেছিলেন। অমল সোম বললেন, সতর্ক হয়ে থাকা সবসময় ভাল।

আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না। ওই যে লছমন, লোকটিকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। বলল, অসুস্থ। ভানুপ্রসাদকে সাহায্য করা ওর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তা না করে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে যেভাবে তাকাল, যে-কেউ ভয় পেয়ে যাবে। আমি ধমকে বলেছিলাম, ভূতের মতো কোত্থেকে এলে?' তাতে কী বলল জানেন? বলল, ওই নামটা একদম মুখে আনবেন না সাহেব, ওঁরা পছন্দ করবেন না। বলে শুয়ে পড়ল।

পুরো সংলাপ ইংরেজিতে বলায় স্টেফি উত্তেজিত হলেন, ফ্যান্টাস্টিক। ওর কথা সত্যি হলে এই বাংলোয় ভূত আছে। ওঃ, আজ রাত্রে আমি জীবনে প্রথমবার ভূত দেখব!

.

রাত ন'টার মধ্যে মাংস-ভাত আর স্যালাড দিয়ে ডিনার শেষ হয়ে গেল ওঁদের। খাবার টেবিলে দিয়ে ভানুপ্রসাদ খেতে যাচ্ছিল, সিঁড়িতে শব্দ হল। ভালুপ্রসাদ বারান্দায় যেতেই লছমন একটা থালা এগিয়ে দিল নিঃশব্দে।

সেটা নিয়ে ভিতরে ঢুকে সে অর্জুনকে বলল, চৌকিদার খাবার চাইছে।

দিয়ে দাও। অর্জুন বলল।

খেতে শুরু করে মেজর বললেন, আমি হলে দিতাম না। নো ওয়ার্ক, নো ফুড। লোকটি ভয়ংকর রহস্যজনক।

খাওয়া শেষ হলে ভালুপ্রসাদ এসে টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেলে স্টেফি বললেন, আচ্ছা, আমরা এখন অনেকক্ষণ ধরে জেগে গল্প করতে পারি না?

মেজর বললেন, নো ওয়ে। আমি খুব টায়ার্ড, শুলেই ঘুমিয়ে পড়ব।

স্টেফি বিরক্ত হলেন, প্লেন যতক্ষণ উড়ছিল ততক্ষণ আপনি ঘুমিয়েছেন। আমি যে বই পড়ে জেগে থাকব তারও উপায় নেই। এত কম আলো!

অমল সোম বললেন, তুমি যে জন্যে জাগতে চাইছ সেটা যদি সত্যি হয়, তা হলে জাগার দরকার নেই। এমনিই ঘুম ভেঙে যাবে।

চারজন তিনটে ঘরে চলে গেলেন। ভানুপ্রসাদও মাঝের ঘরে শুয়ে পড়ল। অমল সোম তাঁর খাটে শুয়ে পড়ে বললেন, হাওয়া না বইলে জঙ্গল কি ভয়ানক চুপচাপ হয়ে যায়, লক্ষ করেছ?

হ্যাঁ।

গুড নাইট। তিনি দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরলেন।

অর্জুনের এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল না। সে প্রায় নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসতেই জঙ্গলের ওপাশের আকাশে এক মায়াময় আলো দেখতে পেল। বড় বড় গাছের ভিতরে গভীর কালো অন্ধকার। কিন্তু তাদের মাথা ডিঙিয়ে সেই আলো উঠছে আকাশে। বারান্দাটা এখন অন্ধকারে মোড়া। সবক'টা দরজা বন্ধ। অর্জুন নিঃশব্দে শেষ প্রান্তে চলে আসতেই মনে হল, ওই আলো গাছের মাথাগুলো ডিঙিয়ে ছড়িয়ে পড়ল এদিকে। কুমড়োর ফালির মতো চাঁদ দেখা গেল দূর-আকাশে। আলো পড়তেই বাংলোর বাগান, গেট, এমনকী বারান্দার কিছু অংশ দৃশ্যমান হল। এই আলো নেহাতই নেতানো, কোনও তেজ নেই। আর তখনই মৃদু বাতাস বইতে শুরু করল। অর্জুনের খুব ভাল লাগছিল। বারান্দার শেষ প্রান্তে রাখা টুলটা টেনে নিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল।

ওপাশ থেকে বাতাস বইতেই অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। নিশ্চয়ই জঙ্গলে ফোটা কোনও ফুল। অবশ্যই একরাশ ফুল। দিকটা দেখে রাখল অর্জুন। কাল সকালে গিয়ে দেখতে হবে ফুলগুলোকে। জ্যোৎস্না ফুটতেই ঝিঁঝিরা ডেকে উঠেছিল। এখন যেন ওরা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। যেন কে কত জোরে ডাকতে পারে তার প্রতিযোগিতা হচ্ছে। অর্জুনের মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের সেই গানটার লাইন, মায়ালোক হতে ছায়া তরণী! এই সময় তার সামনের ভুবনকে মায়ালোক ছাড়া আর কী বলা যায়?

দেখতে দেখতে একটা সময় চোখ বুজে এসেছিল, হঠাৎ চাপা গলার ধমক শুনে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল অর্জুন। গেট খোলা। কেউ একজন কাতর গলায় কিছু বলছে। তারপরেই তিনটে লোককে দেখতে

পেল সে। পিছন থেকে দেখল বলে মুখ অদেখা রইল। তিনজন বেরিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। এবার লছমনকে দেখল সে। ধীরে ধীরে এসে গেট বন্ধ করল। তারপর চোরের মতো বাংলোর দোতলার দিকে তাকাল। রেলিং-এর আড়ালে বসে থাকার জন্যে অর্জুনকে লক্ষ করল না। ফিরে গেল লছমন।

ব্যাপারটা বোধগম্য হল না অর্জুনের। এই লোক তিনটে কারা? কেন এত রাত্রে জঙ্গল ফুড়ে এখানে এসেছিল? লছমনকে ধমকাচ্ছিল কেন? ওদের সামনে লছমন ক্ষমা-চাওয়া গলায় কথা বলছিল কেন? লছমন যে ওদের কাছে দুর্বল তা স্পষ্ট, কিন্তু কেন? ওরা আসবে বলেই কি লছমন ভূতের ভয়। দেখাতে চেয়েছিল? বিকেলে যখন অর্জুন এখানে থাকার কথা বলেছিল, তখন খুশি হয়নি ও। বারবার চলে যাওয়ার কথা বলছিল। অর্জুন অনুমান করল, লছমনের এই কীর্তিকলাপের কথা ওর মালিক সুধাংশুশেখর দত্ত জানেন না।

আরও আধঘণ্টা বসে থেকে অর্জুন উঠে দাঁড়াল। এখন চাঁদের আলো একটু-একটু করে কমছে। জঙ্গলের ওপার থেকে কালচে মেঘের টুকরো ভেসে আসছে চাঁদের নীচে। আসামাত্র আলো প্রায় নিভে যাচ্ছে। কিন্তু সেই মেঘ সরে দ্বিতীয়টি আসার মধ্যে যে সময়, তাতে আবার আলো উজ্জ্বল হচ্ছে। অর্জুন নীচে নেমে এল। ঘাসের উপর পা রাখতেই একটা রাতের পাখি কর্কশ স্বরে এমন চিৎকার করল যে, হকচকিয়ে গেল সে। পাখিগুলো নিশ্চয়ই মানুষ চেনে। লছমন অথবা তিনটে লোককে দেখে ওই পাখি একবারও মুখ খোলেনি।

লছমনের ঘরে হ্যারিকেনের আলো একদম কমানো। যেন নিভে না যায় তেমনভাবে জ্বালানো। ঘরে লছমন নেই। কোথায় গেল লোকটি? অর্জুন চারপাশে তাকাল। ঘষা কাঁচের মতো জ্যোৎস্নায় গাছগুলো এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন জাতীয়সংগীত শুনছে। সে ধীরে ধীরে নদীর দিকে এগোতেই কানে শব্দটা এল। কেউ কাঁদছে। হয় কোনও বালক অথবা নারী। কান্নাটা কয়েক সেকেন্ড পরেই থেমে যাচ্ছে। আবার হচ্ছে। অর্জুনের মনে হল, এই কান্না কোনও মানুষের নয়। এই গভীর নির্জন জঙ্গলে মাঝরাতে কোনও মানুষ কেন এখানে এসে কাঁদবে? আসবেই বা কী করে? বিশেষ করে সে যদি নারী বা বালক হয়! প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে ঘরে ফিরে এল সে। অমল সোম তখন গভীর ঘুমে।

.

অর্জুনের ঘুম ভেঙেছিল একটু দেরিতে। জানলা দিয়ে হালকা রোদ ঢুকছিল ঘরে। বাড়িতে থাকলে বিছানায় বেশিক্ষণ সে থাকতে পারে না ঘুম ভেঙে গেলে। এখানে মনে হল, আর-একটু আরাম করা যাক। সে পাশের খাটের দিকে তাকাল। ওটা শুধু খালি নয়, বেডকভার টানটান ছড়ানো। ওই দৃশ্য দেখার পর আর আরাম করা হল না। বাথরুমে গিয়ে তৈরি হয়ে নিল সে। তারপর বারমুডা আর টিশার্ট পরে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই দেখল, ভানুপ্ৰসাদ নীচের লনে গাড়ি মুছছে। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, চা খাবেন সাহেব?

হয়ে গিয়েছে?

হ্যাঁ। একটু আগে মেমসাহেব আর সোমসাহেব চা খেয়ে বেড়াতে গিয়েছেন।

ও। মাথা নাড়ল অর্জুন, দাও।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল সে। এখন জঙ্গলের চেহারাই আলাদা। সোনা সোনা রোদে ঝলমল করছে গাছের পাতা। বেড়াবার পক্ষে চমৎকার সময়। চা শেষ করে মেজরের ঘরের সামনে গেল অর্জুন। দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে করুণ ধ্বনি ভেসে আসছে। সারারাত ডেকে ডেকে আর বোধ হয় মেজরের নাক তার শক্তি হারিয়েছে।

অর্জুন বাংলো থেকে নেমে নদীর দিকে যেতে যেতে দেখল, লছমন লনের ঘাস কাটছে। চোখাচোখি হল। কিন্তু অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে নিল। লোকটির সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে। বাংলোর পিছন থেকে নদীতে যাওয়ার কোনও বাঁধানো পথ নেই, কিন্তু যাওয়া-আসা থাকায় ঘাসের উপর দাগ পড়ে গিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড হাঁটতেই ওপাশে পাহাড় আর এদিকে নদী দেখতে পেল সে। নদী না বলে ঝরনা বলাই ভাল। দ্রুত বয়ে যাচ্ছে নুড়িপাথর সরিয়ে। জল হাঁটুর উপরে নয়। অর্জুন জলের গায়ে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় সাইজের ব্যাং ডাঙা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জল ছিটকে উঠল একটু। অর্জুন একটা চ্যাপটা পাথর তুলে আড়াআড়ি ছুঁড়তেই সেটা জল চিরে চিরে পৌঁছে গেল ওপারে। তারপরেই একটা চাপা আর্তনাদ কানে এল অর্জুনের। পাথরটা ঢুকে গিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। ওটা কি কারও গায়ে আঘাত করেছে? কৌতূহল হল। অর্জুন ঝরনা ডিঙিয়ে জঙ্গলের ওই অংশ দেখবে বলে পা বাড়াতেই পিছন থেকে গলা ভেসে এল, যাবেন না বাবু!

ঘাড় ঘুরিয়ে অর্জুন দেখল, লছমন দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। সে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন? নদীর ওপারে যেতে নিষেধ করছ কেন?

কোনও জানেনায়ার আপনার ছোঁড়া পাথরে চোট পেয়েছে। চোট পাওয়া জানোয়ারকে বিশ্বাস করা যায় না। খুব ভয়ংকর হয়। নির্বিকার মুখে বলল লছমন।

অর্জুন ওপারের জঙ্গলের দিকে তাকাল। কোনও শব্দ নেই। গাছ বা পাতারা এখন একটুও দুলছে না। অত ছোট পাথর যা জল ছুঁয়ে গিয়েছিল, তার আঘাতে এমন কোনও জোর থাকতেই পারে না যে, একটা জানোয়ার আহত হতে পারে!

ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ তখন যাব না। অর্জুন উপরে উঠে এসে লছমনের পাশে দাঁড়াল, তুমি কতদিন আছ এখানে?

চোখ বন্ধ করল লছমন। তারপর বলল, বাইশ বছর।

অনেকদিন। এই রকম একা-একা থাকতে ভাল লাগে?

পেটের উপর বাঁ হাত রাখল লছমন, পেটের দায় বড় দায় বাবু!

হুঁ। তা তোমার এই বাংলোয় হিংস্র জানোয়াররা ঢুকে পড়ে?

বেড়া আছে বলে কেউ টপকায় না। তবে হাতিরা কয়েকবার বেড়া ভেঙে ঢুকেছিল।

তোমার কাছে বন্দুক নেই?

না।

কাল বিকেলে এতটা জঙ্গল ভেঙে আসতে আমাদের ভয় করছিল। রাত্রে কেউ নিশ্চয়ই এখানে আসবে না। আমি মানুষের কথা বলছি।

দরকার ছাড়া কেউ দিনেরবেলাতেই জঙ্গলে ঢোকে না। রাত্রে আসবে, প্রাণের ভয় নেই? বেশ জোরে প্রশ্নটা করেই গলা নামাল লছমন, বাবু, বাঘ, বাইসন, গন্ডার, হাতির সঙ্গে বুদ্ধি খরচ করে লড়াই করা যায়। হাজার হোক, ওরা জানোয়ার। মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে পারবে কেন? কিন্তু ওই দু'জনের কাছে বুদ্ধির কোনও মূল্য নেই। ওদের ভয়ে তো কাঁটা হয়ে থাকি। তবু, আমাকে তো বাইশ বছর ধরে দেখছেন ওঁরা। একসঙ্গে থাকি বলে হয়তো আমাকে দয়া করেন। কিন্তু আপনারা নতুন নোক, সেটাই তো আমার ভয়। তাই কাল বলেছিলাম, এখান থেকে চলে যেতে। আচ্ছা...! চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল সে।

অর্জুন ডাকল, দাঁড়াও। তুমি যে দু'জনের ভয় পাচ্ছ তারা কারা?

লছমন মাথা নাড়ল, আমি জানতাম আপনি এই প্রশ্নটা করবেন। কিন্তু মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। সে মাথা উঁচু করে চারপাশে তাকাল। এখনও সূর্য গাছের আড়ালে। নদীর মাঝখানে রোদ পড়লেও এ পাশটা গাছের ছায়ায় ঢাকা। দমকা বাতাস বয়ে গেল। লছমন বলল, এখন দিনেরবেলা। রাত হলে বলতাম না। মা মনসার আশীর্বাদ যাদের উপরে তারা মারতে চাইলে লৌহবাসরে ঢুকে লখীন্দরকেও মেরে আসে। জলে স্থলে গাছে ওরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। এই যে আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তার দশ হাত উপরে যে শাল গাছের ডালটা ঝুলছে, তা থেকে লাফিয়ে নেমে আপনার চাঁদিতে ছোবল মেরে যেতে পারে। টের পাওয়ার আগেই আপনি মরে যাবেন।

তুমি সাপ শব্দটা উচ্চারণ করছ না কেন?

মুখে নামটা আনতে নেই, তাই রাত্রে যখন হাঁটতে হয় তখন মনে মনে 'অস্তি অস্তি' বলি। অস্তি নাম যে উচ্চারণ করে তাকে ওরা কামড়ায় না।

বুঝলাম। দ্বিতীয়জন কে?

আপনারা শহরের মানুষ, বিশ্বাস করবেন না।

আমি বিশ্বাস যদি না-ও করি, তবু তোমার বিশ্বাসকে অসম্মান করব না।

এই জঙ্গলে তেনারা আছেন। আমি দু'জনকে জানি। নিশুতি রাত্রে ওই বাংলোর ছাদে পা ঝুলিয়ে বসেন। তবে আমার পরে তেনারা এসেছেন বলে, আমাকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষ পড়লে তেনারা ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। ওই পনেরোদিন আমি বিকেল শেষ হলেই ঘরের দরজা বন্ধ করে হরি নাম জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি। ভুলেও ঘরের বাইরে যাই না। কথা শেষ করে লোকটি উদাস পায়ে চলে গেল।

অর্জুন হাসল। আবার ভয় দেখাল লছমন। সে ওকে জিজ্ঞেস করতে পারত, কাল রাত্রে কারা এসে ওর উপর রাগারাগি করছিল? কী করে ওরা রাত্রে এই জঙ্গলে ঢুকল?

প্রশ্নগুলো করাই যেত। কিন্তু লোকটিকে এত তাড়াতাড়ি কোণঠাসা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এই সময় স্টেফির গলার হাসি শুনতে পেল অর্জুন। সে এগিয়ে গিয়ে দেখল, বাড়ির সামনের গেটে স্টেফি আর অমল সোম দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। স্টেফির হাতে একগোছ পাতাসুদ্ধ লতা। সে গলা তুলে জিজ্ঞেস করল, পেয়েছ?

পেয়েছি। কিন্তু সোম বলছেন উনি সন্তুষ্ট নন।

কাছে গিয়ে বিশল্যকরণী পাতাগুলোকে দেখল অর্জুন। পাতার রং তেমন গাঢ় নয়। সে জিজ্ঞেস করল, কোথায় পেলেন?

অমল সোম হাত তুলে জঙ্গলের একটা অংশ দেখালেন, হাঁটতে গিয়ে চোখে পড়ল। দশ-বারোটা লতা রয়ে গিয়েছে ওখানে। কিন্তু এগুলো আসল বিশল্যকরণী নয়। শরীরের কোথাও ছড়ে গেলে এর রসে কাজ হয় বটে, কিন্তু আসল বিশল্যকরণী মিরাল করে।

অর্জুন বলল, এদের যখন পাওয়া গিয়েছে তখন তাদেরও পাওয়া যাবে। স্টেফি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, ওখানে তো অনেক বুনো গাছের ভিড়। তার মধ্যে এই ক'টা কী করে জন্মাবে?

অমল সোম বললেন, প্রকৃতির খেয়াল। কিন্তু অর্জুন, স্টেফি বেশ মার খেয়েছে।

মার খেয়েছে? কার কাছে?

স্টেফির মুখে কপট রাগ ফুটল, এত দুষ্টু বাঁদর আমি কখনও দেখিনি। যখন এই পাতাগুলো ছিঁড়ছিলাম, তখন ওরা গাছের ডালে বসে ফল ছুঁড়ে আমাকে মারছিল।

ওঁরা কথা বলতে-বলতে বাংলোর সামনে চলে এসেছিলেন। হঠাৎ উপর থেকে গলা ভেসে এল, ওই চৌকিদারের কাছে ছাতা আছে কি না জিজ্ঞেস করুন না!

ওঁরা উপরে তাকাতেই মেজর বারান্দার রেলিং-এ চলে এলেন। অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, বৃষ্টির তো সম্ভাবনা নেই। ছাতি নিয়ে কী করবেন?

স্টেফির জন্যে ছাতা দরকার। ও যখন আবার জঙ্গলে ঢুকবে, তখন ছাতি খুলে রাখলে বাঁদরগুলো বোকা বনে যাবে। মেজর হাসলেন।

স্টেফি ধমক দিলেন, বোকা বোকা কথা বলবেন না। তারপর অমল সোমের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, আমরা কখন ঠিক-পাতা খুঁজতে বের হব?

ব্রেকফাস্ট না করে আমি কোথাও বেরোচ্ছি না। মেজর ঘোষণা করলেন দোতলায় দাঁড়িয়ে।

অমল সোম হেসে ফেললেন, বেশ। তাই হোক।

.

ব্রেকফাস্ট করতে করতে আলোচনা হচ্ছিল, ভানুপ্রসাদ যদি ড্রাইভারি না করে রান্নার কাজ করত, তা হলে অনেক বেশি নাম করত। দুপুরের মেনু কী হবে জিজ্ঞেস করতে ভানুপ্রসাদ সলজ্জ হাসি হেসে বলল, দেখি, ধরতে পারি কি না!

কী ধরবে তুমি? অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

এসব নদীতে অনেক মাছ থাকে। কোনও একটা কায়দা করে ধরতে পারলে আপনাদের দুপুরবেলায় মাছ-ভাত খাওয়াব। ভানুপ্রসাদ চলে গেল।

মেজর বললেন, ইন্টারেস্টিং। ঢাল-তলোয়ার নেই তবু যুদ্ধ করতে চাইছে। না, আপনারা পাতা খুঁজতে যান, আমি ভানুপ্রসাদের সঙ্গে মাছ ধরব। সেই ছেলেবেলায় একবার ছিপ ফেলে পুঁটিমাছ ধরেছিলাম। বাই দ্য ওয়ে, এই নদীতে কী কী মাছ আছে?

অমল সোম বললেন, বেশিরভাগ মাছের এখনও নামকরণ হয়নি। ধরার পর আপনি নাম রাখতে পারেন। মৎস্য দফতরকে জানিয়ে দিলে ওরা রেকর্ড করে রাখবে।

.

স্টেফি তৈরি হয়ে এলেন। জিনস, টিশার্ট, স্পোর্টস শু, মাথায় ক্যাপ। অমল সোমের পরনে সাদামাটা প্যান্ট-শার্ট। অর্জুন ইচ্ছে করেই হাফপ্যান্ট আর টিশার্ট পরেছে, পায়ে কে। ওঁরা যখন গেটের দিকে এগোচ্ছিলেন তখন লছমন সামনে এসে দাঁড়াল, কোথাও যাচ্ছেন আপনারা?

অর্জুন বলল, হ্যাঁ।

বেশি দূরে যাবেন না। ওপাশের রাস্তায় চিতার টাটকা পায়ের ছাপ দেখে এলাম।

এই জঙ্গলে চিতা আছে? অমল সোম ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ সাহেব। বড় বাঘ নেই, কিন্তু চিতা আছে।

অর্জুন হাসল, তা হলে তো দারুণ জায়গা! চিতা, সাপ, হাতি, বাইসন, গন্ডার থেকে শুরু করে সেই তেনারা এখানে বসবাস করেন।

অমল সোমের কপালে ভাঁজ পড়ল, তেনারা মানে?

যাঁরা রাতদুপুরে বাংলোর ছাদে পা ঝুলিয়ে বসে থাকেন।

রাবিশ! অমল সোম হাঁটতে লাগলেন। ওঁরা সঙ্গী হলেন।

স্টেফি আগে জঙ্গলে ঢুকলেন। ডুয়ার্সের এই জঙ্গল সুন্দরবনের মতো অগম্য নয়। বৃষ্টি না হলে গাছের নীচের মাটি শুকনো থাকে। সমস্যা হয় বুনো ঝোঁপগুলো কাঁটাভরতি ডালগুলো বুক বরাবর ছড়িয়ে রাখে। সেগুলো সরাতে ওঁরা গাছের ডাল ভেঙে লাঠি করে নিয়েছিলেন। তাই দিয়ে ডাল সরিয়ে হেঁটে নজর রাখছিলেন নীচে, বিশল্যকরণী পাতার খোঁজে। মাথার উপর বাঁদরগুলো সমানে চেঁচামেচি চালিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কানে অদ্ভুত শব্দ ধাক্কা মারতেই অর্জুন হাত নেড়ে দু'জনকে থামতে বলল। অমল সোম শুনলেন। তারপর বললেন, গাছ কাটা হচ্ছে। বেশি দুরে নয়।

স্টেফি জিজ্ঞেস করলেন, গাছ কাটছে কেন?

অর্জুন বলল, বুড়ো গাছ ঝড়ে পড়ে গেলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তা কেটে নিয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন গাছ কাটে তখন দূর থেকেই তাদের হইচই শোনা যায়। শুধু একটা যান্ত্রিক আওয়াজ ছাড়া কোনও মানুষের গলা পাচ্ছি না। চোরা কাঠশিকারি নয় তো?

অমল সোম বললেন, চলো, নিঃশব্দে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি?

ওঁরা যত এগোচ্ছিলেন তত আওয়াজটা বাড়ছিল। একটানা, ঘষঘষ আওয়াজ। আরও এগিয়ে যেতে ওদের দেখতে পাওয়া গেল। একটা মোটা মেহগনি গাছের প্রায় গোড়ায় যে করাত চালানো হচ্ছে, সেটা হাতে ব্যবহার করা হচ্ছে না। একটা ছোট জেনারেটারের সাহায্যে ওই বিদ্যুৎচালিত করাত চালানো হচ্ছে। সাধারণত চালু করলে জেনারেটার যে আওয়াজ তোলে, ওটা তা করছে না। সম্ভবত সাইলেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে। পাঁচজন লোককে দেখা গেল। একজন তদারকি করছে, বাকি চারজন কাজে ব্যস্ত। এরা যে সরকারি কর্মচারী নয় তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারছিল না এই গভীর জঙ্গলের ভিতরে গাছ কেটে ওরা বাইরে নিয়ে যাবে কী করে? আশপাশে কোনও ট্রাক বা লরি চোখে পড়ল না। অর্জুন নিচু গলায় অমল সোমকে জিজ্ঞেস করল, কী করবেন?

ওদের কাছে অস্ত্র থাকবেই। মুখোমুখি হয়ে কোনও লাভ হবে না।

হঠাৎ স্টেফি চিৎকার করে উঠলেন, ওই যে, ওখানে। ওই গাছের নীচে।

অর্জুন চকিতে দেখতে পেল, স্টেফি আঙুল তুলে কাছের একটা ঝোঁপ দেখাচ্ছেন, যেখানে বিশল্যকরণী জঙ্গল পেঁচিয়ে আছে। কিন্তু ওঁর গলার আওয়াজ পেয়ে গিয়েছে গাছকাটা লোকগুলো। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেটার থামিয়ে দিল একজন। বন্দুক বের করল দু'জন। সতর্ক ভঙ্গিতে আওয়াজটা কোন দিক থেকে এসেছে তা বোঝার চেষ্টা করছিল ওরা। ঠিক তখনই অমল সোম পকেট থেকে একটা হুইসল বের করে ঘনঘন বাজাতে লাগালেন। লোকগুলো পরস্পরের দিকে হকচকিয়ে তাকিয়েই ছোট্ট জেনারেটার তুলে নিয়ে দৌড়োতে লাগল উলটো দিকে। তারপরেই গাড়ির শব্দ শোনা গেল। শব্দটা চলে গেল দূরে।

অর্জুন হেসে ফেলল, হুইসলটা কী ভেবে নিয়ে বেরিয়েছিলেন?

অমল সোম হাসলেন, এটা বাজিয়ে বাঁদর তাড়াব বলে ভেবেছিলাম। চলো, দেখা যাক!

ওঁরা প্রায় কেটে ফেলা গাছটার কাছে গিয়ে ইলেকট্রিক করাতটাকে দেখতে পেলেন। তাড়াহুড়োয় ওরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। অমল সোম বললেন, এই ঘটনার কথা ডি এফ ও-কে জানাতে হয়। পকেট থেকে সেলফোন বের করে বোম টিপে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন, লাইন পাওয়া যাবে। অমল সোম ডি এফ ও-কে ফোন করে চোরা কাঠশিকারিদের কথা জানালেন। তাঁর বাঁশিকে পুলিশের বাঁশি ভেবে ওরা পালিয়েছে বটে, কিন্তু ফিরে আসতে দেরি করবে না। গাছটা ঠিক কোথায় তার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

সেলফোন রেখে অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, এই গাছটার দাম আন্দাজ করতে পারো?

না।

অন্তত লাখ পাঁচেক হবে। এই যে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে ওরা গাছটা কাটতে চাইছিল, তা কখনওই সম্ভব হত না, যদি লোকাল সরকারি কর্মচারীদের মৌন সম্মতি না থাকত। ডি এফ ও বললেন, আধঘণ্টার মধ্যে লোকজন এখানে চলে আসবে। স্টেফি কোথায়?

স্টেফিকে আশপাশে দেখা যাচ্ছিল না। ওঁরা সেই জায়গায় পৌঁছে দেখতে পেলেন, বুনো ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে বিশল্যকরণীর পাতা ছিঁড়ে আর বেরোতে পারছেন না বুনো ডালের কাঁটায় আটকে গিয়ে। অমল সোম বললেন, অভিমন্যুর মতো অবস্থা! যাও সাহায্য করো।

বেশ সময় লাগল কাঁটা ছাড়িয়ে স্টেফিকে বের করে আনতে। ওঁর শরীরে বেশ কয়েকটি জায়গা ছড়ে গিয়েছে। কনুই-এর পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। কিন্তু ওসব নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে অমল সোমকে পাতাগুলো দেখালেন স্টেফি উত্তেজিত হয়ে, দেখুন, এই পাতাগুলো আগেরগুলোর চেয়ে একটু বেশি গাঢ়।

অমল সোম মাথা নাড়লেন, ঠিক। আমার মনে হয় এদিকেই সেই পাতাগুলোকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আপাতত এটুকুই, চলো, ফিরে যাই।।

স্টেফি আপত্তি করলেন, কেন? এখন তো সবে সাড়ে এগারোটা?

আমরা আবার বিকেলের আগে আসব। এখনই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসবে। ওরা ওদের কাজ করুক, আমাদের দেখলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিব্রত করবে।

অমল সোমের সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলেও স্টেফি তাঁকে অনুসরণ করলেন। ওঁদের পিছনে হাঁটতে হাঁটতে অর্জুনের মনে হল, এই পাতাগুলো এখানে অবহেলায় পড়ে আছে অথচ এখানকার কেউ মাথা ঘামায়নি। কেন?

.

বারমুডা, গেঞ্জি, মাথায় টুপি পরে মেজর অনেকক্ষণ জলের ধারে দাঁড়িয়ে ভানুপ্রসাদের মাছধরা দেখছিলেন। শেষপর্যন্ত উত্তেজনা বাড়তে তিনিও জলে নেমে পড়লেন। বেশ স্রোত এবং ঠান্ডা জল। ভানুপ্রসাদ পাথর সরিয়ে জলের ধারাকে মূল স্রোত থেকে আলাদা করে দিতে চাইছিল, কিন্তু সক্ষম হচ্ছিল না। মেজর তার সঙ্গে হাত লাগালেন। একেবারে বালক হয়ে গেলেন তিনি। পাথরগুলোর খাঁজে বালি গুঁজে দেওয়ার পর জলস্রোত আলাদা হল। সেই স্রোত যেখান দিয়ে নেমে আবার মূল স্রোতে মিশে যাচ্ছে, সেখানে দু'পাশে দুটো কাঠি পুঁতে তাতে কাপড় টাঙিয়ে দিল ভানুপ্রসাদ। সঙ্গে সঙ্গে কাপড় ফুলেফেঁপে কাঠি উপড়ে দিল। তখন মেজর এগিয়ে গিয়ে কাপড়ের একপ্রান্ত ধরলেন চেপে, অন্য প্রান্ত ভানুপ্রসাদের হাতে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে একঝাঁক মাছ যেন আত্মহত্যা করতেই কাপড়ের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়ল। ওঁরা দুজনে একসঙ্গে কাপড়ের দুই প্রান্ত তুলে শুকনো নুড়িপাথরের উপর নিয়ে এসে দেখলেন, কড়ে আঙুল থেকে তর্জনীর সাইজের মাছ ভয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। ভানুপ্রসাদ গুনে দেখল, ন'টা মাছ পাওয়া গিয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক মাছকে কবজা করে ভালুপ্রসাদ বলল, এতেই হয়ে যাবে সাব। খুব মিঠা মাছ।

কাপড়ে জড়িয়ে সে পারের দিকে হাঁটতে লাগল। এভাবে মাছ ধরার আনন্দ কখনও পাননি মেজর। এত তাড়াতাড়ি মাছ ধরার আনন্দ ফুরিয়ে যাওয়াটা পছন্দ হল না তাঁর। ইতিমধ্যে বারমুডা ভিজে গিয়েছে, গেঞ্জির খানিকটা। আরও কিছুক্ষণ জলে থাকতে ইচ্ছে হওয়ায় না ফিরে গিয়ে স্রোত ধরে হাঁটতে লাগলেন। জল ক্রমশ হাঁটু ছাড়িয়ে কোমরের কাছাকাছি চলে এল। মেজর বুঝলেন, এখন এর বেশি জল নদীতে নেই। হাঁটতে হাঁটতে উলটো দিকে চলে গিয়েছিলেন মেজর। নুড়িপাথরের উপর খালি পায়ে হাঁটার যে মজা তা এই প্রথম পেয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা খরগোশের বাচ্চা মুখ নামিয়ে জল খাচ্ছে পারের প্রান্তে এসে। তিনি এগিয়ে যেতেই বাচ্চাটা ছুট লাগাল। বেচারা ভয়ে এমন কানা হয়ে গিয়েছিল যে, একটা বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ল কিছুটা। চারটে পা উপরে তুলে চিত হয়ে রইল একটু। তারপর আবার উলটে সোজা হয়ে টলতে টলতে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে। যেন একটা মজার খেলা পেয়েছেন এভাবে বাচ্চাটাকে অনুসরণ করলেন মেজর।

বাচ্চাটাকে আর দেখতে পেলেন না মেজর। কিন্তু যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির। ইটের উনুন, দুটো হাঁড়ি, গোটানো বিছানা। বোঝাই যাচ্ছে এই জায়গা কোনও মানুষের সংসার। অথচ মানুষটা ধারেকাছে

নেই। উপরে বড় বড় পাতার গাছ যেন ছাউনি করে দাঁড়িয়ে আছে। যে এখানে থাকে সে নিশ্চয়ই তার থাকাটা গোপন রাখতে চায়। কিন্তু কেন? এই জঙ্গলের মধ্যে যে-কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। বৃষ্টি নামলে পাতাগুলো যতই বড় হোক, কতক্ষণ তাকে শুকনো রাখতে পারবে! মেজরের মনে হল, লোকটা নির্ঘাত ক্রিমিনাল। পুলিশকে এড়িয়ে এই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো পুলিশের খাতায় ওর নাম একজন ভয়ংকর অপরাধী হিসেবে রয়েছে।

নদী পেরিয়ে এপারে চলে আসতেই লছমনের মুখোমুখি হলেন মেজর। লছমন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

খরগোশ ধরতে পারলাম না, পালিয়ে গেল।

যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল লছমন। বলল, ওদিকে যাবেন না সাহেব!

কেন?

পরশু একটা চিতা হরিণ মেরেছে ওখানে। ব্যাটা ওদিকটায় ঘোরাঘুরি করছে।

রাগ হয়ে গেল মেজরের। এই লোকটিকে প্রথম থেকেই তিনি অপছন্দ করছেন। একদম মিথ্যে বলছে লোকটি। চিতা ঘুরলে ওখানে একটা লোক সংসার সাজিয়ে আছে কী করে? তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, লছমন, চিতা আমাকে কিছু বলবে না। ওরা মানুষ চেনে।

.

এ কী! একেবারে স্নান করে এলেন নাকি? দোতলার বারান্দা থেকে অর্জুন চেঁচাল।

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে মেজর বললেন, মাছ ধরলাম ভানুপ্রসাদের সঙ্গে। দেখেছ?

হ্যাঁ।

সাইজে ছোট কিন্তু খুব মিষ্টি মাছ।

অমল সোম বসে ছিলেন চেয়ারে। বললেন, মেজর ধরেছেন, নাম দাও মাইনর।

মাইনর? নট ব্যাড। সাইজের সঙ্গে নামটা মিলছে। মেজর বারান্দায় উঠে এসে চেয়ার টেনে সে চিৎকার করলেন, ভানুপ্রসাদ। কফি বানাও। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, একটা সন্দেহজনক ব্যাপার দেখে এলাম।

ওঁর মুখের অভিব্যক্তি দেখে হেসে ফেলল অর্জুন, কীরকম?

ওই নদীর ওপারে কেউ লুকিয়ে থাকে। হয়তো আমাকে যেতে দেখে জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিল লোকটা। রান্না করে খায়। হাঁড়ি, উনুন দেখে এলাম। সঙ্গে বিছানাও। মেজর বললেন, এখানে ভিখিরিদের আসার কোনও চান্স নেই। মনে হচ্ছে পুলিশের ভয়ে কোনও ক্রিমিনাল ওখানে আশ্রয় নিয়েছে। আর এই ব্যাটা চৌকিদার জানে লোকটাকে।

কেন একথা মনে হচ্ছে আপনার?

ব্যাটা আমাকে বলল ওপারে না যেতে। ওখানে নাকি চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। চিতা ঘুরছে কিন্তু মানুষটাকে কিছু বলছে না? ভাবতে পারো? মি. সোম, আপনি পুলিশের বড়কর্তাদের খবরটা জানিয়ে দিন। মেজর বললেন।

কিন্তু আপনি তো লোকটাকে দ্যাখেননি?

না দেখিনি। তবে একজন যে ওখানে থাকে তাতে কোনও ভুল নেই। যেসব জিনিস ওখানে পড়ে আছে সেগুলোই প্রমাণ করছে।

কিন্তু পুলিশ এসে কাউকে না পেলে আমার উপর বিরক্ত হবে। অমল সোম নির্বিকার মুখে কথাগুলো বললেন।

ঠিক কোন জায়গায় জিনিসগুলোকে দেখতে পেয়েছেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

ঠিক ওপারে।

এদিক থেকে দেখলে কি বুনো ঝোঁপের আড়াল পড়বে?

একদম ঠিক। মাথা নাড়লেন মেজর।

অর্জুন চিন্তা করল খানিক। তারপর অমল সোমকে বলল, জায়গাটা একটু দেখে আসি। আমি জলে পাথর ছুঁড়েছিলাম। সেটা জঙ্গলে ঢুকে বোধহয় কাউকে আঘাত করেছিল। একটা যন্ত্রণার শব্দ শুনেছিলাম।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, স্টেফি কোথায়?

ঘরে। ল্যাপটপ নিয়ে বসেছে।

পাতা খুঁজে পেয়েছে?

কাছাকাছি পাওয়া গিয়েছে। খোঁজাখুঁজি করলে পেয়ে যাব।

নেমে এল অর্জুন। সে ইচ্ছে করেই নদীর দিকে না গিয়ে সামনের গেট খুলে জঙ্গলের এপাশে চলে এল। আড়চোখে তাকিয়ে বুঝতে পারল, লছমন বাংলোর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। মেজর ঠিকই বলেছেন, এই লোকটি সন্দেহজনক। সে বাংলোয় আসা-যাওয়ার পথ ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

ডুয়ার্সের জঙ্গলের ভিতর একটা চমৎকার গা ছমছমে ব্যাপার আছে। ঝিঁঝির শব্দ, পাখির ডাক, বাঁদরগুলোর উল্লাস মিলেমিশে ছায়া জড়ানো বনের ভিতরটাকে যেন নাটকের মঞ্চ করে তোলে। মনে হয়, যে-কোনও মুহূর্তে নাটক শুরু হবে। একটা মোটা এবং শক্ত ডাল মাটিতে পড়ে আছে দেখে তুলে নিল অর্জুন। তারপর সেটা দিয়ে বুনো ঝোঁপের প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে সরিয়ে এগোতে লাগল। হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে আসতেই সে অবাক হয়ে বকুল গাছটাকে দেখতে পেল। এই জঙ্গলের বড়সড় গাছগুলোর মধ্যে একটা মাঝারি বকুলগাছ একা দাঁড়িয়ে অজস্র ফুল ঝরিয়ে দিয়েছে নীচের মাটিতে। তারই সুগন্ধে চারপাশ ম-ম করছে।

মিনিটদশেক পরে অর্জুনের খেয়াল হল, সে একটাও বিশল্যকরণী গাছ দেখতে পায়নি। এরকম হওয়ার কথা নয়। ডুয়ার্সের জঙ্গলে অযত্নেও বেশ পুরুষ্ট হয়ে ওরা ছড়িয়ে থাকে। তা ছাড়া অমলদার ভুল হওয়ার কথা নয়। হঠাৎ গাড়ির আওয়াজ কানে এল। একাধিক গাড়ি ওপাশের জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই অমল সোমের ফোন পেয়ে ডি এফ ও লোকজন পাঠিয়েছেন। সে দিক পালটে নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। একটা বিরাট পাইথন মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। মাঝারি আকারের হরিণকে অর্ধেক গিলে ফেললেও মুখটাকে গিলতে পারছে না বড় শিং দুটোর জন্যে। হরিণের মাথা শিং সমেত বাইরে রয়ে গিয়েছে। শিং দুটো এত বড় যে, পাইথনের পক্ষে তা গিলে ফেলা সম্ভব নয়। যতটা সম্ভব মুখের হা বাড়িয়েও যখন কাজ হচ্ছে না, তখন ধীরে ধীরে লেজটাকে মুখের কাছে নিয়ে এসে তা দিয়ে শিং দুটোর একটাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিতে লাগল সাপটা। মিনিট খানেকের মধ্যে একটা শিং মট করে ভেঙে যেতেই মুখের অর্ধেকটা গিলে ফেলল পাইথন। হরিণের শরীর ওর মুখের ভিতরে আটকে থাকায় সাপটার আক্রমণ করার ক্ষমতা এখন নেই। অবশ্য একই উপায়ে দ্বিতীয় শিং ভেঙে ফেলে আস্ত হরিণটাকে পেটে চালান করে কয়েকদিন নিশ্চিন্তে ঘুমোবে পাইথনটা। অর্জুন একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। এই সময় শুকনো পাতায় শব্দ তুলে দুটো শিয়ালের চেয়ে বড় প্রাণীর উদয় হল। এরা নির্ঘাত নেকড়ে। কয়েক সেকেন্ড সাপটাকে দেখে নিয়ে দুজনে দু'পাশে গিয়ে শরীরের মাঝখানে কামড়ে মাংস ঘেঁড়ার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শক্তিতে শরীর মোচড়াল পাইথন। দ্রুত লেজ ঝাঁপটে এমন আঘাত করল যে, একটা নেকড়ে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে আর উঠল না। দ্বিতীয় নেকড়ে প্রাণ বাঁচাতে পড়ি কি মরি করে ছুটল যেদিকে পারে।

অর্জুন আর দাঁড়াল না। লাঠিটাকে নিয়ে ও নদীর অনেকটা উপরে চলে এল। এখানে জল বেশি নয় কিন্তু স্রোত প্রচুর। লাঠি থাকায় নদী পার হওয়া সহজ হল।

নদীকে খানিকটা তফাতে রেখে গাছের আড়ালে আড়ালে নীচের দিকে নামতে লাগল অর্জুন। এপার থেকে বাংলোর ছাদ দেখা যাচ্ছে। রোদ পড়ায় চকচক করছে। মেজর যে জায়গাটার কথা বলেছিলেন, তার কাছাকাছি এসে নিঃশব্দে ডালপালা সরিয়ে সে এগোল। মিনিট তিনেক পরে সে শক্ত হল। মানুষের

গলা। বেশ চাপা। সে নিচু হয়ে আর-একটু এগোতেই স্থির হয়ে গেল। বুনো ঝোপে নিশ্চিন্তে ছিল ওটা, মানুষ দেখে সোজা হয়ে ফণা তুলেছে। দূরত্ব এত কম যে, ছোবল মারলেই তার মুখে আঘাত লাগবে। আর মুখে বিষ ঢুকলে মৃত্যু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। অর্জুন নড়ল না। পাথরের মূর্তির মতো সাপের চোখের দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সাপটা দুলছে। ফণাটা এপাশ-ওপাশ করছে। কী সাপ জানার দরকার নেই। কিন্তু ওটা যে বিষধর তাতে কোনও সন্দেহ নেই। লাঠিটা পায়ের পাশে মুঠোয় ধরা। ওটা তুলতে গেলেই ছোবল নেমে আসবে। সাপটা এই মুহূর্তে মনঃস্থির করতে পারছে না।

হঠাৎ ওপাশের মানুষটির গলা চড়ল, তুই এখান থেকে চলে যা। পাহাড় পেরিয়ে ভুটানে ঢুকে যা। আমি বলছি, তুই এখানে থাকিস না!

গলার স্বর সাপটাও শুনতে পেয়েছিল, তাই মুখ ঘুরিয়ে যেদিক থেকে কথাগুলো এসেছিল সেদিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে ফণা নামিয়ে বা দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল নিঃশব্দে। কয়েক সেকেন্ড লাগল অর্জুনের ধাতস্থ। হতে। এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে এর আগে হয়নি।

মিনিটদুয়েক পরে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। অর্জুন বুঝতে পারল কেউ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, লছমন নদী পার হচ্ছে। অর্থাৎ লোকটা কাউকে এখান থেকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে বাংলোয়। অর্জুন লাঠিটা শক্ত করে ধরে এগোল। শেষ পর্যন্ত জঙ্গলের ডালপালার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল, একচিলতে পরিষ্কার জায়গায় পাথরের ভিতর শুকনো ডাল গুঁজে উনুন ধরাবার চেষ্টা করছে একটা লোক। পরনে ময়লা পাজামা আর গেঞ্জি। লোকটা আকাশের দিকে তাকালে বোঝা গেল ওর মুখ দাড়িতে ঢাকা।

ডালপালা সরিয়ে লোকটার পিছনে পৌঁছে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে খানিকটা দূরে গিয়ে একটা ধারালো কাটারি হাতে তুলে নিয়ে নোকটা আক্রমণের ভঙ্গিতে উবু হয়ে বসল।

ওসব করে কোনও লাভ নেই। আমি তোমার শত্রু নই। কে তুমি?

আপনি কে? এখানে কী করে এলেন?

ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম। ওই বাংলোয় বেড়াতে এসেছি।

লোকটা তাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, লছমন আপনাদের কথা বলছিল। আমি কে জেনে আপনার কোনও লাভ নেই।

আমার লাভ না থাকলেও তোমার লাভ হতে পারে। অর্জুন হাসল।

মানে?

কাল রাত্রে কয়েকজন লছমনকে শাসিয়ে গিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, ওরা তোমার খোঁজে এসেছিল। একটু চাপ বাড়লেই লছমন তোমাকে ধরিয়ে দেবে।

লোকটা অদ্ভুত চোখে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, সত্যি কথা বলুন তো, আপনি কে?

একটু আগে তো বললাম, এখানে বেড়াতে এসেছি। অর্জুন হাসল, কিন্তু তুমি এভাবে জঙ্গলে লুকিয়ে আছ কেন? থাকার পক্ষে জায়গাটা নিরাপদ নয়। বাঘ, হাতির কথা ছেড়ে দিলাম, চারপাশে মারাত্মক বিষধর সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটাকে তো ওখানে দেখলাম।

লোকটা মাথা নাড়ল, কিন্তু কোথায় যাব? লছমন বলছে ওই পাহাড়ের ওপারে ভুটানে চলে যেতে। কিন্তু ভুটান তো আরও খারাপ জায়গা। ওখানকার পুলিশ অচেনা লোককে জঙ্গলে দেখলেই মেরে ফেলে। তা ছাড়া খাবারও পাব না। এরকম জঙ্গলে খাওয়া যায় এমন ফল দেখিনি।

খুব খারাপ সমস্যায় পড়েছ হে! তুমি কি পুলিশের ভয়ে এখানে লুকিয়ে আছ?

শুধু পুলিশ? ওরাও আমার মৃত্যু চায়।

কারা?

লোকটা আবার তাকাল, এসব জেনে আপনার কী লাভ? আমাকে আমার মতো থাকতে দিন।

ঠিক আছে। তুমি যখন নিজের মৃত্যু চাইছ তখন তাই হোক।

মৃত্যু? আমি সেটা কখন চাইলাম?

তা হলে আমি যা বলব তা তুমি শুনবে?

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে লোকটা বলল, শুনি।

তুমি ওইসব রান্না শেষ করে খেয়েদেয়ে এই জায়গাটা ছেড়ে দেবে। ইচ্ছে করলে নদী বরাবর গিয়ে অনেকটা উঁচুতে ডেরা বাঁধতে পারো। যদি কেউ বা কারা তোমার খোঁজে এখানে আসে, তা হলে তারা না পেয়ে হতাশ হবে। যাওয়ার আগে তুমি থাকার জন্য এখানে যেসব চিহ্ন রয়েছে তা ভাল করে মুছে দিয়ে যাবে। অর্জুন বলল।

এই জঙ্গলের কোথাও গিয়ে স্বস্তি পাব না। কাল রাত্রে যারা লছমনের কাছে এসেছিল তারাও তো জঙ্গলের ওপাশে নজর রাখছে। তারাও তো ওইদিকে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকটায় সাপের উপদ্রব বেশি বলে ওরা ভয়ে আসে না। লোকটি বলল।

বুঝলাম। ওরা কাল বাইরে থেকে জঙ্গলে ঢুকে এতটা পথ ভেঙে বাংলোয় আসেনি, ওপাশের জঙ্গল থেকে নদী পেরিয়ে গিয়েছিল! অর্জুন চট করে ভেবে নিল। তারপর বলল, একটা পথ আছে। আমি লছমনকে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে পাঠাব। ওই বাংলোর দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়লেই তুমি সোজা বাংলোয় চলে আসবে। লছমন কখনও দোতলায় ওঠে না। তুমি নিশ্চিন্তে দোতলার ঘরে লুকিয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু তুমি কে, কেন এভাবে লুকিয়ে আছ, লছমনের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক, তা আগে পরিষ্কার করে বলতে হবে।

আপনি তো দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন? যখন চলে যাবেন তখন তো আমি ধরা পড়ে যাব। লছমন তখন আমাকে ছাড়বে?।

আমরা তো কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছি না। তেমন হলে তুমি আমাদের সঙ্গে এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাবে। কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। বিকেল চারটের সময় বাংলোর দিকে লক্ষ রেখো।

আমি কী যে করি! আপনাকে ভালমানুষ বলে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে। আমার নাম বাদল রায়। লছমন আর আমার মধ্যে বিশ বছরের উপর জানাশোনা। জেলে আলাপ। দু'জনেই চুরির দায়ে জেল খেটেছিলাম। ওই। জেলেই কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ছিল। লছমন তাদের পছন্দ করত না, এড়িয়ে যেত। কিন্তু আমার খুব ভাল লাগত। ওদের কাছ থেকে অনেক নতুন কথা জানলাম। ওরা চায় দেশে কোনও গরিব বা বড়লোক থাকবে না। সবাই সমান হবে। কারও জমি আছে কারও জমি নেই, এটা চলবে না। এসব কথা বলেছে বলে সরকার ওদের ধরে জেলে ঢুকিয়েছে। জেল থেকে বেরিয়েই ওরা আবার আন্দোলন শুরু করবে। আমাকেও ওরা বলল, ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে! জেল থেকে বেরিয়ে আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই ওরা দলে টেনে নিল। জানতে পারলাম, বড়লোকদের সঙ্গে লড়াই করতে প্রচুর অস্ত্র দরকার। দাম দিলেই সেগুলো পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই টাকা তো কেউ এমনি এমনি দেবে না। আমরা ছোট ছোট জোতদার, ব্যবসায়ীকে ধরে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনদের উপর চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতাম। দু-তিনটে খুনও করতে হয়েছিল। তবে আমি করিনি। আমাদের কেউ সাপের কামড়ে বা হাতির পায়ের চাপে মারা গেলে তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হত, কিন্তু তার বাড়িতে কোনও খবর দেওয়া হত না। মনে হত, আমি মরে গেলে আমার আত্মীয়রা কোনও খবর পাবে না। আমি ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না বলতেই ওদের চোখে খারাপ হয়ে গেলাম। আমাকে আর অ্যাকশনে নিয়ে যেত না ওরা। ক্যাম্পে রান্নার কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখত। ওরা আমাকে সন্দেহ করত। এক রাত্রে ওরা জয়ন্তীতে বেড়াতে আসা বিরাট এক ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে এল জঙ্গলে। এককোটি টাকা দিলে তাকে ছেড়ে দেবে। আমাদের ক্যাম্প ছিল ওই ভুটান পাহাড়ে। লোকটির আত্মীয়রা টাকার। পরিমাণ নিয়ে যখন দরাদরি করছে, তখন ভুটানি পুলিশ আমাদের ক্যাম্পে হানা দিল। বন্দি লোকটিকে ফেলে ওরা যখন পালিয়ে গেল, তখন আমি ওকে সাহায্য করলাম। তখন লোকটি ওদের কাছে বোঝার মতো। তাই প্রমাণ মুছে। ফেলতে ওকে মেরে ফেলতে বলেছিল আমাকে। কিন্তু লোকটা তো নির্দোষ। কেন মারব? আমার কথা শুনে লোকটি ভুটানি পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে প্রাণে বেঁচে গেল। তাতে খেপে গেল ওরা আমার উপর। আমাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিল। আমি কোনওমতে পালিয়ে এখানে চলে এলাম। একদিন লছমনের কাছে ছিলাম। সব শুনে লছমন আমাকে ওর কাছে রাখতে সাহস পেল না। রোজ

চাল, ডাল, আলু দিয়ে যায়, তাই ফুটিয়ে খেয়ে বেঁচে আছি আমি। কিন্তু এভাবে আর থাকতে পারছি না। লোকটা দু'হাতে মুখ ঢাকল।

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। বলল, তুমি বিকেলে নজর রাখবে। আমি রুমাল নাড়লে চলে আসবে। তুমি কোনও মানুষ খুন করোনি তো?

না। একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি বলে আমার এই অবস্থা।

ঠিক আছে। সাবধানে থেকো।

৩. বাংলোয় ফিরে এসে

বাংলোয় ফিরে এসে অর্জুন দেখল, লছমন বাগানে কাজ করছে। স্টেফি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জঙ্গল দেখছেন। কাছে যেতে স্টেফি বললেন, মুশকিল হয়েছে। মি. সোম বললেন, এখান থেকে ইউ এস এ-তে কুরিয়ার করা যাবে না। তার জন্যে শহরে যেতে হবে।

কুরিয়ারে কী পাঠাবে?

ওই পাতাগুলো। ইউনিভার্সিটি স্পেসিমেন দেখতে চাইছে। একটু আগে মেল এল। আমি পাতাগুলোর ফোটো তুলে স্ক্যান করে পাঠিয়েছি। তাতে তো ওরা বুঝবে না।

তুমি তো ঠিকঠাক পাতা পাওনি এখনও। ওটা পেলেই পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু স্টেফি, দেখছ তো, বিশল্যকরণী এখানে একটু ওখানে একটু ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। যদি ওর রস সত্যি কাজে লাগে তা হলে তো তোমার প্রচুর পাতা নিয়মিত লাগবে।

ঠিক কথা। এখানকার মাটি, আবহাওয়ার সঙ্গে মিল আছে এমন জায়গা বেছে নিয়ে ওখানে বিশল্যকরণীর চাষ করব। বিশাল বাগান তৈরি করতে তো অসুবিধে নেই। স্পনসররা খরচ মিটিয়ে দেবে। স্টেফি বললেন।

বাঃ। উইস ইউ গুড লাক।

অর্জুন ঘরে গিয়ে দেখল অমল সোম চেয়ারে বসে বই পড়ছেন। সে পাশে বসে লোকটার ব্যাপারে যা জেনেছে তা খুলে বলল। সব শুনে অমল সোম বললেন, নির্ভেজাল বেড়ানো দেখছি তোমার পছন্দ নয়। কিন্তু লোকটা যে সত্যি কথা বলছে তার প্রমাণ কী?

কোনও প্রমাণ নেই। তবে ওই অবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যে বললে যত বড় অভিনেতা হতে হয়, লোকটা বোধহয় তত বড় অভিনেতা নয়।

.

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে স্টেফি আবার বিশল্যকরণী পাতার সন্ধানে বেরোতে চাইলেন। মেজর সেজেগুজে তৈরি। অর্জুন জানাল, তার পায়ে একটু ব্যথা হয়েছে, রেস্ট নিতে চায়। অমল সোম তাকে অব্যাহতি দিলেন। দুপুর সওয়া দুটোয় ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। তিনজনেই লাঠি জোগাড় করে নিয়েছেন। স্টেফির হাতে একটা ঝোলা।

লছমন ওদের যাওয়া দেখছিল ভানুপ্রসাদের পাশে দাঁড়িয়ে। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি যাবেন না বাবু?

নাঃ। ওই পাতা খুঁজতে আমার ভাল লাগবে না।

কী পাতা বাবু?

ভালুপ্রসাদ তাকে বুঝিয়ে বলল মেমসাহেব কী কারণে অতদুর থেকে এসেছেন!

হাসল লছমন, দুর! ওই পাতা দিয়ে যদি এত বড় কাজ করা যেত, তা হলে এতকাল বনেবাদাড়ে পড়ে থাকে? কবে সাফ হয়ে যেত। যাকগে, মেমদের মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তা ঘোরে। একবার একটা সাহেব এসেছিল কীভাবে পাখি ডিমে তা দেয় তার ফোটো তুলতে। লম্বা গাছগুলোয় উঠে দিব্যি ঘণ্টার পর-ঘণ্টা বসে থেকে ফোটো তুলল। কিন্তু ফিরে যাওয়া ওর ভাগ্যে লেখা ছিল না।

কেন?

ঘাড় মটকে মেরে দিয়েছিল কেউ।

কে?

জানি না। পুলিশ লাশ নিয়ে গিয়েছে, খুনিকে ধরতে পারেনি।

হঠাৎ অর্জুন ভানুপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বিরিয়ানি রাঁধতে পারো?

চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এখানে বিরিয়ানির মশলা তো নেই। তা ছাড়া মাংস আনা দরকার। ভানুপ্রসাদ বলল, ওসব জিনিস রাজাভাতখাওয়াতেও পাওয়া যাবে কি না জানিনা।

লছমন বলল, কে বলল পাওয়া যায় না? সব পাবে ওখানে।

ভানুপ্রসাদ মাথা নাড়ল, এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একা যাওয়া-আসা করতে পারব না।

ঠিক আছে। লছমন, তোমার তো সব চেনাজানা। তুমি সঙ্গে যাও। মেমসাহেব এসেছেন আমেরিকা থেকে, ওঁকে ভাল খাওয়ানো দরকার। অর্জুন বলল।

কিন্তু! লছমন দ্বিধায় পড়ল, আমি বাংলো ছেড়ে যাব কী করে? মালিকের নিষেধ আছে। ওই যেদিন মাইনের টাকা দিতে লোক আসে, সে-ই সব বাজার করে আনে।

আরে, তোমার মালিক তো অমলদার পরিচিত। কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের কাজে বাইরে গেলে নিশ্চয়ই তিনি রাগ করবেন না। ততক্ষণ আমি তোমার হয়ে পাহারা দিচ্ছি। অর্জুন বলল।

তবু রাজি হচ্ছিল না লছমন। কিন্তু ভালুপ্রসাদ তাকে নিচু গলায় কিছু বলতে সে মত বদলাল। লছমন বলল, ঠিক আছে, বলছেন যখন, যাচ্ছি। সন্ধের আগেই ফিরে আসব। আপনি একটু বেশি টাকা দিয়ে দেবেন। হাতে টাকা নেই, কেরাসিন তেল কিনতে হবে।

অর্জুন ভানুপ্রসাদকে উপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে শ'চারেক টাকা দিয়ে বলল, দেখে-শুনে নিয়ে এসো। বেশি দেরি কোরো না।

ওরা গাড়ি নিয়ে চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল অর্জুন। চারধার কী ভীষণ চুপচাপ, ঝিঁঝির শব্দও শোনা যাচ্ছে না। এই জনমানবশূন্য পৃথিবীতে লছমন একা থাকে কী করে? লছমন যে এত সহজে যেতে রাজি হবে তা ভাবেনি অর্জুন। ভানুপ্রসাদ নিশ্চয়ই ওকে কোনও পানীয়ের লোভ দেখিয়েছে। সেই পানীয় পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে ওরা! ভানুপ্রসাদকে সতর্ক করা যেত, কিন্তু ইচ্ছে করেই সে না বোঝার ভান করেছে।

.

সকালে যেদিকটায় যাওয়া হয়েছিল সেদিকে না গিয়ে উলটো দিকের জঙ্গলে ঢুকেছিলেন ওঁরা। ভয় পাওয়া একটা বুনো শূকর প্রায় ওঁদের গায়ের কাছ দিয়ে এমনভাবে ছুটে গিয়েছিল যে, মেজর চিৎকার করে উঠেছিলেন, কী হচ্ছে কী!

সেটা শুনে স্টেফি হেসে গড়িয়ে পড়েছিলেন। আরও কিছুক্ষণ পরে অমল সোম একটা বিষাক্ত সাপ মারলেন। মেরে বললেন, না মেরে উপায় ছিল না! নইলে আমি মারা পড়তাম।

মেজর হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন, স্টেফি, আফ্রিকা আর এই ডুয়ার্সের জঙ্গলের মধ্যে কোনটা বেশি ভয়ংকর বলো তো?

আমি কখনও আফ্রিকায় যাইনি।

তা হলে তোমার একবার যাওয়া দরকার। ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এইট্টির শীতকালে আমি প্রথম মাসাইমারায় যাই।

মেজর! চাপা গলায় সতর্ক করলেন অমল সোম।

ওঃ। এটা সত্যি ঘটনা!

দাঁড়িয়ে গেলেন অমল সোম, তার চেয়ে সত্যি ঘটনা হল, কাছাকাছি কোনও জন্তুর দল আছে। হাতি বা বাইসন মনে হচ্ছে। গন্ডারও হতে পারে।

মাই গড!

আমাদের ওদিকে আর এগোনো ঠিক হবে না।

কিন্তু আমরা তো এখনও একটাও স্পেসিমেন পেলাম না। স্টেফি বললেন।

পেয়ে যাবে। ধৈর্য ধরো। অমল সোম কথাগুলো বলেই দেখলেন একটা বিশাল গঁড় কুড়ি গজ দূরত্বে গাছের ডাল সরাচ্ছে। তিনি চাপা গলায় বললেন, পিছন দিকে দৌড়োও। নইলে সবাই মারা যাব।

মেজরও দৃশ্যটি দেখেছিলেন। তাকে ওই মোটা শরীর নিয়ে আগে দৌড়োতে দেখা গেল। জঙ্গলে শরীর আটকে যাচ্ছে, ছড়ে যাচ্ছে হাত-মুখ। পিছনে একাধিক হাতির চিৎকার। মেজর পিছিয়ে পড়ছিলেন। তার মনে হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ড লোহার বলের মতো হয়ে গলার কাছে উঠে এসেছে। বরং স্টেফি দ্রুত তাদের ছাড়িয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। মেজর আর দৌড়োতে পারছিলেন না। ওঁর অবস্থা দেখে অমল সোম বললেন, গাছে উঠতে পারবেন?

ক্যান ট্রাই। ফ্যাসফেসিয়ে বললেন মেজর।

বাঁ দিকের একটা গাছের ডাল নীচে পাওয়ায় তাই ধরে মেজরকে নিয়ে কোনওমতে উপরে উঠলেন অমল সোম। তারপর সেটায় রেখে আর একটা উপরের ডালে উঠে এলেন। শেষ পর্যন্ত যে দূরত্বে পৌঁছোলেন সেখানে হাতির শুড় পৌঁছোনো সম্ভব নয়। মেজর কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। একটার পর-একটা হাতি গাছের তলায় জড়ো হয়ে গিয়েছে। নেতা হাতিটি উপরের দিকে মুখ করে শুড় নাচাল কয়েকবার। রাগে চিৎকার করল। একবার এগিয়ে এসে মোটা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা দিয়ে বুঝল, ওই গাছ ওপড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এতক্ষণে মেজরের গলায় স্বাভাবিকতা ফিরে এল, উই আর সেফ।

অমল সোম কিছু বললেন না।

আপনি কিছু বলছেন না যে?

দয়া করে শক্ত হাতে ডালটা ধরে থাকুন।

আছি। কিন্তু আজ একটা ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ থাকল না।

কী ব্যাপারে?

আমার পূর্বপুরুষ অবশ্যই হনুমান কিংবা ওইজাতীয় বনমানুষ ছিলেন। এই বডি নিয়ে কীভাবে উঠে এলাম বলুন তো? মেজর যেন নিজের পিঠ চাপড়ালেন।

হাতিগুলো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেল।

নামতে পারবেন? অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

কেন?

আশ্চর্য! মেয়েটার কথা ভুলে গেলেন? ও যে সেই দৌড়ে চলে গেল, কোথায় গেল, বাংলোয় পৌঁছোতে পারল কি না, খোঁজ নেবেন না?

শিয়োর। মাথা নাড়লেন মেজর, কিন্তু নামব কী করে? নীচের দিকে তাকালেই তো মাথা ঘুরছে।

অমল সোম ওঁকে নামাবার চেষ্টা করলেন। নীচের ডালটায় পৌঁছে শেষ রক্ষা হল না। হুড়মুড়িয়ে নীচে পড়লেন মেজর। পড়ে স্থির হয়ে গেলেন। তাঁর পাশে চলে এসে অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, কী হল? অজ্ঞান হয়ে গেলেন নাকি?

না। চোখ বন্ধ করেই মেজর বললেন, শরীরে ক'টা ফ্র্যাকচার হয়েছে বুঝতে চাইছি।

একটাও হয়নি। অত চর্বি ভেদ করে হাড় পর্যন্ত আঘাত পৌঁছোবে না। চলুন, মেয়েটার খোঁজ করি। যদি বাংলোর পথ ধরে তা হলে ঠিক আছে, কিন্তু যদি উলটো দিকের জঙ্গলে ঢুকে যায় তা হলে বিপদে পড়তে পারে। অমল সোম বললেন।

খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হল। চিৎকার করে ওঁরা ডাকতে লাগলেন, স্টেফি! স্টেফি!

কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মেজর বললেন, নিশ্চয়ই বাংলোয় ফিরে গিয়েছে। আজকালকার মেয়ে, তার উপর আমেরিকান, ও ভুল করবে না।

অমল সোম দাঁড়ালেন। তিনি নিজেই বাংলোটা কোন দিকে ঠাওর করতে পারছিলেন না। স্টেফি তো দৌড়োচ্ছিল, ওর পক্ষে ভুল করা খুবই স্বাভাবিক।

.

জানলা দিয়ে নয়, একেবারে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে অর্জুন চেঁচিয়ে ডাকল, বাদল, চলে এসো। তিনবার ডাকার পরে একমুখ সন্দেহ নিয়ে বাদল নামের লোকটা বুনো ঝোঁপ ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। অর্জুন তাকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল।

কোনওরকমে নদী পার হয়ে এল বাদল। ও খুব আতঙ্কিত তা বুঝতে পেরে অর্জুন বলল, ভয়ের কিছু নেই। এখন বাংলো খালি। লছমন বাজারে গিয়েছে। এসো।

লোকটাকে নিয়ে দোতলায় উঠে এল অর্জুন। বলল, এখানে চারটে ঘর। সব ঘরেই আমাদের কেউ না কেউ থাকে। তুমি পিছনের বারান্দায় থাকবে। এসো।

রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে পিছনের বারান্দায় বাদলকে নিয়ে এল অর্জুন। তারপর জিজ্ঞেস করল, তোমার সেই বিছানা কোথায়?

ওখানেই পড়ে আছে।

ওঃ। যাও, চটপট নিয়ে এসো। এই বারান্দায় শোবে তুমি। রোদ, বৃষ্টি গায়ে লাগবে না। বাথরুমের দরকার হলে ওই দরজায় আস্তে আস্তে শব্দ করবে। ভানুপ্ৰসাদ আমাদের ড্রাইভার, ও-ই এখন রান্না করছে, ওকে তোমার কথা বলে রাখব। ও শব্দ শুনে দরজা খুলে দিলে চটপট বাথরুম করে আসবে। খাবার ঠিক সময়ে ভানুপ্রসাদ দেবে। কিন্তু খেয়াল রেখো, ওর সঙ্গে গল্প। করবে না। অর্জুন বুঝিয়ে বলতে বাদল মাথা নাড়ল। তারপর দ্রুত নেমে গেল বাংলো থেকে।

মিনিটদশেক পর লোকটা যখন ফিরে এল বগলে ভাঁজ করা বিছানা নিয়ে, তখন অর্জুন জিজ্ঞেস করল, এত দেরি হল?

নদীতে জল বাড়ছে। দেখুন, পাজামা ভিজে গিয়েছে। তারপর হাঁড়িটাড়িগুলো এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখে এলাম, যা কেউ খুঁজে পাবে না। উনুনটা ভেঙে মাটি চাপা দিতে হল। আমি ওই বারান্দায় চলে যাই? বাদল জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, যাও। মনে রেখো কোনও শব্দ করবে না।

বাদল এগোচ্ছিল, কিন্তু অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ওই লোকটার নাম কী?

কোন লোক?

যাকে ওরা কিডন্যাপ করেছিল, যার প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছিলে।

বিজয়বাবু, বিজয়াদ গুপ্তা।

কোথায় বাড়ি?

শিলিগুড়ি। বহুত বড় ব্যবসাদার।

ঠিক আছে, চলে যাও। আমি এপাশ থেকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। ভালুপ্রসাদ যে ঘরে শুচ্ছে সেই ঘরের দরজা দিয়ে বাদলকে পিছনের বারান্দায় বের করে দিয়ে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল অর্জুন।

মেজর বা স্টেফির এই বারান্দায় আসার প্রয়োজন হবে না। সরাসরি পথও নেই। অমলদার ক্ষেত্রেও তাই। একমাত্র ভানুপ্রসাদ জানবে, ওকে না জানিয়ে বাদলকে এখানে রাখার উপায় নেই। খাবার দেবে কে?

অর্জুন বারান্দায় পায়চারি করতে গিয়ে দেখল, স্টেফির ঘরের দরজা খোলা।

সে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে ভিতরের দিকে তাকাতেই ল্যাপটপটাকে দেখতে পেল। ওরকম মূল্যবান জিনিস খোলা জায়গায় ফেলে গিয়েছেন স্টেফি? অবশ্য এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে চুরি করতে কেউ আসবে না, এটাও ঠিক। অর্জুন ঘরে ঢুকে ল্যাপটপটা তুলতে গিয়ে একটু থমকাল। তারপর ওটা খুলে মিনিটতিনেক চেষ্টা করতেই মুখে হাসি ফুটল তার। না, বাদল মিথ্যে বলেনি। মিসিং পার্সন ইন নর্থবেঙ্গল, কারেন্ট মান্থ-এ বিজয়াদ গুপ্তার নাম ফুটে উঠেছে। শিলিগুড়ির বিখ্যাত কনস্ট্রাকশন কোম্পানির মালিক, তিনটে চা-বাগানের শেয়ারহোল্ডার মি. গুপ্তাকে কেউ বা কারা ডুয়ার্সের জয়ন্তী বাংলো থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছে। যদি কেউ মি. গুপ্তার সন্ধান দিতে পারে, তা হলে তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন। এক, ডি এস পি, শিলিগুড়ি, ও সি রাজাভাতখাওয়া। দুই, করমচাঁদ . গুপ্তা, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি। টেলিফোন ২৫৯২০০৩।

ল্যাপটপ বন্ধ করে ওটাকে আলমারির মধ্যে রেখে শিলিগুড়ির নাম্বার ডায়াল করল অর্জুন। একটু পরেই রিং শুরু হল। তারপর হিন্দিভাষী একজন সাড়া দিলেন, হেল্লো।

করমচাঁদজি আছেন?

বলতেছি।

নমস্কার। আমি অর্জুন। সত্যসন্ধান করা আমার নেশা এবং পেশা।

কী সন্ধান?

আপনি ঠিক বুঝবেন না। আপনার আত্মীয় বিজয়াদ গুপ্তার খবর পেয়েছেন?

না। আপনি, আপনি জানেন?

আমি খবর পেয়েছি তিনি ভুটান সরকারের পুলিশের হেফাজতে আছেন। আপনারা দার্জিলিং-এর এস পি-কে বলুন ভুটান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

দাদা বেঁচে আছে তো?

কিডন্যাপারদের হাত থেকে পালিয়েছেন বলে মারা যাওয়ার আশঙ্কা কম। ঠিক আছে। রাখছি।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার ঠিকানা দিন!

অর্জুন উত্তর না দিয়ে লাইন কেটে দিল। ল্যান্ডলাইনে ফোনটা করেছিল বলে করমচাঁদ তার মোবাইল নাম্বার পাবে না।

দরজা ভেজিয়ে বাইরে আসতেই ওঁদের দেখতে পেল অর্জুন। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত অবস্থায় অমল সোম আর মেজর গেটের দিকে এগিয়ে আসছেন। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, প্রচণ্ড ধকল গিয়েছে ওঁদের উপরে। সে দ্রুত নেমে দূরত্বটা পেরিয়ে গেট খুলে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে আপনাদের? স্টেফি কোথায়?

অমল সোম বললেন, খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। হাতির দলের সামনে পড়ায় আমরা দৌড়ে পালিয়েছিলাম। স্টেফিও দৌড়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ও আমাদের দলছাড়া হয়ে যায়। এতক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করেও ওর হদিশ পেলাম না। ভেবেছিলাম, স্টেফি বাংলোয় ফিরে এসেছে। নাঃ, আবার খুঁজতে বেরোতে হবে।

মেজর হাঁপাচ্ছিলেন, ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। নইলে কোন মুখে ওদেশে ফিরব?

কিন্তু এত বড় জঙ্গলে খুঁজে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে বলুন। ওরা চিরুনিতল্লাশি করে ওঁকে বের করতে পারবে, অর্জুন বলল।

অমল সোম বললেন, এদিকে সন্ধে হতে তো দেরি নেই। দেখি, ডি এফ ও-কে ফোন করি। সেলফোনের নাম্বার টিপলেন অমল সোম। কানে চেপে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে বললেন, যাচ্চলে। সব সাদা।

অর্জুন বলল, নাম্বারটা বলুন। আমারটা দিয়ে চেষ্টা করি।

অর্জুনের ফোনে ডি এফ ও-কে পাওয়া গেল। অমল সোম তাকে স্টেফির সমস্যা জানালেন। ডি এফ ও বললেন, উনি দেখছেন কী করা যেতে পারে।

এই সময় ভানুপ্রসাদের গাড়ি ফিরে এল। অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোথায় গিয়েছিল?

খাবারদাবার কিনতে। অর্জুন বলল।

মেজর বললেন, স্টেফি না ফেরা পর্যন্ত আমরা কেউ কিছু খাব না।

ভানুপ্রসাদ স্টেফির ব্যাপারটা শুনে বলল, চলুন সাব। আমরা খুঁজে দেখি। মেমসাহেব রাস্তা হারিয়ে নিশ্চয়ই কাছাকাছি আছেন।

লছমন বলল, গিয়ে কোনও লাভ হবে না।

ভানুপ্রসাদ তাকাল ওর দিকে, কেন?

এই জঙ্গলে হারিয়ে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না। লছমন বলল, জঙ্গল গিলে ফেলে তাকে। আর এক ঘণ্টার মধ্যে রাত নেমে যাবে। আপনারাও ফেরার পথ খুঁজে পাবেন না।

মেজর খেপে গেলেন, মার্ডারার? মোস্ট সাসপিসিয়াস ক্যারেক্টার!

অর্থ বুঝল কি না সেই জানে, লছমন তার ঘরের দিকে চলে গেল।

অর্জুন ভানুপ্রসাদকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। চিৎকার করে স্টেফিকে ডাকছিল সে। ভানুপ্রসাদ চেঁচাচ্ছিল, মেমসাব! মেমসাব! কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। ক্রমশ জঙ্গলের ভিতরে ছায়া ঘন হয়ে আসছিল। ভানুপ্রসাদ বলল, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। রাত্রে তো খুঁজে পাব না। যদি মেমসাব না আসেন, কাল ভোরে চলে আসব জঙ্গলে।

কথাটা যুক্তিপূর্ণ।

.

বিরিয়ানি রান্না স্থগিত হল। ক্রমশ অন্ধকারে চারপাশ ডুবে যেতে ভানুপ্রসাদ চা এনে দিল তাঁদের। তাতে চুমুক দিয়ে অর্জুনের খেয়াল হল, বাদলের কথা এখনও বলা হয়নি ভানুপ্রসাদকে। এই সময় বারান্দায় লছমনকে দেখা গেল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

আপনারা আমার উপর রাগ করছেন স্যার, কিন্তু আমি আপনাদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম। আমার কথা শুনে যদি চলে যেতেন, তা হলে মেমসাহেব বেঁচে যেতেন। দুটো হাত বুকের উপর জড়ো করে বলল লছমন।

তোমার ধারণা মেমসাহেব মারা গিয়েছেন?

জিভ বের করল লোকটি, ছি ছি। তবে মন তো সবসময় কু ডাকে।

কী বলতে এসেছ?

শুনলাম, বিরিয়ানি হবে না আজ। ভালই করেছেন। আমি বলি কী, তাড়াতাড়ি যাই হোক কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ুন। ভোরের আগে কেউ দরজা খুলবেন না।

কেন? অর্জুনের কপালে ভাঁজ পড়ল।

মানুষের রক্ত পান করলে তেনারা ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। তখন বাইরে আসাই ভাল। কোন মানুষের রক্ত কারা পান করল?

আপনি কি ভাবছেন মেমসাব বেঁচে আছেন?

এই জঙ্গলে পথ হারিয়ে সারারাত কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। চিতা না খাক, নেকড়ে শেষ করে দেবে। আর তেনাদের খপ্পরে পড়লে তো কথাই নেই।

তখন থেকে তেনারা তেনারা করছ, তেনাদের নাম কী?

রাত নামলে ওই নাম উচ্চারণ করতে নেই। আচ্ছা, ভানুপ্রসাদকে বলবেন আমার জন্যে রাতের খাবারের দরকার নেই। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে চিড়ে-মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ব। লছমন কপালে আঙুল ছুঁইয়ে নেমে গেল বারান্দা থেকে।

অর্জুন বসার ঘরে ঢুকল। অমল সোম তাকালেন। মেজর দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন।

অমল সোম বললেন, মেয়েটা যদি গাছে উঠতে পারে তা হলে বিপদে পড়বে না।

বিপদে পড়বে না! খিঁচিয়ে উঠলেন মেজর, কেন? গাছে সাপ নেই? পাইথন একটা মোষ গিলে ফেলে, মানুষ তো ছার!

কিন্তু এই রাতে ডি এফ ও-কে জানানো ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি?

আমরা এখন থানায় গিয়ে ডায়েরি করতে পারি। পুলিশ যদি এখনই স্টেফির খোঁজে জঙ্গলে সার্চ করে তা হলে ওকে পেয়ে যাবই। মেজর বললেন।

এই সময় ভানুপ্রসাদ গাড়ি চালিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে থানায়? জিজ্ঞেস করে দেখুন। অমল সোম কাঁধ নাচাতেই অর্জুন তার সেলফোন বের করে নাম্বার টিপল। রিং হল। অর্জুন সাড়া পেতেই কথা বলল, নমস্কার। আমি অর্জুন বলছি। চিনতে পারছেন? ধন্যবাদ। এখন আমরা একটা ফরেস্টের লাগোয়া বাংলোয় আছি। বাংলোটার মালিক শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী সুধাংশুশেখর দত্ত। রাজাভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তী যাওয়ার রাস্তায় এসে বাঁ দিক ধরে এখানে পৌঁছোনো যায়। আমরা চারজন ছিলাম। একজন মহিলা, তিনি আমেরিকান, গবেষণার কাজে এসেছেন। আজ জঙ্গলে গিয়ে মহিলা হারিয়ে যান। না না, হাতির ভয়ে পালিয়ে আসছিলেন সবাই, মহিলা বোধহয় রাস্তা ভুল করেছেন! ওঁর নাম স্টেফি। যদি লোকাল থানাকে ইনফর্ম করেন, ওঁরা ওঁকে খুঁজে বের করতে পারে। একটানা কথাগুলো বলে গেল অর্জুন। তারপর ওপাশের কথা শুনল। ফোনের লাইন কেটে দিয়ে অর্জুন বলল, জলপাইগুড়ির এস পি সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম। উনি নোট করে নিয়েছেন। এটাই ডায়েরি বলে ট্রিট করা হবে। উনি এখনই লোকাল থানাকে নির্দেশ দিচ্ছেন কাজ শুরু করতে।

সোফায় বসে অর্জুন বলল, আমার বিশ্বাস, কালই স্টেফিকে পেয়ে যাব।

কী করে বিশ্বাস হচ্ছে? মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

এই জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী আছে বটে কিন্তু কোনও ম্যানইটার নেই। থাকলে সেই খবর আমরা জলপাইগুড়িতে বসে জানতে পারতাম। যাকগে, আপনারা যখন জঙ্গলে গিয়েছিলেন তখন আমি একটি লোককে সাহায্য করেছি। অর্জুন বলল।

অমল সোম তাকালেন, কিছু বললেন না।

অর্জুন বলল, পিছনে যে নদী রয়েছে তার পরেই পাহাড় শুরু। ওটা ভুটানের। ওই পাহাড়ে ভুটান সরকারের পুলিশ খুব সতর্ক নয়। তার ফলে ভারতীয় উগ্রপন্থীরা ওখানে আশ্রয় নিয়ে এখানে হামলা চালায়। ওরা বড়লোক ভারতীয়দের কিডন্যাপ করে ভুটানে নিয়ে গিয়ে মোটা টাকা দাবি করে। টাকা পেলে ছেড়ে দেয়। যাকে আমি সাহায্য করেছি সে পাকেচক্রে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইদানীং মানাতে পারছিল না। কয়েকদিন আগে ওরা শিলিগুড়ির এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীকে কিডন্যাপ করে জয়ন্তী থেকে। মোটা টাকা মুক্তিপণ চায়। কিন্তু ওদের কপাল খারাপ হওয়ায় একদিন ভুটানি পুলিশ। পথভুল করে ক্যাম্পের কাছে চলে আসায় ওরা পালাতে বাধ্য হয়। এই লোকটিকে নির্দেশ দেয় মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীকে মেরে ফেলতে। সেই নির্দেশ পালন করেনি লোকটা। ব্যবসায়ীর প্রাণ সে বাঁচিয়ে দেয়। সম্ভবত ভুটানি পুলিশের হেফাজতে আছে ব্যবসায়ী। কিন্তু লোকটি ভয় পাচ্ছে উগ্রপন্থীরা এবার তাকে মেরে ফেলবে। ফলে সে জঙ্গলে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়িয়ে এখানে চলে আসে। লছমনের সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল। কিন্তু উগ্রপন্থীদের ভয়ে লছমন ওকে বাংলোয় আশ্রয় দেয়নি। নদীর ওপারের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে বলেছে। রোজ চাল-আলু দিয়ে আসে লোকটাকে। ওদিকে সাপের উপদ্রব বেশি থাকায় উগ্রপন্থীরা আসতে ভয় পায়। তারা লছমনকে বলেছিল জঙ্গলে নজর রাখতে। মাঝে মাঝে রাত গম্ভীর হলে ওরা এখানে আসে। লছমন তাই লোকটাকে অন্য কোথাও চলে যেতে চাপ দিচ্ছিল। আমাদের বলেছিল বাংলোয় না থাকতে। কারণ, উগ্রপন্থীরা চায় বাংলোটা ফাঁকা থাক। আমি লছমনকে ভানুপ্রসাদের সঙ্গে বাজারে পাঠিয়ে লোকটাকে এই বাংলোয় তুলে এনেছি। পিছনে বারান্দায় আছে লোকটা। ও যে এখানে আছে তা লছমন জানে না।

পিছনে শব্দ হতেই অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে ভানুপ্রসাদকে দেখতে পেল। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অর্জুনের কথাগুলো শুনছিল সে।

গুড জব। লোকটার নাম কী? অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

বাদল।

লোকটাকে এখানে আসতে বলল। মেজর বললেন।

আজই না। ও ঘাবড়ে যেতে পারে। অর্জুন উঠল, ভানুপ্রসাদ, তুমি তো সব শুনেছ। সাবধান, লছমন যেন জানতে না পারে।

কেউ জানবে না সাহেব।

চলো। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

নিঃশব্দে দরজা খুলতেই দেখা গেল বারান্দার ভিতরের কোণে জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে লোকটা। অর্জুন নিচু গলায় 'বাদল' বলে ডাকতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। হাতে সেই কাটারি। অর্জুন বলল, শোনো, এর নাম ভানুপ্রসাদ। যখন যা দরকার হবে ওকে ডেকে বলবে।

মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল বাদল।

ভানুপ্রসাদ জিজ্ঞেস করল, চা খাবে?

বাদলের মুখ হাসিতে ভরে গেল। দ্রুত মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

অর্জুন ইশারায় ভানুপ্রসাদকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, বেশি ভাব করার দরকার নেই। খেয়াল রেখো, বারান্দায় যেন আলো না পড়ে।

ভুটানের পাহাড়ে উগ্রপন্থীরা ক্যাম্প করেছে এই খবর কলকাতার কাগজে ছাপা হয়েছে। ভারত সরকারের চাপে পড়ে ভুটান সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে। বর্ডার পেরিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রে গেলে ধরা পড়ার ভয় নেই বলে তারা বহালতবিয়তে রয়েছে। অমল সোমের সঙ্গে অর্জুন এই ব্যাপারে কথা বলছিল। মেজর বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

রাত বাড়ছে। ভানুপ্ৰসাদ আজ চিকেন আর ভাত বানিয়েছিল। তাই খেয়ে সবাই যে-যার ঘরে চলে গেলে অর্জুন অন্ধকার বারান্দার এক কোণে এসে দাঁড়াল।

কী ভাবছ?

অর্জুন দেখল, অমল সোম তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন।

বুঝতে পারছি না। অস্বস্তি হচ্ছে।

হুম। আমি তোমার কথা শোনার পর অন্য কিছু ভাবছি। স্টেফি যদি উগ্রপন্থীদের হাতে পড়ে, তা হলে ভয়ানক বিপদ হবে। ও আমেরিকান, জানামাত্র ওরা প্রচুর টাকা মুক্তিপণ চাইবে।

বোধহয় সেই ভয় নেই। ওরা থাকে ভুটানের পাহাড়ে। নদী পেরিয়ে এদিকে আসে বিশেষ পরিকল্পনা থাকলে। স্টেফি জঙ্গলে পথ হারিয়েছে। তার সঙ্গে ওদের দেখা হওয়া সম্ভব নয়।

লেট্স প্রে দ্যাট।

অর্জুন কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। কাল রাতের লোকদুটো গেট খুলে ঢুকছে। ভিতরে এসে বাংলোর দিকে তাকাল। বাংলোর কোনও ঘরে আলো জ্বলছে না। ওরা ধীরে ধীরে বাংলোর পিছন দিকে চলে গেল।

অর্জুন অমল সোমকে বলল, কিচেনের জানলায় চলুন।

নিঃশব্দে জানলার পাশে এসে শব্দ না করে সেটা ঈষৎ খুলতেই গলা শুনতে পেল। তুই আমাদের সঙ্গে দু'নম্বরি করছিস লছমন!

বিশ্বাস কর আমি কিছু জানি না।

আজ বিকেলে ওকে ওই নদীর ওপারে আমাদের একজন দূরবিনে দেখেছে। ওখানে কেউ থাকলে তুই জানতে পারবি না?

তা হলে আজই এসেছে।

ওখানে কোথায় লুকিয়ে থাকা যায় জানিস?

জানি।

চল, গিয়ে দেখি।

এই রাত্রে? ওখানে সাপ আছে।

তুই আগে যাবি। সাপ থাকলে তোকে কামড়াবে।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় লছমনকে দেখা গেল ওদের নিয়ে নদীর দিকে যেতে।

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, উগ্রপন্থীদের লোক?

তাই তো মনে হচ্ছে। চলুন, নীচে যাই।

কী করতে চাও?

ওই দু'জনকে আটকালে জানা যাবে ওরা আজ স্টেফিকে পেয়েছে কি না। অর্জুন বলল, তা ছাড়া বাদলের প্রাণ বাঁচাতেও ওদের আটকানো দরকার। আমি ভানুপ্রসাদকে ডাকছি। ওর সাহায্য দরকার হবে।

অর্জুন ভালুপ্রসাদকে ডাকতে গেল। অমল সোম দেখতে পেলেন, একটা টর্চের আলো জ্বেলে কেবল তিনটে ছায়ামূর্তি নদী পার হচ্ছে। এখন নদীর জল সম্ভবত বেড়ে গিয়েছে। কারণ, ওদের পার হতে সময় লাগল। ওপারে পৌঁছে তিনজনই চোখের আড়ালে চলে গেল। অমল সোম বুঝলেন, ওরা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেল।

ইতিমধ্যে ভানুপ্ৰসাদকে নিয়ে চলে এসেছে অর্জুন। অমল সোম বললেন, তুমি নিশ্চয়ই ওদের আটকাতে চাও। কীভাবে? ওরা সশস্ত্র কি না তা তুমি জানো না।

অন্ধকারের সুযোগটা নেব। ওরা দু'জন। আমি আর ভালুপ্রসাদ যদি আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ি, তা হলে লোক দুটোকে কবজা করতে পারব। ওদের অস্ত্র থাকলেও বের করতে পারবে না।

নদীর ধারে চলে এসে গাছের আড়ালে দাঁড়াল ওরা। হঠাৎ ওপার থেকে চেঁচামেচি ভেসে এল। একজন খুব উত্তেজিত হয়ে গালাগালি দিচ্ছে। তারপরেই দেখা গেল একজনকে ঠেলতে ঠেলতে বাকি দু'জন নদীতে নামল। সেই দু'জনের একজন টর্চ ধরেছে বলে মুখ পরিষ্কার হচ্ছিল না। অমল সোম বললেন, লছমনকে গালাগাল দিচ্ছে কেন?

ওরা নদী পার হচ্ছিল। অর্জুন বলল, ওরা লছমনের দেখানো জায়গায় বাদলকে খুঁজে পায়নি। নিশ্চয়ই ওকে এখন অবিশ্বাস করছে।

ভানুপ্রসাদকে বোধহয় আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিল অর্জুন। সে দ্রুত ওপাশের আড়ালে চলে এল। ওরা নদীর এপারে পৌঁছে গিয়েছে এর মধ্যে। একজন বলল, তুই বেইমানি করেছিস লছমন। বেইমানদের কী সাজা দেওয়া হয় তা তুই জানিস! শেষবার জিজ্ঞেস করছি, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস বাদলকে?

আমি জানি না, বিশ্বাস কর। আজ দুপুরেও ওকে ওখানে দেখেছিলাম। পাথরের উনুনে রান্না করেছিল। ওগুলো তুলে নিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

জানিস না। জোরে ধাক্কা মারতেই উপুড় হয়ে পড়ে গেল লছমন।

দ্বিতীয় লোকটি বলল, বাদলকে এই বাংলোর ভিতরে লুকিয়ে রাখেনি তো?

আমার তাই সন্দেহ হচ্ছে। আগে ব্যাটাকে বেঁধে ফ্যাল, তারপর খুঁজে দেখব। ওর ঘরে গিয়ে দ্যাখ, নিশ্চয়ই দড়ি পাবি।

প্রথম লোকটার কথা শুনে দ্বিতীয় লোকটা চোখের আড়ালে চলে যেতেই ভানুপ্রসাদ বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অর্জুন চটপট মুখ চেপে ধরল লোকটার। ওর কোমর থেকে দিশি রিভলভার বের করে শাসাল, আওয়াজ করলেই মেরে ফেলব।

লোকটাকে উপুড় করে ওরই জামা দিয়ে এমনভাবে বেঁধে ফেলল অর্জুন যে, নড়তে-চড়তে পারছিল না আর। দ্বিতীয় লোকটা দড়ি নিয়ে ফিরে এসেই আক্রান্ত হল। তাকেও বেঁধে ফেলতে অসুবিধে হল না। লছমন মাটিতে বসে ফ্যালফ্যাল করে ব্যাপারটা দেখছিল। অর্জুন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এদের তুমি চেনো? এরা কারা?

লছমন চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ল, না।

সঙ্গে সঙ্গে তার চুলের মুঠো ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে অর্জুন বলল, ওরা তোমাকে আজ শেষ করে দেবে জানা সত্ত্বেও তুমি সত্যি কথা বলবে না?

লছমন জবাব না দিয়ে অন্যদিকে তাকাল। অর্জুন হাসল, বেশ, তা হলে ওদের বলে দিচ্ছি, বাদলকে চাল-আলু তুমি সাপ্লাই দিতে। তোমরা দুজন একসময় একসঙ্গে জেল খেটেছিলে।

আপনি, আপনি জানলেন কী করে? লছমন বিভ্রান্ত।

জানি। এরা ওই দলের লোক, যারা ব্যবসায়ীদের কিডন্যাপ করে। অর্জুন বলল, হ্যাঁ কি না?

মুখে শব্দ না করে মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলল লছমন।

লোক দুটোকে বসিয়ে দেওয়া হল। দু’জনের দুটো হাত পিঠের দিকে টেনে বাঁধা হয়েছে। দুটো পা শক্ত করে বেঁধেছে ভানুপ্রসাদ। এবার অমল সোম এগিয়ে এলেন, তোমরা তো সাধারণ সদস্য। কেউ নেতা নও। আমরা যা জিজ্ঞেস করব তার উত্তর দিলে তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি।

লোক দুটো কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, বিজয়চাঁদ কোথায় আছেন?

দ্বিতীয়জন মাথা নাড়ল, আমি জানি না।

তুই?

প্রথমজন বলল, ক্যাম্পে ছিল। আমরা যখন ক্যাম্প ছেড়েছিলাম তখন লোকটা বাদলের হেফাজতে ছিল। বাদল জানে।

বাদলকে খুঁজছিস কেন? মেরে ফেলবি ওকে?

ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

কীভাবে?

বিজয়চাঁদকে ছেড়ে দিয়েছে। নিশ্চয়ই বিজয়চাঁদ ওকে টাকার লোভ দেখিয়েছে।

তোদের দলের বাকিরা এখন কোথায়?

ওপারে। এখান থেকে দেড়মাইল দূরে। আমরা আজই এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতাম, কিন্তু...! বলেই থেমে গেল দ্বিতীয়জন।

কিন্তু কী? অর্জুন ধমকাল।

প্রথমজন বলল, অনেক বলে ফেলেছিস তুই!

না, মানে...! দ্বিতীয় লোকটির মুখে ভয় ফুটল।

অমল সোম তার হাত তুলে নিয়ে কনুই-এর নীচে চাপ দিতেই লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। অমল সোম হাত সরিয়ে বললেন, মুখ না খুললে তোমার হাত চিরজীবনের জন্যে অসাড় করে দেব।

আজ সন্ধের সময় একটা নতুন মুরগি পেয়ে গিয়েছি আমরা। সাদা মেমসাব। শেষ রাত্রে নেতা এসে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ঠিক হবে। আমরা এখানে থাকব, না সরে যাব। যা জানি বলে দিলাম। আমি আর পারছি না। গলায় কান্না মিশল লোকটার।

কেন?

এ একটা জীবন? চোরের মতো পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। টাকা যা আসছে তা আমরা কেউ চোখে দেখতে পাচ্ছি না। ওসব নাকি অস্ত্র কিনতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর নির্দেশে ওদের মুখে কাপড় গুঁজে হাত পা বাঁধা অবস্থায় লছমনের ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেওয়া হল।

ভানুপ্রসাদ লছমনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এর কী হবে?

সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ল লছমন, আমি ওদের ভয়ে সবসময়। মিথ্যে কথা বলেছি। এখানে থাকলে ওরা আপনাদের বিপদে ফেলতে পারে মনে করে চলে যেতে বলেছি, ভূতের ভয় দেখিয়েছি। আমায় মাপ করুন।

অমল সোম বললেন, তুমি বাংলোর বারান্দায় গিয়ে বসো। ওখান থেকে নামবে না।

অর্জুন লছমনকে নিয়ে বাংলোর বারান্দায় চলে এল। লছমন কাতর গলায় বলল, বাবু, আমাকে ছেড়ে দিন। এখনই যদি এখান থেকে না পালিয়ে যাই

তা হলে মারা পড়ব।

কীভাবে?

ওরা ফিরে না গেলে দলের লোকেরা খুঁজতে আসবেই।

পুলিশকে ওদের কথা আগে জানাওনি কেন?

মাথা নাড়ল লছমন, পুলিশকে জানালে ওরা ঠিক খবর পেয়ে যেত। হাতজোড় করল সে, আপনারাও ভোর হলে এখান থেকে চলে যান বাবু।

তুমি ভিতরে এসো।

হারিকেনের আলোয় বাদলকে দেখে ভূত দেখার মতো অবস্থা লছমনের। কোনওরকমে বলল, তু-তুই! তুই এখানে?

আমি ওকে জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছি। না আনলে ওর কী অবস্থা হত তুমি জানো। যাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে তারা নিশ্চয়ই ভালবাসার কথা বলত না।

তুই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলি? প্রায় চিৎকার করে উঠল বাদল।

আঃ। চেঁচিয়ো না।

না নিয়ে গেলে ওরা আমাকে মেরে ফেলত! লছমন মিনমিনে গলায় বলল।

তুই আমাকে খতম করতে ওদের নিয়ে গিয়েছিলি?

যা হওয়ার তা হয়েছে, এখন বাঁচতে চাস তো এখান থেকে পালিয়ে চল।

আমি তোর সঙ্গে কোথাও যাব না।

অর্জুন বলল, মান-অভিমান করে লাভ নেই।

অমল সোম ঘরে ঢুকলেন, নাঃ। ও দুটোকে উপরে নিয়ে আসাই ভাল। লছমন যেমন নীচে থাকে তাই থাক। ওর সঙ্গে ভানুপ্রসাদ থাকবে, যাতে পালাতে না পারে। যদি ওই দুটোর সন্ধানে কেউ ঢোকে তা হলে লছমন বলবে সে কিছুই জানে না, কোনও লোক আজ রাত্রে বাংলোয় ঢোকেনি।

ভোরের আগেই আসতে পারে। অর্জুন বলল, কাল তিনজন এসেছিল। আজ এই দু’জন ফিরে না গেলে তৃতীয় ব্যক্তি এদের সন্ধানে আসতে পারে।

ভানুপ্ৰসাদ আর লছমন একে-একে ওই দু'জনকে উপরে নিয়ে এসে পিছনের বারান্দায় শুইয়ে রাখল। অমল সোম বাঁধনগুলো আরও শক্ত করে দিলেন। লছমন আর ভানুপ্রসাদ নীচে নেমে গেলে অমল সোম বললেন, আর রাত জেগে লাভ নেই। শুয়ে পড়া যাক!

অর্জুন বলল, কিন্তু স্টেফিকে উদ্ধার কীভাবে করবেন?

যেভাবেই করো, আজ রাত্রে নিশ্চয়ই তা করা সম্ভব নয়। কাল সকালে ভাবা যাবে। আর এ ব্যাপারে বাদল বোধহয় আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

বাদল? কীভাবে?

কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক অর্জুন।

অমল সোমের কথা শেষ হওয়ামাত্রই একটা হালকা গর্জন কানে এল। বাদল দৌড়ে কাছে এসে বলল, বোধহয় বাঘ!

নিজের ঘরে যেতে যেতে অমল সোম বললেন, অর্জুন, মেজরকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দাও। চিত হলেই ওঁর নাক থেকে বাঘের আওয়াজ বের হয়!

না। ওই রাত্রে কেউ আর এই বাংলোয় ঢোকেনি। যতই বিছানায় শুয়ে থাক, ঘুম ভেঙে ছিল বারবার। যখন ভোর হল, জঙ্গলে পাখিরা তুমুল চেঁচামেচি শুরু করল, তখন অর্জুন বারান্দায় বেরিয়ে এল। লছমনের ঘরের দরজা ভেজানো। একটা অস্বস্তি নিয়ে দরজা ঠেলতেই ভানুপ্রসাদকে দেখতে পেল। পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। লছমন নেই। দ্রুত নদীর ধারে এসে চারদিকে তাকাল। না, কোথাও তার চিহ্ন নেই। ফিরে গিয়ে ভানুপ্রসাদকে কয়েকবার ডাকতেই সে চোখ খুলল। অর্জুনকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, লছমন কোথায়?

ও তো ওপাশে শুয়ে ছিল।

কখন শেষবার দেখেছ।

রাত্রে।

চারপাশ খুঁজে দ্যাখো তো।

ভালুপ্রসাদ খুঁজতে বের হল। বাংলোর ভিতরে লছমন নেই। গাড়ির কাছে গিয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার। ফিরে এসে বলল, সাহেব, কাল গাড়ির চাকা খোলার চেষ্টা করেছিল কেউ!

খুলতে পেরেছিল?

না।

একটু আলগা করতে পেরেছিল।

লোকটা চেয়েছিল গাড়িটাকে অকেজো করে আমাদের বিপদে ফেলতে।

কী হয়েছে? বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন অমল সোম।

ব্যাপারটা জানাল অর্জুন।

এরকম কিছু ঘটতে পারে তা আমাদের ভাবা উচিত ছিল। লছমন চেয়েছিল যাতে গাড়ি নিয়ে আমরা ওকে খুঁজতে বেরোতে না পারি। ও নিশ্চয়ই গভীর রাত্রে জঙ্গলের পথ ধরবে না। গিয়েছে আলো ফুটতে। তোমরা খানিকটা যাও গাড়ি নিয়ে। যদি বেশিদূর যেতে না পারে ও, দ্যাখো। অমল সোম ভিতরে চলে গেলেন।

চাকা টাইট করে ভানুপ্ৰসাদ অর্জুনকে নিয়ে বের হল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওরা গভীর জঙ্গলে মোড়া কাঁচা রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। এখনও রোদ নরম, তাই জঙ্গলের ভিতরে ঘন ছায়া নেতিয়ে রয়েছে। কিছু দূর যাওয়ার পর ব্রেক চেপে গাড়ি থামাল ভানুপ্রসাদ। পাশের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা পায়েচলা পথ চলে গিয়েছে। সেটা দেখিয়ে ভানুপ্রসাদ বলল, কাল লছমন রাজাভাতখাওয়ায় যাওয়ার সময় বলেছিল, ওই পথ দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি রাজাভাতখাওয়ায় যাওয়া যায়।

অর্জুন সামনের দিকে তাকাল। রাস্তা এখানে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত সোজা। লছমনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি থেকে নামল অর্জুন, চলো, খানিকটা হেঁটে দেখে আসি।

গাড়িটাকে রাস্তার একপাশে রেখে ভানুপ্রসাদ সঙ্গী হল। সরু পথ, দু'পাশের গাছগুলোর ডাল-পাতা তার অনেকটাই দখল করে রেখেছে। সেগুলো সরিয়ে হাঁটতে অসুবিধে হলেও, ওরা চেষ্টা করছিল দ্রুত চলতে। মিনিটদশেক হাঁটার পর জঙ্গল যখন আরও বেশি গভীর, তখন পথ বাঁক নিল। সেখানে পৌঁছোতেই চিৎকার করে উঠল ভানুপ্রসাদ, সাব!

ওকে লক্ষ করে মুখ ফেরাতে দৃশ্যটা দেখতে পেল অর্জুন। মানুষটা মাটিতে পড়ে, আছে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে। একটু কাছে যেতে লছমনকে চিনতে অসুবিধে হল না। ওর বুক-পেট ফেটে চেপটে গিয়েছে মাটিতে। দুটো পা-ই মুচড়ে ছোট হয়ে গিয়েছে। রক্তে মাটি লাল হয়ে আছে এখনও। কোনও মানুষের পক্ষে এভাবে হত্যা করা সম্ভব নয়।

ভানুপ্রসাদ ফিসফিসিয়ে বলল, হাতি, হাতি ওকে মেরেছে। ওই দেখুন!

কিছুটা দূরে পড়ে থাকা হাতির বিষ্ঠা দেখাল ভানুপ্রসাদ।

সেলফোন বের করে অমল সোমকে ফোন করল অর্জুন, জঙ্গলের ভিতরে লছমনের ডেডবডি পড়ে আছে। মনে হচ্ছে হাতির সামনে পড়েছিল। একেবারে স্ম্যাশড। ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো দরকার। আপনি যদি বলেন আমরা এখান থেকে থানায় গিয়ে জানিয়ে আসতে পারি।

তার দরকার নেই। আমি ফোনে এস পি-কে বলছি। জায়গাটা ঠিক কোথায়?

আমি কয়েক মিনিট পরে গাড়ির রাস্তায় ফিরে গিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি।

মনখারাপ হয়ে গেল অর্জুনের। এখানে আসার পরে লোকটার সঙ্গে তার ঠকাঠকি লাগছিল বটে, কিন্তু এভাবে মরে যাবে কল্পনা করেনি। লোকটা ক্রিমিনাল নয়, স্রেফ উগ্রপন্থীদের ভয়ে ওরকম আচরণ করছিল।

হাঁটতে হাঁটতে ভানুপ্রসাদ বলল, ও যদি গাড়ির রাস্তায় যেত তা হলে এভাবে মরতে হত না। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে শর্টকাট পথ ধরে মারা পড়ল বেচারা!

বড় রাস্তায় পৌঁছে জায়গাটার বর্ণনা অমল সোমকে সেলফোনে জানিয়ে দিল অর্জুন।

৪. এস পি-কে ফোন

এস পি-কে ফোনে পেতে একটু দেরি হল। পাওয়ার পর অমল সোম জানালেন ঘটনা দুটোর কথা। যে বাংলোয় তাঁরা উঠেছেন তার দরোয়ান আজ ভোরে জঙ্গলে হাতির পায়ে চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। তার মৃতদেহ এখনও জঙ্গলে পড়ে আছে। কীভাবে সেখানে পৌঁছাতে হবে তাও জানিয়ে দিলেন তিনি।

এস পি সব নোট করে নেওয়ার পর অমল সোম বললেন, আমি গতকাল ডি এফ ও সাহেবকে জানিয়েছিলাম, আমাদের সঙ্গে আসা একজন। আমেরিকান মহিলা জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছেন। আমি জানি না তিনি আপনাকে জানিয়েছেন কি না! মহিলা এখনও ফিরে আসেননি। একটু আগে জানলাম, তাঁকে উগ্রপন্থীরা ধরে নিয়ে গিয়েছে।

কী করে জানলেন?

আমরা দু'জন উগ্রপন্থী, যারা এই বাংলোয় এসেছিল, তাদের ধরে রেখেছি। তাদের মুখ থেকেই খবরটা বেরিয়েছে।

খুব ভাল করেছেন মি. সোম। আমাদের যে পার্টি ডেডবডি তুলে আনতে যাচ্ছে তাদের হাতে ওদের তুলে দিন। খুব দুঃখের সঙ্গে আপনাকে একটা খবর দিচ্ছি। আজ সকালে উগ্রপন্থীরা লোকাল থানায় ফোন করে বলেছে যে, তারা স্টেফি নামের একজন মহিলাকে কিডন্যাপ করেছে। মহিলা আমেরিকান। চারদিনের মধ্যে দু'কোটি টাকা না পেলে তারা ওঁকে মেরে ফেলবে। মহিলার আমেরিকার ফোন নাম্বার ওরা দিয়েছে। আমরা মার্কিন কনসুলেটের সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছি। বুঝতে পারছেন, ওরা টাকার গন্ধ পেয়ে গিয়েছে। এর আগে যাঁদের কিডন্যাপ করেছিল তাদের উদ্ধার আমরা করতে পারিনি। কারণ, ওরা ক্যাম্প করত ভুটানে। ওখানে আমাদের পুলিশের ঢোকার অধিকার নেই। তবু, ঘটনা যেমন ঘটবে আপনাকে তা জানিয়ে দেব। এস পি বললেন।

দ্বিতীয় ফোনটা করলেন অমল সোম সুধাংশুশেখর দত্তকে। তাঁকে শিলিগুড়ির বাড়িতেই পাওয়া গেল। খবরটা শুনে চেঁচিয়ে উঠলেন, সে কী? ভোরবেলায় লছমন জঙ্গলে কেন গিয়েছিল? ও তো জানে ভোরের মুখে জঙ্গলের হাতি বাংলোর দিকে চলে আসে। আঃ। আমি একটু পরেই রওনা হচ্ছি।

অর্জুন এবং ভানুপ্রসাদ ফিরে এল। ততক্ষণে মেজর উঠে পড়েছেন। তাঁকে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে ঘটনাগুলো বলেছেন অমল সোম।

মেজর বললেন, যাচ্চলে! লোকটাকে আমি পছন্দ করছিলাম না বটে, কিন্তু ও পালাল কেন? সবাইকে বিপদে ফেলে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল বলে শাস্তিটা পেল। কিন্তু স্টেফির কী হবে? টাকা না পেলে ওকে কি খুন করবে ওরা?

সেটাই চালু নিয়ম!

নিয়ম? মেয়েটা আমার ভরসায় এ দেশে এসেছে। মেরে ফেলবে বললেই হল? মানলাম, এক দেশের পুলিশ অন্য দেশে যেতে পারে না। চলুন, আমরা ভুটান পুলিশকে বলি ওকে রেসকু করতে। মেজর উত্তেজিত।

তাদের কোথায় পাবেন?

ওই পাহাড়ে যখন ভুটানিরা থাকে তখন নিশ্চয়ই থানা-পুলিশও থাকবে।

কিন্তু এখান থেকে পাহাড় টপকে তাদের ডেরা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া সিদ্ধান্ত নেবে ভুটানের রাজধানীর কর্তারা। এখান থেকে থিম্পু যাওয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। রাজাভাতখাওয়া থেকে হাসিমারা হয়ে ফুন্টশলিং যেতে ঘন্টা আড়াই লাগবে। ফুন্টশলিং থেকে গাড়িতে থিম্পু অন্তত সাত-আট ঘণ্টা। এখন রওনা হলে মাঝরাত হয়ে যাবে পৌঁছোতে। অমল সোম বললেন।

তা হলেও তো তিনদিন হাতে থাকবে।

আমাদের কথায় ওরা কান দিতে না-ও পারে। একমাত্র আমেরিকান কনসুলেট চাইলে ওঁরা ভুটানের স্বরাষ্ট্র দফতরকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করতে পারেন।

অর্জুন ঘরের ভিতরে চলে এল। মাঝখানের যে ঘরে ভানুপ্রসাদ প্রথম রাত্রে ঘুমিয়েছিল, সেখানে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে ছিল বাদল।

অর্জুন তার পাশে বসে বলল, লছমন বলত রাত্রে জঙ্গলে ঢোকা বিপজ্জনক, কিন্তু নিজেই ওই ভুলটা করল!

বহুদিন ধরে ওকে চিনতাম। আমাকে তো ও একসময় সাহায্য করেছিল। ও যদি আমাকে চাল-আলু না জোগান দিত, তা হলে আমি না খেয়ে মরে যেতাম। ও যে আমার কাছে ওদের নিয়ে গিয়েছিল সেটা একদম বাধ্য হয়ে। ওর যে এভাবে মৃত্যু হবে তা আমি কল্পনাও করিনি বাবু। আমি যদি ওর সঙ্গে যেতাম তা হলে এরকম হত না। আমি ওকে নিয়ে বড় রাস্তা দিয়েই যেতাম। বাদল বলল।

বাদল, তুমি তো অনেকদিন ওই দলের সঙ্গে ছিলে?

হ্যাঁ বাবু।

ওরা এখন কোথায় ক্যাম্প করেছে আন্দাজ করতে পারো।

অনেক জায়গা আছে। বিজয়চাঁদ বাবুকে যেখানে রেখেছিল, সেখান থেকে সরে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে। ঠিক কোন জায়গায় তা কী করে বলব?

অর্জুন একটু ভাবল। তারপর চুপচাপ উঠে বারান্দায় চলে এল। লোক দুটো উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। দ্বিতীয় লোকটিকে সোজা করল সে। লোকটা চোখ পিটপিট করল। এই লোকটার মন দুর্বল হয়েছে। এভাবে পালিয়ে বেড়াতে ওর ভাল লাগছে না। লোকটাকে কাজে লাগানো দরকার। সে বাঁধা থাকা অবস্থাতেই লোকটাকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিল। লোকটা অবাক হল। ওর মুখে কাপড় ঠাসা। সেই অবস্থাতেই প্রায় কোলে করে ওকে নিয়ে ভিতরে এল অর্জুন। সোফায় বসিয়ে দিতেই লোকটার চোখ পড়ল বাদলের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত হল তার চোখ।

অর্জুন ওর মুখ থেকে গুঁজে রাখা কাপড় বের করতেই লোকটা ঢোক গিলল। অর্জুন বলল, তোমরা ওকে মারতে এসেছিলে?

কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারল না লোকটা। অর্জুন একগ্লাস জল ওর মুখের সামনে ধরতে ও ঢকঢক করে কিছুটা জল গিলে ফেলল। প্রথম কথা বলল সে, তুমি পালাও। তোমাকে ওরা খুঁজছে।

বাদল কোনও কথা বলল না।

ওকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করো তা হলে তোমারও কোনও ভয় নেই। অর্জুন হাসল, তোমাকে দলে ফিরে যেতে হবে না।

ওরা ঠিক আমাকে খুঁজে বের করবে।

কাল যে মেমসাহেবকে কিডন্যাপ করা হয়েছে তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে? অর্জুন খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল।

ছাঙ্গুবাড়িতে।

সেটা কোথায়?

নদী পেরিয়ে এক মাইল ভিতরে। ভুটানে।

কাল রাত্রে কোনও নেতার সেখানে আসার কথা ছিল?

নাম জানি না। সবাই বলে নাম্বার টু। তাকে খবর দেওয়া হয়েছিল।

ক'টা ক্যাম্প আছে ওখানে?

সাতটা।

তুমি আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?

না বাবু!

কেন?

আমি ওখানে কখনও যাইনি।

তা হলে তুমি কোথায় ছিলে? কোত্থেকে এসেছ?

আমরা নদীর ওপারে ছিলাম। আমাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, ওঁকে খুঁজে বের করতে। আমরা তিনজন ছিলাম। একজনকে কাল ছাঙ্গুবাড়িতে ডেকে নেওয়া হয়েছিল। যে খবরটা দিয়েছিল তার মুখেই শুনেছি, এক মেমসাহেবকে ওখানে ধরে আনা হয়েছে।

এই সময় বাইরে গাড়ির আওয়াজ হল। অর্জুন বাইরে বেরিয়ে দেখল, পুলিশের একটা জিপ এবং ভ্যান এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। ও সি এবং চারজন সেপাই নেমে এলেন দুটো গাড়ি থেকে।

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে ও সি জিজ্ঞেস করলেন, মি. সোম?

অমল সোম বললেন, আমি। বসুন।

ও সি চেয়ারে বসলেন, আমরা ডেডবডি পেয়ে গিয়েছি। লোকটার নাম বলুন!

লছমন। উপাধি জানি না। এই বাংলোর দরোয়ান ছিল।

বাংলোর মালিক ফোন করেছিলেন। উনি শিলিগুড়ি থেকে আসছেন। আপনারা কী করে খবরটা পেলেন?

খুঁজতে গিয়েছিল ওকে।

বুঝলাম। বড় রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে কীভাবে পৌঁছোলেন?

অর্জুন এগিয়ে এল, ওখানে একটা সরু হাঁটাপথ নিশ্চয়ই দেখেছেন। আমরা ভেবেছিলাম, লছমন ওখান দিয়ে শর্টকাট করতে পারে।

আপনি?

আমি অর্জুন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন ও সি। নমস্কার করে বললেন, আচ্ছা! আপনার কথা আমি খুব শুনেছি।

মেজর গম্ভীর গলায় বললেন, মি. সোম অর্জুনের গুরু।

ও হ্যাঁ। তারপরেই ও সি প্রসঙ্গ পালটালেন, এস পি সাহেব বলেছেন, দু'জন উগ্রপন্থীকে আপনারা এখানে আটকে রেখেছেন। তারা কোথায়?

অর্জুন অমল সোমের দিকে তাকাল। অমল সোম বললেন, ওরা এখানেই আছে।

আমরা ওদের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।

অমল সোম বললেন, আমি এস পি এবং ডি এফ ও-কে বলেছি, আমাদের সঙ্গে গবেষণার কাজে আসা একটি আমেরিকান মেয়েকে উগ্রপন্থীরা কিডন্যাপ করেছে। এস পি নিশ্চয়ই তার কথা আপনাকে জানিয়েছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু ওরা কাউকে কিডন্যাপ করলে ভুটানে নিয়ে যায়। সেখানে অনুমতি ছাড়া ভারতীয় পুলিশ ঢুকতে পারে না।

তার মানে আপনি বা আপনারা স্টেফিকে উদ্ধার করতে পারবেন না?

যদি ওরা ওঁকে বর্ডার পেরিয়ে এদিকে নিয়ে আসে...!

যদি না নিয়ে আসে?

বুঝতেই পারছেন, আমাদের হাত-পা বাঁধা।

তা হলে এই দু'জনকে জিজ্ঞেস করে স্টেফির উপকার করতে পারবেন না?

আমরা অন্য তথ্য পেতে পারি। ওদের যাবতীয় সাপ্লাই ভারত থেকে যায়। এর আগে ধরপাকড় হওয়ার পর ওরা পদ্ধতি বদলেছে। সেটা কী জানতে পারলে ওরা ওখানে বিপাকে পড়বে। সেক্ষেত্রে ওরা বর্ডার পেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে।

অফিসার, আপনি যা বলা উচিত তাই বলছেন, কিন্তু আমাদের হাতে আর তিনটে দিন আছে। আপনার উপর ভরসা করে অনন্তকাল অপেক্ষা করলে স্টেফিকে হয়তো কোনওদিন দেখতে পাব না। অমল সোম বললেন।

অর্জুন বলল, আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করব।

বলুন।

একজন উগ্রপন্থী, যে মুখ খুলছে না, তাকে আপনি নিয়ে যান!

দ্বিতীয়জন? ও সি জিজ্ঞেস করলেন।

দ্বিতীয়জনকে এখনও আমাদের দরকার হবে। তাকে আমরাই আপনার থানায় পৌঁছে দেব, কথা দিচ্ছি।

দরকার হবে মানে?

আপনাদের পক্ষে যখন ভুটানে গিয়ে স্টেফিকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়, তখন আমরাই চেষ্টা করে দেখি। দ্বিতীয় লোকটার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়।

এ কী বলছেন! ওরা আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে। ওদের কাছে খালি হাতে আপনারা কী করতে পারবেন?

না পারলে যা হবে, এখানে হাতগুটিয়ে বসে থাকলেও তাই হবে।

আমি এ ব্যাপারে আপনাদের সমর্থন করছি না। যা করবেন তা নিজেদের দায়িত্বে করবেন। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে?

দেখাই যাক। অর্জুন হাসল।

বারান্দা থেকে বন্দি করে রাখা লোকটিকে সেপাইরা তুলে নিয়ে এলে ও সি বিদায় নিলেন। মেজর এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। ওভাবে থাকতে তাঁর বোধহয় খুব পরিশ্রম হচ্ছিল। ও সি চলে যেতেই ফেটে পড়লেন মেজর, কিল মারার গোঁসাই! পটকোচিয়াম!

অর্জুন হেসে ফেলল, শব্দটার মানে কী?

মেজর বললেন, আহাম্মক। ব্রংকসের হিসপ্যানিজদের ভদ্র গালাগাল।

অর্জুন ভানুপ্রসাদকে বলল, বাদলকে ডেকে আনো।

বাদল এল মাথা নিচু করে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাদের ছাঙ্গুবাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে? গিয়েছ কখনও?

এক ক্যাম্পের লোককে অন্য ক্যাম্পে যেতে দেওয়া হয় না। তবে আমি অনুমান করতে পারছি জায়গাটা কোথায়?

তুমি ওই লোকটির সঙ্গে ভাব জমাও। জিজ্ঞেস করো, কত লোক ওই ছাঙ্গুবাড়িতে আছে? কীভাবে সেখানে পৌঁছে আমরা মেমসাহেবকে উদ্ধার করতে পারি? অর্জুন নিচু গলায় পরামর্শ দিল।

ঠিক আছে।

ওকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে অর্জুন অমল সোমকে বলল, চলুন, একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে?

জয়ন্তীর কাছে এই নদী গাড়িতে চেপেই পার হওয়া যায়। ওখানে জল খুব কম। দু'পাশ দিয়ে দুটো ধারা আছে। নদী পেরিয়ে কিছুটা গেলে একটা মন্দির পাওয়া যাবে। স্থানীয় লোকরা ওই মন্দিরের দেবীকে খুব জাগ্রত বলে মনে করে। গাড়ি ওই পাহাড়ে উঠতে পারে। অর্জুন বলল।

মন্দির? মেজর বিড়বিড় করলেন, আমি মন্দির ফন্দির কোথাও যাচ্ছি না।

অমল সোম বললেন, তা হলে আপনি এই ফোর্ট আগলান। আমরা ঘুরে আসছি।

.

ভানুপ্রসাদ জঙ্গলের রাস্তা ধরে জয়ন্তী-রাজাভাতখাওয়া রোডে চলে এল বেশ দ্রুতগতিতে। জয়ন্তীতে পৌঁছে খোঁজখবর নিতে একটা লোক জুটে গেল! লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দালাল-দালাল ভাব। বলল, পুজো দেবেন? কোনও চিন্তা নেই। আমি মন্দিরের বন্ধ দরজা খুলিয়ে পুজোর ব্যবস্থা করে দেব। মাই নেম ইজ ওয়াংচু!

অমল সোম বললেন, ওয়াংচু? তুমি তো বাঙালি?

নো স্যার। বাংলায় কথা বলি। বাট মাই ফাদার ওয়াজ ভুটানি।

দক্ষিণা কত?

স্যার। মুরগি আর খাসির মাংসের ডিফারেন্স নিশ্চয়ই আপনার জানা। কী আর বলব!

অর্জুন বলল, চলুক ও। কী বলেন?

অমল সোম মাথা নাড়লেন। ওয়াংচু উঠে বসল পিছনে। তারপর তারই নির্দেশমতো গাড়ি চালিয়ে নদী পার হলেন ওঁরা। এখন নদীর বুকে জল নেই কিন্তু গোটা পনেরো লরি দাঁড়িয়ে আছে। তাতে বোল্ডার বোঝাই করছে শ্রমিকরা।

অর্জুন বলল, এখানে জল নেই অথচ নীচে হাঁটুজলে ভাল স্রোত রয়েছে। কীভাবে?

নো প্রবলেম স্যার। দুটো ধারা এক হয়ে গিয়ে হাঁটুজল হয়েছে। তার মানে মাটি ভেদ করে ওঠা স্প্রিং-এর জল মিশেছে। এবার আমরা ইন্ডিয়া পার হয়ে ভুটানে পৌঁছোলাম স্যার। ওয়াংচু যোগ করল, মাই

ফাদারল্যান্ড।

তোমার মাদারল্যান্ড নয়? অমল সোম হাসলেন।

নো। মাই মাদার ওয়াজ ইন্ডিয়ান। বাঁ-দিকে ভাই। শেষটা ভানুপ্রসাদকে বলল।

অর্জুন ভুটান এবং ভারতের প্রকৃতিতে কোনও ফারাক দেখতে পাচ্ছিল না। পাহাড়ি রাস্তা ধরে গাড়ি উঠে যাচ্ছিল উপরে। মিনিট পনেরো যাওয়ার পর মন্দিরটাকে দেখা গেল। গাড়ি থামতে ওয়াংচু নেমে পড়ল আগে। অমল সোম বললেন, চলো, মন্দিরের ভিতরটা দেখে আসি।

অর্জুন বলল, আমি কিন্তু...।

তাকে থামিয়ে দিয়ে অমল সোম বললেন জানি।

ওয়াংচু তাঁদের জুতো খুলিয়ে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যেতে গিয়ে বাধা পেল। একজন ভুটানি পুরোহিত জানিয়ে দিলেন, এখন মায়ের ভোগের সময়। ভোগ শেষ হলে বিশ্রাম নেবেন। দর্শন পাওয়া যাবে বিকেল চারটে থেকে।

ওয়াংচু অনেক চেষ্টা করেও ওঁর মন ভেজাতে পারল না। এই সময় দু'টো গাড়ি উপর থেকে দ্রুত নেমে এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ও দুটো পুলিশের গাড়ি কিন্তু পুলিশ শব্দ কোথাও লেখা নেই। একজন ভারিক্কি গোছের লোক, বোঝাই যাচ্ছে বড় অফিসার, এগিয়ে যেতে গিয়ে বাধা পেলেন। তাঁদের একই কথা বললেন পুরোহিত। ভদ্রলোক ঘড়ি দেখে বললেন, ব্যাড লাক!

ওয়াংচু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ স্যার, ব্যাড লাক। এঁরাও এসেছেন ইন্ডিয়া থেকে। দেখতে পাচ্ছেন না।

অর্জুন এগিয়ে গেল। ইংরেজিতে বলল, আমি অর্জুন। একজন সত্যসন্ধানী। ইনি আমার গুরু অমল সোম।

ভদ্রলোক দু'জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, সত্যসন্ধানী? কোন ফিল্ডে?

অর্জুন হাসল, যে-কোনও ফিল্ডে, যেখানে সত্যকে মিথ্যে দিয়ে আড়াল করা হয়।

ইন্টারেস্টিং! তার মানে আপনারা ডিটেকটিভ?

অমল সোম মাথা নাড়লেন, ডিটেকটিভ শব্দটায় আপত্তি আছে। ও। আপনারা চলুন, আমার সঙ্গে চা খেয়ে যাবেন। চারটের আগে তো মন্দির খুলবে না। আমি এখানে নতুন। কিন্তু আমার টেন্টে ভাল চা আছে। অফিসার বললেন।

অর্জুনের ইচ্ছে ছিল না কিন্তু অমল সোম বললেন, এ তো আমাদের সৌভাগ্য।

ঠিক হল ভানুপ্রসাদ গাড়ি নিয়ে ওখানেই অপেক্ষা করবে।

টেন্টে পৌঁছোতে পঁচিশ মিনিট লাগল। পাহাড়ের অনেকটা উপরে চলে এসেছেন ওঁরা। এখান থেকে শুকনো জয়ন্তী নদী এবং ওপারের ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। গরম একটুও নেই। বোঝাই যায় বিকেল থেকে ভাল ঠান্ডা পড়ে।

টেন্টের বাইরে চেয়ার পেতে দেওয়া হলে অফিসার ওঁদের বসতে বলে চায়ের অর্ডার করলেন। ওঁরা জলপাইগুড়িতে থাকেন শুনে অফিসার বললেন, আমি একবার ফুন্টশলিং থেকে বাগডোগরা হয়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম সরকারি কাজে। কখনও জলপাইগুড়িতে যাইনি। আপনারা থিম্পু বা পারো গিয়েছেন?

অর্জুন মাথা নাড়ল, না। যাওয়া হয়নি।

একবার ঘুরে আসুন। এত ভাল প্রাকৃতিক দৃশ্য কম জায়গায় দেখতে পাবেন। এখনও ভিসা-পাসপোর্ট লাগে না। আইডেন্টিটি কার্ড হলেই হয়ে যায়।

চা এল। কাপে চুমুক দিয়ে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এদিকে কেন এসেছেন? বেড়াতে, না কোনও সত্যসন্ধান করতে?

বেড়াতেই এসেছিলাম। অমল সোম সম্ভবত এই প্রসঙ্গের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, আমাদের সঙ্গে একজন আমেরিকান গবেষক ছিলেন। মহিলা একটা গাছের পাতার খোঁজে এসেছিলেন, যা এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

কী করবেন ওই পাতা দিয়ে?

শরীরে সামান্য কেটে গেলে ওই পাতার রস লাগালে জুড়ে যায়। স্টেফির ধারণা, ঠিকমতো ব্যবহার করলে আরও বড় ক্ষত জুড়তে পারে।

ইন্টারেস্টিং!

মুশকিল হল, কাল সন্ধে থেকে স্টেফিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সে কী? কেন?

আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, ও জঙ্গলে পথ হারিয়েছে। পরে জানতে পারলাম, ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

কীভাবে জানলেন?

কিডন্যাপাররা ইন্ডিয়ান পুলিশকে জানিয়েছে কত টাকা তারা চায়!

আচ্ছা! অফিসার সোজা হয়ে বসলেন।

ভারতীয় পুলিশ অসহায়। কারণ, ওরা ভুটানের জমিতে ক্যাম্প করে আছে। অর্জুন বলল, বর্ডার পেরিয়ে ভারতীয় পুলিশের আসা বেআইনি কাজ হবে।

অফিসার একটু ভাবলেন, সমস্যা আমি বুঝতে পারছি। আমাদের দেশের মাটিকে এরকম অন্যায় কাজে কেউ ব্যবহার করুক তা আমরা চাই না। সমস্যা হল, এখানকার সব খবর থিম্পুতে পৌঁছোয় না। ঠিক কোন জায়গায় ক্যাম্প করা হয়েছে?

সম্ভবত ছাঙ্গুবাড়ি নামে একটা জায়গায়।

ছাঙ্গুবাড়ি? সেখানে তো লোকবসতি নেই। গভীর জঙ্গল। দেশের ভিতর থেকে ওখানে পৌঁছোবার কোনও রাস্তা নেই। বর্ডার থেকে পায়েচলা পথ থাকতে পারে।

সবক'টা ক্যাম্প ওখানেই?

বোধহয় না। স্টেফিকে ওই ক্যাম্পে কাল সন্ধের পরে দেখা গিয়েছে।

অফিসার বললেন, দেখুন, আপনাদের কথা শুনে আমি রাজধানীতে ঘটনাটা জানালে ওদের সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগবে। অথচ আমার উপর অর্ডার আছে কাল সকালেই এখান থেকে পারো যাওয়ার জন্যে। আমার এখানে যে ফোর্স আছে তাদের আমি ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারি না। আবার আপনাদের দেশের পুলিশও বর্ডার পার হতে পারবে না। লেটস টেক এ চান্স! একটু ঝুঁকে নিচু গলায় অফিসার কথা বলতে লাগলেন।

.

অফিসারের পরামর্শমতো ওঁরা ফিরে এলেন নদী পেরিয়ে। ভারত থেকে নদীর এপারে কত গাড়ি আসছে এবং তাদের ক'টা ফিরছে তার হিসেব নিশ্চয়ই উগ্রপন্থীরা জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে করছে। আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় এটা করতে বাধ্য ওরা।

বাংলোয় যখন ফিরে এলেন তখন বিকেল চারটে। গেটের সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওঁদের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে মেজরের সঙ্গে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন বাংলোর বারান্দায়। বেশ ফরসা, মধ্য ষাটের মানুষটির মাথার অনেকটাই চকচকে টাক।

অমল সোমকে নামতে দেখে তিনি উপর থেকেই হাতজোড় করলেন, আপনার ফোন পেয়ে ছুটে এলাম। আমি সুধাংশু!

চিনতে পেরেছি। অমল সোম বললেন, খুব খারাপ লাগছে। লছমন যে কেন এখান থেকে পালাতে গেল!

ও বেশ কিছুদিন ধরেই আমাকে বলছিল এখানে থাকতে চায় না। এরকম জায়গায় কোনও লোক চাকরি করতে আসতে চায় না। তাই ওকে বলেছিলাম, বদলি পেলে সরিয়ে নিয়ে যাব শিলিগুড়িতে। সমস্যাটা আমারই বেড়ে গেল।

পোস্টমর্টেম কবে হবে? অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

সদরে পাঠানো হচ্ছে ডেডবডি। হাতিই ওকে মেরেছে। আপনারা এখানে কতদিন থাকতে চান? সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন সুধাংশু।

আমরা একজনের অপেক্ষায় আছি। সে এলেই ফিরে যাব।

একটা অনুরোধ করব? যাওয়ার সময় সব দরজায় তালা দিয়ে যাবেন। চাবি আমার শিলিগুড়ির অফিসে পৌঁছে দিতে যদি অসুবিধে হয়, তা হলে লোকাল থানার ও সি-র কাছে রেখে যাবেন। আমার বাংলোয় এসেছেন অথচ আপনাদের সেবাযত্ন করতে পারছি না বলে খারাপ লাগছে। আচ্ছা, নমস্কার। সুধাংশু চলে গেলেন।

দ্বিতীয় লোকটিকে রেখে কোনও কাজ হল না। সে কিছুতেই ওদিকে যেতে রাজি হল না। তার ভয়, দেখতে পেলেই ওরা তাকে মেরে ফেলবে।

অতএব বাদলকে নিয়ে বসলেন অমল সোম। বাদল যে-কোনও কারণেই হোক, এতদিন উগ্রপন্থীদের দলে ছিল। ওর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই পুলিশ অনেক অভিযোগ করতে পারবে। ধরা পড়লে আবার জেলে যেতে হবে তাকে, অন্তত সাত-আট বছরের জন্যে। এক্ষেত্রে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র রাস্তা হল, মেমসাহেবকে উদ্ধার করতে সাহায্য করা। এরকম ভাল কাজ করলে তিনি পুলিশকে অনুরোধ করবেন ওর বিরুদ্ধে কোনও মামলা না আনতে।

বাদল মাথা নাড়ল, ওরা খুব ভয়ংকর লোক। সঙ্গে এ কে ফর্টি সেভেন আছে। খালি হাতে কী করে ওদের সঙ্গে লড়াই করবেন?

সেসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি রাতের অন্ধকারে ওদের চোখ এড়িয়ে আমাদের ছাঙ্গুবাড়ি ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। পারবে?

মাথা নাড়ল বাদল। পারবে।

অর্জুন ওর সঙ্গে বসল। জয়ন্তী থেকে আধমাইল উপরে গিয়ে নদী পেরিয়ে ভুটানে যেতে হবে। নদী পার হতে কুড়ি মিনিট লাগবে। তারপর একটা কাগজে ম্যাপ এঁকে সে বুঝিয়ে দিল ছাঙ্গুবাড়িটা কোথায়!

.

সন্ধের পরে ওঁরা বের হলেন। দ্বিতীয় লোকটার পায়ের দড়ি খুলে দেওয়া হয়েছিল। তাকে থানায় নামিয়ে দেওয়া হল। ও সি অবাক হলেন, এত তাড়াতাড়ি ওকে দিয়ে কী করালেন?

করানো গেল না বলে আপনার হেপাজতে দিয়ে গেলাম। অর্জুন বলল, একটা কথা, যে-কোনও ভারতীয় বেড়াতে বা ধর্মকর্ম করতে ভুটানে যেতে পারে। এ ব্যাপারে আপনাদের আপত্তি নেই বলে জানি। ঠিক কিনা?

কোনও আপত্তি নেই। দু'দেশের মধ্যে পাসপোর্ট-ভিসা এখনও চালু হয়নি।

জয়ন্তী ছাড়িয়ে ওরা যেখানে পৌঁছোল সেখানেই পথের শেষ। এখন চারপাশে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। অমল সোম বললেন, মিনিটদশেক গাড়িতেই বসে থাকা যাক। কেউ আলো জ্বালাবেন না। গাড়ির হেডলাইট নদীর ওপার থেকেও দেখা যাবে। যদি কেউ লক্ষ করে, তা হলে তাকে বিভ্রান্ত করা দরকার।

রাত দশটায় ওঁরা নদীর নুড়িতে পা দিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর মেজর থমকে দাঁড়ালেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, কী হল?

স্নেক! ফিসফিস করলেন মেজর।

কোথায়?

আমার জুতোর নীচে। এনি মোমেন্ট ছোবল মারবে।

অন্ধকারে মেজরের পা দেখা যাচ্ছে না। অমল সোম বললেন, আপনি লাফিয়ে সামনে চলে আসুন।

মেজর লাফ দিলেন। তার বিশাল শরীরটা পাথরের উপর আছড়ে পড়তে তিনি আর্তনাদ করেই চুপ করে গিয়ে বললেন, সরি!

উঠুন! অর্জুন বলল।

ইম্পসিবল। আমার পা ভেঙে গিয়েছে। উঃ! মেজর কাতরালেন।

অর্জুন ওঁকে টেনে তুলতেই তিনি বললেন, এজিং। বয়স হচ্ছে। আমি এখন হেঁটে যেতে পারব না। তোমাদের বোঝা বাড়াবার কোনও মানে হয় না। আমি বরং গাড়িতে ফিরে যাই। মেজর পিছন ফিরলেন।

যেতে পারবেন? পা ভেঙে গিয়েছে বলছিলেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

খঞ্জও পাহাড় ডিঙোয়। আই উইল ওয়েট ফর ইউ।

মেজর ফিরে গেলে ওঁরা নদী পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন। ঘণ্টাখানেক পরে অর্জুন দেখতে পেল, পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো পরপর তিনবার জ্বলে নিভে গেল। ওটা যে টর্চের আলো তা বুঝতে অসুবিধে হল না। অফিসারের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল, উনি টর্চের আলো জ্বেলে সংকেত পাঠাবেন। সেইদিকে এগোতে বাদল বলল, ওদিকে না, এদিক দিয়ে যেতে হবে।

কেন?

ছাঙ্গুবাড়ি ক্যাম্প এদিকে।

সরাসরি না গিয়ে আমরা একটু ঘুরে যেতে চাই।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পাহাড়ে ওঠার পর অমল সোম পকেট থেকে টর্চ বের করে পরপর তিনবার আলো জ্বালিয়ে নেভালেন। কোথাও কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

অর্জুন একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সামনে তাকিয়ে ছিল। অন্ধকার একটু একটু করে পাতলা হচ্ছে। এই সময় মানুষের গলা পাওয়া গেল। দুটো লোক কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। একজন খুব উত্তেজিত। ওরা যে ভাষায়। কথা বলছে তা বোধগম্য হল না অর্জুনের। লোক দুটো দূরে চলে গেলে বাদল এসে দাঁড়াল পাশে, ওর খবর পেয়ে গিয়েছে সাহেব। ওদের একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে থানায়। এই খবরটা ক্যাম্পে দিতে যাচ্ছে এরা। নিশ্চয়ই নদী পার হয়ে এল।

ক্যাম্পে কারও মোবাইল ফোন নেই?

এখানে ইন্ডিয়ার টাওয়ার কাজ করে না।

অমল সোম আবার টর্চ জ্বালিয়ে সংকেত পাঠাতেই খুব কাছ থেকে গলা ভেসে এল, ওকে! উই আর হিয়ার।

ভুটানের অফিসার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওঁর পিছনে আরও তিনজন, কিন্তু তাঁদের পরনে সাদা পোশাক। বাদলকে দেখে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, এ কে?

অমল সোম বললেন, এই লোকটির নাম বাদল। ও ক্যাম্পটা চেনে।

অফিসার বাদলকে জিজ্ঞেস করলেন, ক্যাম্পে কত লোক আছে?

বারো-তেরোজন থাকে। এখন কত আছে জানি না।

অস্ত্র আছে নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ সাহেব। এ কে ফর্টি সেভেন আছে।

অফিসার অমল সোমকে বললেন, আমরা একটু অপেক্ষা করব। আরও রাত বাড়ুক। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক। না হলে দশ-বারোজনের সঙ্গে আমরা লড়াই করে জিততে পারব না। চলুন, আর-একটু এগিয়ে যাওয়া যাক।

বাদল ওঁদের পথ চিনিয়ে নিয়ে গেল। এখন অন্ধকার আরও পাতলা হয়ে গিয়েছে।

ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালেই ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। ওঁরা যতটা সম্ভব গাছ এবং পাথরের আড়াল নিলেন।

বাদল নিচু গলায় বলল, ওই নিচু জায়গায় গাছের আড়ালে ক্যাম্প।

ক্যাম্পে কোনও আলো জ্বলছে না। জ্বললে গাছের ফাঁক দিয়ে তা দেখা যেত। মাঝে মাঝে হুইলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনটে নাগাদ অফিসার বললেন, নাউ অ্যাকশন নেওয়ার সময় হয়েছে। আপনারা চারধারে নজর রাখুন।

তারপরেই কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ থেকে একটা কিছু বের করে তাতে চাপ দিয়ে সজোরে ক্যাম্পের দিকে ছুড়লেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত পরে প্রচণ্ড শব্দে পাহাড় কেঁপে উঠল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার ছুঁড়েছেন। অফিসার। এবার আরও ওপাশে। শব্দ হল প্রচণ্ড, সেইসঙ্গে আগুনের ঝলকানি। তৎক্ষণাৎ চিৎকার শুরু হল। ক্যাম্পের লোকজন ভয়ে চিৎকার করে চলেছে সমানে। কেউ একজন তাদের ধমকে থামাতে চাইছে। হঠাৎ যেদিকে বোমা ফেটেছিল সেদিক লক্ষ করে গুলি চালাতে লাগল কেউ কেউ। অর্জুন দেখল, অফিসার গ্রেনেড ছুড়লেন ক্যাম্পের নীচ লক্ষ্য করে। একজন চেঁচিয়ে বলল, শেল্টার নাও। ক্যাম্প ছেড়ে তিন নম্বরে চলে যাও সবাই। কুইক। ভুটানি পুলিশ অ্যাটাক করছে।

তারপরেই মেয়েলি গলায় চিৎকার ভেসে এল। ওটা যে স্টেফির গলা তা বুঝতে পারছিল অর্জুন। স্টেফিকে জোর করে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু তিনি যেতে চাইছেন না। ঝোঁপঝাড় ভেঙে লোকজন ছুটছে ওপাশে।

অফিসার বললেন, লেটস গো।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অর্জুন অফিসারের সঙ্গে দৌড়োতে লাগল। দু'মিনিট পরেই দৃশ্যটা দেখতে পেলেন ওঁরা। স্টেফিকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে তিনজন লোক। একজন স্টেফিকে চড় মারল। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ওরা জায়গাটা ছাড়তে চাইছিল। স্টেফির আপত্তিতে তাতে বাধা পড়ছিল। অফিসার তৃতীয় ব্যক্তির পা লক্ষ্য করে গুলি চালাতেই সে আর্তনাদ করে পড়ে গেল। যে দু'জন স্টেফিকে ধরে টানছিল তারা ওকে পিঠে তুলতে চাইল। ততক্ষণে অর্জুন আর অফিসার পৌঁছে গিয়েছেন ওদের পিছনে। ভয় পেয়ে

ওরা স্টেফিকে নামিয়ে দিতেই স্টেফি দৌড়োলেন পিছনে। লোক দুটোকে ধরে ফেলল অফিসারের লোক। অমল সোম চিৎকার করে ডাকলেন, স্টেফি! কুইক!

স্টেফিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। অর্জুন তাঁকে খুঁজতে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটে আসতে অর্জুন লাফিয়ে আড়ালে চলে যেতে যেতে বুঝল, অল্পের জন্য বেঁচে গেল এখন। কিন্তু যে লোকটা তখনও ক্যাম্পে থেকে গিয়ে অর্জুনের উদ্দেশে গুলি ছুড়ছিল, সে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। অর্জুন চিৎকার করল, স্টেফি! কুইক চলে এসো।

নো। এক মিনিট।

ততক্ষণে অমল সোম এবং অফিসার চলে এসেছেন ভিতরে। অফিসার বললেন, মাই গড! ওরা তো রীতিমতো আর্মি ক্যাম্প তৈরি করে ফেলেছিল এখানে।

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, স্টেফি দেরি করছে কেন?

অর্জুন চিৎকার করল, স্টেফি!

এবার স্টেফি বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে একটা বড় থলে।

অমল সোম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী আছে ওতে?

ও মি. সোম! আমি পেয়েছি। একদম গাঢ় রঙের পাতা। রিয়েল বিশল্যকরণী পাতা। কাল সারাদিন ধরে এখানে কুড়িয়েছি।

ভগবান! অমল সোম বললেন।

ওঁরা ফিরতে গিয়ে অমল সোম দাঁড়িয়ে পড়লেন। দৌড়ে গেলেন চিত হয়ে পড়ে থাকা একটি মৃতদেহের দিকে। হাত বাড়িয়ে চোখের পাতা বন্ধ করে দিলেন তিনি। অর্জুন দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছিল। গলার পাশে আঙুল চেপে মাথা নাড়ল সে। প্রাণ নেই। কখন মারা গেল বাদল?

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, সেই লোকটি না?

অর্জুন বলল, হ্যাঁ।

ওর বডি আপনারা নিয়ে যেতে চান?

কোথায় নিয়ে যাব? ওর কেউ কোথাও আছে কিনা জানি না। অমল সোম বললেন, এখানে নিশ্চয়ই আপনাদের পুলিশ আসবে?

আসা উচিত। অফিসার ঘড়ি দেখলেন, এবার আমাদের চলে যাওয়া উচিত। ভোর হতে দেরি নেই। আমাকে পারো যেতে হবে এখনই। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি অফিসিয়ালি এখানে আসিনি। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি যে কারণে এসেছিলাম তা তাঁর সাহায্যে সম্ভব হয়েছে। সঙ্গীদের নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেলেন তিনি।

স্টেফিকে নিয়ে ওঁরা নদী পেরিয়ে যখন গাড়ির সামনে পৌঁছোলেন তখন সূর্য উঠেছে। দূর থেকে স্টেফিকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দু'হাত তুলে চিৎকার করছিলেন মেজর। দৌড়ে ওঁর কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন স্টেফি, আমি পেয়ে গিয়েছি। একদম ঠিকঠাক বিশল্যকরণী!

অল্প দূরে দাঁড়িয়ে অমল সোম বললেন, কিডন্যাপড হয়েছিল, ওরা ওকে মেরেও ফেলতে পারত! কিন্তু সে সব ভুলে মেয়েটা গবেষণার পথে এগিয়ে যাওয়ার রসদ পেয়ে আনন্দে বুঁদ হয়ে আছে। তুমি একে কী বলবে অর্জুন?

পাগল মাৎৰই জিনিয়াস নয়। কিন্তু জিনিয়াসরা পাগল হয়। অর্জুন হাসল।

দাসবংশ ধ্বংস (২০১১)

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ @bongboi।

১. ভর বিকেলেই অন্ধকার

দাসবংশ ধ্বংস (২০১১)
অর্জুন সমগ্র ৫ – সমরেশ মজুমদার

ভর বিকেলেই অন্ধকার নেমেছিল। মোষের মতো রাগী মেঘগুলো ছুটে আসছিল আকাশের সব কোণ থেকে, ধাক্কা খাচ্ছিল এ-ওর সঙ্গে। তখনই ছিটকে উঠছিল আলো, গড়িয়ে আসছিল শব্দ। হাওয়ারা যেখান থেকে জন্মায় তার মুখটাকে কেউ বন্ধ করে রেখেছিল বলেই হয়তো গাছগুলো সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যে কোনও মুহূর্তে মেঘগুলো গলে গিয়ে চরাচর ভাসিয়ে দেবে।

আধাপাহাড়ি ছোট্ট স্টেশনে নেমে অর্জুন দেখল, কোথাও মানুষ নেই। একজন স্টেশনমাস্টার, যিনি টিকিট বিক্রেতা আবার পতাকাও নাড়েন, ট্রেন চলে গেলে দৌড়ে ঢুকে পড়েন তার ঘরে। যে ট্রেনে অর্জুন এসেছিল তার কামরায় গোটাপাঁচেক মানুষ ছিল, যার চারজন চলে গিয়েছে ট্রেনের সঙ্গে। জংশন স্টেশনে মেল ট্রেন থেকে নেমে দুপুরবেলায় ওই লোকাল ট্রেনে উঠেছিল সে। চিঠিতে সেরকমই নির্দেশ ছিল। এই পথে সারাদিনে দুটো ট্রেন যায়, ফিরে আসে। অর্জুন মোবাইলে বহুবার চেষ্টা করেছে পৎৰলেখককে ধরতে, সব সময় শুনতে হয়েছে 'আউট অফ রেঞ্জ'। শেষ পর্যন্ত ভেবেছে, স্টেশনে নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করে নিজেই পৌঁছে যাবে ভদ্রলোকের ঠিকানায়। চিঠিতে ভদ্রলোক লিখেছিলেন, যতটা সত্বর সম্ভব চলে আসুন।

এখন এই প্রায়-অন্ধকারে মেঘের গর্জন শুনতে শুনতে শূন্য স্টেশনচত্বর দেখে অর্জুন এগিয়ে গেল স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে। ভেজানো দরজায় শব্দ করতে প্রায় চিৎকার ভেসে এল, কে? কে?

দরজাটা ঠেলে ঘরে পা দিতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল সে। মধ্যবয়সি টাক মাথার স্টেশনমাস্টার হাতে একটা লম্বা শক্ত রুল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন আক্রান্ত হলেই তিনি পালটা আক্রমণ করতে পারেন।

আমি এই ট্রেনে এলাম। আসছি জলপাইগুড়ি থেকে। আমার নাম অর্জুন।

ভদ্রলোক দু-তিন সেকেন্ড জরিপ করে রুল নামালেন, কী উদ্দেশ্যে এখানে আগমন?

এক ভদ্রলোক অনুরোধ করেছেন আসার জন্যে। কিন্তু তিনি জানেন না যে, আজ আমি আসছি। স্টেশনের বাইরে কোনও ট্যাক্সি তো দূরের কথা রিকশাও নেই। তাই...!

ওগুলোর দু-চারটেকে দিনেরবেলায় মাঝে মাঝে দেখা যায়। ভদ্রলোকের নাম কী?

তুলসীদাস চৌধুরী! ঠিকানা...!

হাত তুলে অর্জুনকে থামিয়ে দিয়ে স্টেশনমাস্টার বললেন, বিলক্ষণ চিনি। আপনি বাঙালি, আমিও তাই। সে কারণেই একটা উপদেশ দিচ্ছি। ফিরে যান।

ফিরে যাব? হকচকিয়ে গেল অর্জুন।

একটা মালগাড়ি আসছে একটু পরেই। আমি ওটাকে থামিয়ে গার্ডের কামরায় আপনাকে তুলে দিচ্ছি। ওখানে নিরাপদে থাকবেন। জংশনে পৌঁছোতে ভোর হয়ে যাবে।

কিন্তু চলে গেলে, যে কাজের জন্যে এসেছি সেটা তো হবে না!

কাজটা কী জানাতে আপত্তি আছে?

বিন্দুমাত্র নয়। তুলসীদাসবাবু আমার সাহায্য চেয়েছেন। সেটাই আমার কাজ।

কীরকম সাহায্য?

ওটা ওঁর অনুমতি ছাড়া বলা উচিত হবে?

হুম! আপনি কি আগে এই অঞ্চলে এসেছেন?

না। আজই প্রথম এলাম। অর্জুন দরজার বাইরে তাকাল, যে-কোনও মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে বলে মনে হচ্ছে। কীভাবে যেতে পারি যদি বলে দেন!

গিয়ে লাভ হবে না ভাই! তুলসীদাস চৌধুরী খুব অসুস্থ। আপনাকে আমি বলতে পারতাম এই ঘরে রাতটা চেয়ারে বসে কাটিয়ে ভোরের আলো ফুটলে বাইরে যেতে। কিন্তু আমি তা পারছি না। দুঃখিত।

স্টেশনমাস্টারের কথা শেষ হওয়ামাত্র বাইরে সাইকেলের বেল শোনা গেল। তারপরেই দরজার বাইরে থেকে গলা ভেসে এল, মাস্টারসাব, মালগাড়ি চলে গিয়েছে? লোকটা কথা বলছে দেহাতি হিন্দিতে।

কৌন? স্টেশনমাস্টার চিৎকার করলেন।

হরিরাম।

মেঘ না চাইতেই জল একেই বলে। স্টেশনমাস্টার বললেন, ভিতরে এসো।

প্যান্ট-শার্ট পরলেও যুবকের চেহারায় দেহাতি ভাব একটা। ঘরে ঢুকে একটু আগে করা প্রশ্নটি আবার করল।

স্টেশনমাস্টার মাথা নাড়লেন, না যায়নি। কিন্তু ওটা এখানে থামে না।

আপনি পারেন। দয়া করে ওটা একটুখানির জন্যে থামান। আমাকে শহরে যেতেই হবে। যুবক বেশ কাতর গলায় বলল।

পৌঁছোতে সকাল হয়ে যাবে।

হোক। আমি এখন গেলে দুপুরের ট্রেনে ফিরে আসতে পারব।

কী ব্যাপার?

ডাক্তারজি চারটে ইঞ্জেকশন আনতে বলেছেন। কাল বিকেলের মধ্যে প্রথমটা দেওয়া দরকার। খুব জরুরি। জীবন-মরণের ব্যাপার।

তুলসীদাসজি কেমন আছেন?

ভাল না। একদম ভাল না। ওষুধটা আনা খুব জরুরি, না হলে আমি এরকম অন্ধকারে বেরোতে সাহসই পেতাম না। যুবক বলল।

তুলসীদাসজি কথা বলতে পারছেন?

বলছেন। কিন্তু খুব দুর্বল।

তুমি এখানে কীভাবে এসেছ?

সাইকেলে। ওটা এখানেই থাক। তালাচাবি দিয়ে রেখেছি।

এবার স্টেশনমাস্টার অর্জুনের দিকে তাকালেন, আপনি সাইকেল চালাতে জানেন?

অর্জুন হেসে ফেলল, মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল। স্টেশনমাস্টার হরিরামের দিকে তাকালেন, এই ভদ্রলোক পশ্চিমবাংলা থেকে এসেছেন। তুলসীদাসজি ওঁকে কোনও দরকারে আসতে বলেছেন। অত দূরে তো উনি হেঁটে যেতে পারবেন না। তোমার সাইকেলের চাবিটা দাও। আর ওঁকে বুঝিয়ে দাও কীভাবে যেতে হবে।

হরিরাম খুব অবাক হয়ে তাকাল, আপনার নাম কী?

অর্জন।

অর্জুন! আপনি কি জলপাইগুড়িতে থাকেন?

হ্যাঁ।

আপনাকে উনি যে চিঠি লিখেছিলেন সেটা আমিই শহরে গিয়ে পোস্ট করেছিলাম। কিন্তু কী লিখেছিলেন তা জানি না। আপনার আসার কথা জানলে একটা ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু মাস্টারসাব, এই অন্ধকারে সাইকেল চালিয়ে কি উনি যেতে পারবেন? হরিরাম জিজ্ঞেস করল।

স্টেশনমাস্টার কিছু বলার আগেই অর্জুন বলল, আমার সঙ্গে টর্চ আছে।

না না, আলোর কথা বলছি না। থেমে গেল হরিরাম।

স্টেশনমাস্টার বললেন, অন্য কিছু না বলে ওঁকে পথটা বুঝিয়ে দাও। যে-কোনও মুহূর্তে মালগাড়ি এসে পড়বে।

হরিরাম পকেট থেকে একটা চাবি বের করে বলল, এখান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরবেন। সোজা যাবেন। রাস্তাটা দুটো ভাগ হয়ে গেলে ডান দিকেরটা ধরবেন। পথে সাইকেলের স্পিড কমাবেন না, কাউকে দেখলে কথা বলার জন্যে দাঁড়াবেন না। এই কথাটা ভুলে যাবেন না যেন। ওই পথ ধরে আরও দশ মিনিট গেলে একটা দোতলা বাগানওয়ালা বাড়ির গেট দেখতে পাবেন। দোতলায় আলো জ্বলছে। গেটে তালা দেওয়া থাকে। আপনি 'রামঅবতার' বলে চিৎকার করলে ভিতর থেকে লোক বেরিয়ে আসবে।

হরিরামের কথা শেষ হওয়ামাত্র দূরে ইঞ্জিনের হুইসল বাজল। স্টেশনমাস্টার লাল কাগজমোড়া লণ্ঠন আর ফ্ল্যাগ হাতে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন, পিছনে হরিরাম। অর্জুন অলস পায়ে বাইরে বেরিয়ে দেখল, স্টেশনমাস্টার আলো এক হাতে ধরে ফ্ল্যাগ নাড়ছেন। ধীরে ধীরে মালগাড়িটা অনেকটা এগিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত থেমে গেল। টর্চ বের করল অর্জুন। সাইকেলটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। সে তালা খুলে ওটাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

তখনই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল কাছাকাছি। তার আগে আকাশ-পৃথিবী এক লহমার জন্যে ফোটোর নেগেটিভের মতো অস্পষ্ট হল। বাঁ দিকের পথ ধরল অর্জুন। সাইকেলটা বেশ ভাল। প্যাডেলে চাপ দিতেই গতি বাড়ছে। বাঁ হাতে টর্চ জ্বেলে সাইকেল চালাচ্ছিল অর্জুন। ব্যাগ রেখেছিল সাইকেলের ক্যারিয়ারে। টর্চের আলোয় রাস্তার চিলতে অংশ দেখা যাচ্ছিল। দু'পাশে এবং সামনে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। মেঘের গর্জন ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। এমনকী, একটা নেড়িকুকুরও চোখে পড়ছে না।

মিনিট দশেক পর রাস্তাটা যেখানে দুটো ভাগ হয়েছে, সেখানে পৌঁছোতেই বৃষ্টি নামল। একেবারে হাজার হাজার বর্শার মতো নেমে এল জলরাশি। এক সেকেন্ডেই ভিজে চপচপে হয়ে গেল অর্জুন। জলের বেগ

এত প্রবল যে, সাইকেল চালানো অসম্ভব হয়ে উঠল। বিদ্যুৎ চমকাতে রাস্তার দুপাশে কয়েকটা বিশাল ঝাকড়া গাছ দেখতে পেল সে। ওই গাছের নীচে দাঁড়ালে বৃষ্টিতে তেমন ভিজতে হবে না। কিন্তু হরিরাম নামের যুবকটি তাকে সতর্ক করেছে পাশের কোথাও না দাঁড়াতে। কেন নিষেধ করেছে তা জানায়নি। এই স্টেশনমাস্টারের আচরণেই একটা আতঙ্কের ছাপ ছিল। হরিরাম বলেছিল, বাধ্য না হলে সে এখন বাড়ি থেকে বের হত না। এরকম জায়গায় তো ভয় একটা কারণেই হতে পারে। গুন্ডা-বদমাশ ছিনতাই করতে পারে। বাধা দিলে খুন হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এই কাজ নিশ্চয়ই দিনের পর দিন চালিয়ে যাওয়া যায় না। পুলিশ নিশ্চয়ই নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে না। যত অজ পাড়াগাঁই হোক, স্টেশন যখন আছে তখন নিশ্চয়ই থানা দুরে থাকবে না। একটা বড় ঝাকড়া গাছের নীচে চলে এসে অর্জুন সাইকেল থেকে নামল। ইতিমধ্যে যথেষ্ট ভিজে গিয়েছে জামা-প্যান্ট, ব্যাগটা ওয়াটার প্রুফ বলে স্বস্তি, ওটার ভিতরে জল ঢুকবে না।

চারপাশে ঘন কালো অন্ধকার, অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। কিন্তু মাথার উপর পাতার আড়াল থাকায় ফোঁটা ফোঁটা এখন শরীরে পড়ছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। রাস্তাঘাট, গাছপালা, এমনকী, বৃষ্টির ধারাকেও সাদাটে দেখাল। আর তারপরেই কানের পরদা কাঁপিয়ে দিয়ে শব্দ হল। খুব কাছাকাছি বাজ পড়ল এবার। এসময় বিশাল গাছটার আড়াল ছেড়ে পথে নামার কোনও মানে হয় না। অর্জুন আরও সরে এল গাছটার গায়ে। এত বড় গাছে বাজ পড়লে তা উপরে ডালপাতার ক্ষতি করবে, নীচে নিশ্চয়ই নামবে না।

প্রায় মিনিট পনেরো চুপচাপ দাঁড়ানোর পর বৃষ্টি একটু ধরল, কিন্তু মেঘের হম্বিতম্বি কমছিল না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। হঠাৎ সেই আলোর ঝলকানিতে অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল অর্জুন। চারজন মানুষ এই বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে চলেছে। প্রত্যেকের আপাদমস্তক ঢাকা। এমনকী, মাথাও ঘোমটার আড়ালে। বোধহয় মাথা থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত কালো বর্ষাতি পরে আছে ওরা। মাথা নীচের দিকে ঝুঁকে আছে। এক লহমার মধ্যে এটুকু দেখতেই চরাচর অন্ধকারে ঢেকে গেল। এরা কারা? কোত্থেকে আসছে? কোথায় যাবে?

পরেরবার যখন আবার বিদ্যুৎ চমকাল তখন চারধার শুনশান। মানুষগুলো নেই। এটা ঠিক, ওদের হাঁটার ভঙ্গি স্বাভাবিক নয়। হরিরাম কি ওদের কথা ভেবেই তাকে সাবধান করে দিয়েছিল?

শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিটা প্রায় ধরল। প্রায়, কারণ দু'-চার ফোঁটা পড়া শেষ হচ্ছিল না। এত বৃষ্টি ঝরিয়েও আকাশ মেঘমুক্ত নয়। অর্জুন সাইকেলে চাপল। প্রায় মিনিট দশেক চলার পর দূরে আলো জ্বলতে দেখতে পেল সে। টিমটিমে আলো। কাছাকাছি এসে সে বুঝতে পারল, আলোটা জ্বলছে দোতলা বাড়ির বারান্দায়। বাড়িটার সামনে গাছগাছালি এবং প্রাচীর আছে, আছে গেটও। নিশ্চয়ই এই বাড়ির কথা হরিরাম তখন বলেছিল। গেটের সামনে নেমে টর্চ জ্বালতে গিয়ে হতাশ হল সে। জ্বলছে না। টর্চের ভিতরে জল ঢুকল কী করে? অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বোঝা গেল, লোহার গেটে তালা ঝুলছে। সে বাড়িটির দিকে তাকাল। একমাত্র উপরের ওই শীর্ণ আলো ছাড়া প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই। এই বাড়িতেই তুলসীদাসজি থাকেন?

হরিরামের উপদেশ মতো অর্জুন চিৎকার শুরু করল, রামঅবতারজি, রামঅবতারজি। চারবার ডাকার পরও ভিতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে লোহার গেটে আওয়াজ তুলল সে। নিস্তব্ধ রাতে সেই আওয়াজ বহু দূর থেকে নিশ্চয়ই শোনা যাচ্ছিল। প্রায় হতাশ হয়ে অর্জুন আবার চেঁচাল, রামঅবতার। এবার 'জি' জুড়ল না অজান্তেই।

বাড়ির গায়ে একতলার একটা দরজা খুলল। একটা লণ্ঠন উঁচিয়ে ধীরে কেউ চিৎকার করে জানতে চাইল, কৌন?

তুমি রামঅবতারজি?

হ্যাঁ। লোকটার হিন্দি দেহাতি।

দয়া করে গেট খোলো। আমি বাংলা থেকে আসছি।

কেন?

যাচ্চলে! অর্জুন মাথা নাড়ল, এর কাছেও ইন্টারভিউ দিতে হবে নাকি? তুলসীদাসজি আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন। এটা তাঁর বাড়ি তো?

আপনার ভাল নাম?

অর্জুন।

সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠন ভিতরে ঢুকে গেল, দরজাও বন্ধ হল। অর্জুন অবাক হল। এই গেট বেশ উঁচু, টপকে যেতে একটু অসুবিধে হবে। কিন্তু সারারাত এখানে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। তুলসীদাসজি তাকে এখানে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাকে বাড়ির বাইরে সারারাত দাঁড় করিয়ে রাখবেন, এটা কী ধরনের ভদ্রতা?

মিনিট পাঁচেক পর দরজাটা আবার খুলল। লণ্ঠন এগিয়ে এল গেটের দিকে। ওটাকে নীচে নামিয়ে তালা খুলল লোকটা, মাপ করবেন, আপনাকে একটু দাঁড় করিয়ে রেখেছি বলে। কিন্তু কী করব, অচেনা লোককে গেট খুলে দেওয়ার অর্ডার নেই। আসুন, ভিতরে আসুন।

তা হলে আমার উপর সদয় হলে কেন? অর্জুন বিরক্ত।

আপনার কথা মেজবাবুকে গিয়ে বললাম। শুনে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন উনি। আপনাকে ওঁর কাছে এখনই নিয়ে যেতে বললেন। রামঅবতার বলল।

গেটে তালা দিয়ে রামঅবতার অর্জুনকে নিয়ে যেখান দিয়ে ভিতরে ঢুকল, সেটা খিড়কি দরজা। ভিতরে অন্ধকার ঝিম মেরে রয়েছে। কীরকম থমথম করছে চারধার। লণ্ঠন হাতে নিয়ে ভিতরের বারান্দায় উঠে রামঅবতার বলল, আপনি ওর সঙ্গে যান।

অর্জুন তাকিয়ে দেখল, ভিতরের দরজার ওপাশে সেজবাতি হাতে নিয়ে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধ হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার পরিচয় দেবেন?

অর্জুন মাথা নাড়ল, আমার নাম অর্জুন। পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়িতে থাকি। তুলসীদাসজি আমাকে দুটো চিঠি দিয়েছিলেন। অনুরোধ করেছিলেন এখানে আসার জন্যে। দ্বিতীয় চিঠির উত্তরও আমি দিয়েছিলাম।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, ওই চিঠি দুটোর একটা কি আপনার সঙ্গে আছে?

অর্জুন ব্যাগ খুলে দুটো চিঠিই বের করে বৃদ্ধের হাতে দিল। বৃদ্ধ সেগুলো দেখে নিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না বাবু, এই বাড়িতে নতুন কেউ এলে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হচ্ছে। আপনাকে বিব্রত করেছি বলে আমি দুঃখিত। আসুন আমার সঙ্গে।

বৃদ্ধ তাকে দোতলায় নিয়ে এসে বললেন, দেখছি আপনি বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছেন। আগে জামা-প্যান্ট পালটান, হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আসুন, এই ঘরে আপনি থাকবেন। বলে বৃদ্ধ গলা তুললেন, বংশী।

সঙ্গে সঙ্গে বেঁটেখাটো প্রৌঢ় বেরিয়ে এল পাশের অন্ধকার থেকে। বৃদ্ধ বললেন, এই বাবু আমাদের অতিথি। অতিথি নারায়ণের সমান শ্রদ্ধেয়। ওই ঘরে উনি থাকবেন। ওঁর সেবাযত্নের দায়িত্ব তোমার উপর। ওঁকে ঘরে নিয়ে যাও।

বংশী একটুনিচুহয়ে হাত দেখিয়ে অর্জুনকে যে ঘরটিতে নিয়ে গেল, সেখানে একটা সেজবাতি জ্বলছে। বেশ বড় ঘর। আসবাবগুলোয় প্রাচীনকালের গন্ধ থাকলেও বোঝা যাচ্ছে বেশ যত্ন নেওয়া হয়। বিছানা না বলে পালঙ্ক বলাই ভাল। তার পাশে একটা বেশ বড় গোল শ্বেতপাথরের টেবিল। অর্জুনের হাত থেকে ব্যাগ টেনে নিয়ে টেবিলটার উপর রাখল বংশী।

অর্জুন মুখ তুলে দেখল, তিন ডানার ফ্যান স্থির হয়ে আছে। তারপর ঘরের তিন দিকে ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা দেখতে পেল। সে জিজ্ঞেস করল, কারেন্ট নেই কেন?

বংশী বলল, দিনভর থাকে। সন্ধে হওয়ার আগেই লাইন কেটে দেয়।

কেটে দেয় মানে?

বংশী জবাব না দিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অর্জুন সেটা ঠাওর করে বলল, কতদিন ধরে এরকম হচ্ছে?

আড়াই মাস হয়ে গেল। সকালে বিজলি ডিপার্টের লোকজন গিয়ে কাটা লাইন জুড়ে দেয় বলে পাখা চলে। বলতে বলতে পাশের দরজাটা খুলে দিল বংশী, এখানে জল ভরা আছে। আপনি তৈরি হয়ে নিন। এখন তো বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। তবু যদি বলেন, চা নিয়ে আসতে পারি।

একটু শীত শীত লাগছিল। অর্জুন বলল, চা হলে মন্দ হয় না।

মাথা নেড়ে বংশী বেরিয়ে গেল।

বাথরুমে গিয়ে জামা-প্যান্ট ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিল অর্জুন। চা খেয়ে তুলসীদাসজির সঙ্গে দেখা করবে সে। ভদ্রলোক প্রথম চিঠিতে লিখেছেন একটু রহস্যের মতো, আমার এখানে সর্বত্র অসত্য, সত্য তার মধ্যে আড়ালে পড়ে গিয়েছে। আপনি তো সত্যসন্ধানী, দয়া করে এসে সত্যসন্ধান করে দিন। দ্বিতীয় চিঠিতে জানিয়েছিলেন, পশ্চিমের এই গ্রামে কীভাবে কোন ট্রেনে আসতে হবে। তাঁকে জানালে স্টেশনে লোক রাখবেন। সত্যসন্ধান করার জন্যে অর্জুনকে সম্মানদক্ষিণা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ইত্যাদি।

এখানে আসার পর প্রথমে স্টেশনমাস্টার তারপর হরিরাম, খোলাখুলি না বলে যথেষ্ট রহস্যের সৃষ্টি করেছেন। বৃষ্টির মধ্যে যে চারজনকে সে হেঁটে যেতে দেখেছে, তারা কি মানুষ? আবার এই বাড়ির দরজা দরোয়ান রামঅবতার যে সতর্কতার সঙ্গে খুলল, সেটাও মনে রাখতে হবে। আর এই বাড়ি, বোঝাই যাচ্ছে বেশ ধনী মানুষের বাড়ি। ইলেকট্রিকের সব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এখানে সেজবাতি, হারিকেন জ্বালতে হয়। দিনভর আলো থাকে। কারণ, ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর লোক সন্ধেতে কাটা তার সকালে জুড়ে দেয়। কেন তারা উদ্যোগী হয়ে যারা তার কাটছে তাদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে না? পুলিশ কেন সক্রিয় হচ্ছে না? এক-আধদিনের ব্যাপার নয়, আড়াই মাস ধরে চলছে এই ঘটনা। আবার যারা তার কাটছে তারা কেন কাজটা করছে? কী লাভ হচ্ছে তাদের? গ্রামের কিছু বখে যাওয়া ছেলের বদমায়েশি বলে উড়িয়ে দেওয়া তো যাচ্ছে না। দোতলায় যে আলোটা জ্বলছিল সেটা নিশ্চয়ই বড় হারিকেনের আলো।

বংশী চা নিয়ে এল, সঙ্গে নারকোলের মিষ্টি। ওটা দেখে অর্জুন খুশি হল। এখন একটু খিদে খিদে পাচ্ছে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল বংশী। অর্জুনকে খেতে দেখে জিজ্ঞেস করল, বাবু, এই বাড়িতে সবাই নিরামিষ খায়। কিন্তু আপনি যদি মাছ-মাংস খেতে চান তা হলে কাল থেকে দিতে পারব। আজ...!

তাকে থামিয়ে দিল অর্জুন, আমার খাওয়া নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। যা দেবে তাই খাব।

তা হলে আজ রাতের খাবার কখন দেব?

তোমরা যখন খাবে। তুলসীদাসজি কখন খান?

ওঁর খাওয়া হয়ে গিয়েছে। বাবুরা সবাই খেয়ে নিয়েছেন। মায়েরা খেতে বসেছেন। এখন এখানে রাত ন'টার মধ্যেই সবাই খেয়ে শুয়ে পড়েন।

বংশীর কথা শেষ হওয়ার আগে বাইরে পায়ের শব্দ হল। দরজার বাইরে থেকে গলা ভেসে এল, ভিতরে আসতে পারি?

নিশ্চয়ই। আসুন। অর্জুন চা শেষ করল।

সেই বৃদ্ধ সঙ্গে একজন প্রৌঢ়কে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আপনার অসুবিধে হচ্ছে না তো?

না না। অর্জুন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

আমি আপনার সঙ্গে অসভ্যতা করেছি। আপনার পরিচয় নিয়েছি, কিন্তু নিজের পরিচয় দিইনি। আমি বিষ্ণুদাস চৌধুরী। তুলসীদাসজির ছোটভাই। হাতজোড় করলেন বিষ্ণুদাস।

নমস্কার ফিরিয়ে দিল অর্জুন।

বিষ্ণুদাসজি বললেন, এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি ড. রামগোপাল গুপ্তা। আমাদের এখানে একজন হাতুড়ে ডাক্তার আছেন, যিনি সামান্য জ্বর বা পেট খারাপ হলে সারাতে পারেন। দাদা অসুস্থ হওয়ার পর আমরা ওঁকে শহরে নিয়ে যাই। বড় নার্সিংহোমে চিকিৎসা করিয়ে একটু সুস্থ হলে ফিরিয়ে আনি। দিন দশেক হল দাদা আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন ড. গুপ্তাকে অনুরোধ করি এখানে আসার জন্যে। উনি একদিনের জন্যে এসে সাতদিন থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, তুলসীদাসজির কী হয়েছে?

ড. গুপ্তা বললেন, ব্লাডপ্রেশার ফ্লাকচুয়েট করছে। সকালে লো, তো বিকেলে হাই। প্রচণ্ড টেনশনে ভুগছেন উনি। আর প্রায়ই বলছেন, কিছুই মনে রাখতে পারছেন না। আর টেনশন থেকেই রক্তে সুগারের পরিমাণ বেড়েছে।

বিষ্ণুদাসজি বললেন, আজকের পরিবর্তনটা বলুন!

হ্যাঁ। এই ক'দিন ধরে রাতে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ না দিলে দেখলাম উনি ঘুমোতে পারছিলেন না। আজ যখন সেটা দিতে যাচ্ছি, তখন বিষ্ণুদাসজি এসে খবর দিলেন, আপনি এসেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে তুলসীদাসজি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। কিন্তু বিষ্ণুদাসজি বললেন, আপনি খুব ভিজে গিয়েছেন। পোশাক বদলে আসতে দেরি হবে। তার চেয়ে আগামীকাল দেখা করলে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারবেন। মেনে নিলেন উনি। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আজ ঘুমের ওষুধ ছাড়াই উনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ড. গুপ্তা হাসলেন।

অর্জুনের মনে হল, কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে জিজ্ঞেস করল, শোনামাত্র ঘুমোলেন?

ড. গুপ্তা বললেন, আপনি এসেছেন শুনে ওঁর সব টেনশন চলে গেল। এরকম ক্ষেত্রে ক্লান্তি এসে যাওয়া খুব স্বাভাবিক।

বিষ্ণুদাসজি বললেন, একবার যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন আবার ডেকে তোলা বোধহয় উচিত কাজ হবে না। আপনি বিশ্রাম করে খাওয়াদাওয়া সেরে নিন। আরাম করে ঘুমোন। কাল সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, ঠিক আছে।

বিষ্ণুদাসজি বংশীকে আবার বললেন অর্জুনকে যত্ন করতে। তারপর ওঁরা বেরিয়ে গেলেন।

চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাপ-ডিশ তুলে নিয়ে বংশী জিজ্ঞেস করল, রাতের খাবার কখন দেব বলবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে দিয়ো।

বংশী বেরিয়ে যেতে অর্জুন দরজার বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বের হওয়ার সময় দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিল। বাইরে এখন মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। সামনের বাগানের গাছগুলো প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে সেই ভারী জলধারার সঙ্গে।

এখানে রাত নামলে বাড়ির ইলেকট্রিক সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। কারা কাটে তা নিশ্চয়ই এতদিনে কারও অজানা নেই। তবু তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে সবাই ভয়ে চুপ করে আছে কেন? আসার সময় বৃষ্টির ভিতরে মাথা নিচু করে যে চারজনকে সে হেঁটে যেতে দেখেছিল, তারাই কি ওই কাণ্ড করছে? লোকগুলো নিশ্চয়ই এই গ্রামেই থাকে। তা হলে ওদের এত ভয় পাওয়ার কারণ কী? আব এইসব করে লোকগুলোর কী লাভ হচ্ছে? কেন করছে ওরা? অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না। এই গ্রাম, স্টেশন অঞ্চলে কিছু লোক ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে রেখেছে। স্টেশনমাস্টার থেকে সবাই ভীত, অথচ পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে, এটা কী করে সম্ভব?

এখানে আসার পর গেট খুলেছিল রামঅবতার। কিন্তু সে দোতলায় ওঠেনি। কারণ, বিষ্ণুদাসজি তার জন্যে নীচের দরজায় অপেক্ষা করছিলেন। উপরের কাজের লোক বংশী। এরা ছাড়া বাড়িতে মহিলারা আছেন। বংশী বলেছিল, মায়েরা খেতে বসেছেন। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব এখনও বোঝা যায়নি। এইরকম গ্রামের মহিলারা রক্ষণশীল হতেই পারেন।

ড. গুপ্তা নিশ্চয়ই ভাল মানুষ। না হলে শহরের প্র্যাকটিস ছেড়ে এই গ্রামের একজন পেশেন্টের জন্যে থেকে যেতেন না। তাঁরই প্রেসক্রিপশন নিয়ে হরিরাম শহরে ছুটেছে ইঞ্জেকশন আনতে। ব্যাপারটা খুব জরুরি। হরিরাম বলেছিল, কাল বিকেলের মধ্যে প্রথমটা দেওয়া খুব জরুরি। জীবন মরণের ব্যাপার। তা হলে তুলসীদাসজি গুরুতর অসুস্থ, ওঁকে বাড়িতে না রেখে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু

যে ভদ্রলোক তাকে এখানে আনার জন্যে ব্যগ্র ছিলেন, তার আসার খবর পেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন কী করে? চটজলদি তার টেনশন চলে গিয়ে ঘুম এসে গেল? ড. গুপ্তার কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না অর্জুন। তুলসীদাসজি তার সঙ্গে দেখা না করে ঘুমিয়ে পড়বেন, এ ভাবা যায় না।

বৃষ্টি পড়েই চলছিল। অর্জুন যখন সাত-পাঁচ ভেবেই চলেছে, তখন নীচে আওয়াজ হল। অন্ধকারে চোখ যেটুকু সয়ে গিয়েছিল তাতে মনে হল, সদর গেট খুলছে। গেটের এপাশে কেউ নেই। তাকে গেট খুলে দিয়েছিল রামঅবতার, তাও অনেক ডাকাডাকির পর। আওয়াজটা গেট খোলার এবং এপাশে রামঅবতার নেই। এই সময় বিদ্যুৎ চমকে উঠল। অর্জুন কিছু ভাল করে বোঝার আগেই অন্ধকার আছড়ে পড়ল। তবু তার মনে হল, চারটে মানুষ গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আবার যখন বিদ্যুৎ চমকাল, তখন দেখা গেল গেটটা বন্ধ।

হঠাৎ সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। আসার সময় বৃষ্টি থেকে বাঁচতে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে যে চারজনকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে দেখেছিল সে, তাদের সঙ্গে এদের বেশ মিল আছে। এরা কারা? কেন এই বাড়িতে এল? এই বাড়িতে ঢোকার জন্যে হাঁকডাক করে গেট খোলাতে হল না ওদের। তা হলে কি ওরা এখানে যায়-আসে অনুমতি নিয়ে? একধাপ নীচে নেমে ওদের উদ্দেশ্য যাচাই করলে কেমন হয়? পরক্ষণেই মাথা নাড়ল সে। তুলসীদাসজির সঙ্গে কথা না বলে সে কোনওরকম কৌতূহল দেখাতে পারে না।

বাবু। ভিতর থেকে বংশীর গলা ভেসে এল। বেশ চাপা গলা।

অর্জুন দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকতেই বংশী বলল, ও, আপনি বারান্দায় ছিলেন? ভিতরে কোথাও দেখতে না পাওয়ায় খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

কেন? ভয় পাওয়ার কী আছে?

না, নতুন জায়গা...!

তুমি সত্যি কথা বলছ না বংশী।

না বাবু। আপনি নীচে যাননি, বৃষ্টির রাত, আপনাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাই মন কু গাইছিল।

এখানে কথায় কথায় মন কু গায় নাকি?

বংশী কোনও জবাব না দিয়ে ঘরের কোণে টেবিলের কাছে চলে গেল, খাবার ঢেকে রেখেছি। গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নিন।

খিদেও পেয়ে গিয়েছিল। অর্জুন চেয়ার টেনে বসল। ঢাকা খুলে ভাতের পাশে রুটি দেখে খুশি হল সে। ওড়িশার গ্রামাঞ্চলের মানুষ সাধারণত ভাতই পছন্দ করে। নারকোল দেওয়া ডাল, দু'রকমের তরকারি আর ছোট কাঁচের বাটিতে ঘন ক্ষীর।

খাওয়া শুরু করে অর্জুন বলল, হরিরামের সঙ্গে আলাপহল। তুলসীদাসবাবুর জন্যে ইঞ্জেকশন আনতে শহরে যাচ্ছিল। সে এই বাড়ির ছেলে?

না। বড়বাবুর ভাগনে। বছর পাঁচেক হল, ওকে এখানে এনে রেখেছেন বড়বাবু। পড়াশুনো বেশিদূর হয়নি, চাকরিও পায়নি, কিন্তু মনটা সরল। বংশী বলল।

খাওয়া শেষ হতে সংলগ্ন টয়লেট থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে অর্জুন দেখল, বংশী এঁটো বাসন তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার জল ওখানে রেখেছি। আর কিছু?

না। তুমি যেতে পারো।

বংশী দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর গলার স্বর নামাল, বাবু!

অর্জুন তাকাতে বংশী বলল, দরজাটা এখনই ভিতর থেকে বন্ধ করে দিন।

কেন? এখানে চুরিচামারি খুব হয় নাকি?

বংশী কিছু বলল না। চোখ নামাল মেঝেতে।

নীচে তো পাহারাদার আছে। তাদের ফাঁকি দিয়ে চোর কীভাবে উপরে উঠবে? অর্জুন হাসল, বেশ, তুমি যখন বলছ তখন বন্ধ করে দিচ্ছি।

এবার হাসি ফুটল বংশীর মুখে, ভোরের আলো ফোটার আগে যেন ভুল করে দরজা খুলবেন না। বলে আর দাঁড়াল না।

শিকল এবং ছিটকিনি তুলে অর্জুন বুঝতে পারল, তার ট্রেনযাত্রার ক্লান্তি, বৃষ্টিতে ভেজা শরীর খাবার পেয়ে এখন দ্রুত ঘুম ছড়িয়ে পড়ছে। সে আলো নিভিয়ে টর্চটাকে পাশে নিয়ে শুয়ে পড়ল। বালিশে মাথা দিতেই অদ্ভুত শান্তির অনুভব হল। বাইরে তখনও জল নেমে আসছে আকাশ ফুড়ে। তার শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

.

ঘুম ভাঙল শব্দ কানে আঘাত করায়। চোখ মেলে বুঝল, দরজার বাইরে যে ' দাঁড়িয়ে সে-ই শব্দ করছে। জানলার পরদার ফাঁক গলে আলো ঢুকছে ঘরে। অর্থাৎ সকাল হয়ে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি মুখে-চোখে জল দিয়ে অর্জুন দরজা খুলে দেখল, বিষ্ণুদাসজি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে হেসে বললেন, আপনার ঘুম দেখে আমি অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। রাতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

বিন্দুমাত্র না। এখানে দরজা বন্ধ করে ঘুমোনোর বোধহয় প্রয়োজন নেই। বছরখানেক আগে আমাদের এক আত্মীয় এসেছিলেন। রাতে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলেন। ভোরবেলায়ও দরজা খুলছেন না দেখে ওটা ভাঙতে হল। দেখলাম, দরজার পাশেই ওঁর মৃতদেহ পড়ে আছে। হার্ট অ্যাটাক। উঠে দাঁড়াতে পারেননি। হামাগুড়ি দিয়ে দরজা পর্যন্ত এসে আর উঠতে পারেননি। যাকগে, আপনি তৈরি হয়ে নিন। দাদার ঘুম ভেঙেছে। একটু পরে যখন চা খাবেন, তখন আপনি দেখা করতে যাবেন।

বেশ।

আর-একটা কথা। আপনি কাল রাতে এসেছিলেন, ওঁকে খবরটা দেওয়ার পর খুব খুশি হয়েছিলেন, টেনশন চলে গিয়েছিল। ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। আজ সকালে ওঁর কথাবার্তা শুনে মনে হল, ওই ব্যাপারটা ওঁর মাথায় নেই। একদম ভুলে গিয়েছেন।

সে কী! অর্জুন অবাক হল।

ওঁর অসুখটা বেড়ে গেলে স্মৃতি হঠাৎ হঠাৎ মুছে যায়। আমি একটা অনুরোধ করছি। আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় ওঁকে বলব, আপনি ভোরের ট্রেনে পৌঁছেছেন। হাসলেন বিষ্ণুদাসজি। নইলে উনি বেশ লজ্জায় পড়ে যাবেন।

বেশ। অর্জুন ছোট্ট করে বলল।

২. হুইল চেয়ারে যে বৃদ্ধ

একেবারে উলটো দিকের দোতলায় ঘরের ভিতর বারান্দায় হুইল চেয়ারে যে বৃদ্ধ বসে ছিলেন, তার চেহারা খুবই শীর্ণ। মাথায় হলদেটে কয়েকগাছি চুল। গায়ের চামড়া বৃদ্ধ বয়সেও দারুণ ফরসা। বৃদ্ধের পাশে দু'জন বয়স্কা মহিলা চেয়ারে বসে ছিলেন। বিষ্ণুদাসজির সঙ্গে অর্জুনকে ঢুকতে দেখে তারা ঘোমটা টানলেন মাথার মাঝবরাবর।

বিষ্ণুদাসজি বললেন, দাদা, পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি শহর থেকে এখানে আসার জন্যে তুমি যাকে নিমন্ত্রণ করেছ, তিনি এসেছেন।

তুলসীদাসজি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে চেষ্টা করতে অর্জুন তার সামনে এগিয়ে গিয়ে দু'হাত জড়ো করে বলল, নমস্কার। আমি অর্জুন।

তুলসীদাসজি প্রায় তিরিশ সেকেন্ড অর্জুনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ইশারায় বিষ্ণুদাসজিকে কাছে ডাকলেন। বিষ্ণুদাসজি তার মুখের কাছে মাথা নিয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন ডেকেছিলাম বলো তো?

বিষ্ণুদাসজি বললেন, উনি প্রাইভেট গোয়েন্দা, ওঁকে নিয়ে লেখা বই পড়ে তুমি আগ্রহী হয়েছিলে আলাপ করতে।

কথাগুলো যত নিচু স্বরেই হোক, অর্জুনের কান এড়াল না। সে মৃদু প্রতিবাদ করল, আমি গোয়েন্দা নই, সত্যসন্ধানী।

ডান হাত তুললেন তুলসীদাসজি, স্বাগতম! মনে পড়েছে। বসুন।

তুলসীদাসজির সামনে রাখা চেয়ারে বসল অর্জুন। বসে জিজ্ঞেস করল, আপনার শরীর এখন কেমন আছে?

হাত নাড়লেন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। যার অর্থ হল, এটা কোনও সমস্যাই নয়। এখানে আসতে নিশ্চয়ই আপনার খুব কষ্ট হয়েছে? আসার দিন ঠিক করে জানালে আমি আমার ভাগনে হরিরামকে স্টেশনে থাকতে বলতাম।

না না। আমার কোনও কষ্ট হয়নি।

রাতের ট্রেনে এসেছেন। তুলসীদাসজি তাকালেন।

অর্জুন জবাব দিল না। হাসল একটু। তুলসীদাসজির পিছনে দাঁড়ানো বিষ্ণুদাসজি মাথাটা একটু দোলালেন।

আপনার বয়স বেশি নয় বলে শুনেছিলাম, কিন্তু এত কম ভাবিনি। বলে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করে ডাকলেন গলা তুলে, বংশী! চা কোথায়?

মিনিটখানেকের মধ্যে চা-বিস্কুট নিয়ে হাজির হল বংশী।

বিষ্ণুদাসজি বললেন, আপনারা গল্প করুন। আমি একটু কাজ সেরে আসি।

আমরা নিরামিষ খাই। কিন্তু অর্জুনবাবুর জন্য মাছ-মাংসের ব্যবস্থা করবে।

কোনও দরকার হবে না। অর্জুন বলল, আমি নিরামিষ পছন্দ করি।

বাঃ। উত্তম। ও হ্যাঁ। এরা আমার দু'বোন। বড়টি আমার কাছেই থাকে, ছোট আমার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছে। তুলসীদাসজি পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অর্জুন দুই মহিলাকে নমস্কার করল। কিন্তু তারা কোনও প্রতিক্রিয়া জানালেন না।

চা খেতে খেতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি লিখেছিলেন, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসতে। কী ব্যাপার?

বলব। সব বলব। আপনি যখন এখানে এসে গিয়েছেন তখন আর কোনও চিন্তা নেই। চা শেষ করে আমার বাড়িটা দেখুন। এই বাড়ি তৈরি হয় প্রায় দেড়শো বছর আগে। তখন থেকে একটু একটু করে বড় হয়েছে। আমার পিতামহ বাড়ির বাগানের চারপাশে দেওয়াল তুলেছিলেন। ভারতবর্ষে যত ফল পাওয়া যায়, তার সব তিনি এই বাগানে পেতে চেয়েছিলেন। পাহাড়ি গাছগুলো ওঁর বাসনা পূর্ণ করেনি। আমার তো যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। বিয়ে-থা করিনি, বংশরক্ষা সম্ভব হবে না। আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা ভাইকে নিয়ে। বিষ্ণুদাস দীর্ঘকাল বাইরে ছিল। শুনেছি, সেখানে সে বিবাহ করেছিল, সন্তানও হয়েছিল। কোনও কারণে মতপার্থক্য হওয়ায় বিবাহবিচ্ছেদ করে এখানে ফিরে এসেছে। আমি যখন থাকব না, তখন ওকেই তো সব সামলাতে হবে। একনাগাড়ে কথা বলে একটু জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা দু'জন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একজন ভিতরে গিয়ে চটপট ইনহেলার নিয়ে এলেন। সেটা পাম্প করে কিছুটা স্বস্তি পেলেন তুলসীদাসজি।

আপনার দেখছি পূর্বপুরুষের অনেক কাহিনি ঠিকঠাক মনে আছে? অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

একটু ধাতস্থ হয়ে তুলসীদাসজি বললেন, এই নিয়েই তো আছি।

কিন্তু আপনি আমাকে কেন ডেকেছেন তা বললেন না।

বলব, নিশ্চয়ই বলব। কাল রাতে বলতে চাইনি, এখনও বলছি না, তবে বলব। বৃদ্ধ হাসলেন। চমকে উঠল অর্জুন। কিন্তু নিজেকে সামলে উঠে এল সে।

.

নীচে নামার সিঁড়ির বাঁকে বংশীকে দেখতে পেল অর্জুন। লম্বা একটা ঝাঁটা হাতে উঠে আসছে। তাকে জায়গা দিতে একপাশে সরে দাঁড়াল সে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, নীচে কি রামঅবতারকে পাওয়া যাবে?

হ্যাঁ। কোনও দরকার আছে?

ওই বাগানটা একটু ঘুরে দেখব।

বংশী হাসল, আপনার জন্যে ওঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। বলে উপরে চলে গেল সে। চলে যাওয়ার আগে ওর ঠোঁটে যে হাসি চলকে উঠল, তা বেশ অর্থবহ বলে মনে হল অর্জুনের।

ধীরে ধীরে নীচে নামতেই খানিকটা দূরে গাছের নীচে বিষ্ণুদাসজিকে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে দেখল সে। বিষ্ণুদাসজি বলছেন, তাঁর দাদার স্মৃতি মাঝে মাঝেই লোপ পেয়ে যায়। গত রাতে ওর আসার কথা অথচ ভদ্রলোকের মনে নেই। তাই বলতে হবে যে, আজ সকালে এখানে পৌঁছেছেন।

কিন্তু তুলসীদাসজি স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাতের ট্রেনে এসেছেন? স্মৃতি লোপ পাওয়ার কোনও লক্ষণ তো দেখা গেল না!

গল্প হল? বিষ্ণুদাসজি জিজ্ঞেস করলেন।

সামান্য। কিন্তু কথা বলে তো মনে হল না ওঁর স্মৃতিতে গোলমাল। হচ্ছে।

চট করে বুঝতে পারবেন না। ডাক্তার, বুঝিয়ে দিন।

ডাক্তার বললেন, এসব পেশেন্টরা তাঁদের অল্প বয়সের, ধরুন তিরিশ চল্লিশ বছর আগেকার কথা বিশদভাবে মনে রাখতে পারেন। কিন্তু গত কাল কী হয়েছে, তা মাঝে মাঝেই ভুলে যান। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।

অর্জুন বলল, তা হলে জিজ্ঞেস করলেন কী করে, কাল রাতের ট্রেনে এসেছেন?

বিষ্ণুদাসজি হাসলেন, তাই তো করবেন। যে ট্রেন এখানে ভোরবেলায় এসে পৌঁছোয় তাকে সবাই 'রাতের ট্রেন' বলি।

ও! অর্জুন হাসল, ভাবছি, আপনাদের বাগানটা একটু ঘুরে দেখব।

বেশ তো, চলুন। ডাক্তার, আমরা একটু ঘুরে আসি?

বাগানটা বেশ বড়। বড়-ছোট গাছে ভরা। এক দিকে শৌখিন ফুলের গাছ, অন্য দিকে বিশাল গাছের ভিড়। বিষ্ণুদাসজি বললেন, আপনি তো নর্থ বেঙ্গলের মানুষ, ওই গাছটাকে চিনতে পারছেন? নর্থ বেঙ্গলের গাছ।

অর্জুন গাছটাকে দেখল। মাঝারি লম্বা ওই ধরনের গাছ প্রচুর পরিমাণে জলদাপাড়ায় অথবা তোর্ষা নদীর দু' পারে দেখা যায়। সে মাথা নাড়ল, খয়ের গাছ।

গুড। দাদা গাছটাকে লাগাবার সময় ভেবেছিলেন, ওটা বাঁচবে না। কিন্তু এই মাটিতে দিব্যি বড় হয়ে গিয়েছে।

বাগানটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পূর্ব কোণে পাঁচিলের একটা অংশের ইট ভেঙে গর্ত হয়ে আছে। বিষ্ণুদাসজি বিরক্ত হলেন, মালি কী অপদার্থ দেখুন। পাঁচিল খসে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের জানায়নি। অবশ্য কাল বিকেলেও ওখানে গর্তটা ছিল না। হয়তো ও ঘুরে যাওয়ার পরে ইট খসে পড়েছে।

ওঁরা গর্তের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ দিব্যি ওই গর্ত দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু অর্জুনের মনে হল, ওই গর্ত কখনওই আজ-কালের মধ্যে তৈরি হয়নি। পড়ে থাকা ইটের উপর শ্যাওলা জন্মাত না তা হলে। অর্জুন কিছু বলল না।

বিষ্ণুদাসজি একটার পর-একটা গাছের নাম বলে যাচ্ছিলেন। অমলতাস, ময়না, নাগেশ্বর, জামরুল, চালতা, ডুমুর, বনকাঁপাস, শিমুল, বহেড়া, গাছগুলোর যেন সকাল এখনও কাটেনি। আর-একটুহাঁটতেইব্যারাকবাড়িটাকে দেখতে পেল সে। লম্বা টানা বাড়ি। সামনে-পিছনে দুটো দরজা গাছগুলোর আড়ালে রয়েছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ওই বাড়িতে কেউ থাকে?

বিষ্ণুদাসজি হো হো শব্দে হাসলেন। তারপর বললেন, না না, ওটা বাবার আমলে তৈরি। তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন। গাঁধীজির ডাকে লবণ আন্দোলনে নেমেছিলেন। বিদেশি লবণ কেনা বন্ধ করতে হবে। তাই সমুদ্রের জল তুলে তা থেকে লবণ বের করে বস্তায় বস্তায় ভরে এই গুদামে জমা করা হত। তারপর এখান থেকে লরিতে চাপিয়ে সেই লবণ গ্রামেগঞ্জে পাঠানো হত। আমি তখন সদ্য জন্মাই, পরে এসব গল্প শুনেছি।

এখন কি ঘর ভোলা হয় না?

বছরে এক-আধদিন ঝাড়পোঁছ হয়। এই যে, ওদিকে দেখুন।

অর্জুনরা যেখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই জমিটা বেশ উঁচু। ফলে সামনের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে। বিষ্ণুদাসজি যেদিকে আঙুল তুললেন, সেদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে জল, দিঘি বলা যেতে পারে। জল কত গভীর তা বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন দেখল, কয়েকটা মাছরাঙা পাখি জলে ডুবছে আর উঠছে।

পাখিগুলোর নাম জানেন? বিষ্ণুদাসজি জিজ্ঞেস করলেন।

মাছরাঙা।

আজ্ঞে না। দিশি নাম জানি না, ইংরেজিতে ওদের বলে, হুইসলিং টিল। সারাদিন ঝিলেই থাকে, ডিম পাড়ে উঁচু জমির ঘাসের জঙ্গলে।

এই ঝিল নিশ্চয়ই আপনাদের নয়। পাঁচিলের ওপাশে রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

না। যাঁর ঝিল তিনি ভুবনেশ্বরে থাকেন। আশপাশের মানুষরা ওই ঝিলের জল ব্যবহার করা দূরের কথা, কাছাকাছি যায় না।

কারণ?

কুসংস্কার! ওদের ধারণা, এই ঝিলে প্রেতাত্মারা বাস করেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ তাদের দেখেছে।

আপনি, আপনি প্রেতাত্মা বিশ্বাস করেন? বিষ্ণুদাসজি যেন অবাক হলেন।

অর্জুন বলল, আমি বিশ্বাস করি না বললে কি আপনাদের গ্রামের লোক রাত-দুপুরে ঝিলে নামতে পারবে?

ওরা কেউ কিছু দ্যাখেনি, রশিকে সাপ ভেবে নিয়েছে।

আচ্ছা, আপনার পরিচিত বা অপরিচিত কোনও মানুষ কি ভগবানকে দেখেছেন? দ্যাখেননি। তাঁরা প্রচলিত মূর্তিকে ভগবান ভেবে নিয়ে মন্দির বানিয়েছেন।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর বিষ্ণুদাসজি নিচু গলায় বললেন, আপনি যখন অবিশ্বাস করছেন না, তখন একটা কথা বলি। ক্রমশ আমার মনে হচ্ছে, তেনারা আছেন। যাকগে, কেমন লাগল আমাদের বাগানটা?

খুউব ভাল। কিন্তু বিষ্ণুদাসজি, আমি এখনও বুঝতে পারছি না আপনার দাদা অত ব্যস্ত হয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?

যখন দেখা করতে গেলেন তখন কিছু বলেননি?

না। আপনি বললেন, ওঁর স্মৃতি কাজ করে না, হয়তো ভুলেই গিয়েছেন।

অস্বাভাবিক নয়। সকালে যখন ওঁকে আপনার কথা বললাম, তখন প্রথামতো চিনতেই পারছিলেন না। আমি অনেক বুঝিয়ে বলতে হয়তো আবছা আবছা মনে পড়ে গিয়েছিল। ওই যে বললাম, চল্লিশ বছর আগের ঘটনা পরিষ্কার মনে আছে ওঁর। অথচ গত কাল যদি কারও সঙ্গে আলাপ হয়, তা হলে আজ তাকে মনে রাখতে পারেন না। বিষ্ণুদাসজি হাসলেন, থাকুন দিন দুয়েক। বাই চান্স যদি মনে পড়ে যায়...।

উনি তো অবিবাহিত?

হ্যাঁ।

ওঁর পাশে যে মহিলাদের দেখলাম, তাঁরা আত্মীয়া?

না বলি কী করে? সারাক্ষণ ওরা দাদাকে আগলে রাখে।

কেন?

যদ্দিন দাদা বেঁচে থাকবেন, তদ্দিন ওরা আরামে থাকবে।

বুঝলাম। কিন্তু ওঁর বয়স হয়েছে, ওঁর মৃত্যুর পর আপনিই তো মালিক হবেন। এই বাড়ি, বাগান, আর যা-যা আছে সব আপনার হয়ে যাবে।

কে বলল? বিষ্ণুদাসজি দাঁড়িয়ে গেলেন।

আপনার দাদাই আজ আমাকে বলেছেন।

ওঃ। কাঁধ নাচালেন বিষ্ণুদাসজি, আজ বলেছেন? এখন গিয়ে আবার প্রসঙ্গ তুলুন, দেখবেন, সব ভুলে গিয়েছেন।

মুশকিল ব্যাপার।

হ্যাঁ। তবে আমার কোনও আগ্রহ নেই। দাদার সম্পত্তি, উনি যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়ে যেতে পারেন। উদাস গলায় বললেন বিষ্ণুদাসজি।

আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না, আপনি বলছেন, এসব আপনার দাদার সম্পত্তি। অথচ এগুলো পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন আপনারা। দেড়শো বছর আগে এই বাড়ি তৈরি হয়েছিল। আপনার ঠাকুরদা বাড়ির চারপাশে পাঁচিল দিয়েছিলেন। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া সম্পত্তিতে আপনার দাদার যেমন অধিকার আছে, তেমনি আপনারও আছে। অথচ আপনি বলছেন, এসব দাদার সম্পত্তি। কী করে সম্ভব?

বিষ্ণুদাসজি মাথা নাড়লেন, আপাতদৃষ্টিতে তাই হওয়া উচিত। কিন্তু জীবন তো সব সময় একই নিয়মে চলে না।

এই সময় ডাক্তারকে বিরক্ত মুখে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছে এসে তিনি বললেন, আমি যদি চিকিৎসা করার সুযোগ না পাই, তা হলে এখানে– থেকে কী করব?

বিষ্ণুদাসজি বললেন, আপনাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে?

আশ্চর্য! আমি কী ওষুধ বা ইঞ্জেকশন দেব, তা ওই মহিলারা ঠিক করবেন?

বুঝিয়ে বলুন।

আপনাদের হরিরামইঞ্জেকশন কিনেনা আসাপর্যন্ত আমি পেশেন্টকে ফেলে রাখতে পারি না। গত রাতে যেটা দিয়েছিলাম, তার কিছুটা রেখে দিয়েছিলাম। এখন সেটাই দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পেশেন্ট বায়না করলেন তিনি ইঞ্জেকশন নেবেন না। নিলেই নাকি তাঁর ঘুম পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওই মহিলারাও মাথা নাড়তে থাকলেন, ওই ইঞ্জেকশন দিতে হবে না, চব্বিশ ঘণ্টা উনি ঘুমিয়ে থাকুন তা তাঁরা চান না। এঁরা বুঝতেই পারছেন না, এখন ওঁর যতটা সময় সম্ভব ঘুমিয়ে থাকা উচিত। তা হলে নার্ভগুলো টেন্সড় হয়ে থাকবে না।

বিষ্ণুদাসজি বললেন, ওদের উচিত হয়নি বাধা দেওয়া। তবে গত রাতের লেক্ট ওভার তো বেশিক্ষণ কাজ করবে না। ছেড়ে দিন। হরিরাম ফিরলে আবার চিকিৎসা শুরু করবেন।

বিষ্ণুদাসজির কথা শেষ হতেই বাড়ির সামনে কিছু লোকের কথাবার্তা শোনা গেল। তিনি কী হচ্ছে দেখার জন্যে এগিয়ে যেতেই অর্জুন ডাক্তারকে বলল, আপনার মতো ডাক্তার এখন সচরাচর দেখা যায় না।

কেন? ডাক্তারের চোখে সন্দেহ।

নিজস্ব চেম্বার ছেড়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে একজন পেশেন্টের জন্যে থেকে গিয়েছেন, এটাকে মহানুভবতা ছাড়া কী বলব? অর্জুন হাসল।

ওসব আমি বুঝি না। আমি প্রফেশনাল লোক। এঁরা টাকা দিচ্ছেন বলে থেকে গিয়েছি। কিন্তু আমাকে যদি চিকিৎসা করতে বাধা দেওয়া হয়, তা হলে থাকা সম্ভব নয়। কথাগুলো বলে ডাক্তার আবার বাড়ির

ভিতর চলে গেলেন।

অর্জুন অলস পায়ে বাইরে এল। বিষ্ণুদাসজির সঙ্গে যাদের কথা হচ্ছে, তারা বিদ্যুৎ দপ্তরের লোক। বিষ্ণুদাসজি বলছিলেন, এ কী বলছেন? আমাদের পক্ষে রাত জেগে কি পাহারা দেওয়া সম্ভব?।

ওদের যিনি প্রধান, তিনি বললেন, আমাদের পক্ষেও রোজ-রোজ এসে কাটা তার জোড়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আশ্চর্য ব্যাপার, গোটা গ্রামের ইলেকট্রিক কানেকশন কেটে দেওয়া হচ্ছে, অথচ কেউ দেখতে পাচ্ছে না। ভোর হতে না-হতেই ফোন যাচ্ছে দপ্তরে, লাইন জুড়ে দিন। এটা যেন খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ শেষবার, বলে দিলাম।

লোকগুলো কাজ শুরু করলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কী?

আর বলবেন না! সন্ধের পরেই কারা এসে ইলেকট্রিকের তার কেটে দেয়।

কারা?

মাথা নাড়লেন বিষ্ণুদাসজি, বোঝা যাচ্ছে না।

আপনারা গ্রামের ছেলেদের নিয়ে পাহারাদারির দল তৈরি করছেন না কেন?

গ্রামে ছেলে কোথায়? ষোলো বছর হলেই সবাই কাজ খুঁজতে কলকাতা বা ভুবনেশ্বর চলে যায়। বিষ্ণুদাসজি ঘুরে দাঁড়ালেন।

আমি একটু গ্রামখানা ঘুরে দেখে আসি? অর্জুন পা বাড়াল।

তাড়াতাড়ি ফিরবেন। দাদা আবার কথা বলার জন্যে ব্যস্ত হতে পারেন! অর্জুন দেখল গ্রামটা। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ গ্রামের মতো এখানে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন। জলপাইগুড়িতে বেশ কয়েকটা দোকান চালায় ওড়িশার লোক। রান্নার ঠাকুর এবং তাদের হেলপাররাও তাই। বেঁচে থাকার জন্যে তাদের কোথায়-না-কোথায় যেতে হয়েছে। হঠাৎ সামনে একগাদা বাচ্চাকে হইহই করে ছুটে যেতে দেখল সে। খানিকটা দূরে একটি পাগল চিৎকার করছে, তার হাতে পাথর।

বোঝা গেল, বাচ্চারা পাগলটাকে উত্যক্ত করছিল বলে সে খেপে পাথর তুলেছে। অর্জুন ছেলেগুলোকে ধমক দিতেই রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটা লোক হেসে বলল, পাগলটা পাথর তোলে কিন্তু ছুঁড়ে মারে না।

যেদিন মারবে সেদিন এদের মাথা ফাটবে। বাচ্চাদের নিষেধ করেন না কেন?

নিষেধ করলে শুনবে নাকি! আপনি নতুন লোক বলে কিছু বলল না। এখান থেকে সরে গেল। কোন বাড়িতে এসেছেন?

তুলসীদাসজির বাড়িতে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি দুটো হাত জড়ো করে মাথায় ঠেকাল, উনি কেমন আছেন?

ভাল।

তা হলে তো ভালই। লোকটি পাশের বাড়িতে ঢুকে গেল।

একটু অবাক হল অর্জুন। গ্রামের নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে সে পুরো ব্যাপারটা ভেবে বুঝতেই পারছিল না, কেন তাকে এত দূরে ডেকে আনলেন তুলসীদাসজি। এখন পর্যন্ত তার কাছে এমন কোনও সমস্যা আনা হয়নি, যা এঁদের বিচলিত করছে। রাতের রাস্তায় কিছু রহস্যময় মানুষ এবং বিদ্যুতের তার কাটা ছাড়া আর কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা চোখে পড়ছে না। তুলসীদাসজি গত হলে তাঁর এই সম্পত্তির মালিক হবেন বিষ্ণুদাসজি। একথা তুলসীদাসজির মুখেই শুনেছে সে। আবার বিষ্ণুদাসজি বলেছেন, একই পিতার দুই সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তিনি সম্পত্তির অধিকার হারিয়েছেন। যদি পান তা হলে তুলসীদাসজির দয়ায় পাবেন। এজন্য তিনি অবশ্যই দাদার কাছে কৃতজ্ঞ। অতএব তাঁকে অপরাধী হিসেবে ভাবা যাচ্ছে না। অবশ্য আদৌ যদি এ বাড়িতে কোনও অপরাধ হয়ে থাকে। অর্জুনের শুধুই মনে হচ্ছিল, সে অনর্থক এখানে এসেছে!

হাঁটতে হাঁটতে সে অবাক হয়ে দেখল, সামনেই একটা ছোট্ট নদী। নদীর পারে বুনো গাছের ঝোঁপ, কিছুটা জঙ্গল। একটা সরু পায়েচলা পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নদীর গায়ে চলে গিয়েছে। সেই পথ দিয়ে এগিয়ে অর্জুন দেখল, নদীর জল প্রায় স্থির। স্রোত নেই বললেই চলে। চওড়াও বেশি নয়। তার উপর কচুরিপানায় ছেয়ে গিয়েছে ওধারটা। গ্রামের মানুষরা যে নদীকে অবহেলা করে, তা বুঝতে অসুবিধে হল না। অর্জুন একটা বড় গাছের ছায়ায় বসল। বসার পরেই সে একটা মাছরাঙাকে ছোঁ মেরে জল থেকে মাছ তুলে নিতে দেখল। পাখিটা উড়ে গেল ওপাশে। মাঝে মাঝে পাখি ডাকছে, এ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। এই যে সে বসে আছে, খুব কাছে না এলে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। হঠাৎ জলে শব্দ শুরু হল। সে মুখ বাড়িয়ে নদীর দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, একটা মাঝারি সাইজের মাছ পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার মুখে বঁড়শি গেঁথে থাকায় সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। মাছটাকে যে ছিপ দিয়ে ধরল, সে তুলে নেওয়ায় জল আবার স্থির হল। কাছাকাছি কেউ মাছ ধরছে সে বুঝতেই পারেনি। মাছধরা দেখতে তার সব সময় ভাল লাগে। অর্জুন উঠে বুনো ঝোঁপ এড়িয়ে খানিকটা যেতেই অবাক হয়ে গেল। মাছের মুখ থেকে বঁড়শিটা খুলে নিচ্ছে সেই পাগলটা, যার পিছনে গ্রামের বাচ্চাগুলো লেগেছিল। যে মানুষ পাগল হয়ে গিয়েছে তার পক্ষে কি মাছ ধরা সম্ভব?

অর্জুন দেখল, লোকটি মাছটাকে মেরে ফেলল। তারপর ছিপের সুতো গুটিয়ে সেটাকে একটা ঝোঁপের মধ্যে এমনভাবে লুকিয়ে রাখল, যাতে কারও চোখে না পড়ে। এবার একটা বস্তা থেকে ছুরি বের করে

আঁশ ছাড়িয়ে, পেট থেকে নাড়িভুড়ি বের করে নিল। তারপর চারটে পাথরের মাঝখানে শুকনো পাতা, শুকনো ডাল গুঁজে দিয়ে তার উপর লম্বা তিনটে ডাল দিয়ে মাচা তৈরি করে আগুন জ্বেলে দিল দেশলাই ঠুকে। এবার মাছটার দুটো টুকরো উপরের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়ামাত্র আগুনের শিখা তাদের স্পর্শ করল। অর্জুন চুপচাপ দেখছিল। বারবিকিউ-এর এমন সহজ ব্যবস্থা যে লোক জানে, সে কখনওই পাগল হতে পারে না।

মাছ ঝলসে নিয়ে একটা পাতার উপর রেখে ঝোলা থেকে কৌটো বের করে লোকটি মাথা নাড়ল। তারপর কৌটো খুলে একচিমটে নুন নিয়ে ঝলসে যাওয়া মাছের উপর ছড়িয়ে দিল। অর্জুন লক্ষ করল, একেবারে কাছে না এলে এই ঝোঁপের আড়াল ভেদ করে ওকে দেখা সম্ভব নয়।

লোকটি যখন মাছের টুকরো থেকে কাঁটা বেছে মুখে পুরেছে তখন ওর চোখ বুজে গেল। বোঝা গেল, অনেকক্ষণ সে অভুক্ত রয়েছে। অর্জুন হাঁটু মুড়ে বসে খুব নিচু গলায় বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি?

লোকটি চমকে এমনভাবে তাকাল যেন ভূত দেখেছে। অর্জুন হাসল, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আমি এখানে থাকি না। ক'দিনের জন্যে এসেছি। কিন্তু আপনি এখানে পাগলের ভান করে আছেন কেন?

লোকটি মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত মুখে পোরা মাছ চিবিয়ে গিলে ফেলল। সম্ভবত সে ভাবতে চেষ্টা করছিল তার কী করণীয়!

অর্জুন বলল, আমি আপনার কোনও ক্ষতি করব না। কিন্তু আপনি এখানে ছদ্মবেশে আছেন। যেভাবে মাছ ধরে আগুন জ্বেলে সেঁকে নিলেন, তা কোনও পাগল কখনওই করতে পারে না।

এবার লোকটি ধীরেসুস্থে দ্বিতীয় টুকরোটা তুলে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

আমার নাম অর্জুন। পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি শহরে থাকি।

বাঙালি?

হ্যাঁ।

এখানে কার কাছে এসেছেন?

তুলসীদাসজির বাড়িতে। উনিই অনুরোধ করেছিলেন আসার জন্যে।

কবে এসেছেন?

গতকাল।

অসত্য বলছেন। গত কাল সন্ধের আগে কোনও নতুন মানুষ গ্রামে আসেনি।

আমি সন্ধের পরে এসেছিলাম। তখন খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল।

আচ্ছা! কেউ আপনাকে বলেনি সন্ধের পর গ্রামে না ঢুকতে?

স্টেশনমাস্টার বলেছিলেন। কিন্তু কারণটা বলেননি।

লোকটি শেষ টুকরোটা খেয়ে নিয়ে বলল, আপনাকে অনুরোধ করছি, আজই ফিরে যান। এখানে থাকলে বিপদে পড়বেন। যেভাবে আপনি বুনন ঝোঁপের জঙ্গলে এসে আমার সঙ্গে কথা বলছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে, কৌতূহল একটু বেশি। এখানকার পরিস্থিতি কৌতূহলীদের পক্ষে বিপদজনক।

আমার মনে হচ্ছে আপনি এই গ্রামের বাসিন্দা নন?

পাগলদের কোনও ঘর থাকে না।

কিন্তু আমার পক্ষে চট করে যাওয়া সম্ভব নয়। তুলসীদাসজি আমার সাহায্য চেয়েছেন বলে আমি এখানে এসেছি। অর্জুন বলল।

আপনার সাহায্য? আপনি কীভাবে এখানে ওঁকে সাহায্য করবেন?

সত্যি কথা বলছি, আমি এখনও ওঁর সমস্যা কী তা জানি না। উনি বলার সুযোগ পাননি। সেটা জানার পর আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, থাকব না চলে যাব।

আপনার প্রফেশন কী?

অর্জুন হাসল, আপনি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানলেন, আমি আপনার সম্পর্কে কিছুই জানি না। তাই বিশ্বাস করে বলব কী করে?

লোকটি উঠে দাঁড়াল। ঝোলাটাকে পিঠে তুলে নিয়ে বলল, দয়া করে পিছন পিছন আসবেন না। আর আমার সঙ্গে যে কথা বলেছেন, তা কাউকে জানাবেন না।

ঠিক আছে। কিন্তু আপনার কাছে কিছু জানতে চাই।

বলুন।

কাল রাতে আমি যখন গ্রামে ঢুকছিলাম, তখন চারটে লোক বৃষ্টির মধ্যে বর্ষাতি পরে প্রায় ভৌতিক কাহিনির চরিত্রের মতো গ্রামে ঢুকেছিল। যদি ভুল না দেখে থাকি, তারা তুলসীদাসজির বাড়ির ভিতরে চলে গিয়েছিল। লোকগুলো কারা, কী করে, তা আপনি জানেন?

না। সন্ধের পরে আমি রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের ভোগ খেয়ে সেখানেই শুয়ে থাকি। আর অত রাতে তো জোর বৃষ্টি হচ্ছিল। মন্দিরের চাতাল থেকে বের হইনি।

প্রতি রাতে গ্রামের ইলেকট্রিক লাইন কারা কেটে দেয়?

পুরো গ্রামের নয়। একটা দিকের রাস্তায় বাড়িতে আলো জ্বলুক যারা চায়, তারাই লাইন কেটে দেয়।

তাদের আপনি চেনেন?

সেই চেষ্টাই তো করছি। লোকটি আর দাঁড়াল না।

অর্জুন চুপচাপনদীর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। যারা কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকে, তারা কখনও নিজেদের কষ্ট দেয় না। অপরাধী কি, ভয়ে সারাদিন পাগল সেজে থাকবে? তারা ভাল খাবার না খেয়ে নদী থেকে মাছ ধরে পুড়িয়ে খাবে না। এমন হতে পারে, ওড়িশা সরকার তাদের গোয়েন্দা দপ্তরের কোনও অফিসারকে কি এখানে পাঠিয়েছেন?

বাড়ি ফিরে এল অর্জুন। ফিরেই বংশীর মুখে শুনতে পেল, তুলসীদাসজি ঘুমিয়ে আছেন। বিষ্ণুদাসজি এবং ডাক্তার পাশের গ্রামে গিয়েছেন। উপরে উঠে নিজের ঘরে যাওয়ার মুখে অর্জুন অবাক হল। যে দুই মহিলাকে তুলসীদাসজির পাশে সকালে বসে থাকতে সে দেখেছিল, তাঁদের একজন প্যাসেজের একপাশে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। অর্জুন নমস্কার জানালে মহিলা ইশারায় তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। ওঁর পিছনে হেঁটে সে চলে এল তুলসীদাসজির শোওয়ার ঘরে। ভিতরে ঢুকে দেখল, তিনি খাটের উপর বাবু হয়ে বসে মন দিয়ে একটা চিঠি পড়ছেন। অর্জুনকে দেখে একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ঘুরতে বেরিয়েছিলেন শুনলাম।

অর্জুন একটা চেয়ার টেনে বসল, হ্যাঁ, ওই নদীর দিকটায় গিয়েছিলাম।

নদীর দিকে? এখানে নদী আছে তা কে বলল আপনাকে?

না না, কেউ বলেনি। হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম। দেখে খারাপ লাগল। এত সুন্দর নদীটাকে অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে। অর্জুন বলল।

ওই নদীকে স্থানীয় মানুষ ‘বিষনদী’ বলে মনে করে। কেউ ওর জল ব্যবহার করে না, মাছ পর্যন্ত ধরে না। তাই যত্ন নেওয়ার কথাও ভাবে না।

বিষনদী কেন?

চোখ বন্ধ করলেন তুলসীদাসজি, তা ধরুন, বছর পঞ্চাশেক আগের কথা। তখন নদীর জল মানুষ ব্যবহার করত, মাছ ধরত। পরিষ্কার রাখা হত নদীকে। হঠাৎ এক ভোরে দেখা গেল, নদীর জল লাল হয়ে গিয়েছে। রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে জলের সঙ্গে মিশে। পুলিশ এসেও রহস্যের সমাধান করতে পারল না। এই গ্রামের মাইল আড়াই দূরে একটা গভীর জঙ্গল আছে। নদীটা তার ভিতর দিয়ে বয়ে আসে। ওই জঙ্গলে হিংস্র পশু ছাড়াও জলে কুমিরের বাস বলে মানুষ কাঠ কাটতেও ভিতরে ঢুকত না। পুলিশ গিয়ে সাতটা মৃতদেহ বের করে নিয়ে এল। তাদের কুপিয়ে খুন করে শেষ রক্তের ফোঁটা জলে। মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারা খুন করেছে পুলিশ জানতে পারেনি। কিন্তু পরের বছর ওই একই সময়ে রক্ত ভাসল জলে। তবে পরিমাণে অল্প। পুলিশ গিয়ে দুটো মৃতদেহ নিয়ে এল। তাদের শরীরের আঘাত আগের বছরের মতোই। তার পরের বছর আবার একই কাণ্ড। এই মৃতদেহগুলোর পরিচয় জানা নেই। সেই থেকে আর এমন ঘটনা ঘটেনি বটে, কিন্তু যে নদীর জলে রক্ত মিশে থাকে তা বর্জন করেছে এই গ্রামের মানুষ। এখানে সবাই কৃষ্ণের পূজারি। পূর্বপুরুষদের মুখে শুনেছি যে, স্বয়ং চৈতন্যদেব এই গ্রামে পদার্পণ করেছিলেন। আমরা সবাই খুব শান্তিতে ছিলাম। একটানা কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগলেন বৃদ্ধ। পাশে দাঁড়ানো একজন মহিলা তাঁর পিঠে চাপ দিয়ে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, এতদিন শান্তি ছিল, এখন নেই কেন?

দ্বিতীয় মহিলা নিচু স্বরে বললেন, আজ অনেক কথা বলা হয়েছে। বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে না হয় কথা বলা যেতে পারে।

তুলসীদাসজি মাথা নাড়লেন, না। ইনি সেই উত্তরবাংলা থেকে আমার ডাকে এত দূরে এসেছেন। কথা তো বলতেই হবে। তোমরা চিন্তা কোরো না, আমি ঠিক আছি।

অর্জুন বলল, ঠিক আছে, আমরা বিকেলে কথা বললে এমন কিছু অসুবিধে হবে না।

হবে। এখন এই বাড়িতে আমরা ছাড়া কেউ নেই। আমি চাই না পঞ্চম ব্যক্তি আমার কথা শুনুক। একটু বসুন। তুলসীদাসজি ইশারা করতেই একজন মহিলা টেবিল থেকে ইনহেলার এনে দিলেন। সেটা গলায় ঢুকিয়ে কয়েকবার পাম্প করে জোরে শ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বললেন, বাঃ, বেশ ভাল লাগছে।

দুই মহিলার একজন অন্যজনকে ইশারা করতে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তুলসীদাসজি খুশি হলেন, ঠিক করেছ। কেউ এলে ও জানান দিতে পারবে।

খানিকটা সময় চুপ করে থেকে তুলসীদাসজি বললেন, আমার বয়স হয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে একসময় মরতে হয়, আমিও মরব, একথা আমার জানা। কিন্তু আমি অপঘাতে মরতে চাই না।

আপনার কি ভয় হচ্ছে সেরকম কিছু হতে পারে?

হ্যাঁ। আমি অ্যাজমার পেশেন্ট। কিন্তু আমার পূর্বপুরুষেব কারও অ্যাজমা ছিল না। আমার ভাইয়েরও না। বছর পাঁচেক আগে আমার দুটো হাতে একজিমা হয়েছিল। কীভাবে হল জানি না। ডাক্তার প্রথমে ভেবেছিলেন অ্যালার্জি। কিছুতেই সারছিল না। বছর দুয়েক ভুগলাম। তখন হাতের চেহারা এমন যে, বাইরের লোককে দেখাতে লজ্জা হয়। তখন বিষ্ণু ফিরে এসেছে। ও আমাকে ভুবনেশ্বরে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। তিনি সব দেখেশুনে ওষুধ দিলেন। দশদিনের মাথায় সব একজিমা উধাও হয়ে গেল। হাত একদম .. পরিষ্কার। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে শ্বাসের কষ্ট শুরু হল। লোকাল ডাক্তার দেখে বললেন, আপনার অ্যাজমা হয়েছে। ভুবনেশ্বরে গেলাম। সেখানেও তাই শুনলাম। এই যে ডাক্তার দয়া করে এখানে এসেছেন, তিনি দেখে বললেন, অতিরিক্ত স্টেরয়েড খাওয়ার জন্যে আমার অ্যাজমা হয়েছে। নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে, শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে ইনহেলার ব্যবহার করতে হবে। তখন থেকে ওঁর চিকিৎসায় আছি। একটা অসুখ আর-একটা অসুখকে টেনে নিয়ে আসে। আমার শরীর এখন অসুখে অসুখে জীর্ণ।

আমি শুনেছি ডাক্তাররা সচরাচর বাধ্য না হলে স্টেরয়েড দিতে চান না। কিন্তু এর সঙ্গে অপঘাতে মৃত্যুর তো সম্পর্ক নেই। অর্জুন বলল।

আপাতদৃষ্টিতে নেই। বিষ্ণু এখানে আসার আগে সেরকম ভাবনা আমার মনে ছিল না। ক্রমশ মনে হচ্ছে, তার উপস্থিতি কারও বা কাদের পছন্দ হচ্ছে না। সে এখানে ফিরে আসার পর এবাড়ি তো বটেই, এই গ্রামের আবহাওয়া বদলে গিয়েছে। সন্ধে নামলেই মনে হয়, মৃত্যু থাবা বাড়াচ্ছে। গ্রামের মানুষজন ভূত-পেতনিতে বিশ্বাস করে। তাদের অনেকেই নাকি রাতে ভৌতিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। তারপর থেকে কেউ রাত নামলে আর বাড়ির বাইরে ভয়ে বের হয় না। কিন্তু ভূত আর যাই পারুক, ইলেকট্রিকের তার কাটতে পারবে না। আমার বিশ্বাস, কোনও একটি দল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রামকে দখল করতে চাইছে। এখনও তারা দিনেরবেলায় দেখা দেয়নি। আমার এই বাড়ির বাগানে তাদের রাতে আসা-যাওয়া আছে। কী চাইছে তারা আমি জানতে চাই। তাদের উদ্দেশ্য কি আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া? তাই যদি হয়, যে-কোনও রাতেই তারা সেটা করতে পারত। তা হলে তাদের উদ্দেশ্য কী? তাকালেন তুলসীদাসজি।

আপনি কি সেই কারণেই আমাকে এখানে এনেছেন?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিলে...! অর্জুন অন্য কথায় গেল, আপনার বাবা বিষ্ণুদাসজিকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। অথচ আপনি তাকে এতদিন পর ফিরিয়ে এনেছেন? ব্যাপারটা জানতে পারি?

তুলসীদাসজি আবার ইনহেলার ব্যবহার করলেন। ইশারায় পাশে দাঁড়ানো। মহিলাকে বললেন কথা বলতে। মহিলা বললেন, অল্প বয়সে কুসংসর্গে পড়েছিল বিষ্ণু। ভুবনেশ্বরে পড়তে গিয়ে যাদের সঙ্গে মিশত, তারা মোটেই ভাল ছেলে ছিল না। এসব কথা এ বাড়িতে কেউ জানত না। জানল, যখন পুলিশ

এল। তারা দু'জন অপরাধীকে খুঁজছে, যাদের বন্ধু হল বিষ্ণু। বিষ্ণুকেও পাওয়া যাচ্ছে না। সে হস্টেলে নেই। খোঁজার কারণ হল, বিষ্ণুর দুই বন্ধু একজন বড় ব্যবসায়ীকে খুন করে অনেক টাকা লুঠ করেছে। পুলিশ চলে যেতে কর্তাবাবা গুম হয়ে রইলেন। কারও সঙ্গে কথা বললেন না। ঠিক তিন রাত পর বিষ্ণু ওই দুই বন্ধুকে নিয়ে হাজির হল এখানে। দাদার হাতে-পায়ে ধরে বাগানের পিছনে গুদামঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকল। কর্তাবাবা এই খবর পাননি। তিনি বাগানের ওদিকটায় যেতেন না। দরোয়ান, কাজের লোকদের দাদা নিষেধ করে দিলেন, তাঁকে বিষ্ণুর খবর দিতে। লুকিয়ে দু'বেলা খাবার দেওয়া হত ওদের। কিন্তু দু'জন খুনি অপরাধী এই বাড়িতে লুকিয়ে থাকবে তাও দাদা মেনে নিতে পারছিলেন না। ওঁর চাপেই বিষ্ণু ছেলে দুটোকে এখান থেকে চলে যেতে বলল। তারা চলে যায় বাধ্য হয়ে। বিষ্ণু রাতে বাড়ির বাইরে যেত। তখন এখানকার স্টেশনমাস্টার ছিলেন একজন তামিল ভদ্রলোক। তিনি পুলিশকে খবর দিয়ে ওকে ধরিয়ে দেন। বিষ্ণু এই গ্রামের স্টেশন থেকেই ধরা পড়েছে জেনে কর্তাবাবা খেপে গেলেন। তিনি ওকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করলেন। শুধু তাই নয়, ভুবনেশ্বরে গিয়ে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে ঘোষণাটাকে আইনগত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুশকিল হল, যেহেতু এসব সম্পত্তি কর্তাবাবা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন, তাই তিনি চাইলেও তাঁর ছেলেমেয়েদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না। তা ছাড়া ত্যাজ্যপুত্র ব্যাপারটা আইন ঠিকঠাক মেনে নেবে বলে উকিলবাবুর মনে হল না। কর্তাবাবা খুব ভেঙে পড়লেন। দাদা তখন উকিল দিয়ে বিষ্ণুর হয়ে মামলা লড়ে শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়ে আনতে পারলেন। দাদা কর্তাবাবাকে অনেক বোঝানোর পর তিনি বিষ্ণুকে থাকতে দিলেন একটা শর্তে। বিষ্ণুকে স্ট্যাম্পপেপারে লিখে দিতে হবে, এই পরিবারের সম্পত্তির উপর তার যাবতীয় অধিকার সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছে। কোনওদিন সে সামান্য অংশ দাবি করবে না। বিষ্ণু রাজি হল। কর্তাবাবা বিষ্ণুর সঙ্গে কথা বলতেন না। দাদা তাকে পড়াশুনো আবার শুরু করার জন্যে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। সেখানকার কলেজে ভরতি হয় সে। দাদাই টাকা পাঠাতেন মানিঅর্ডার করে। একবার গ্রামের একজন কলকাতায় যাচ্ছে জেনে তার হাতে দাদা টাকা পাঠান বিষ্ণুকে দেওয়ার জন্যে। সে ওখান থেকে ফোন করে জানায়, বিষ্ণু হস্টেলে থাকে না। প্রতি মাসের প্রথমে এসে মানিঅর্ডারের টাকা নিয়ে যায়। খবর নিয়ে জানা গেল যে, বিষ্ণু খিদিরপুর অঞ্চলে থাকে। একটা বস্তিতে। সেখানে সে বিয়ে করে সংসার করছে। খবর শোনামাত্র দাদা কলকাতায় যান। হস্টেলের দরোয়ানের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বিষ্ণুর বাড়িতে গিয়ে আবিষ্কার করেন, ওর স্ত্রী তেলুগু। ধরা পড়ে বিষ্ণু মুখ নিচু করে বসে থাকে। দাদা ফিরে আসেন, কিন্তু খবরটা কর্তাবাবাকে জানালেন না। তারপর বেশ কিছুকাল ওর কোনও খবর এখানে আসেনি। কর্তাবাবা দেহ রাখলেন। তিনি অনেক চেষ্টা করেও দাদাকে বিয়ে করতে রাজি করাতে পারেননি। আমি বিধবা হওয়ার পর বাবা আমাকে এখানে এনেছিলেন। দিদিকেও দাদা নিয়ে এলেন ওর স্বামী চলে যাওয়ার পর। ভদ্রমহিলা কথা শেষ করলেন।

কিন্তু বিষ্ণুদাসজিকে আবার খুঁজে পেলেন কী করে? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

তুলসীদাসজি বোনের দিকে তাকালেন। ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, ও হায়দরাবাদের জেলে ছিল। আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামের একজন ওই জেলে রাঁধুনির কাজ করত। বিষ্ণুর কথা জানতে পেরে সে আমাদের জানায়। খোঁজখবর নিয়ে দাদা জানতে পারেন, খবরটা সত্যি। ছ'মাসের জেল হয়েছিল তার। মেয়াদ শেষ হতে দু'সপ্তাহ দেরি ছিল। দাদা হায়দরাবাদে চলে যান। দাদাকে দেখে ভেঙে পড়ে বিষ্ণু। বলে, তিনি

যদি আশ্রয় দেন তা হলে সে বাকি জীবন সৎপথে থাকবে। মেয়াদ শেষ হলে দাদা বিষ্ণুকে এখানে নিয়ে আসেন।

এখানে আসার পর উনি কি কখনও বাইরে গিয়েছেন?

একা যায়নি। দাদাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্যে ভুবনেশ্বরে গিয়েছে। ও যে পুরোপুরি বদলে গিয়েছে, তাতে আমাদের কারও সন্দেহ নেই।

অর্জুন মাথা নাড়ল, ওঁর স্ত্রী সঙ্গে আসেননি?

ওদের নাকি ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে।

আইনসম্মতভাবে?

তা জানি না। ও বলেছে, আর কোনও সম্পর্ক নেই।

এবার তুলসীদাসজি বললেন, এই হল এ বাড়ির ইতিহাস। আমরা খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ। কিছুদিন হল যে ভৌতিক কাণ্ড এই গ্রামে ঘটছে, তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমার শুধুই মনে হচ্ছে, আয়ু আর বেশিদিন নেই। কিন্তু আমি অপঘাতে মারা যেতে চাই না।

অর্জুন সোজা হয়ে বসল, এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?

স্বচ্ছন্দে করতে পারেন।

আপনি ডাক্তারকে ভুল বোঝাতে চেষ্টা করছেন কেন?

আমি কী ভুল বোঝাব?

ডাক্তারের বিশ্বাস, আপনি অতীতের কিছু কথা স্পষ্ট মনে করতে পারেন, কিন্তু গত কাল কী বলেছিলেন বা করেছিলেন তা আজ কিছুতেই মনে করতে পারেন না। এটা একটা ভয়ংকর অসুখ। এরকম পেশেন্টকে সুস্থ করা প্রায় অসম্ভব। এরকম পেশেন্টরা ধীরে ধীরে কথা বলা বন্ধ করেন। বললেও, খুব কাছের মানুষকে চিনতে পারেন না। আপনার ক্ষেত্রে এরকম হলে আপনি ওঁর নামও ভুলে যাবেন, উনি কে তা নিয়ে একটুও ভাববেন না। ডাক্তার মনে করছেন আপনি সেদিকে এগোচ্ছেন। তাঁর এই মনে করাটা সম্ভব হয়েছে। আপনার আচরণের জন্যে। আপনি নিশ্চয়ই ওঁকে বিভ্রান্ত করতে অভিনয় করছেন। আমি যে গত রাতে এই বাড়িতে এসেছি, তা আপনার বেমালুম ভুলে যাওয়ার কথা। কিন্তু আজ সকালে আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ভুলে যাননি। আপনার অসুখের অন্যতম কারণ নাকি টেনশন। আমি এসেছি খবর পেয়ে এক মুহূর্তে টেনশন এত লোপ পেয়ে গেল যে, কাল রাতে ঘুমের ওষুধ ছাড়াই আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ওঁরা খুশি হয়েছেন খবরটা শুনে। কিন্তু এটা তো সত্যি নয়!

মাথা নাড়লেন তুলসীদাসজি, ঠিক। একদম ঠিক। আসলে আমি এখন আমার বোনদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি যত বলি ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ো না, ওরা কানেই তুলছে না।

হয়তো ঘুমের ইঞ্জেকশনই আপনাকে সাহায্য করতে পারে। আপনি যদি ভুল সিম্পটম বলে ডাক্তারকে বিভ্রান্ত করেন, তা হলে...! কথা শেষ করল না অর্জুন।

এতে কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে না। উলটে মজাই পাচ্ছি।

কীরকম?

ডাক্তার, ভাই, কাজের লোকজন মনে করছে যে, সকালের কথা বিকেলে ভুলে গিয়েছি। তাই যে-যার ইচ্ছেমতো আমাকে বোঝাচ্ছে। হাসলেন তুলসীদাসজি।

ভদ্রমহিলা বললেন, আসল কথাটা বলা হয়নি...!

তুমি বলো। তুলসীদাসজি বললেন।

এই যে ঘটনাগুলো গ্রামে ঘটছে, সেগুলো কি ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে হয়? ভদ্রমহিলা অর্জুনের দিকে তাকালেন।

দেখুন, ইলেকট্রিকের লাইন কেটে ফেলা আর রাতবিরেতে রাস্তায় রহস্যজনক কিছু মানুষের চলাফেরা ছাড়া তো অন্য কোনও ঘটনার কথা আমি শুনিনি। কোনও খুনখারাপি অথবা মারধরের মতো ঘটনা কি ঘটেছে? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

না।

ঠিক আছে। আমাকে একটু ভাবতে হবে। অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

এই সময় দ্বিতীয় মহিলা ঘরে ফিরে এলেন, হরিরাম ফিরে এসেছে।

তুলসীদাসজির মুখে হাসি ফুটল, ওষুধ পেয়েছে?

গেট পেরিয়ে ঢুকতে দেখলাম। নিশ্চয়ই পেয়েছে।

তুলসীদাসজি বললেন, আপনাকে যেসব কথা বললাম, তা যেন গোপন থাকে।

নিশ্চয়ই, এটা আমার পেশা।

আপনার কোনও অসুবিধে হলে বংশীকে বলবেন।

আপনি চিন্তা করবেন না।

হরিরাম ঢুকল। তাকে খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল। দ্বিতীয় মহিলা একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন, বোস। ওষুধ পেয়েছিস?

হ্যাঁ, পেয়েই একটা লরি ধরে চলে এলাম। কেমন আছেন?

প্রশ্নটা তুলসীদাসজিকে। তিনি জবাব দিলেন না। গম্ভীর মুখে অন্য দিকে তাকালেন।

দ্বিতীয় মহিলা একটু জোরে তুলসীদাসজিকে বললেন, হরিরাম ভুবনেশ্বর থেকে আপনার ওষুধ এনে দিয়েছে।

কেন? ওষুধ কেন? কী হয়েছে ওর?

দ্বিতীয় মহিলা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হরিরাম হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে বলল, থাক। ভুলে গিয়েছেন এর মধ্যেই।

প্রথম মহিলা বললেন, তুই যা। হাতে-মুখে জল দিয়ে কিছু খেয়ে বিশ্রাম কর। কাল থেকে অনেক ধকল গিয়েছে তোর।

হরিরাম উঠল। অর্জুনও ওর সঙ্গে বেরিয়ে এল। হরিরাম হাসল, তা হলে আপনি ওই দুর্যোগের মধ্যে বাড়ি খুঁজে পেয়েছেন?

হাঁটতে হাঁটতে অর্জুন বলল, আপনি যেভাবে ডিরেকশন দিয়েছিলেন, তাতে ভুল করার কোনও সুযোগ ছিল না।

ওরা সিঁড়ির কাছে চলে এসেছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল বংশী। বলল, আপনার জলখাবার ঠান্ডা হয়ে আসছে। ঘরে দিয়ে দেব?

দাও। অর্জুন বলল।

আমাকেও দাও। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। পরে হাত-মুখ ধোব।

তা হলে তুমি নতুনবাবুর ঘরে গিয়ে বসো। বংশী নীচে নেমে গেল।

হরিরাম অর্জুনের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে হরিরাম জিজ্ঞেস করল, রাস্তায় নিশ্চয়ই ঝড়-বৃষ্টি পেয়েছিলেন? কোনও মানুষের দেখা পাওয়ার কথা নয়। আপনি দেখছি বেশ লাকি লোক।

ভুবনেশ্বরে কখন পৌঁছোলেন?

ভোররাতে। একটা দোকান চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। সেখানেই ওষুধ পেলাম।

আপনি কিন্তু তুলসীদাসজিকে ওষুধ দিতে ভুলে গিয়েছেন?

কী করে দেব? ওষুধ তো আমার কাছে নেই।

বুঝলাম না। আপনি বললেন ওষুধ এনেছেন।

হ্যাঁ। গ্রামে ঢুকতেই ডাক্তারবাবু আর ছোটমামার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওষুধ পেয়েছি শুনে ডাক্তারবাবু দেখতে চাইলেন। আমি প্যাকেটটা ওঁকে দিতে উনি নিজের কাছে রেখে দিলেন। হরিরাম বলল।

ও। উনি ওখানে কী করছিলেন?

বোধহয় বেড়াতে বেড়াতে ওদিকে গিয়েছিলেন।

ওষুধের নাম আপনার মনে আছে?

নাম? না। খটোমটো শব্দ। ওষুধ মানে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল নয়, ইঞ্জেকশন। ও হো, দাঁড়ান, যে কাগজে ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছিলেন সেটা আমার কাছেই আছে। হরিরাম পকেট থেকে একটা পার্স বের করে তার ভিতর থেকে প্রেসক্রিপশনের কাগজটা তুলে এগিয়ে ধরল।

ওটা নিয়ে ভাঁজ খুলল অর্জুন। ডাক্তারের প্যাডে তুলসীদাসজির নাম লেখা। ইঞ্জেকশনের নাম পড়তে গিয়ে হিমশিম খেল সে। এত জড়ানো লেখা যে অক্ষরগুলো স্পষ্ট হচ্ছিল না। ডাক্তারদের হাতের লেখা একমাত্র ওষুধবিক্রেতারাই পড়তে পারে। অনেক চেষ্টায় প্রথম অক্ষরটা 'এন' বলে মনে হতে অর্জুন অনুমান করল, ওটা নিওরো জাতীয় কোনও শব্দ। সে জিজ্ঞেস করল, ক্যাশমেমো নেই?

ও হ্যাঁ। আছে। বুকপকেট থেকে সেটা বের করে দিল হরিরাম।

ক্যাশ মেমোতেও জড়ানো লেখা, তবু তার অনুমানই ঠিক। নিওরো পড়তে অসুবিধে হচ্ছে না। কদমতলার চৌধুরী মেডিক্যাল স্টোর্সে বসে রামদার সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে অনেক ওষুধের নাম সে শুনেছে। নার্ভের অসুখে বোধহয় এই ধরনের ট্যাবলেট বা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

বংশী এল ট্রে-তে দুটো প্লেটে লুচি এবং তরকারিতে সাজিয়ে। বলল, ক্ষীর আনছি। চা খাবেন তো?

অর্জুন মাথা নাড়ল, চা খাব। কিন্তু আমার জন্যে ক্ষীর আনতে হবে না।

হরিরাম হেসে ফেলল, আমি কিন্তু না বলব না।

হরিরামকে পছন্দ হল অর্জুনের। আপাতদৃষ্টিতে ওকে বেশ সহজ-সরল বলে মনে হচ্ছিল। খেতে খেতে অর্জুন আচমকা প্রশ্ন করল, আপনি ভূত আছে বলে মনে করেন?

নেই ভাবলে খারাপ লাগত। যেমন, ভগবান নেই বললে মায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। কিন্তু এখন এই গ্রামে যা হচ্ছে, তাতে রাত নামলেই মনে হয় ভূত আছে।

মনে হয়? হরিরাম জিজ্ঞাসা করল, কাল এ বাড়িতে আসার সময় দ্যাখেননি, চারপাশ কীরকম ভয়ংকর ভৌতিক হয়ে উঠেছিল। তার উপর কাল তো বৃষ্টি পড়ছিল।

আপনি অল্প বয়সে এই বাড়িতে এসেছেন?

অনেকবার। প্রত্যেক গরমের ছুটিতে মায়ের সঙ্গে চলে আসতাম।

তখন এখানকার রাতগুলোকে ভৌতিক বলে মনে হত?

দুর! তখন সব কিছু স্বাভাবিক ছিল।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। হরিরাম ক্ষীর নিল বলে চা ফিরিয়ে দিল। অর্জুন চা খেয়ে উঠে দাঁড়াল, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি একটু ঘুরে আসি।

আপনি যদি চান আমি সঙ্গে যেতে পারি!

না, থাক।

৩. স্টেশন থেকে বাড়িতে

কাল যে পথ দিয়ে স্টেশন থেকে এ বাড়িতে এসেছিল, সেই পথে হাঁটতে শুরু করল অর্জুন। রাস্তা ফাঁকা বলাই ঠিক, দু-চারজন কাজে-কর্মে বেরিয়েছে। তারা অবাক হয়ে অর্জুনকে দেখছে। হাঁটতে হাঁটতে সেই বিশাল গাছের পাশে এসে দাঁড়াল সে। গত রাতে এখানেই সে বৃষ্টির জল এড়াতে দাঁড়িয়ে ছিল। এখানে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের আলোয় সেই চারজনকে দেখতে পেয়েছিল। এখন মনে হল, ওরা নির্ঘাত ওপাশের মাঠ ভেঙে এসে রাস্তায় উঠেছিল। মাঠের দিকে তাকিয়ে খানিকটা জঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। অর্জুন মাথা নাড়ল। কৌতূহলী হয়ে ওদিকটা দেখতে যাওয়া ঠিক হবে না। যারা সারারাত এই গ্রামে রাজত্ব করে, তারা দিনেরবেলায় চোখ বন্ধ করে বসে থাকার মতো বোকামি নিশ্চয়ই করবে না।

স্টেশনে এল অর্জুন। প্ল্যাটফর্মে একটা গোরু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে।

স্টেশনমাস্টারের ঘরে উঁকি মারল সে। ভদ্রলোক খালি গায়ে লুঙ্গি পরে একটা খাতায় কিছু লিখছেন। সে জিজ্ঞেস করল, ভাল আছেন?

মুখ ফিরিয়ে দেখে নিয়ে স্টেশনমাস্টার বললেন, তা হলে বেঁচে আছেন?

মরে যাওয়ার মতো কোনও ঘটনা তো ঘটেনি। অর্জুন ভিতরে ঢুকল।

আপনার ভাগ্য ভাল বলতেই হবে।

বসতে পারি?

ভিতরের ঘরে গিয়ে বসুন। আমি কাজ শেষ করে আসছি।

অর্জুন ভিতরের ঘরে চলে এল। বোঝা যাচ্ছে, এই ঘরটাই স্টেশনমাস্টারের শোওয়া এবং রান্নার ঘর। পাশে একটা বাকথরুম-কাম-ল্যাট্রিনও রয়েছে। মিনিটখানেক পরে স্টেশনমাস্টার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, চা খাবেন?

না। একটু আগে খেয়েছি।

ঘণ্টাদেড়েক পর একটা ট্রেন আসছে ভুবনেশ্বর থেকে। হরিরাম বোধহয় ওই ট্রেনে ওষুধ নিয়ে ফিরবে। তুলসীদাসজি কেমন আছেন?

ভাল।

খুব খারাপ লাগে। শুনলাম, ওঁর স্মৃতিশক্তি একদম লোপ পেয়ে গিয়েছে। আপনাকে কী বললেন? স্টেশনমাস্টার তাকালেন।

আমাকে উনি সত্যি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কি না এখন সন্দেহ হচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি কারও স্মৃতিবিভ্রম হতে পারে? ওঁর ভাই-বোনেরা জানতেন বলে আমি আতিথ্য পেয়েছি।

তা হলে আজ ঠিকই শুনেছি।

কার কাছে শুনলেন?

যে ডাক্তার ওঁর চিকিৎসার জন্যে এই গ্রামে রয়ে গিয়েছেন, তিনি স্টেশনে এসেছিলেন ভুবনেশ্বরে ফিরে যাওয়ার ট্রেনের সময় জানতে। তিনিই বললেন, অবস্থার খুব দ্রুত অবনতি হচ্ছে। স্টেশনমাস্টার মাথা নাড়লেন, তা হলে আপনার এখানে আসা বৃথা হল?

মনে তো হচ্ছে।

যে ডেকেছে সে যদি মনে করতে পারে, তা হলে থেকে কী করবেন? আবহাওয়া আরও খারাপ হওয়ার আগেই চলে যান।

আচ্ছা, আপনি তো একজন সরকারি অফিসার, এখানে অনেকদিন আছেন। হঠাৎ গ্রামটার আবহাওয়া খারাপ হল কেন বলুন তো?

আপনি কী করে ভাবলেন, জানলেও আমি বলব? আপনি অচেনা অজানা মানুষ। মুখ খুললে বিপদে পড়ব না এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। স্টেশনমাস্টার কথা শেষ করামাত্র একটা মিহি স্বর ভেসে এল, মাস্টার, দরজাটা খুলুন।

এত সরু গলা, কিন্তু তা মেয়েদের নয়। মাস্টার মাথা নাড়লেন, এই সময় হঠাৎ এল? আপনি এখানে চুপচাপ বসে থাকুন। কোনও শব্দ করবেন না। ফিসফিস করে বললেন স্টেশনমাস্টার। তারপর গলা তুলে বললেন, এক মিনিট, আসছি।

একটু পরে স্টেশনমাস্টারের গলা কানে এল অর্জুনের, আরে। আসুন, আসুন।

মিহি গলা জিজ্ঞেস করল, কী করা হচ্ছিল?

বাথরুমে গিয়েছিলাম।

হুঁ। আজ রাতে মেল ট্রেনটাকে এখানে এক মিনিটের জন্যে দাঁড় করাতে হবে।

মেল ট্রেন? এখানে তো দাঁড়ায় না।

দাঁড়ালে আমি এখানে আসব কেন? মিহি হাসি শোনা গেল, ওই লাল পতাকা আর লণ্ঠন দেখলেই অত বড় ট্রেনটা জিভ বের করে দাঁড়িয়ে যাবে।

শুনুন। আমার কোনও অধিকার নেই মেল ট্রেনকে এখানে দাঁড় করানোর। যদি করি, তা হলে হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে। সন্তুষ্ট না হলে কর্তৃপক্ষ আমাকে সাসপেন্ড করবেই। গরিবের চাকরিটা চলে গেলে আপনাদের কী লাভ হবে?

ট্রেনটা আসছে তা আপনি কখন জানতে পারবেন?

জংশন ছাড়লেই আমাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

তা হলে বলি, আপনাকে একটু কষ্ট দিতে বাধ্য হব। মেল ট্রেন জংশন ছাড়লেই আপনি প্ল্যাটফর্মের উপর হ্যাঁজাকটাকে রেখে দেবেন। ওর আলো দেখতে পেলে বুঝতে পারব মেল ট্রেন আসছে। ভুল যেন না হয়।

কিন্তু...!

আপনি যখন পারবেন না তখন বাকিটা আমরাই করে নেব।

দেখুন, এটা ঠিক হচ্ছে না।

ঠিক-বেঠিক আমরা আপনার কাছে শিখব না। অন্য কেউ হলে এত কথা আমাকে বলতে হত না। কিন্তু স্টেশনমাস্টার হওয়ায় আপনাকে আমাদের প্রয়োজন আছে। দয়া করে এসব কথা উপরমহলকে জানানোর মতো ভুল করবেন না। ঠিক আছে?

খানিক পর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ হল। স্টেশনমাস্টার ফিরে এলেন। তাঁর মুখ প্রায় রক্তশূন্য। হাত কাঁপছিল। অর্জুন বলল, আপনি বসুন।

স্টেশনমাস্টার বসলেন। অর্জুন কুঁজো থেকে জল গ্লাসে ঢেলে এগিয়ে দিল। ভদ্রলোক চটপট জল খেয়ে নিলেন। নিয়ে মাথা নাড়লেন, গত কয়েক মাস ধরে আমি চার-চারটে দরখাস্ত করেছি বদলির জন্যে, ওরা পাত্তাই দিচ্ছে না। কী যে করি!

মেল ট্রেনটা কখন এখান দিয়ে যায়?

অ্যাঁ! আপনার কী দরকার?

আপনি তো আমাকে কিছু বলেননি। ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি নিজেই শুনেছি। অর্জুন বলল, হ্যাঁ, কখন ট্রেনটা যায়?

রাত দশটা-দশটা এক। তবে মাঝে মাঝে লেট করে।

তার আগের ট্রেন?

সন্ধে সাতটায়। স্টেশনমাস্টার বললেন, ওটা লোকাল ট্রেন।

মেল ট্রেন শেষ কোথায় থামে?

আপনি কী চাইছেন বলুন তো?

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, দুপুরের পর এখান থেকে ওদিকে যাওয়ার ট্রেন আছে?

আছে। তিনটের সময়।

স্টেশনমাস্টারকে বিহ্বল অবস্থায় রেখে অর্জুন বেরিয়ে এল। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। তুলসীদাসজির বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল সে। কিছু দূর যাওয়ার পর বাচ্চাদের গলার হইচই চিৎকার শুনতে পেল সে। বাঁক ঘুরতেই সে দেখতে পেল, পাগলটি দৌড়ে আসছে আর তার পিছনে মজা পেয়ে ছুটছে কয়েকটা বাচ্চা, কেউ-কেউ ঢিল ছুড়ছে। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন ছোটখাটো একজন মানুষ। ধমক দিলেন বাচ্চাদের, অ্যাই কী হচ্ছে? পাগলের পিছনে কেন লাগছ? যাও, বাড়ি যাও। পাজির পাঝাড়া ছেলে সব।

ছেলেগুলো থমকে গেল। তারপর দৌড়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল। অর্জুন অবাক হয়ে গেল। এই কণ্ঠস্বর একটু আগে সে শুনেছে। স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে যে লোকটি কথা বলছিলেন, তিনি অবশ্যই এই ব্যক্তি। পাগল ততক্ষণে তার পাশে এসে দু'হাত মাথার উপর তুলে অভিযোগ জানাচ্ছিল। অর্জুন বলল, ঠিক আছে। আর ভয় নেই। আপনি আপনার বাড়িতে চলে যান।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাড়িতে থাকলেই তো হয়! কিন্তু বাড়ি থাকলে তো থাকবে! শুনলাম, এই পাগলটাকে কয়েকদিন আগেও কেউ এখানে দ্যাখেনি। কোত্থেকে এটা এসে জুটল কে জানে? কিন্তু আপনাকেও তো প্রথমবার দেখছি। অর্জুনের দিকে তাকালেন বিরক্ত লোকটি।

হ্যাঁ। আমাদের এই প্রথম দেখা হল। আপনি এই গ্রামেই থাকেন?

আমার চোদ্দো পুরুষ এই গ্রামে ছিলেন। আপনি কে? কোন বাড়ি?

বিষ্ণুদাসজির বাড়িতে বেড়াতে এসেছি।

অ্যাঁ। আপনি পায় না আবার শঙ্করাকে ডাকে। ওটা বিষ্ণুর বাড়ি হল কবে থেকে? ওর এখানে কোনও বাড়িঘর নেই। আচমকা মানুষটি হাঁটতে লাগলেন গ্রামের দিকে।

পাগল চুপচাপ দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিল। সেই অবস্থায় বলল, নিজেকে খুব মাতব্বর ভাবে। বলেই চট করে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। অর্জুন দেখল, দু দিকের রাস্তাই জনমানবশূন্য। সে গাছটার পাশে এসে দাঁড়াতেই পাগল বলল, সবচেয়ে অসুবিধে হয় সিগারেট খাওয়ার সময়। পাগল তো সিগারেট খায় না। মাঝে-মাঝে বিড়িতে দু'-একবার টান দিতে পারে। লোকটি একটা সিগারেট বের করে সন্তর্পণে ধরাল। একগাল ধোঁয়া কিছুক্ষণ ধরে রেখে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে ছাড়ল।

আপনি এভাবে এখানে পড়ে আছেন কেন?

ডিউটি ইজ ডিউটি। অর্জুনবাবু, এটা আমার শেষ সুযোগ।

আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?

যারা জানার তারা জেনে গিয়েছে। ওই বিষ্ণুদাস আর ডাক্তার বাসস্ট্যান্ডের চায়ের দোকানে বসে চারবার আপনার নাম বলেছে। আপনি এখানে সত্যসন্ধান করতে নর্থ বেঙ্গল থেকে এসেছেন। সিগারেট খাবেন?

না।

আপনি পুলিশে চাকরি করেন?

ঠিক পুলিশে নয়। আই বি-তে। এখানে যে ভয়ংকর ভৌতিক কাণ্ড হচ্ছে তা হেডঅফিস বিশ্বাসই করে না। যেহেতু আমি কোনওদিন কোনও কেস সমাধান করতে পারিনি, তাই আমাকে ডেকে বলল, এই গ্রামে এসে পাগল সেজে খোঁজখবর নিতে। যদি সঠিক সন্ধান দিই তা হলে প্রমোশন হবে। আরে মশাই, আমার দশ বছর পরে ডিপার্টমেন্টে ঢুকে ওরা প্রাশন পেয়ে গেল, আর আমি এক জায়গায় আটকে আছি। এবার যেমন করে হোক...!

সিগারেট নেভান।

অ্যাঁ।

লোকটির হাত থেকে সিগারেট নিয়ে মাটিতে ফেলে জুতোর তলায় রাখতে–রাখতেই সাইকেল দুটোকে দেখা গেল। দুটি তরুণ দ্রুত বেরিয়ে গেল ওদের পাশ দিয়ে। অর্জুন বলল, আপনি সিগারেট খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করছেন দেখলে আর পাগল সেজে থাকতে পারতেন না। আপনার নাম কী?

জগন্নাথ দাস। অথচ কোথায় তিনি, কোথায় আমি!

জগন্নাথবাবু, আপনি স্টেশনে চলে যান। ওখানকার প্ল্যাটফর্মে পাগলের মতে থাকুন। বিকেল তিনটের সময় যে ট্রেন আসবে তাতে চড়ে বসবেন। আপনার সঙ্গে তারপরে আমার দেখা হবে।

আমি যদি এখানেই পৌনে তিনটে পর্যন্ত থাকি?

কী করে সময় বুঝতে পারবেন?

তা নিয়ে আপনি ভাববেন না। কিন্তু আমার উপর গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ নেই। ওটা করলে কৈফিয়ত দিতে হবে অনেক।

দেবেন। আমি বলে দেব কী দিতে হবে। অর্জুন গাছের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল।

.

দোতলায় উঠতেই বংশী ছুটে এল, আপনি ফিরছেন না বলে সবাই দুশ্চিন্তা করছিলেন। বেলা হয়ে গিয়েছে। স্নান-খাওয়া করবেন তো?

হরিরাম স্নান করেছে?

উনি জলখাবার খেয়ে সেই যে শুয়েছেন, এখনও ঘুম ভাঙেনি।

তুলসীদাসজির খাওয়া হয়ে গিয়েছে?

হ্যাঁ।

আমি একবার যেতে পারি?

যান। ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়ে গেলেন। এখনও বোধহয় জেগে আছেন।

অর্জুন তুলসীদাসজির কাছে গিয়ে দেখল, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সে দরজায় দু'বার টোকা মারল। একটু পরে দরজা খুললেন দুই মহিলার মধ্যে যিনি ছোট, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ঘুমোচ্ছেন নাকি?

আসুন। সরে দাঁড়ালেন মহিলা।

অর্জুন ওঁর পিছন পিছন তুলসীদাসজির ঘরে ঢুকল। তুলসীদাসজি বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। বিছানায় পড়ে থাকা হাতের আঙুলগুলো মাঝে মাঝে নড়ছে। মহিলা বললেন, বেশ ভাল ছিলেন। গল্প করতে করতে খাওয়াদাওয়া করলেন। কিন্তু ডাক্তার এসে পরীক্ষা করার পর আবার ইঞ্জেকশন দিলেন। বললেন, নাড়ি খুব চঞ্চল হয়েছে। হরিরামের আনা ইঞ্জেকশনটা এঁকে দিলেন তিনি। দিতেই ঝিম মেরে গেলেন উনি। একে ঘুম বলা ভুল হবে।

অর্জুন তুলসীদাসজির মুখের উপর ঝুঁকে দেখল। চোখ বন্ধ। শ্বাস পড়ছে। সে টেবিলের উপর রাখা অনেক ওষুধের দিকে তাকাল। তারপর কাছে গিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, কোন ইঞ্জেকশনটা দেওয়া হয়েছে?

মহিলা একটা ইঞ্জেকশনের বাক্স দেখিয়ে দিলেন। অর্জুন সেটা তুলে নিয়ে নাম পড়ল। ক্যাশমেমোর নামের সঙ্গে কোনও মিল নেই। তলায় লেখা রয়েছে, এটিতে স্টেরয়েড রয়েছে। অবাক হয়ে গেল সে। এই ওষুধ তো হরিরাম আনেনি। মহিলা বললেন, আজ থেকে এই ট্যাবলেট খাওয়াতে বললেন।

ট্যাবলেটের নাম পড়ল অর্জুন, লিপিয়াম।

উনি নিশ্চয়ই ইঞ্জেকশনটা সঙ্গে এনেছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনারা আপত্তি করবেন। কোনও ইঞ্জেকশন বা ট্যাবলেট ওঁকে দেওয়া চলবে না।

কিন্তু আপত্তি করলে বলবেন, আমরা চিকিৎসায় বাধা দিচ্ছি।

বলুক। কিন্তু এগুলো ওঁর ক্ষতি করছে বলে আমি মনে করছি। আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

স্নান-খাওয়া শেষ করে ঘড়ি দেখল অর্জুন। পৌনে দুটো বাজে। তৈরি হয়ে সে সোজা বিষ্ণুদাসজির ঘরে গেল। ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তাকে দেখে সোজা হয়ে বসে বললেন, আসুন, আসুন, শুনলাম স্টেশনের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দিনেরবেলায় অবশ্য কোনও সমস্যা নেই। বসুন।

কে বলল আপনাকে? অর্জুন বসল।

এই গ্রামেরই একজন। বলুন, কী খবর?

হরিরামকে আর-একবার ভুবনেশ্বরে পাঠাতে হবে।

নিশ্চয়ই পাঠাব। কিন্তু কেন? কী হয়েছে?

ওকে ডাক্তারবাবু যে ইঞ্জেকশন আনতে দিয়েছিলেন তার ক্যাশমেমো করেও প্যাক করার সময় কেমিস্ট ভুল করে অন্য ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছে।

সে কী! ।

ওর কাছে ডাক্তারবাবুর লেখা প্রেসক্রিপশন এবং দোকান থেকে দেওয়া ক্যাশমেমো রয়েছে। মিলিয়ে দেখলেই পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

সর্বনাশ! এত বড় ভুল দোকানদার করল? আর এই বুদ্ধুটা সেটা না দেখে নিয়ে চলে এল? বিষ্ণুদাসজি বেশ উত্তেজিত।

ভুল মানুষমাত্রেরই হয় বিষ্ণুদাসজি। হরিরাম ভুল করে ওষুধ নিয়ে এল, ডাক্তারবাবুও ভাল করে না দেখে আপনার দাদার শরীরে সেই ওষুধ পুশ করে দিলেন? দেখলে নিশ্চয়ই দিতেন না। শান্ত মুখে বলল অর্জুন।

সেই ইঞ্জেকশন অলরেডি দাদাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ। তারপর থেকেই উনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন। অবশ্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবার ঠিক হয়ে যাবেন।

দেখুন, আমি এসবের কিছুই জানি না। আপনি বাইরের লোক হয়েও এত জানলেন আর আমাকে কেউ জানাল না! না না। ডাক্তারের উচিত ছিল কী দিচ্ছে তা দেখে দেওয়া।

ভুল তো হতেই পারে। উনি কত বড় ডাক্তার। নিজের প্র্যাকটিস ফেলে রেখে এখানে এসেছেন। আচ্ছা, আমি একটু বেরোব। আপনি হরিরামকে এখনই ওগুলো পালটে নিয়ে আসতে বলুন।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

একটু বেড়িয়ে আসি।

দাঁড়ান। আপনার সামনেই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব।

ডাক্তারকে পাওয়া গেল বাগানে। একটা ইজিচেয়ারে আধশোওয়া হয়ে গাছ দেখছেন। বিষ্ণুদাসজি তাঁকে গোলমালের কথা বলামাত্র তিনি মাথা নাড়তে লাগলেন, অসম্ভব। আমি একজন ডাক্তার। এত বড় ভুল আমি করতে পারি না।

অর্জুন বলল, ভুল অজান্তেই হয় ডাক্তারবাবু। যে ইঞ্জেকশনটা আপনি তুলসীদাসজিকে দিয়েছেন, সেটা টেবিলের উপর রয়ে গিয়েছে।

মিথ্যে কথা। প্রায় গর্জন করলেন ডাক্তার, হতেই পারে না। ইঞ্জেকশনটা দিয়ে আমি প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। কিছু রেখে আসিনি।

তা হলে যেটা ওখানে আছে সেটা...?

আমার ব্যবহার করা নয়। কেউ আমার চরিত্র হনন করার জন্যে ওটা ওখানে রেখে এসেছে। কী ইঞ্জেকশন ওটা?

আপনারা ওখানে গেলেই দেখতে পাবেন। আচ্ছা, আপনি কি ওঁকে লিপিয়াম ট্যাবলেট খাওয়াতে বলেছেন?

হ্যাঁ বলেছি। ওটা এখন ওঁকে সাহায্য করবে।

তা হলে বিষ্ণুদাসজি, ডাক্তারবাবুর কথা নিশ্চয়ই সত্যি, ওই ইঞ্জেকশন কে ওখানে রেখে গেল তা নিয়ে খোঁজখবর করা দরকার। কিন্তু আমার অনুরোধ, আপনি কোনও উদ্যোগ নেবেন না। যে আসামি সে নিশ্চিত থাক এই ভেবে যে, আপনি কিছু জানেন না। যা করবার তা আমি করব। আচ্ছা চলি।

.

স্টেশনে পৌঁছে অর্জুন দেখল, ট্রেন আসার সিগনাল দেওয়া হয়েছে। স্টেশনমাস্টার গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সে কাছে গিয়ে বলল, সবচেয়ে কম ডিসট্যান্সের একটা রিটার্ন টিকিট আমাকে দিন।

শর্ট ডিসট্যান্সে রিটার্ন টিকিট হয় না। মুখ ফেরালেন স্টেশনমাস্টার।

তা হলে ওয়ানওয়ে টিকিট দিন।

স্টেশনমাস্টার তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন। অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে পাগল সাজা লোকটাকে দেখতে পেল না। তিনটে স্টেশন পরে একটা জংশন স্টেশন, যার নাম খুরদা, সেই পর্যন্ত যাওয়ার টিকিটের দাম বত্রিশ টাকা দিতে হল। টিকিট দেওয়ার সময় স্টেশনমাস্টার বললেন, অনুগ্রহ করে আমাকে ঝামেলায় ফেলবেন না।

টিকিট নিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই সে হরিরামকে দেখতে পেল। প্রায় দৌড়ে দৌড়ে আসছে। স্টেশনমাস্টারের কাছ থেকে টিকিট কিনে হাঁপাতে হাঁপাতে অর্জুনের পাশে এসে বলল, কী সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল বলুন তো। ওষুধের দোকানদার যে ভুল ওষুধ প্যাক করে দেবে, তা কে জানত? ডাক্তারবাবু আমাকে খুব ধমক দিলেন। এখন আবার ভুবনেশ্বরে গিয়ে বদলে নিয়ে আসতে হবে। সাইকেলটাকে আসার সময় দেখতে পেলাম না বলে হেঁটে আসতে হল। আজকের রাতটা আবার জেগে কাটাতে হবে।

আমার মনে হয় তার দরকার হবে না।

মানে? লোকাল ট্রেনে ভুবনেশ্বর পৌঁছোব যখন, তখন দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। স্টেশনেই থেকে যাব। সকালে দোকান খুললে ইঞ্জেকশন নিয়ে মেল ট্রেনে ফিরতে ফিরতে...!

আপনাকে ভুবনেশ্বরে যেতে হবে না।

আশ্চর্য! দোকানটা তো ভুবনেশ্বরে।

জানি। কিন্তু ওষুধ বদলাবার দরকার নেই।

কেন? ওরা ভুল ওষুধ দিয়েছিল।

কী করে প্রমাণ করবেন? ক্যাশমেমোতে ব্যাচ নাম্বার পর্যন্ত লিখে দিয়েছে। সেটা লেখার পর এত বড় ভুল কোনও কেমিস্ট করতে পারে না।

তা হলে এই ওষুধ এল কোত্থেকে?

হরিরামের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে দূরে ট্রেন হুইসল দিল। ইতিমধ্যে আরও চার পাঁচজন যাত্রী প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গিয়েছে। ট্রেন যেভাবে এসে থামল, তাতে মনে হচ্ছিল ওর চলতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। অর্জুন এবং হরিরাম প্রায় ফাঁকা কম্পার্টমেন্টে উঠে বসল। স্টেশনমাস্টার দাঁড়িয়ে আছেন প্ল্যাটফর্মে। ট্রেন ছাড়ল।

হরিরাম বলল, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

দেখুন, আপনি যে ওষুধ এনেছিলেন সেটা ঠিকঠাকই ছিল। এমনও তো হতে পারে সেটা বদলে গিয়েছে। যে বদলেছে সে ভাবতেই পারেনি বদলটা ধরা পড়ে যাবে। তাই স্বাভাবিক অভ্যেসে ওটা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল সে।

হাঁ হয়ে শুনছিল হরিরাম। মুখ বন্ধ করার আগে জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি জানি না।

ডাক্তারবাবু ছাড়া আমাদের বাড়িতে এসব করার বুদ্ধি কারও হবে না।

উনিও তো প্রতিবাদ করলেন। অর্জুন হাসল, তাই আপনাকে আর ওষুধ পালটাতে ভুবনেশ্বর যেতে হবে না।

কিন্তু মামা বললেন, আপনি নাকি বলে এসেছেন, আমাকে ওষুধ পালটাতে ভুবনেশ্বর পাঠাতে। মনে পড়ে গেল হরিরামের।

হ্যাঁ। কারণ, আপনাকে আমার দরকার হবে।

বলুন, কী করতে পারি?

বলব, আর-একটু ধৈর্য ধরুন।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল হরিরাম। চাষের মাঠ, গাছগাছালি, গোরু ছাগল ছুটে যাচ্ছে পিছনে। মাথা নেড়ে সে বলল, তা হলে তো বড়মামাকে খুন করার চেষ্টা হচ্ছে।

আপনার বড়মামাকে খুন করা হলে কার লাভ হবে?

মানে? লাভ হবে কেন?

আহা! উনি চলে গেলে বাড়ি-জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিক কে হবেন?

ছোটমামা। চোখ বড় হয়ে গেল হরিরামের, তা হলে ছোটমামাই কি বড়মামাকে খুন করতে চাইছেন? ইস, বড়মামা ছোটমামাকে কী আদর করে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি, আবার সম্মানের জায়গা দিলেন। তার বদলে ছোটমামা এতটা বিশ্বাসঘাতকতা করছেন?

আরে! আপনি আচমকা অনুমান করে সিদ্ধান্তে আসছেন কেন? কোনও প্রমাণ আছে আপনার হাতে? তা ছাড়া বিষ্ণুদাসজিকে তাঁর বাবা ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। ওই সম্পত্তির উপর তাঁর কোনও দাবি নেই একথা তিনি জানিয়েছেন। তাই তুলসীদাসজির মৃত্যুর পরে তাঁর তো মালিকানা পাওয়ার কথা নয়। অর্জুন বলল।

তা হলে? ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল হরিরাম।

তুলসীদাসজির আর কোনও ভাই নেই। বিয়ে-থা না করায় স্ত্রী অথবা সন্তানও নেই। আছেন দুই বোন। একজনের সন্তান হয়নি। আর-একজনের সন্তান আপনি। অতএব আপনারই দাবি সবচেয়ে বেশি।

আমি?

হ্যাঁ। তুলসীদাসজি মারা গেলে আপনারই লাভ হবে। অর্জুন হাসল।

আপনি কী বলতে চাইছেন? হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গেল হরিরাম, আমি ভুল ওষুধ এনে দিয়েছি? যদি তাই হয়, ডাক্তারবাবু সেটা না দেখে বড়মামাকে ইঞ্জেকশন দিলেন কী করে? কোনও ডাক্তার এই ভুল করবে? নাকি, ভুল ওষুধ আনার জন্যে আমাকে ভর্ৎসনা করবে?

ঠিক। এ সবই ঠিক। কিন্তু আমাদের দেশে এরকম উদাহরণ আছে। ডাক্তারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খুন করার চেষ্টা, এর আগেও হয়েছে। অর্জুন বলল।

হরিরাম হাঁ হয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, এ কী বলছেন! আমি বড়মামাকে খুন করার চেষ্টা করব? ছি ছি ছি!

না, আপনি সেই চেষ্টা করবেন না। কারণ, ডাক্তারকে আপনি চেনেন । তা ছাড়া আপনার মা তাঁর দাদাকে ভালবাসেন। সেটাও আপনি জানেন। আমি যেসব সম্ভাবনা থাকে তার একটা আপনাকে বললাম। এবার শুনুন, আপনাদের গ্রাম যে থানার মধ্যে পড়ে সেটা কত দূরে?

দুটো স্টেশন পরে।

স্টেশনটা এলে বলবেন, আমরা নামব।

কেন?

থানায় যেতে হবে। আপনি ভুবনেশ্বর যাচ্ছেন, আমি যাচ্ছি খুরদা জংশনে। স্টেশনমাস্টার তাই জানেন। কেউ যদি জানতে চায় তা হলে সে-ও তাই জানবে। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়? অর্জুন চারপাশে তাকাল।

কোন লোক?

আপনাদের গ্রামে কয়েকদিন হল একটা পাগল এসেছে। তারও এই ট্রেনে যাওয়ার কথা ছিল। বলতে বলতে পরের স্টেশনে ট্রেন থামল।

অর্জুন জানলায় মুখ বাড়াতেই দেখতে পেল লোকটিকে। ওপাশের কম্পার্টমেন্ট থেকে নেমে দৌড়ে এসে এই কম্পার্টমেন্টে উঠল। উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

অর্জুন তার দিকে তাকিয়ে বলল, চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন। ট্রেন ছাড়ার সময়ও আপনাকে দেখতে না পেয়ে ভাবলাম আপনি হয়তো ভুলেই গিয়েছেন।

লোকটি হরিরামের দিকে তাকাল। হরিরাম খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরা, হাতে বস্তা নিয়ে দাঁড়ানো লোকটিকে দেখে অর্জুনের দিকে তাকাল।

অর্জুন বলল, ইনি শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস। সরকারি অফিসার। আপনাদের গ্রামে পাগল সেজে ছিলেন যদি রহস্যের সন্ধান পান সেই চেষ্টায়। বসুন জগন্নাথবাবু।

জগন্নাথ বসলেন। অর্জুন বলল, ইনি হরিরাম, তুলসীদাসজির ভাগনে।

হরিরাম বলল, আশ্চর্য! আপনাকে আমি গ্রামে দেখেছি। কিন্তু আপনি যে পাগল নন, তা ভাবতে পারিনি।

জগন্নাথ বললেন, আমি একটু কথা বলি?

অর্জুন বলল, অবশ্যই।

আমার আর প্রমোশন হবে না। জীবনটার কোনও মানে আর থাকল না।

কেন? অর্জুন অবাক হল।

এই যে শেষ মুহূর্তে ট্রেন ধরলাম, আর-একটু হলে পারতাম না, তার কারণ কী জানেন? ওই গ্রামের পাবলিক জেনে গিয়েছে আমি পাগল নই। আমি কী তা ওরা হয়তো জানে না, কিন্তু পাগল নই তা ওরা নিশ্চিত জানে।

কী করে? আপনি তো ভালই অভিনয় করছিলেন।

খিদে পেয়েছিল। খিদে যে মানুষের কী সর্বনাশ করে! আপনি দেখেছেন, ওই পিছনের নদীতে গিয়ে ঝোঁপের মধ্যে বসে মাছ ধরে পুড়িয়ে খেয়ে পেট ভরাই। ওই খাওয়াতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। এই গ্রামের কেউ মুড়িটুড়ি দিলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খাই, যেভাবে পাগলরা সাধারণত খেয়ে থাকে। আপনি চলে গেলে মনে হল খিদে পেয়েছে। গ্রাম পেরিয়ে অত দূরে যেতে ইচ্ছে করল না। তা ছাড়া ছোঁড়াগুলো যে ঢিল ছোড়ে, তা সহ্য করা বেশ কঠিন। রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, ওই যে ঝাঁকড়া কিছু বড় গাছ রয়েছে, তার ডান দিকে মাঠের মধ্যে নেমে দেখলাম, একটা জঙ্গল রয়েছে। সেই জঙ্গলের ভিতর ঢুকে একটা বড় পুকুর দেখতে পেলাম। ভাবলাম ওই পুকুরেই মাছ ধরি। ছিপ নেই, বঁড়শি-ফাতনা তো ঝোলায় আছে। ফড়িং ধরে বঁড়শিতে গেঁথে সবে জলে ফেলেছি, অমনি একটা মাগুর কপাত করে গিলে ফেলল। ওটাকে ডাঙায় টেনে এনে পুড়িয়ে খেয়ে ভাবলাম একটা সিগারেট ধরাই। ঠিক তখনই গুলির শব্দ কানে এল। জগন্নাথ শ্বাস নেওয়ার জন্যে থামলেন।

গুলির শব্দ? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

আমার তো তাই মনে হল। রিভলভারের আওয়াজ। আমি উঠে দাঁড়ানোমাত্র একটা লোক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, অ্যাই, তুই কে? তখন থেকে দেখছি, ঠিকঠাক মাছ ধরলি, পুড়িয়ে খেলি, সিগারেট ধরাচ্ছিস, তার মানে তুই পাগল নোস। আমি আবার পাগলের ভান করতেই লোকটা আমার হাত চেপে ধরে বলল, চোপ। চল আমার সঙ্গে বস-এর কাছে। বস ঠিকই সন্দেহ করছিল।

প্রাণ বাঁচাতে লোকটাকে আচমকা ঘুসি মারলাম। লোকটা পড়ে গেল। ওর মুখে আরও কয়েকবার আঘাত করে পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে দৌড়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বুঝলাম, ভুল পথে চলেছি। স্টেশনের দিকে না গিয়ে উলটোপালটা ঝোঁপঝাড় পেরিয়ে ট্রেন লাইনের কাছে চলে এসে একটা সাঁকোর নীচে লুকিয়ে থাকলাম। তারপর ট্রেনটা এল। নীচে বসে বুঝলাম সাঁকোটা বোধহয় শক্ত নয়, তাই ট্রেন খুব আস্তে আস্তে সাঁকোটা পার হচ্ছে। অমনি বেরিয়ে এসে একটা কামরার দরজা খোলা পেয়ে দৌড়ে দৌড়ে

হাতল ধরে উঠে বসলাম। ওরা আমাকে খুঁজতে স্টেশনে আসতে পারে এই ভয়ে টয়লেট থেকে বের হইনি। টয়লেটের জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, আপনারা ওপাশের কম্পার্টমেন্টের দিকে যাচ্ছেন। ভরসা পেয়ে পরের স্টেশনে নেমে এখানে চলে এলাম। আর আমার প্রমোশন হবে না।

এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়বেন না জগন্নাথবাবু। এবার বলুন, এই ক'দিনে আপনি কী তথ্য পেয়েছেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

সেই সিগারেটটা ধরাই? জগন্নাথ জিজ্ঞেস করলেন।

সিগারেট যদিও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি না বলব না।

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে জগন্নাথ বললেন, গ্রামের সব মানুষ খুব ভয়ে ভয়ে বাস করছে। রাতে রাস্তায় কেউ থাকে না।

রাতে কী দেখলেন?

কী করে দেখব?

মানে?

আমি তো রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের চাতালের এক কোণে সন্ধে হলেই ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করতাম।

সে কী! রাতে খোঁজখবর নিতেন না?

কী করে নেব? দিনেরবেলায় যা বলবেন তাই করতে পারি। রাতে সব সাহস উধাও হয়ে যায়। ছেলেবেলা থেকে ভূতের ভয় আমার। আর যখন শুনছি রাত বাড়লেই গ্রামে ভূতেরা ঘোরাফেরা করে, তখন সাহস দেখিয়ে মারা পড়তে রাজি নই।

চমৎকার!

ঠাট্টা করছেন। কিন্তু স্যার, ভূত আছে। এই যে, দিনেরবেলায় যখন আমি জঙ্গলে ঢুকতাম, তখন হঠাৎ হঠাৎ এমন লোককে দেখতাম যার সেখানে থাকার কথা নয়। ওরা কেউই গ্রামের মানুষ নয় একথা আমি। হলপ করে বলতে পারি। আমাকে দেখেই এত দ্রুত উধাও হয়ে যেত যা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তারা মেছোভূত নয়, একথা আমি। বলতে পারি।

কী করে?

তা হলে আমি যখন মাছ ধরতাম তখন আমার কাছে মাছ চাইত।

হরিরাম একমনে শুনে যাচ্ছিল। এবার বলল, এই লোকগুলো কারা আমি জানি না। তবে জানলার ফাঁক দিয়ে এক রাতে ওদের আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি। সেদিন চাঁদের রাত বলে দেখতে পেয়েছিলাম।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি কখনও আপনাদের বাড়ির বাগানের পিছনে যে ব্যারাকবাড়ি আছে তার ভিতরে গিয়েছেন?

ছেলেবেলায় গিয়েছি। জিনিসপত্র রাখা হত ওখানে।

কতদিন ঘরগুলো ব্যবহার করা হয়নি?

বলতে পারব না। আমরা পাকাপাকি এখানে আসার পর কেউ ওখানে গিয়ে বাস করেনি, দরজা খুলতেও দেখিনি। হরিরাম বলল।

দ্বিতীয় স্টেশনে ট্রেন থামল। এখন ঘড়িতে সাড়ে তিনটে। অর্জুন বলল, জগন্নাথবাবু, সামনের স্টেশনে নেমে আমরা থানায় যাব। ওখানকার ও সি-কে আপনি চেনেন?

বলরামবাবু। কেন?

কীরকম মানুষ?

আর মাস সাতেক পর অবসর নেবেন বলে কোনও কাজ করতে চান না।

সে কী?।

তা ছাড়া ভুবনেশ্বরে যারা পোস্টিং পান, উনি তাঁদের অপছন্দ করেন। কারণ, উনি চেষ্টা করেও তা পাননি।

এস পি কে?

একজন বাঙালি। অরূপ দত্ত। অল্প বয়স। আমাকে দু-তিনবার দেখেছেন।

আপনি আমাকে ভাল জানেন না। আমার নাম অর্জুন। আমি পশ্চিমবাংলার উত্তর অঞ্চলের শহর জলপাইগুড়িতে থাকি। আমার পেশা সত্যসন্ধান করা।

সত্যসন্ধান! মানে...?

ইংরেজিতে যাকে টুথ ইনভেস্টিগেটার বলে, তাই।

হরিরাম হাসল, বড়মামার মুখে শুনেছি। যাকে বলে গোয়েন্দা, আপনি তা নন।

ডিটেকটিভ? জগন্নাথ বিজ্ঞের মতো মুখ করলেন।

না। আমার কাজ শুধু অসত্যকে সরিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। যাকগে, আমরা থানায় গেলে আপনি বড়বাবুকে এই পরিচয়টা দেবেন। আর হ্যাঁ, বলবেন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক আছে।

বেশ। বলব। কিন্তু আপনি থানায় যাচ্ছেন কেন?

ওই যে, যে লোকটা আপনাকে বসের কাছে নিয়ে যেতে চাইছিল সেই বসের খবর দিতে। অবশ্য লোকটাকে আপনি পুকুরে ফেলে দিয়ে এসেছেন, যদি ডুবে মারা গিয়ে থাকে তা হলে ঝামেলায় পড়তে পারেন। অর্জুন হাসল।

ট্রেন থামতেই ওঁরা নেমে পড়লেন। অর্জুন আড়চোখে দেখল, জগন্নাথবাবু তাঁর পাগলের বস্তাটা ট্রেনেই রেখে এলেন। স্টেশনের বাইরে এসে সে জিজ্ঞেস করল, থানা কত দূরে?

কাছেই। মিনিট তিনেক হাঁটতে হবে। জগন্নাথ বললেন।

জায়গাটা একেবারেই সাদামাটা মফসল শহর। জলপাইগুড়ি থেকে তিস্তা পেরিয়ে আলিপুরদুয়ারের দিকে গেলে যেসব ছোট-ছোট শহর পড়ে, সেগুলো এর চেয়ে অনেক বেশি জমজমাট।

থানার ভিতর ঢুকে ওঁরা দেখলেন, দু'জন সেপাই খবরের কাগজ পড়ছে। জগন্নাথ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, বড়বাবু আছেন?

এখন ঘুমোচ্ছেন।

কখন ঘুম ভাঙবে?

বলতে পারব না।

জগন্নাথ খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে পকেট থেকে তাঁর আইডেন্টিটি কার্ড বের করে ওদের সামনে ধরতেই একজন করুণ মুখে বলল, এখন ডাকলে খুব রাগ করবেন।

কিছু করার নেই। ডাকো।

লোকটি ভিতরে চলে গেল। এই সময় একজন এস আই বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? আপনাদের তো চিনতে পারলাম না।

আপনাদের এই থানায় টোটাল স্টাফ ক'জন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

এস আই বেশ অবাক হয়ে গেলেন, আপনি কে?।

জগন্নাথ বললেন, উনি অর্জুন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন। আমি আই বি সাব-ইনস্পেক্টর। নিজের পরিচয়পত্র দেখালেন।

এস আই-কে বেশ বিভ্রান্ত দেখাল, দশজন থাকার কথা।

এখন দেখছি তিনজন আছেন। মনে হচ্ছে এখানে অশান্তি হয় না।

না না। খুব কাম অ্যান্ড কোয়ায়েট জায়গা। আপনারা হঠাৎ এখানে?

আপনার সঙ্গে কথা বললে যদি সমাধান সম্ভব হয় তা হলে বলতে পারি।

না, মানে, আসলে বড়বাবুই তো সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু...!

তিনি এখন ঘুমোচ্ছেন। ওঁকে খবর দিতে গিয়েছেন একজন। আমরা অপেক্ষা করছি।

তা হলে ভিতরে এসে বসুন। এস আই-এর ব্যবহার বদলে গেল। বড়বাবু নামলেন আরও আধঘণ্টা পরে। বেশ রোগা, গাল ভাঙা, পরনে বাড়ির পোশাক। মাথার অর্ধেকটায় টাক চকচক করছে। মুখে বিরক্তি স্পষ্ট। এস আই ওঁদের বড়বাবুর টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারে বসতে বললেন। মুখোমুখি বসলেন, এস আই ওঁদের দুজনের পরিচয় দিলেন বড়বাবুকে। দুটো কনুই টেবিলের উপর, হাতের উপর চিবুক রেখে বসে ছিলেন বড়বাবু, কোনও প্রতিক্রিয়া ফুটল না মুখে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকে পুরী, ভুবনেশ্বর, গোপালপুর যায়, এখানে কেন?

আমরা বেড়াতে আসিনি, এসে মনে হচ্ছে আপনার সাহায্য দরকার।

ভদ্রলোকের মুখ থেকে আলতো শব্দ বের হল, উঃ।

আপনি কি অসুস্থ?

দেখেই বুঝতে পারছেন?

দেখে মনে হচ্ছে আপনার শরীরে ব্লাডসুগার বেশ বেড়ে গিয়েছে।

হাত সরালেন ভদ্রলোক, আপনি ডাক্তারি জানেন নাকি?

খুব সাধারণ জ্ঞান থেকে বলছি। লক্ষ করছি, চেয়ারে বসার পর থেকে আপনি বারবার পজিশন বদল করছেন। সচরাচর পাইসের পেশেন্টরা এটা করেন।

এস আই মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, স্যারের ওই দুটোই আছে। খুব কষ্ট।

আঃ, চুপ করো। আমি মরছি যন্ত্রণায় আর তোমার মুখে হাসি ফুটছে। বড়বাবু খেঁকিয়ে উঠলেন, ছেড়ে দিন এসব কথা। বলুন, কী দরকার?

অর্জুন হরিরামকে দেখাল, এর নাম হরিরাম। দুটো স্টেশন পরে অঞ্জলি গ্রামে থাকে। ওর বড়মামা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছেন। ওই গ্রাম নাকি সন্ধের পর ভুতেদের দখলে চলে যায়। তখন সমস্ত গ্রাম মড়ার মতো পড়ে থাকে।

জানি। ওদের বলুন, ওঝা ডেকে ভূত নামাতে। পুলিশের কাজ ভূত ধরা নয়। ভূত ধরার মতো কোনও অস্ত্র আমাদের নেই। চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকালেন বড়বাবু।

আপনি অঞ্জলি গ্রামের খবর জানেন?

ওই যেটুকু বললেন। ওখানকার কেউ এসে যখন কোনও অভিযোগ করেনি, তখন ধরেই নিচ্ছি ওরা বেশ শান্তিতে আছে।

ভূত কখনও ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিতে পারে?

আমি জানি না। জানতেও চাই না।

আপনি জানতে চাইছেন না কিন্তু জগন্নাথবাবুকে ভুবনেশ্বরের আই বি অফিস এ-ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে পাঠিয়েছে। অর্জুন বলল।

চোখ খুললেন বড়বাবু, আপনি ভুবনেশ্বরে পোস্টেড?

মাথা নাড়লেন জগন্নাথ, হ্যাঁ।

আই বি?

হ্যাঁ।

বেশ আছেন। নেই কাজ তো খই ভাজ। আমরা পড়ে আছি বনবাদাড়ে। এখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা আমাদের জিজ্ঞেস না করে খরচা করে আপনাদের পাঠাচ্ছে ফোপড়দালালি করতে। আর ক'মাস পর অবসর নিতে হবে। অসুখ-বিসুখে শরীর কাহিল হয়ে যাচ্ছে। ভুবনেশ্বরে থেকে কর্তব্যরত অবস্থায় চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলাম। সেই সুযোগ উপরওলা আমাকে দিল না। আর কিছু বলার আছে?

আছে। অঞ্জলি গ্রামে বেশ কিছু বাইরের লোক ঢুকেছে। দিনেরবেলায় তাদের দেখা যায় না। রাত নামলে তারা রাস্তায় নামে।

নামতেই পারে। দিনেরবেলায় ঘুমিয়ে রাতে কেউ জাগলে জাগতেই পারে।

হঠাৎ হরিরাম মুখ খুলল, আমার বড়মামা তুলসীদাস মহাপাত্রকে কেউ বা কারা ধীরে ধীরে খুন করার চেষ্টা করছে।

অ্যাঁ? এটা কী বললেন? ধীরে ধীরে খুন করা যায় নাকি! যত্ত সব।

অর্জুন হাসল, আমি বুঝতে পারছি আপনার শরীর এবং মন খুবই খারাপ। ভুবনেশ্বরে গিয়ে চিকিৎসা করালে ভাল হয়ে যেতেন। ছুটি নিয়ে সেটা করুন না!

পাগল। এই সময় কেউ ছুটি নেয়? ছুটির টাকা মারা যাবে তা হলে?

আচ্ছা, অরূপবাবুর কি কোনও ক্ষমতা আছে?

কে অরূপবাবু?

আপনাদের এস পি সাহেব। অরূপ দত্ত।

আচমকা সোজা হয়ে বসলেন বড়বাবু, চেনেন নাকি?

অর্জুন নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

ও, বুঝেছি। তিনিও বাঙালি, বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। কিন্তু উনি আমাকে সহ্য করতে পারেন না। কোনও কারণ নেই, দুর্ব্যবহার করেন।

আপনার অসুখের কথা বোধহয় জানেন না। ব্লাডসুগারের খুব ভাল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা আছে। বিশাল চেহারার মানুষ ব্লাডসুগারের চাপে কড়ির মতো গুটিয়ে গিয়েছিল। সেই চিকিৎসায় স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। আর পাইল্সটা আপনি অপারেট করিয়ে নিন। লোকে বলে অপারেশনের পরেও আবার হয়। সেটা হতে হতে বছর আট-দশ কেটে যায়। আচ্ছা, আপনি যখন ডায়েরি নেবেন না তখন...।

বসুন। এই যে গুণধর, এঁদের জন্যে চা বলো। কতক্ষণ এসেছেন অথচ তোমার খেয়ালই নেই?

এস আই বেরিয়ে যেতে আবার মুখ খুললেন, মুশকিল হল, আমার এখানে স্টাফ খুব কম। আমরা কবে শেষবার গুলি ছুঁড়েছি, তা নিজেরাই ভুলে গিয়েছি। অঞ্জলিতে গিয়ে অ্যাকশন নিতে হলে যে শক্তি দরকার তা এখানে নেই। বড়বাবু টাকে হাত বোলালেন, ভাল আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কোথায় হয় নিশ্চয়ই জানেন?

জানি।

যদি দয়া করে নাম-ঠিকানা লিখে দেন। একটা কাগজ আর কলম খুঁজে বের করে এগিয়ে দিলেন বড়বাবু।

কিন্তু আপনাকে সেখানে যেতে হবে। ছুটি নেবেন?

ওই তো মুশকিল।

আমি ভেবে দেখছি। আপনার যাবতীয় শারীরিক অসুবিধেগুলো ওই কাগজে লিখে রাখবেন, আমি কাগজটা ডাক্তারকে দেখিয়ে বলব, আপনার। সঙ্গে ফোনে কথা বলতে। সেটা জানার পর উনি যদি সন্তুষ্ট হয়ে ওষুধ দেন। তা হলে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

খুব উপকার হয় তা হলে! হাসি ফুটল বড়বাবুর মুখে।

এই সময় এস আই একটা লোককে নিয়ে ঢুকলেন। লোকটা কেটলি থেকে গ্লাসে চা ঢেলে বড়বাবু ছাড়া সবাইকে দিয়ে চলে গেল।

বড়বাবু বললেন, গুণধর, ডায়েরির খাতাটা নিয়ে এসো। ওঁদের অভিযোগ খাতায় তোলো। অর্জুনের দিকে তাকালেন তিনি, আপনাদের অভিযোগ গ্রহণ করে আমি এস পি সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেব। উনি যা বলবেন তাই হবে। ও হ্যাঁ, পাইল্স কি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় সারে না?

জিজ্ঞেস করতে হবে। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

খু-উ-ব। টয়লেটে গেলে রক্তে ভেসে যায়।

একদিকে মঙ্গল। কিছু চিনি শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বলছেন?

আমি এস পি সাহেবকে একটা ফোন করতে পারি?

অবশ্যই। অপারেশনে আমার খুব ভয়, বুঝলেন। ল্যান্ডফোনটা এগিয়ে দিলেন বড়বাবু।

অর্জুন জগন্নাথবাবুকে ইশারা করতে তিনি ডায়াল করলেন। তৃতীয়বারে লাইন পাওয়া গেল। জগন্নাথ চিৎকার করলেন, স্যার, আমি জগন্নাথ বলছি, এস আই, আই বি ভুবনেশ্বর। অঞ্জলি গ্রামে ডিউটি পড়েছিল। এখন লোকাল থানায় বড়বাবুর ঘরে...। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কথা বলুন।

রিসিভারটা বড়বাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন জগন্নাথবাবু, আপনার সঙ্গে...।

আবার আমাকে কেন? রিসিভারটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বড়বাবু, স্যার, সত্যেন বলছি। না স্যার, আমি ওকে ফোন করতে বলিনি। ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে অর্জুনবাবু এসেছেন, উনি কথা বলতে চাইছেন! অ্যাঁ। কে অর্জুনবাবু? ঢোক গিললেন বড়বাবু। অর্জুন হাত বাড়িয়ে রিসিভার টেনে নিয়ে বলল, নমস্কার, আমি কি মি. অরূপ দত্তের সঙ্গে কথা বলছি।

ইয়েস। আপনি কে?

আমাকে সবাই 'অর্জুন' বলেই জানে। এখানে এসেছি জলপাইগুড়ি থেকে। আমার জীবিকা সত্যসন্ধান করা। অর্জুন বলল।

সত্যসন্ধান? অর্জুন! আপনি কি...।

অর্জুন ওঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, ট্রুথ ইনভেস্টিগেটার।

আমি যদি ভুল না করি, যিনি লাইটার সমস্যার সমাধান করেছিলেন, সেই মানুষটি আপনি?

না, আপনি ভুল করছেন না।

আরে মশাই! হোয়াট এ সারপ্রাইজ! তা এত জায়গা থাকতে আপনি। সত্যেনবাবুর থানায় কী করছেন? ও আপনাকে বসতে বলেছে?

হ্যাঁ। বড় অমায়িক ব্যবহার করছেন সত্যেনবাবু।

রিয়েলি! আপনি নিশ্চয়ই কোনও সমস্যার কারণে এসেছেন?

আসার পর জেনেছি। আপনার সাহায্য পাওয়া খুব জরুরি।

আমি যেখানে আছি সেখান থেকে থানায় পৌঁছতে চল্লিশ মিনিট লাগবে। অপেক্ষা করবেন?

অবশ্যই। রিসিভার নামিয়ে রেখে অর্জুন বলল, এস পি সাহেব এখানে আসছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বড়বাবু, সে কী! উনি নিজে থেকেই বললেন আসবেন? তা হলে তো আপনি, আপনি বিখ্যাত মানুষ। ও গুণধর, ঝাড়ুদারকে ডাকো, যত তাড়াতাড়ি পারো, থানা পরিষ্কার করো। যাও।

গুণধর দৌড়ে বেরিয়ে যেতে বড়বাবু বললেন, মিষ্টি খাবেন? ভাল। সন্দেশ?

আপনি খান? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

জিভ বের করলেন বড়বাবু, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও খেতে পারি না। অভিশাপ মশাই। মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় উলটো দিকে মুখ করে থাকি।

.

অরূপ দত্তের বয়স চৌত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ। লম্বা, পেটানো শরীর, চলাফেরায় সপ্রতিভ ভাব। হাত মেলানোর পর বড়বাবুর চেয়ারে বসে বললেন, বলুন, আপনি যখন এত দূরে এসেছেন তখন সমস্যা বেশ গভীর?

অর্জুন ঘরের মানুষগুলোর দিকে তাকাল। অরূপ দত্ত বললেন, আপনারা সবাই বাইরে যান। আমি ওঁর সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই।

অর্জুন ইশারা করতে হরিরাম এবং জগন্নাথবাবু বড়বাবু এবং গুণধরের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে অরূপ দত্ত বললেন, হ্যাঁ, বলুন।

তুলসীদাসজির টেলিফোনে আমন্ত্রণ থেকে শুরু করে যা-যা ঘটেছে তা সংক্ষেপে বলল অর্জুন। শোনার পর অরূপ দত্ত বললেন, দেখুন, কী অবস্থা। ওই অঞ্জলি গ্রামে কিছু একটা হচ্ছে তা ভুবনেশ্বরের আই বি ডিপার্টমেন্ট সন্দেহ করে লোক পাঠিয়েছে, অথচ এই থানায় সেই খবর আসেনি। এলেও কাজ করতে হবে বলে এরা হয়তো আমাকে জানায়নি।

অর্জুন বলল, বড়বাবু বললেন, যেহেতু কেউ অভিযোগ করেনি, তাই উনি কিছু জানেন না।

ছেড়ে দিন। সমস্যা একটা হল, অঞ্জলি গ্রামের আশপাশের জঙ্গলে বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়েছে। তাদের দিনেরবেলায় দেখা যায় না, কিন্তু রাতে তারাই গ্রামের দখল নেয় বলে আপনার অনুমান। অথচ গ্রামে গুজব চালু হয়েছে যে, ওখানে ভূতের উপদ্রব হচ্ছে। এই লোকগুলো কারা এবং কেন এসেছে তা জানা যাচ্ছে না। যেহেতু এদের আচরণ রহস্যময়, তাই এরা ভাল কিছু করতে চাইছে তা ভাবার কারণ নেই।

অর্জুন খুশি হল, একদম ঠিক।

দ্বিতীয় সমস্যা হল, আপনি যার অতিথি, সেই তুলসীদাসজির চিকিৎসার জন্যে তাঁর ভাই ভুবনেশ্বর থেকে ডাক্তার নিয়ে এসেছেন। ওই ডাক্তার সম্পর্কে তুলসীদাসজির বোনেরা আপনার কাছে অভিযোগ করেছেন। আপনি জেনেছেন, ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে যে ওষুধ আনিয়েছেন তা ব্যবহার করে অন্য ওষুধ ইনজেক্ট করেছেন। আপনার মনে হচ্ছে তুলসীদাসজিকে খুব ধীরে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁকে মারতে পারলে কার লাভ হবে?

ওঁর ভাই বিষ্ণুদাসজি চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু সম্পত্তির অধিকার পাবে ভাগনে হরিরাম, যে আমার ডান দিকে বসে ছিল। অথচ হরিরামের মনে তার মামাকে খুন করার বাসনা বিন্দুমাত্র নেই। মনে রাখতে হবে, তুলসীদাসজির বাড়ির পিছনে বিশাল বাগান আর ব্যারাকবাড়ি প্রতিটি রাতে বাইরের লোক

ব্যবহার করে। হয়তো ওঁকে মেরে ফেলার ব্যাপারে ওদেরও স্বার্থ আছে। অর্জুন বলল, আর শেষটা খুবই সন্দেহজনক। গ্রামের একজন প্রবীণ লোক, তিনি স্টেশনমাস্টারকে আদেশ দিয়েছিলেন ট্রেনটাকে দাঁড় করাতে। মেল ট্রেন যেহেতু ওখানে দাঁড়ায় না তাই স্টেশনমাস্টার রাজি হননি। ওঁরা নিজেরাই স্টেশনের একটু আগে ট্রেনটাকে দাঁড় করাবেন এবং স্টেশনমাস্টার যাতে সহযোগিতা করেন তাই শাসিয়ে গিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল, ওঁরা কেন ট্রেনটা দাঁড় করাতে চাইছেন? তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, ওঁরা কারা?

অর্জুন হাসল, একবার শুনেই আপনি ব্যাপারটাকে সুন্দর সাজালেন। যেহেতু এখন ছ'টা বাজতে বেশি দেরি নেই, এই মেল ট্রেন আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই এলাকা দিয়ে চলে যাবে। তাই আমাদের হাতে বেশি সময়ও নেই। ভুবনেশ্বরে পৌঁছোবার অনেক আগেই মেল ট্রেন সেখান থেকে ছেড়ে আসবে। আমার সন্দেহ, ওই ট্রেনে এমন কিছু নিয়ে আসা হচ্ছে যা অঞ্জলির রহস্যময় মানুষজনের প্রয়োজন হয়েছে। এই জিনিসগুলো আটকাতে পারলেই লোকগুলোর হদিশ জানা যাবে।

অরূপ দত্ত বললেন, ঠিক কথা। আমরা খুরদা স্টেশনে ট্রেনটাকে সার্চ করতে পারি। ওখানে মাত্র এক মিনিট মেল ট্রেন দাঁড়ায়। সার্চ করে কিছু পেতে গেলে অন্তত পনেরো মিনিট দরকার হবে। কোন কামরায় কী আছে তা তো আমাদের জানা নেই।

হয়তো তার চেয়ে বেশি সময় লাগবে। কিন্তু মি. দত্ত, খবরটা অঞ্জলিতে পৌঁছে যাবে। মোবাইল ফোনের দৌলতে সেটা সম্ভব। আর তা হলে আমরা জিনিসগুলোই পাব, লোকগুলো নাগালের বাইরে চলে যাবে। অর্জুন বলল।

তা হলে?

ওরা ট্রেন অঞ্জলিতে ঢোকার মুখে থামিয়ে জিনিসগুলো নামাতে চাইছে। ওদের সেটা নামাতে দিন। তারপরেই আপনারা ওদের হাতেনাতে ধরুন।

কাদের নিয়ে ধরব? এই থানার স্টাফদের চেহারা তো দেখেছেন।

খুরদায় আপনাদের ফোর্স নেই?

গুড আইডিয়া। আছে। তবে আমার এলাকার মধ্যে পড়ে না। ঘড়ি দেখলেন অরূপ দত্ত। তারপর মোবাইল ফোন অন করে নাম্বার টিপলেন, সৎপতি, অরূপ দত্ত বলছি। আমার এলাকা অঞ্জলিতে ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে অ্যাকশন নিতে হবে। আমার পক্ষে এখনই স্টাফ আনানো সম্ভব নয়। তুমি কত লোক দিতে পারবে?

ওপাশের কথা শুনে অরূপ দত্ত বললেন, অ্যাকশন মানে অ্যাকশন। গুলি চালাতে হতে পারে। তুমি সহযোগিতা করলে আমি হোম সেক্রেটারিকে ফোন করে জানাব।

আবার শুনলেন অরূপ দত্ত, ঠিক আছে, কুড়িজন এনাফ। ওদের এখনই তৈরি হয়ে ভুবনেশ্বর থেকে যে মেল ট্রেনটা আটটা নাগাদ খুরদায় একমিনিট থামবে, তাতে তুলে দিয়ে। ওদের লিডার কে? বাঃ, এ তো আমার সৌভাগ্য। তুমি এলে তো কথাই নেই। শোনো, অঞ্জলিতে ট্রেনটা থামে না। কিন্তু দেখবে, অঞ্জলি ক্রস করার আগে ধীরে ধীরে ট্রেনটা থেমে যাবে। ট্রেন থামার পর ঠিক দু'মিনিট অপেক্ষা করবে। দেখবে, কেউ বা কারা ট্রেন থেকে জিনিসপত্র নামাচ্ছে। ঠিক তখনই আমি রিভলভারের গুলি ছুড়ব। শোনামাত্র তোমার লোকজন ওদের চার্জ করবে। আমি চাইছি সবাইকে হাতেনাতে ধরতে। গুলি করলে যেন পায়ের দিকে এইম করে। ওকে?

মোবাইলে দ্বিতীয় নাম্বারে ফোন করে ইংরেজিতে বিস্তারিত জানালেন অরূপ দত্ত। শেষে বললেন, ব্যাপারটা আমাদের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের বোধহয় জানা আছে। ওরা একজন এস আই-কে খোঁজখবর নিতে পাঠিয়েছে। হা স্যার, আপনাকে আমি সাড়ে ন'টা নাগাদ রিপোর্ট করব।

অর্জুন বলল, এখান থেকে খুরদায় গিয়ে ট্রেন ধরা যাবে কি না জানি না, কিন্তু আমরা তো বাই রোড অঞ্জলিতে যেতে পারি।

এখন এ ছাড়া কোনও উপায় তো নেই। অরূপ দত্ত বললেন, এবার ওদের ডেকে নেওয়া যাক। আমার মনে হয়, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি তা এই মুহূর্তে ওদের না জানানোই ভাল হবে।

হাত বাড়িয়ে বেল বাজালেন অরূপ দত্ত। একটি পিয়ন গোছের লোক ঘরে ঢুকতে তিনি বললেন, সত্যেনবাবুদের এখানে আসতে বলো।

ওঁরা এলেন। অরূপ দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, সত্যেনবাবু, থানার গাড়ি দুটো ঠিক আছে?

সত্যেনবাবু গুণধরের দিকে তাকালেন, আছে?

গুণধর মিনমিন করে বলল, একটা একদম ঠিকঠাক আছে। অন্যটা স্টার্ট। নিতে গোলমাল করছে, তবে স্টার্ট নেওয়ার পর দারুণ চলছে।

অরূপ দত্তের মুখে রক্ত জমল। তিনি সত্যেনবাবুর দিকে তাকালেন, পুলিশের একটা গাড়ি খারাপ হয়ে আছে জেনেও সারাতে দেননি কেন? সত্যেনবাবু মাথা নাড়লেন, আমাকে কেউ বলেনি স্যার। আমি তো ওই গাড়িতে চড়ি না। এখনই সারাতে পাঠাচ্ছি স্যার।

দাঁড়ান। ওই গাড়ি সারিয়ে আসার আগেই আপনি রিটায়ার করে যাবেন। এক্ষুনি একটা ভাল বলেরো বা সুমো গাড়ি ভাড়া করে আনুন। আধঘণ্টার মধ্যে চাই।

সত্যেনবাবু হাঁকলেন, গুণধর!

যাচ্ছি স্যার। গুণধর বেরিয়ে গেল।

৪. দুটো গাড়ি রওনা হল

ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট পর দুটো গাড়ি রওনা হল। প্রথমটায় অরূপ দত্ত, অর্জুন এবং হরিরাম। দ্বিতীয় গাড়িটি সুমো, তাতে সত্যেনবাবু, গুণধর, জগন্নাথবাবু এবং চারজন সেপাই। তাদের হাতে বন্দুক। অর্জুন জগন্নাথবাবুকে পরামর্শ দিয়েছিল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে তা যেন সঙ্গীদের না জানান।

জগন্নাথ বললেন, পাগল নাকি। স্যার, আমার সঙ্গে তো একটা রিভলভারও নেই, কিন্তু অ্যাকশনে না নামলে তো প্রমোশন হবে না!

খালি হাতেই বিক্রম দেখাবেন। তা হলে মি. দত্ত নিশ্চয়ই তার রিপোর্টে ভাল লিখবেন।

দুটো গাড়ি হাইওয়ে দিয়ে ছুটছিল। ক্রমশ সন্ধের অন্ধকার নেমে এল চরাচরে। অরূপ দত্ত হরিরামকে বললেন, আপনাদের গ্রাম পাঁচ কিলোমিটার দূরে, তখন বলবেন। এখনও তিরিশ কিলোমিটার বাকি। মুশকিল হল মাঝে মাঝেই মাইলস্টোন উধাও হয়ে গিয়েছে।

হরিরাম বলল, একটা ছোট ব্রিজ পড়বে। সেখান থেকে গ্রামে বাস যায় আধঘণ্টায়। গাড়িতে কম সময় লাগবে।

গাড়ির গ্রামে ঢোকার পথ থেকে স্টেশন কত দূরে? মাইলখানেক রাস্তা। তবে তার আগে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। একটা ভাগ গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে, অন্যটা রেল লাইনের পাশ দিয়ে প্রায় স্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে আবার গ্রামে ঢুকে গিয়েছে।

বলবেন।

পিছনের গাড়ির ড্রাইভারের পাশে বসে সত্যেনবাবু বললেন, গুণধর?

পিছন থেকে গুণধর সাড়া দিল, স্যার।

তোমার আর কত বছর চাকরি আছে?

বাইশ বছর তিন মাস সতেরো দিন।

উঃ! ভাবাই যায় না। তবে তোমার-আমার ভাগ্যের লিখন একই।

বুঝলাম না স্যার।

ভূতের হাতে মৃত্যু, যেটা আজ রাতে হবে। সত্যেনবাবু শ্বাস ফেললেন।

.

মাঝে মাঝে ট্রাক যাচ্ছিল রাস্তাটা দিয়ে। তা নইলে দু'পাশ অন্ধকারে মোড়া। ওঁরা একটা বাঁক নিতেই হরিরাম বলল, আমরা ব্রিজটার কাছে এসে গিয়েছি।

অরূপ দত্তের নির্দেশে গাড়ি দুটো দাঁড়াল। অর্জুন বলল, এখনও প্রায় একঘণ্টা বাকি আছে ন'টা বাজতে। অন্তত আধঘণ্টা আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে। এই অন্ধকারে আলো নিভিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকলে যে-কোনও গাড়ির ড্রাইভার সন্দেহ করবে।

কারেক্ট। অরূপ দত্ত তার জিপ থেকে নেমে টর্চ জ্বেলে রাস্তার দুপাশ দেখে বললেন, বাঃ! গাড়ি দুটোকে ওখানে নামিয়ে দিলে রাস্তা থেকে চট করে কারও নজরে পড়বে না। বেশি ঢালু নয়, গাছগুলোর আড়াল পাওয়া যাবে।

সেই ব্যবস্থাই হল। সত্যেনবাবু নামতে যাচ্ছিলেন সুমো থেকে, জগন্নাথ বললেন, একসঙ্গে বসে থাকলেই তো হত।

কিন্তু আমার ইয়ে পেয়েছে যে।

অন্ধকারে যাবেন? এই অন্ধকারটা ভাল নয়। জগন্নাথ বললেন।

কেন?

অঞ্জলির তেনারা তো এখনই বের হবেন। অন্ধকার বেয়ে এখানে চলে আসা তেনাদের পক্ষে খুব সহজ।

অ! সত্যেনবাবু ফাঁপরে পড়লেন।

তবে একটা উপায় আছে। তেনারা সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে পারেন না। ইনজুরিয়াস টু হেল্থ। সিগারেট ধরিয়ে যান, ধারেকাছে আসবে না। পকেট থেকে একটা সিগারেট আর দেশলাইয়ের বাক্স বের করে অন্ধকারেই এগিয়ে দিলেন জগন্নাথ।

একটু দ্বিধা সত্ত্বেও ও দুটো নিয়ে নীচে নামলেন সত্যেনবাবু। বললেন, বিপদে পড়লে মানুষকে কত কী করতে হয়। স্মোকিং আফটার থার্টি ইয়ার্স।

দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে জোরে জোরে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে তিনি অন্ধকারের দিকে পা বাড়ালেন।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে মুখ ঘোরাতেই অরূপ দত্ত সিগারেটের আগুনের– বাড়া-কমা দেখতে পেলেন। চাপা গলায় ধমকালেন তিনি, কে? হু ইজ দেয়ার?

ততক্ষণে প্রাণপণে ধোঁয়া ছাড়ছেন সত্যেনবাবু। সেই অবস্থায় কথা বলতে পারছেন না। গুণধরের গলা শোনা গেল, স্যার, উনি বড়বাবু।

মাই গড! অরূপ দত্ত গর্জন করলেন, ফেলে দিন, সিগারেট ফেলে। দিন।

সিগারেট মাটিতে ফেলে জুতোর চাপে নিভিয়ে দিলেন তিনি।

অরূপ দত্ত বললেন, এদিকে আসুন। আমরা এখানে কেন অপেক্ষা করছি তা বুঝতে পারেননি? এত সিগারেটের নেশা আপনার?

না স্যার, নেশা নয়। আমি সিগারেট খাই না। জগন্নাথবাবু বললেন সিগারেটের ধোঁয়া তেনারা সহ্য করতে পারেন না। তাই...।

তেনারা মানে? অরূপ দত্ত প্রশ্ন করামাত্র তার মোবাইল বেজে উঠল। তিনি সেটা অন করে কথা বলতে লাগলেন। বলতে বলতে ইশারা করতে লাগলেন, যাতে সত্যেনবাবু গাড়িতে ফিরে যান।

সত্যেনবাবু অন্ধকারে সেটা বুঝতে পারছিলেন না। অর্জুন বলল, বড়বাবু, আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন। সত্যেনবাবু দ্রুত ফিরে গেলেন। .. কথা শেষ করে অরূপ দত্ত বললেন, সব ঠিক আছে। ওরা ট্রেনে উঠেছে।

ট্রেন ছেড়েও দিয়েছে। এখন একটাই প্রার্থনা, ওদের এই ট্রেনে ওঠাটা যেন কারও মনে সন্দেহজনক বলে না মনে হয়।

আশা করি। অৰ্জন বলল, তা হলে যাওয়া যাক। মেল ট্রেন স্টেশনের কাছাকাছি এসে যাবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে।

দুটো গাড়ি আবার রাস্তায় উঠল। হঠাৎ খেয়াল হতে অরূপ দত্ত অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যেনবাবু কাদের কথা বলছিলেন বুঝতে পেরেছেন। তেনারা কারা?

অনেক রকমের ভূতের কথা শোনা যায়। তাদের একত্র করলে তেনারা হয়ে যান।

অ্যাঁ! ভাবুন। পুলিশের একজন ও সি ভূতের ভয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। কাদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর হরিরামের গলা শোনা গেল, ডান দিকের রাস্তাটা ধরবেন, ওটা স্টেশনের কাছাকাছি গিয়েছে।

নামেই রাস্তা, বড় বড় গর্ত সামলে নৌকোর মতো দুলতে দুলতে ওঁরা যখন ট্রেন লাইনের পাশাপাশি একটা বাঁকের মুখে এলেন, তখন নটা বাজতে মাত্র সাত মিনিট বাকি। হরিরাম বলল, আর রাস্তা ধরে যাবেন না। তা হলে...।

বুঝতে পেরেছি। গাড়ি থামান। অরূপ দত্ত বললেন।

গাড়ি থেকে নামার পর দেখা গেল বহু দূরে একটা আলো জ্বলছে। দ্বিতীয় রাস্তায় ঢোকার পর অর্জুনের কথায় গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে দিয়েছিল দুই ড্রাইভার। অন্ধকার তাই এখন চোখে সয়ে গিয়েছে। ট্রেন লাইনটা সামান্য উঁচুতে। অর্জুন সেখানে উঠে স্টেশনের দিকে তাকাতেই বুঝল প্ল্যাটফর্মের উপর আলো রাখা হয়েছে। অর্থাৎ স্টেশনমাস্টার নির্দেশমতো কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। সে রেললাইনে হাত রাখতেই খুব মিহি কাঁপুনি টের পেল, অর্থাৎ মেল ট্রেন আসছে।

নীচে নেমে আসতেই অরূপ দত্ত বললেন, কিছু দেখতে পাওয়া গেল?

হ্যাঁ। স্টেশনমাস্টার আলোর ইশারা দিতে বাধ্য হয়েছেন। ওই ইশারা হল, মেল ট্রেন আসছে। এখান থেকে স্টেশন অন্তত দুশো গজ দূরে। ওরা নিশ্চয়ই স্টেশনের কাছেই মেল ট্রেনটাকে থামাবে। আমাদের আর-একটু এগিয়ে যাওয়া উচিত।

আপনার সঙ্গে রিভলভার আছে?

না। আমি এবার সঙ্গে আনিনি।

অরূপ দত্ত রাইফেলধারীদের সামনে ডেকে নিয়ে বললেন, আমরা ধীরে ধীরে খানিকটা পিছন দিক দিয়ে স্টেশনের দিকে যাব। ট্রেনটা যদি থামে তা হলে তোমরা অপেক্ষা করবে। ওই ট্রেনেও ফোর্স আসছে। ট্রেন থেকে বেআইনি জিনিস নামাবে এখানকার কিছু লোক। তাদের সঙ্গে ট্রেনে আসা আমাদের ফোর্সের লড়াই শুরু হলে ওরা যদি পালাতে চায়, তা হলে আমাদের দিক দিয়ে পালাতে হবে। তখন ওদের পা লক্ষ্য করে গুলি চালাবে তোমরা। আমি 'ফায়ার' বললেই ফায়ারিং শুরু করবে। লেটস গো। অর্জুনবাবু, আপনি, নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আসবেন?

না। আমাকে একটা লাঠি দিন। যদি এদিক দিয়ে কেউ পালাতে চায়...।

সঙ্গে সঙ্গে হরিরাম এবং জগন্নাথ বললেন, আমরাও এদিকে থাকব।

অরূপ দত্ত তার লোকজন নিয়ে চলে যাওয়ামাত্র দুটো আলো ট্রেনলাইনের উপর উঠে এসে দুলতে লাগল। বোঝা গেল, ওরা আলোর সংকেত দিয়ে ট্রেনের ড্রাইভারকে থামবার জন্যে অনুরোধ করছে। একটু পরেই দূরে ছুটন্ত ট্রেনের আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রচণ্ড গতিতে ট্রেনটা ছুটে আসতে আসতে আচমকা গতি কমাতে লাগল। অর্জুন লক্ষ করল, যারা আলোর সংকেত পাঠাচ্ছিল তারা একটুও ভয় না পেয়ে ট্রেনলাইন দুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আলো নাড়তে লাগল। ধীরে ধীরে গতি কমে গেল মেল ট্রেনের। প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি গিয়ে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আগেই অবশ্য লোক দুটো নেমে গিয়েছে ট্রেনলাইন থেকে। ট্রেন থেকে কেউ একজন দরজা খুলে চেঁচিয়ে জিজ্ঞো করল, কী হয়েছে?

সামনে ফিশপ্লেট উড়ে গিয়েছে।

সর্বনাশ! লোকটি সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল।

অর্জুন গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল খানিকটা। পিছনে হরিরাম এবং জগন্নাথবাবু। এবং তখনই কিছু লোক চলে এল ট্রেনের গায়ে, দরজা খুলে গেল। কামরার আলোয় বোঝা গেল বাক্স নেমে আসছে ট্রেন থেকে। এক, দুই করে আটটা বাক্স নামতে দেখল অর্জুন। ঠিক সেই সময় গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠল চরাচর। জিনিসগুলো যারা নামিয়েছিল তারা অবাক হয়ে দেখল, তাদের দু' দিক থেকে সশস্ত্র কিছু মানুষ ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়তে লাগল তারা। ট্রেন থেকে যারা নামছিল তাদের কেউ কেউ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। হঠাৎ হ্যান্ড মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, আত্মসমর্পণ করো, না হলে সবাই প্রাণ হারাবে। ওড়িশা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করো।

কিন্তু এর জবাবে ঝাঁকে ঝাকে গুলি ছুটে এল। অর্জুনের আশঙ্কা হচ্ছিল, নীচ থেকে যারা গুলি ছুড়ছে তাদের রাইফেলের মুখ সামান্য ঘুরলেই তাদের গায়ে গুলি লাগবে। সে সঙ্গী দু'জনকে ইশারা করল মাটিতে বসে পড়তে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গুলির শব্দ থেমে গেল। প্রায় কুড়ি সেকেন্ড ভয়ংকর নীরবতার পর আবার গুলির আওয়াজ শোনা গেল। এবার আওয়াজটা আসছে ওপাশ থেকে। অর্জুন বুঝতে পারল গুলি ছুড়ছেন অরূপ দত্ত এবং তার সঙ্গীরা। ট্রেন থেকে নামা পুলিশরা সেদিকে এগিয়ে যেতে অর্জুন দেখতে পেল, তাদের খুব কাছ দিয়ে একটা ছায়াশরীর নিচু হয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে অর্জুন তাকে অনুসরণ করতে চাইল। লোকটি ক্রমশ ট্রেনলাইন ছেড়ে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছে তাকে কেউ অনুসরণ করছে কি না। সন্দেহমুক্ত হওয়ামাত্র আবার এগিয়ে যাচ্ছে সে। ওদিকে গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গিয়েছে। দুই পুলিশ বাহিনীর মাঝখানে পড়ায় লোকগুলোর এখন আত্মসমর্পণ না করে কোনও উপায় নেই।

বেশ কয়েক হাত দূরত্ব রেখে অর্জুন অনুসরণ করছিল। অন্ধকারের একরকম নিজস্ব আলো থাকে। চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত না হলে সেই আলো দেখতে পায় না। এতক্ষণ গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে আসছিল বলে নিজেকে আড়ালে রাখার সুবিধে পাচ্ছিল অর্জুন। এক-এক সময় ইচ্ছে হচ্ছিল পিছন থেকে লোকটার

উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু ওর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকা খুব স্বাভাবিক। ঝাপালে হয়তো আত্মহত্যা করা হবে।

লোকটা রাস্তার কাছে এসে দাঁড়াল। এটা সেই রাস্তা যেটা স্টেশন থেকে গ্রামের ভিতরে চলে গিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষার পর মাথা নিচু করে খরগোশের মতো দ্রুত রাস্তাটা পেরিয়ে ওপাশে চলে গেল লোকটা। অর্জুন। মুশকিলে পড়ল। লোকটা যদি ওপাশের কোনও গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এদিকে লক্ষ রাখে, তা হলে সে রাস্তা পার হবে যখন, তখন দেখতে পেয়ে যাবে। একবার ট্রিগার টিপলেই তার শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু এর উলটোটাও হতে পারে। লোকটা গাছপালা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে গেলে সে শতচেষ্টা করলেও ওর দেখা পাবে না। এসময় গাড়ির আওয়াজ কানে এল। যে গাড়ি দুটোয় ওরা এসেছিল তারা ওপাশের কঁচা পথ ধরে এগোচ্ছে এই রাস্তায় পড়ার জন্যে। অর্জুন বুঝল এটাই সুযোগ। ওই গাড়ি দুটো নিশ্চয়ই স্টেশনের দিকে আসবে। সে আড়ালে-আড়ালে খানিকটা গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল। এবার হেডলাইট জ্বালিয়ে জিপটাকে আসতে দেখল। অন্ধকারে জিপের হেডলাইটের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। তারপরেই সুমো গাড়িটা সামনে দিয়ে চলে যেতেই সে দৌড়ে রাস্তা পার হল। যাকে অনুসরণ করছিল সে যদি গাড়ির আওয়াজ শুনে দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে হেডলাইটের আলো নিশ্চয়ই কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাকে অন্ধ করে দেবে। এই রাস্তা পার হওয়াটা সে বুঝতেই পারবে না।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পর অর্জুন বুঝতে পারল, তার অনুমান ভুল হয়নি। নইলে পায়ের চাপে শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ শোনা যাবে কেন? অর্জুন কয়েক পা হাঁটতেই দেখতে পেল, ছায়ামূর্তি মাঠের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাঁ হাত কানের গায়ে চেপে ধরা। লোকটা ঘনঘন মাথা নাড়ছে। নিশ্চয়ই মোবাইল ফোনে কাউকে নির্দেশ দিচ্ছে। অর্জুন সন্তর্পণে লোকটার একেবারে পিছনে চলে এসে ডান হাতের পাশ দিয়ে লোকটার মাথায় আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। মোবাইল চলে গেল খানিকটা দূরে। তার আলো জ্বলছিল এবং অস্পষ্ট গলা শোনা যাচ্ছিল।

অর্জুন লোকটার পাশে গিয়ে দেখল, চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। কানের নীচে আঙুল রেখে বুঝল, আঘাতটা বেশি হলেও ও জীবিত আছে। দ্রুত ওর শার্ট টেনে-হিঁচড়ে ছিঁড়ে শরীর থেকে বের করে দুটো হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলল সে। তারপরেই কোমরে গোঁজা রিভলভারটা দেখতে পেল। সেটা টেনে নিয়ে লোকটার পকেট থেকে রুমাল বের করে দুটো পা শক্ত করে বেঁধে ফেলল। এখন জ্ঞান ফিরলেও লোকটার পক্ষে পালানো সম্ভব হবে না।

মোবাইলটা তুলে নিতেই মনে হল, কেউ যেন এদিকে আসছে। সেদিকে রিভলভার তাক করতে চিৎকার শুনল, আমরা, আমরা স্যার।

মাথার উপর হাত তুলে হরিরামকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ এসে দাঁড়ালেন, স্যার, ফাটাফাটি। কী কায়দায় ব্যাটাকে জব্দ করলেন। আহা!

আপনারা কোত্থেকে এলেন?

আপনাকে ফলো করছিলাম। দেখুন, কী ভাল ফলো করেছি, আপনি একটুও টের পাননি। শুধু এই কাজটা যদি আমি করতে পারতাম! লোকটার মুখ দেখার চেষ্টা করলেন জগন্নাথবাবু, ফেস নট নোন।

আপনারা এখনই অরূপবাবুকে খবরটা দিন।

ওখানে যেতে পারব? ফায়ারিং চলছে।

ওটা থেমে গিয়েছে।

ওকে স্যার। জগন্নাথ চলে গেলেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, হরিরামবাবু, একে চিনতে পারছেন?

অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছি না।

মোবাইলের আলো লোকটার মুখের উপর ফেলল, অর্জুন। সঙ্গে সঙ্গে হরিরাম বলল, দেখেছি স্যার। ডাক্তারবাবুর কাছে ওষুধ নিতে এসেছিল।

ডাক্তারবাবু ওষুধ বিক্রি করেন নাকি? বলুন প্রেসক্রিপশন নিতে এসেছিল।

নাঃ। দরোয়ান রামঅবতারজিকে বলেছিল, ওষুধ দরকার, তাই দেখা করবে?

দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ। ওঁরা বাগানে বসে কথা বলছিলেন। আমি উপরের জানলা দিয়ে দেখেছি।

আপনার ছোটমামা সেখানে ছিলেন?

হ্যাঁ।

একে তার আগে দেখেননি? এই গ্রামের লোক নয়?

হতে পারে। আমি তো কারও সঙ্গে মিশি না, আর বেশিদিন এখানে আসিওনি।

অর্জুন মোবাইল ফোনটার শেষ ডায়াল করা নাম্বার দেখল। তখনই একটা গোঙানি বেরিয়ে এল বন্দি লোকটার গলা থেকে। লোকটাকে উঠিয়ে বসিয়ে দিতে মাথাটা বুকের উপর একবার ঝুঁকে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে সেটা সোজা হল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী?

লোকটা অন্ধকারে তাকাবার চেষ্টা করতে মোবাইলের আলো ওর মুখে ফেলল অর্জুন। একটু-একটু করে চেতনা স্পষ্ট হচ্ছে লোকটার। যখন সে বুঝল তার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা রয়েছে, তখন শব্দ করে পাশের ঘাসের উপর থুতু ফেলল।

নাম কী?

প্রশ্ন করে কোনও লাভ হবে না। উত্তর দেব না। গলার স্বর মেয়েলি।

সঙ্গীদের পুলিশের গুলির মুখে ফেলে তুমি একা পালাচ্ছিলে? এতক্ষণে সঙ্গীরা উপরে চলে গিয়েছে। রিভলভারটা সামনে ধরল অর্জুন, এই বস্তুটা তোমার সম্পত্তি। এটা দিয়েই তোমাকে ওদের কাছে পাঠাতে পারি। এখন তো এখানে ভূত নামার কথা। তাই ভূতের ভয়ে কেউ সাক্ষী হতে চাইবে না। কী নাম?

লোকটা মাথা নামাল। সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন লোকটার নাকের উপর রিভলভারের নল ঠেকাল, পাঁচ গুনব। তার মধ্যে কথা না বললে ট্রিগার টিপব।

নাম জেনে কী করবে? যা বলব তাই তো মেনে নিতে হবে।

দাঁড়াও, দাঁড়াও। এই গলা তো আজই শুনেছি, স্টেশনে। স্টেশনমাস্টারকে যখন ধমকি দিচ্ছিলে...! তাই তো?

ওর নাম খবরের খাতায় লেখা হয়ে গেল। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ও।

না। স্টেশনমাস্টার কিছু করেননি। তোমাদের সাহস এত বেড়ে গিয়েছে যে, স্টেশনমাস্টারের ঘরে আর কেউ ছিল কি না তা দেখার প্রয়োজন বোধ করোনি।

এই সময় দূরের রাস্তায় জিপটা এসে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জগন্নাথ, মি. দত্ত আর মি. সৎপতিকে নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন।

অর্জুন বলল, এই লোকটি ওয়ান অফ দ্য রিং লিডার। নাম বলছে না। ওখানে বিপদ বুঝতে পেরে পালাবার চেষ্টা করছিল।

অরূপ দত্ত লোকটার মুখে টর্চ ফেলতেই সৎপতি চেঁচিয়ে উঠলেন, মাই গড! এ তো গজেন! কুখ্যাত টেররিস্ট। পঞ্চাশ হাজার টাকা রিওয়ার্ড ডিক্লেয়ার করা আছে ওর নামে। একবার ধরা পড়েছিল কিন্তু কোর্টে নিয়ে যাওয়ার সময় পালিয়েছিল।

আপনাদের আর-একটা কাজ আছে। এই গ্রামটাকে ভূতমুক্ত করতে হলে মাঠের ওপাশে যে জঙ্গলটা আছে, সেখানে যেতে হবে। এখনও কিছু লোক ওখানে থাকতে পারে। আমার অনুমান ওখানেই ক্যাম্প

আছে। অর্জুন বলল।

আপনার অনুমান ঠিক স্যার। লোকটা আমাকে বসের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ওদিকেই। জগন্নাথ বললেন।

মি. সৎপতি তার বাহিনীকে সুমো গাড়িতে চেপে দ্রুত আসতে বললেন। অরূপ দত্ত বললেন, ওখানে মোট এগারোজন ছিল। ছ'জন মারা গিয়েছে, বাকি পাঁচজনকে অ্যারেস্ট করে স্টেশনের একটা ঘরে বেঁধে রাখা হয়েছে।

ওরা ট্রেন থেকে কী নামাচ্ছিল?

চোখ কপালে উঠেছে মশাই। বাক্সের উপর লেখা সেতার উইথ কেয়ার। বাদ্যযন্ত্র। ভিতরে এ কে ফর্টি সেভেন। একটা ভয়ংকর কিছু করবার পরিকল্পনা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ভুবনেশ্বরে কী করে বাক্সগুলো এল, কী করে এরা ট্রেনে তুলল, তাও মেল ট্রেনে, বুঝতে পারছি না। অরূপ দত্ত বললেন।

চোখে ধুলো দিতে গিয়েছিল। আর মেল ট্রেনে আনার কারণ, রেলপুলিশের সন্দেহ কম হবে। ট্রেনটাকে থামালে যে সময়ে থামবে তা এদের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত সময়। এই সময় কেউ বাইরে আসে না। আমি যদি স্টেশনমাস্টারের ঘরে তখন না থাকতাম, আর স্টেশনমাস্টার যদি ওদের ভয়ে সহযোগিতা করতেন, তা হলে এতক্ষণ অস্ত্রগুলো নিঃশব্দে ওদের ক্যাম্পে চলে যেত। অর্জুন বলল।

.

কয়েক রাউন্ড গুলি চললেও শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পের আটজন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। বন্দিদের খুরদায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেলেন মি. সৎপতি। অর্জুন অরূপ দত্তকে বলল, আর-একটা কাজ বাকি আছে। আমরা এখন হরিরামের মামার বাড়িতে যাব।

গজেনকে জিপে তুলে আনা হল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, মি. দত্ত, ওদের ছ'জন মারা গিয়েছে বললেন, আমাদের কারও কিছু হয়নি তো?

একজন ছাড়া লাকিলি সবাই সুস্থ।

যার কথা বলছেন তার তো এখনই চিকিৎসা দরকার?

কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারে। তার পা ভেঙেছে মনে হচ্ছে। লোকটি কে জানেন। স্বনামধন্য সত্যেনবাবু, বড়বাবুর এসব অভ্যেসে নেই তো।

যাচ্চলে! বড়বাবুর মুখ মনে পড়ে গেল অর্জুনের, বেচারা!

রামঅবতার দরজা খুলে দিল। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, ডাক্তারবাবু কোথায়? তাকে খবর দাও।

ডাক্তারসাব ঘরমে নেহি হ্যায়।

কোথায় গিয়েছেন?

নেহি জানতা সাব!

বিষ্ণুদাসজি?

আভি লোটকে আয়া। রামঅবতার চিৎকার করল, বংশী, এ বংশী।

সিঁড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল বংশী। অর্জুন তাকে বলল, বিষ্ণুদাসজিকে একটু এখানে আসতে বলো, এস পি সাহেব এসেছেন।

উনি তো উপরে ওঠেননি।

রামঅবতার বলছে উনি একটু আগে বাড়িতে ফিরেছেন।

হঠাৎ অন্ধকার থেকে গলা ভেসে এল, কী ব্যাপার অর্জুনবাবু?

বিষ্ণুদাসজি ওদের সামনে এসে অরূপ দত্তকে নমস্কার করলেন।

আপনি ওই অন্ধকারে কী করছিলেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

আর বলবেন না। ক'দিন থেকে শিয়ালের উপদ্রব হয়েছে খুব। বাড়িতে ঢুকেই একটাকে দেখতে পেলাম ওদিকে ছুটে যেতো ব্যারাকবাড়িতে কেউ তো থাকে না। ওখানেই বোধহয় আস্তানা গেড়েছে।

তা কী করে সম্ভব? শিয়াল তো তালা খুলতে পারে না। যাকগে, আপনি কি জানেন ডাক্তারবাবু কোথায় গিয়েছেন? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

ডাক্তার? আর বলবেন না, ওঁর মোবাইলটা হঠাৎ কাজ করছে না। এই গ্রামে তো মোবাইল সারাবার কোনও দোকান নেই। বিকেলবেলায় সাইকেল নিয়ে পাশের গ্রামে গিয়েছেন সারিয়ে আনতে। অনেক রিকোয়েস্ট করেছিলাম, কাল সকালে আমি গিয়ে সারিয়ে আনব, কিন্তু উনি কিছুতেই শুনলেন না। আসলে ওখানে কিছু পেশেন্ট ওঁর উপর খুব নির্ভর করেন, তাঁদের খবর না নিতে পারলে স্বস্তি পান না। কিন্তু আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? এই বংশী, নীচের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওঁদের বসাতে পারিসনি? বোকা কোথাকার! আসুন, আসুন। বিষ্ণুদাসজি এগিয়ে গেলেন।

এই বাড়িতে আসার পর এই ঘরে অর্জুনের ঢোকার প্রয়োজন হয়নি। বিষ্ণুদাসজি আলো জ্বালতেই সে বলল, যাক, এখনও ইলেকট্রিকের আলো আছে। লাইন কাটেনি।

বিষ্ণুদাসজি ওঁদের বসার জন্যে সোফা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, স্বয়ং এস পি সাহেব গ্রামে এসেছেন, সবকিছু তো ঠিকঠাক থাকবে।

অরূপ দত্ত সোফায় বসে বললেন, তা হলে ভূতেরা পুলিশকেও ভয় পায়?

স্যার, আমার সন্দেহ আছে এটা ভুতের কাজ কি না! কিছু দুষ্টু ছেলেও করতে পারে। বিষ্ণুদাসজি বংশীর দিকে তাকালেন, আরে, দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? চা নিয়ে আয়।

না বিষ্ণুদাসজি, চা খাব না। কথা হচ্ছে, এখানে নাকি খুব ভূতের ভয়, সন্ধে হলে কেউ বাড়ির বাইরে যায় না। তা হলে ডাক্তারবাবু সাইকেল নিয়ে পাশের গ্রামে যেতে সাহস পেলেন কী করে? ওঁর মোবাইল নাম্বারটা বলুন তো! অরূপ দত্ত বললেন।

স্যার, প্রয়োজন হয়নি বলে নাম্বার নিইনি।

গজেনকে তো আপনি চেনেন! কী করে আলাপ হল? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

কোন গজেন?

আরে হাফ টাকমাথা, আপনার সঙ্গে এ বাড়িতে এসে দেখাও করেছে।

ও, গজেন। আমি যখন ভুবনেশ্বরে পড়তাম, তখন সহপাঠী ছিল।

তারপর?

আর যোগাযোগ ছিল না, কিছুদিন আগে হঠাৎ এল।

কোত্থেকে এল?

তা বলতে পারব না। ডাক্তারবাবু এখানে এসেছেন তা ভুবনেশ্বর থেকে জেনেই বোধহয় চলে এসেছে। পুরনো দিনের কথা নিয়ে সময় কাটল।

গজেনকে পুলিশ খুঁজছে, তা আপনি জানেন না?

না স্যার! সে কী! খুঁজছে কেন?

আপনাদের গ্রামের পাশে জঙ্গলে ও যে ক্যাম্প করেছে তা নিশ্চয়ই আপনি জানতেন না? অরূপ দত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

বিশ্বাস করুন, এসব আমার অজানা।

আপনার দাদা আপনাকে এখানে ফিরিয়ে আনার কয়েক মাস পরেই কিন্তু ভূতের উপদ্রব শুরু হল। সেই ভূত আপনি প্রথম দেখেন এবং তার পরে গ্রামের মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়ে। এই ভূতের গল্প ফেঁদে রাতটাকে কবজা করার কী কারণ? কেন ওরা অত অস্ত্রশস্ত্র এনে কীসের জন্যে তৈরি হচ্ছিল?

এসব আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? বিষ্ণুদাসজি বিরক্ত।

ডাক্তারবাবুর নাম কী? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

ড. দাস। কাশীনাথ দাস।

এই দেখুন। পকেট থেকে প্রেসক্রিপশনটা বের করল অর্জুন, যেটা ডাক্তার হরিরামকে ওষুধ আনতে দিয়েছিলেন, এখানে ছাপা আছে 'কে এন জানা'। 'কে এন' যদি 'কাশীনাথ' হয়, তা হলে 'দাস' 'জানা হয়ে গেল কী করে? অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

অরূপ দত্ত জানতে চাইলেন, এই ডাক্তারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কী করে হল?

ভুবনেশ্বরে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক ওঁর কথা বলেছিলেন।

আপনি ওঁকে গিয়ে বললেন যে, এই গ্রামে থেকে আপনার দাদার চিকিৎসা করতে হবে আর উনি রাজি হয়ে গেলেন?

না। প্রথমে রাজি হননি। অনেক অনুরোধ করার পর মোটা টাকার বিনিময়ে উনি রাজি হয়েছেন। এখানে এসে চিকিৎসা শুরু করার পর দাদা ভাল ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ওঁর শরীরের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় ডাক্তার চলে যেতে পারেননি।

এই যে উনি এতদিন এখানে আছেন তার জন্যে যা প্রাপ্য তা ওঁকে দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, প্রথম পনেরো দিনের চেক উনি নিয়েছেন?

চেকে কি 'ড. কে এন দাস' লেখা হয়েছিল?

না। উনি বেয়ারার চেক দিতে অনুরোধ করেছিলেন।

অর্জুন অরূপবাবুকে নিচু গলায় কিছু বলে জগন্নাথবাবুকে অনুরোধ করল, জিপ থেকে আমাদের নতুন অতিথিকে নামিয়ে আনুন। আপনি একা পারবেন না। অন্যদের সাহায্য নেবেন, সাবধান! মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেলেন জগন্নাথবাবু।

আপনার দাদার মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি তো আপনি পাবেন? অরূপ দত্ত বললেন।

বোধহয় না স্যার। বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। তারপরেও দাদা আমাকে ফিরিয়ে এনে লিখিয়ে নিয়েছিলেন, আমি কোনওদিন সম্পত্তি দাবি করব না।

অরূপ দত্ত বললেন, কিন্তু আইন ওই ত্যাজ্যপুত্র করা ব্যাপারটাকে মেনে নেবে না তা আপনার জানা আছে।

না। আমি জানি না। বিষ্ণুদাসজি যেন অস্বস্তিতে পড়লেন।

আপনার বাবা কি ওটা আদালতে নিয়ে গিয়েছেন?

জানি না।

দ্বিতীয়ত, কাগজে দাদাকে কী লিখে দিয়েছেন তা অস্বীকার করলে আদালতে ধোপে টিকবে না। বিষ্ণুদাসজি, তুলসীদাসজির একমাত্র ভাই হিসেবে আপনি সম্পত্তির দখল পাবেন, তবে তার জন্যে তুলসীদাসজিকে মারা যেতে হবে?

আপনি কী বলছেন? আমি এসব ভাবিইনি।

এসময় জগন্নাথ এবং একজন সেপাই ধরে ধরে নিয়ে এলেন গজেনকে। তাকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বিষ্ণুদাসজি। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, আপনার সহপাঠী। জেল পালানো আসামি। ওকে ধরে দিতে পারলে সরকার পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে। বিষ্ণুদাসজি, টাকাটা নেবেন নাকি?

হঠাৎ গজেন চেঁচিয়ে উঠল, বিষ্ণু!

বিষ্ণুদাসজি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমি কিছু বলিনি, বিশ্বাস করো।

অরূপ দত্ত গজেনকে জিজ্ঞেস করলেন, বিষ্ণুদাসের সঙ্গে কলেজের পর শেষ কবে দেখা হয়েছিল? সত্যি কথা বললে কিছুটা লাভ হবে।

বছর আড়াই আগে।

কোথায়?

হায়দরাবাদের জেলে। ওর ছমাস জেল হয়েছিল, আমার ন'মাস।

কেন?

খুব সামান্য ব্যাপার। মনে করতে ভাল লাগছে না।

এখানে এলে কী করে?

কয়েক বছর আগে ওর সঙ্গে এখানে এসে কিছুদিন থেকে গিয়েছিলাম। তখনই এই জায়গাটা খুব পছন্দ হয়েছিল।

অর্জুন বলল, মনে হচ্ছে তুমি মিথ্যে বলছ না। এবার বলো, কোন কারণে এই গ্রামটাকে পছন্দ হয়েছিল?

গজেন জবাব দিল না। অরূপ দত্ত ধমক দিলেও চুপ করে থাকল।

ড. কে এন দাস অথবা কে এন জানার খবর বিষ্ণুদাসজিকে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

কেন?

বিষ্ণু ওইরকম একজনকে চাইছিল। কোনও ভাল ডাক্তার তার প্র্যাকটিস ফেলে এখানে পড়ে থাকবে না। কাশীনাথ থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়ার পর পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু যে-কোনও ডাক্তারের মতো চিকিৎসা মোটামুটি করতে পারত।

অরূপ দত্ত বিষ্ণুসজিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জানতেন উনি ডাক্তারি পাশ করেননি?

বিষ্ণুদাসজি মাথা নিচু করলেন।

গজেন, তোমার সঙ্গীরা কেন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত? কেন রাতের বেলায় ভূতের ভয় দেখিয়ে গ্রাম জনশূন্য করে তোমরা বের হতে?

ওদের অধিকাংশই ওড়িয়া বা বাংলা বলতে পারে না। তেলুগু এই গ্রামের কেউ বুঝবে না, উলটে সন্দেহ করবে। তাই!

অর্জুন হাসল, আমার সন্দেহ হচ্ছিল। এখন বুঝতে পারছি, সন্দেহটা ভুল হয়নি। এখান থেকে বর্ডার কত দূরে?

জগন্নাথ এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, এবার মুখ খুললেন, এই গ্রামের পরেই ওই যে নদীতে আমাকে মাছ ধরতে দেখেছিলেন, তার ওপারেই অন্ধ্রপ্রদেশ শুরু। কাকুলাম বেশি দূর নয়।

অর্জুন অরূপ দত্তকে জিজ্ঞেস করল, অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিশ ওড়িশায় আসতে পারে?

অনুমতি নিতে হয়, আর এই সুযোগটাই অপরাধীরা নিয়ে থাকে।

গত কয়েক মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের এই দিকটায় যেসব ডাকাতি বা অপহরণের ঘটনা ঘটেছে তার খোঁজ নিলে গজেনরা কেন এখানে ক্যাম্প করেছে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। গজেন যেসব অস্ত্র আজ মেল ট্রেনে এখানে আনতে চেয়েছিল সেগুলো রাখার জন্যে একটা ডবল জায়গা দরকার। তাই না? অর্জুন জিজ্ঞেস করতে গজেন বিষ্ণুদাসজির দিকে তাকাল। বিষ্ণুদাসজি মাথা নাড়লেন। অর্জুন বলল, অস্ত্রগুলো যখন হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, তখন বলতে আপত্তি নেই। আপনি শিয়াল খুঁজতে যেখানে গিয়েছিলেন তার চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় পাওয়া যাবে বিষ্ণুদাসজি? তুলসীদাসজি থাকলে আপনার অনেক অসুবিধে হচ্ছিল। অথচ ওঁর বোনরা যেভাবে পাহারা দিচ্ছেন তাতে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে খুন করাও আপনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ডাক্তার হিসেবে একজনকে আনিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। অর্জুন কথা শেষ করল।

অরূপ দত্ত বললেন, তা হলে বিষ্ণুদাসজি, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। তিনি ইশারা করতে একজন সেপাই এগিয়ে গিয়ে বিষ্ণুদাসজির জামার কলার চেপে ধরল।

অর্জুনের দিকে তাকিয়ে অরূপ দত্ত বললেন, চলুন, আজ আপনি আমার অতিথি।

অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এখনও একটা কাজ বাকি আছে। অর্জুন বলল।

সেটা কী?

ছোটভাই পড়তে গিয়ে দুষ্কর্ম করছে জেনে বাবা অপমানিত হয়েছেন। তাকে পুলিশ খুঁজছে জেনে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। তা সত্ত্বেও বাবার জীবিতকালে বড়ভাইয়ের মনে স্নেহ এতটাই প্রবল হল যে, তিনি ছোটভাইকে লুকিয়ে এই বাড়ির বাগানের কোণে ব্যারাকবাড়িতে আশ্রয় দিলেন। শুধু সে একা নয়, তার দুই অপরাধী বন্ধুও এখানে এসে থাকল, যার একজন গজেন। শুধু তাই নয়, ছোটভাইকে আবার পড়াশুনোর জন্যে কলকাতায় পাঠালেন তিনি। বাবার মৃত্যুর পরেও ছোট ভাইয়ের খরচ মিটিয়েছেন। সেই ছোটভাই বিয়ে করে বস্তিতে বাস করছে জেনেও তাঁর স্নেহ কমল না। যখন তিনি জানলেন ছোটভাই হায়দরাবাদের জেলে ঘানি টানছে তখন ছুটে গেলেন তার কাছে। সাজা শেষ হওয়ার পর পরম আদরে আবার এই বাড়িতে নিয়ে এলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এসব করলেন? এত স্নেহ বোধহয় রামচন্দ্রেরও ভাইদের প্রতি ছিল না। অর্জুন হাসল।

অরূপ দত্ত বললেন, সত্যি, বিশ্বাস করা খুব শক্ত।

এর পিছনে, আমার অনুমানের কারণ একটাই। ছোটভাই একটার পর-একটা অন্যায় করে যাচ্ছে, আর বড়ভাই তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বড়ভাই জানতেন, বাবা যতই ত্যাজ্যপুত্র করুন না কেন, আদালতে সেটা টিকবে না। সম্পত্তি নেব না বলে যে ডিক্লেয়ারেশন স্ট্যাম্প পেপারে ছোটভাই দিয়েছেন, তা খারিজ করা একজন উকিলের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু বড়ভাই চাননি সম্পত্তি ছোটভাই পাক। তাই তিনি বোন এবং ভাগনেকে এখানে এনে রেখেছেন। আর তাঁর জানা ছিল, আগুনের দিকে পতঙ্গকে ঠেলে দিতে হয় না, তার সামনে আগুন জ্বেলে দিলেই কাজ হয়ে যায়। আমার সন্দেহ, ছোটভাইকে তিনি অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। সে গজেনকে নিয়ে যে ভয়ংকর অপরাধচক্র তৈরি করেছে, তাও তার জানা ছিল। তিনি অভিনয় করছিলেন, তাঁর স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। আর এই অভিনয় ছোটভাই বিশ্বাস করেছিল। এসময় তিনি আমার শরণাপন্ন হন। আমি এসে ছোটভাইকে ওই অপরাধচক্রের একজন হিসেবে প্রমাণ করে দিলে কয়েক বছর জেলে বাস করতে হবেই। বড়ভাই এই কাঁটা দূর করতে ভাড়াটে খুনিকে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কোনও সাক্ষী রাখতে চাননি। আমি জানি না এই ধরনের অপরাধকে আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কি না! অর্জুন বলল।

অরূপ দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে স্লো-পয়জনের ব্যাপারটা ওঁর জানা ছিল না?

এটা রহস্যময়। স্লো-পয়জন্ড পেশেন্টের চেহারা ওঁর নয়। এমন হতে পারে উনি ডাক্তারকে কিনে নিয়েছেন। ডাক্তার ডবল রোলে অভিনয় করছেন। ওঁর খাটের পাশে যেসব ওষুধ দেখেছি, তা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে রাখা হয়েছে, এটাও হতে পারে। অর্জুন বলল, ব্যাপারটা ডাক্তারকে পেলে স্পষ্ট হবে।

এই সময় বাড়ির বাইরে গাড়ির শব্দ হল। হরিরাম বাইরে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ফিরে এল মি. সৎপতিকে নিয়ে। অরূপ দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, সব ব্যবস্থা হল?

মি. সৎপতি বললেন, ভোরের ট্রেনে ওদের নিয়ে যাওয়া হবে। আশ্চর্য ব্যাপার, আপনারা এই বাড়িতে আছেন তা আমি জানতাম না। আমার ফোনের ব্যাটারি ডাউন হয়ে গিয়েছে। কী করে যোগাযোগ করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

তা হলে এখানে এলেন কী করে? অরূপ দত্ত হাসলেন।

আরে স্টেশনমাস্টারের ভিতরের ঘরে একজন লুকিয়ে বসে ছিল। বলল, ট্রেনের খবর নিতে এসেছিল, গোলাগুলি চলছে দেখে ভয়ে লুকিয়ে পড়েছে। ও কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, এই গ্রামের অতিথি। সত্যি কি

যাচাই করতে যেতে এই বাড়িতে নিয়ে এল। বলল, এই বাড়ির মালিক বিষ্ণুদাসজির অতিথি হয়ে আছেন। বিষ্ণুদাসজি কে?

অরূপ দত্ত দেখিয়ে দিলেন। বিষ্ণুদাসজির জামার কলার তখনও সেপাইয়ের মুঠোয়। মি. সৎপতি চমকে উঠলেন, এ কী!

অরূপ দত্ত বললেন, গজেনের সহকর্মী। অন্যতম মদত এই লোকটি দিয়েছেন।

মি. সৎপতি বেরিয়ে গেলেন বাইরে। মিনিটখানেকের মধ্যে ফিরে এলেন যাকে নিয়ে তাকে দেখে হরিরাম চেঁচিয়ে উঠল, ডাক্তারবাবু!

তা হলে একে চেনেন আপনি? মি. সৎপতি হরিরামের দিকে তাকালেন।

অর্জুন বলল, উনি ডাক্তারি পাশ না করেও ডাক্তার সেজে ছিলেন এই বাড়িতে। এই চক্রের একজন। বুঝতেই পারছেন কাশীনাথ দাস বা জানা, আপনি ধরা পড়ে গিয়েছেন। তুলসীদাসজির যে স্মৃতিবিভ্রম হয়নি তা আপনি জানতেন?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ।

তাঁকে এমন কোনও ইঞ্জেকশন দেননি যা তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে? তাই তো? কত টাকা পেয়েছেন সে জন্যে?

ডাক্তার একবার বিষ্ণুদাসজির দিকে তাকিয়েই মাথা নামালেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুদাসজি চিৎকার করলেন, ডাক্তার, তুমি বিশ্বাসঘাতক। খুন করে ফেলব!

ডাক্তার নড়লেন না।

তিনজনকে গ্রেফতার করে বাইরে নিয়ে যাওয়ামাত্র উপর থেকে কান্না ভেসে এল। দুই মহিলা চিৎকার করে কাঁদছেন। অর্জুন, অরূপ দত্ত এবং হরিরামের সঙ্গে মি. সৎপতিও ছুটলেন উপরে।

এক বোন ধরে রেখেছেন তুলসীদাসজিকে। তাঁর মুখ বেঁকে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বোন চিৎকার থামিয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, দাদা বিষ খেয়েছে। বাঁচান, বাঁচান ওকে।

দ্রুত নীচে নামানো হল তুলসীদাসজিকে। অরূপ দত্তের জিপে তুলে পাঠানো হল খুরদার হাসপাতালে। অরূপ দত্ত বললেন, কপাল খুব ভাল বলে ভদ্রলোক হাসপাতালে জীবিত অবস্থায় পৌঁছোতে পারলেন।

.

সেই রাতে ওঁরা অঞ্জলি গ্রামেই থেকে যাবেন বলে স্থির করলেন। হরিরাম ব্যবস্থা করল। মি. সৎপতি বললেন, অর্জুনবাবু, আপনি নিশ্চয়ই আপসেট?

কেন? অর্জুন তাকাল।

আপনাকে সম্মানদক্ষিণা দেওয়ার অবস্থায় তুলসীদাসজি থাকলেন না। তবে অন্যভাবে সেটা মিটে যাবে।

কীভাবে?

গজেনকে ধরার জন্যে পঞ্চাশ হাজারের রিওয়ার্ড আপনি পাবেন।

না। মাথা নাড়ল অর্জুন, গজেনকে তো আমি ধরিনি।

সে কী? কে ধরেছে?

জগন্নাথবাবু। খালি হাতে ওকে ধরেছেন তিনি। ওঁর নাম দেবেন।

ওকে! ঠিক আছে।

হঠাৎ একটা কান্নার আওয়াজ কানে এল। সবাই অবাক হয়ে দেখলেন, জগন্নাথ দু হাতে মুখ ঢেকে কান্না থামাতে চাইছেন।